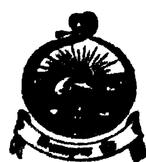
যুগনায়ক বিবেকানন্দ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রচার

স্বামী গম্ভীরানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৭৩

মুদ্রাকর

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ইকনমিক প্রেস

২৫ রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য-ষোল টাকা

প্রাগ্‌বাণী

"নরেন শিক্ষে দেবে"—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্ত-লিখিত 'চাপরাশ' লইয়া 'ঈশ্বরকোটি' স্বামী বিবেকানন্দ জগতে প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বামীজী কি প্রচার করিলেন, কেন প্রচার করিলেন, কি ভাবে প্রচার করিলেন ইত্যাদি কথা আমরা প্রচলিত গ্রন্থাবলী এবং অধুনা প্রকাশিত *Reminiscences of Swami Vivekananda*, *Swami Vivekananda in America : New Discoveries* by Marie Louise Burke ইত্যাদি পুস্তকাবলম্বনে পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি। এই প্রচারপর্ব বা মধ্যলীলার আলোচ্যকাল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই স্বামীজীর চিকাগো মহানগরে প্রথম পদার্পণ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতে প্রত্যাগমনের পরে কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ কয়েক দিনের কার্যাবলী পর্যন্ত। এ সময়ে তিনি প্রচারকার্যে বা তাঁহার অমূল্য চিন্তারাজিকে বাঙ্ময় রূপপ্রদানেই প্রধানতঃ নিরত ছিলেন। কত দুঃখকষ্ট, বাধা-বিপত্তি, অভাব-অনটন, বিদেশ-বিভুঁই-এ নানাবিধ মিথ্যা কুৎসা ও বিপরীত সংস্কারের মধ্যে যে এই প্রচারপর্ব উদ্‌যাপিত হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। অথচ কেমন অটল ছিল তাঁহার সঙ্কল্প! হিতাকাঙ্ক্ষী আমেরিকান বন্ধুরা যখন তাঁহাকে এই দুঃসাহসিকতার জন্য সাবধান করিয়া দিতেন, তখন তিনি নিজেকে 'জ্যোতির তনয়' বলিয়া পরিচয় দিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার, তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবো?" ('বাণী ও রচনা', ৭।৩৬৪)। আর প্রচারে উৎসাহ দিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে লিখিয়াছিলেন, "একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর্‌—তোলপাড় কর্‌ দুনিয়া। কি ব'লব আপসোস—যদি আমার মতো দুটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।...একটাকে চীনদেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা।"(ঐ, ৭।২১০-১১)।

বিস্ময় জাগে মনে, কি করিয়া এই কপর্দকহীন সন্ন্যাসী বিশ্বের সমস্ত মানবের দ্বারে দ্বারে ভারতীয় ঋষিদের সার্বদেশিক, সার্বকালিক অখণ্ড আত্মার

বাণী শুনাইয়া আসিলেন; আর তখনই মনে পড়ে তাঁহারই কথা, "যতদিন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর দাবাবার জো আছে?" কিন্তু শুধু বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমেই তো তাঁহার বার্তা বিঘোষিত হয় নাই, তাঁহার বাণীর প্রকৃত বাহক ছিল তাঁহার সীমাহীন প্রেম। তিনি সারা বিশ্বকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বমানবও তাঁহাকে পাইয়াছিল নিকট আত্মীয়রূপে। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "আমি অশরীরী বাণী," "আমি জগতের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।" আর জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহের মৃত্যু হইলেও তাঁহার বাণী অমর: "এমনও হইতে পারে যে, আমি হয়তো বুঝিব—এই দেহের বাহিরে যাওয়া, এই দেহকে জীর্ণ পোশাকের মতো ফেলিয়া দেওয়াই আমার পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি কোন দিন কর্ম হইতে ক্ষান্ত হইব না। যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করিতেছে, ততদিন আমি সর্বত্র—মানুষের মনে প্রেরণা জাগাইতে থাকিব।" ('বাণী ও রচনা', ১০।২৭৫)।

বর্তমান গ্রন্থে প্রচলিত পুস্তকাদি হইতে সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনা সংগ্রহের সাধ্যানুরূপ চেষ্টা হইয়া থাকিলেও আমরা জানি যে, স্বামীজীর জীবনের অনেকখানিই আমাদের নিকট অজ্ঞাত এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এখনও নূতন তথ্যাবিষ্কারে নিরত আছেন। আমরা সে শুভদিনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব থাকিব, যেদিন ঐগুলি ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হইয়া মানবসমাজকে নবতর ও কল্যাণতর পথে উন্নীত করিবে। তথাপি আজ পর্যন্ত যেসব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করারও একটা সার্থকতা আছে জানিয়াই আমরা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি। ইতি

বেলুড় মঠ
জন্মাষ্টমী ১৩৭৩

নিবেদক
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

আমেরিকার প্রথম দিনগুলি

সুবিস্তৃত মহানগর চিকাগো বিশাল সাগরতুল্য মিশিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত। বিশ্বমেলা উপলক্ষে তথায় বিরাট লোকসমাগম হইয়াছে। স্বামীজী যখন সেখানে পৌঁছিলেন, তখন নানা দিগ্‌দেশাগত নরনারী রাস্তায় ভিড় করিয়া চলিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি মুখও স্বামীজীর পরিচিত নহে। অচেনা শহরে নিজের জিনিসপত্র লইয়া তিনি বিব্রত; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক নাই। এদিকে সুযোগ বুঝিয়া সকলে তাঁহাকে ঠকাইতেছে—কুলিরা পর্যন্ত ন্যায্য পাওনার চারিগুণ আদায় করিতেছে, আর এই কিম্ভূত-কিমাকার পোশাক পরিহিত অদ্ভুতদর্শন লোকটিকে দেখিয়া কেহ বিদ্রূপ করে, কেহ হাততালি দেয়, দুষ্ট ছেলের দল পিছু লইয়া নানা প্রকারে বিরক্ত করে। একে অনাহার ও শীতে তিনি জর্জরিত, তাহার উপরে এই অত্যাচার! অবশেষে তিনি একটি হোটেলে আশ্রয় লওয়াই উচিত মনে করিলেন; আর হোটেল-ওয়ালাও বুঝাইয়া দিল, ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তিনি বুঝিলেন, কথাটা ঠিক, যদিও হোটেলের খরচ অনেক।

চিকাগোয় তিনি প্রায় বার দিন ছিলেন। নগরে পৌঁছিবার দ্বিতীয় দিন হইতেই তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশ্বমেলা দেখিতে লাগিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পসৃষ্টি ও কলাকৌশল এখানে সমবেত হইয়া যেন দর্শকের দৃষ্টি ও প্রশংসার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। মেলার সকল স্থানই তিনি দেখিলেন; বিপুলকায় যন্ত্রপাতি হইতে কারুকার্যখচিত ব্যসনদ্রব্য পর্যন্ত সমস্তই তাঁহাকে চমৎকৃত করিল বটে, কিন্তু এই সমস্তের মধ্য দিয়া মানবাত্মার যে অসীম উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাই তাঁহাকে অধিকতর মুগ্ধ করিল। তথাপি এমন পরিবেশ-মধ্যেও তিনি ছিলেন বন্ধুহীন, একা সারাদিন আপনমনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় একাকী ক্লান্তদেহে হোটেলে ফিরিতেন; পরদিন আবার দেখা শুরু হইত—কি ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি আর কেমন পরিপাটি বন্দোবস্ত! সব তিনি দেখিতেন, সব কিছু হইতেই শিখিতেন।

কিন্তু স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এমন এক আকর্ষণীয় বস্তু ছিল যে, তিনি কোথাও দীর্ঘ দিন অজানা থাকিতে পারিতেন না—বিশ্বমেলায়ও ক্রমে তাঁহার

প্রতি লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই কয়দিনে যাঁহাদের সহিত স্বামীজীর আলাপ জমিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের কথা স্বামীজীর ২০শে অগস্ট তারিখের পত্রে পাই। ঐ পত্রে তিনি চিকাগো সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম—সে এক বিরাট ব্যাপার; অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব। বরদ রাও যে মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী চিকাগো সমাজের মহা গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থ-সাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এবার এখানে বড় দুর্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে।" অপর ব্যক্তির নাম লালুভাই।[১] ইনি চিকাগো হইতে বস্টন পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বস্টনের কথা আমরা পরে বলিব।

চিকাগোর একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনা স্বামীজী উল্লেখ করিয়াছেন; উহা হইতেও বুঝা যায়, তিনি ইতোমধ্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন: "চিকাগোয় সম্প্রতি বড় একটা মজা হইয়া গিয়াছে। কপূরতলার রাজা এখানে আসিয়াছিলেন, আর চিকাগো-সমাজের কতকাংশ তাঁহাকে কেষ্ট-বিষ্টু করিয়া তুলিয়াছিল। মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বড়লোক, আমার মত ফকিরের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? এখানে একটা পাগলাটে, ধুতিপরা মারাঠি ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি, এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহারা দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি; আর এই সত্যবাদী (?) সম্পাদকেরা—যাহার জন্য আমেরিকা বিখ্যাত—এই লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব-আরোপের ইচ্ছায় তার পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বাহির করিল; তাহারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিল—অবশ্য

১ স্বামীজীর ইংরাজী চিঠিতে Lulloobhoy বানান অনুযায়ী নামটি "ললুভাই" হইতেও পারে।

আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছিল। আমাকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়া আমার মুখ দিয়া তাহারা এমন সকল কথা বাহির করিল, যাহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই; তারপর এই রাজার সম্বন্ধে মারাঠি ব্রাহ্মণটি যাহা যাহা বলিয়াছিল, সব আমার মুখে বসাইল। আর তাহাতেই চিকাগো-সমাজ একটা ধাক্কা খাইয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করিল। এই মিথ্যাবাদী সম্পাদকেরা আমাকে দিয়া আমার দেশের লোককে বেশ ধাক্কা দিলেন। যাহা হউক—ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই দেশে টাকা অথবা উপাধির জাঁক-জমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৬২-৬৩)।

সাংবাদিকগণ সত্যই স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও তাঁহার বিষয়ে সবিশেষ জানিবার আগ্রহে মেলাভূমিতে কিংবা সুযোগ অনুযায়ী অন্যত্র তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি যে হোটেলে ছিলেন, সেখানকার মালিকের নিকট হইতেও ইঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার চেহারা এবং চাল-চলনে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এইরূপ না হইলেই বরং আশ্চর্য মনে হইত। ক্রমে তিনি নিজেও এই নূতন পরিবেশের সহিত পরিচিত হইয়া নিজেকে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইলেন। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে একটা নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া পড়িত। মেলাভূমি ও অন্যত্র অনেকের সহিত আলাপ হইলেও তাঁহার কোন বন্ধু জোটে নাই, অর্থ-সাহায্য তো দূরের কথা। এ পর্যন্ত তাঁহাকে একান্তই আপন শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইতেছিল। মেলার উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত এই সাময়িক দুশ্চিন্তা মিশ্রিত থাকিলেও একটি বিষয়ে তিনি সর্বদাই নিশ্চিত ছিলেন—বিধাতার বিধানেই তিনি আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, অতএব যেমন করিয়াই হউক, বিধাতা শেষ পর্যন্ত পথ করিয়া দিবেন।

চরম সাফল্য বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ মানুষকেও সাময়িক বিপত্তি স্বীকার করিতে হয়; স্বামীজীও ঠিক এমনি সময়ে একটা বড় বিপত্তির সম্মুখীন হইলেন। চিকাগোয় দিন কয়েক কাটিয়া গেলে তিনি একদিন মেলাক্ষেত্র-বিষয়ক সংবাদ-পরিবেশনের কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য জানিতে চাহিলেন। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাসভার অধিবেশন কবে হইবে, তখন শুনিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলেন যে, উহা সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে আরম্ভ হইবে না। তিনি আর এক দুঃসংবাদ পাইলেন যে, সঙ্গে উপযুক্ত

পরিচয়পত্রাদি না থাকিলে কাহাকেও ঐ সভায় প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হইবে না, অধিকন্তু তখন আর প্রতিনিধি গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না, কারণ উহার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্বামীজীর মন প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখনও মহাসভার প্রায় এক মাস বাকি; তিনি অনেক আগে চলিয়া আসিয়াছেন। আবার সে আসাও বৃথা হইল, কেননা মহাসভার মঞ্চে তিনি প্রবেশাধিকার পাইবেন না। সবই নিষ্ফল হইল! এতটা বিফলতা সহ্য করা সত্যই কঠিন। আর এই সহজ কথাটাও তো তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, প্রতিনিধি হইতে গেলে কোনও প্রতিষ্ঠানের ছাপ লইয়া আসিতে হয়; নিজের দায়িত্বে কেহ কখনও কাহারও প্রতিনিধি হয় না। ভাবপ্রবণ ভক্তদের কথায় চলিয়া বড়ই ভুল হইয়া গিয়াছে; আশ্চর্যের বিষয় এই এতগুলি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ভারতীয়ের চিত্তে এই সহজ সরল কথাগুলি একবারও উঠে নাই! ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন: "তাঁহাদের (অর্থাৎ ভক্তদের) অসীম শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোমধ্যে একথা কখনও উদিত হয় নাই যে, মানবজগতে যাহা অসম্ভব তাঁহারা এমনই একটা কিছুর দাবি করিতেছিলেন—তাঁহারা মনে করিতেছিলেন, বিবেকানন্দের শুধু উপস্থিত হওয়া আবশ্যক এবং উপস্থিত হইলেই তিনি সমস্ত সুযোগ অবশ্য পাইবেন। জাগতিক রীতিনীতি সম্বন্ধে শিষ্যরা যেমন স্বামীজীও তেমনি অতি সরল বিশ্বাসই পোষণ করিতেন। তিনি যখন একবার বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এই প্রচেষ্টার জন্য ভগবানের আদেশ পাইয়াছেন, তখন আর পথের বিঘ্নের কথা ভাবিতে পারিলেন না। হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিতে যিনি আগত, তিনি যখন বিশ্বের ঐশ্বর্য ও শক্তি-ভাণ্ডারের দৃঢ়সুরক্ষিত দ্বারপথে প্রবেশের জন্য পা বাড়াইলেন, তখন কেহই যে তাঁহার কথা ঘোষণা করিল না, কিংবা তিনি যে সঙ্গে করিয়া যথারীতি কোনও পরিচয়পত্র আনিলেন না, ইহাই কি এই বিষয়ে অনন্যনিরপেক্ষ প্রমাণ নহে যে, হিন্দুসমাজ তখনও সম্পূর্ণ সংহতিবিহীন ছিল?"

এদিকে তাঁহার একমাত্র সম্বল ভক্তদের প্রদত্ত অর্থ দ্রুত নিঃশেষ হইতে চলিল। হোটেলের ব্যয় অসম্ভব বেশী; আবার অপরিচিত স্থানে বিদেশীকে ঠকাইয়া সকলেই অধিক লাভবান হইতে চায়। তিনি নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত-চিত্তে আলাসিঙ্গার নামে লিখিত ২০শে অগস্টের এক পত্রে মাদ্রাজের ভক্তদিগকে জানাইলেন, "এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড

দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মতো টাকা খরচ করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিসের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, জগতের অপর কোন জাতি যেন কোনমতে এদেশে ঘেঁষিতে না পারে।... এখানে আসিবার পূর্বে যেসব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছে, এদেশ হইতে চলিয়া যাই ; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।" (ঐ, ৬।৩৬১)

সিদ্ধান্ত তাঁহার অবিচল রহিল, বিশ্বাসও অটুট রহিল ; কিন্তু বাস্তবকে তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না, বন্ধুবান্ধবহীন চিকাগো মহানগরে রিক্তহস্তে বাস করাও চলে না। পরিচিত শুভকামীদের পরামর্শে তিনি স্থির করিলেন, চিকাগো ছাড়িয়া আমেরিকার পূর্বকূলে বস্টনে যাইবেন, কেননা ব্যয় সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প। বস্টন পর্যন্ত তাঁহার রেলের সাথী ছিলেন শ্রীযুক্ত লালুভাই ; আর ভগবান অপ্রত্যাশিতভাবে একজন সহৃদয় বন্ধু জুটাইয়া দিলেন, তিনি ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের ব্রিজি মেডোজ নামক একটি গোলাবাড়ির স্বত্বাধিকারিণী বর্ষীয়সী শ্রীমতী ক্যাথেরিন এবট স্যানবর্ন। এই বস্টন অঞ্চলে গমন এবং শ্রীমতী ক্যাথেরিন (বা সংক্ষেপে কেট) স্যানবর্ন সম্বন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন : "আমি এক্ষণে বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়িতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকটে রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে ; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন !!! এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রূপ —এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস ! জানিবে, কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই।" (ঐ, ৩৬১)।

মিস স্যানবর্নকে স্বামীজী বৃদ্ধা বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি তখনও আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টিতে বৃদ্ধা নহেন; তিনি তখন প্রৌঢ়া এবং বয়স চুয়ান্ন। কর্মোদ্যম তাঁহার তখনও যথেষ্ট ছিল এবং স্বামীজীকে লইয়া এখানে সেখানে যাইতে আনন্দই পাইতেন। সমাজেও বাগ্মী ও লেখিকা হিসাবে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। অতএব এই মহিলার সাহায্যে স্বামীজী শীঘ্রই ঐ অঞ্চলের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য সমাজে সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারই সাহায্যে তিনি অধ্যাপক ডাঃ রাইট-এর সহিত পরিচিত হন এবং সেই সূত্রে ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধির আসন লাভ করেন। আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি শ্রীমতী স্যানবর্নের সহিত ১৮ই অগস্ট ঘোড়ার গাড়িতে দশ মাইল দূরবর্তী একস্থানে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যান। এতদ্ব্যতীত বস্টনের একটি মহিলা ক্লাবে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ঐ ক্লাবের সভ্যেরা মহারাষ্ট্র-দেশীয় ব্রাহ্মণ বিধবা, কিন্তু পরে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতা পণ্ডিতা রমাবাঈ-এর ভারতীয় কার্যের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। আরও জানা যায়, স্বামীজী শেরবোর্নে অবস্থিত মহিলা-সংশোধনাগারে (রিফর্মেটরিতে) ভারতীয় রীতিনীতি ও জীবন-ধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ সময়ে আমেরিকার জনসাধারণ স্বামীজীর নাম ঠিক উচ্চারণ বা বানান করিতে পারিত না; সত্য কথা বলিতে গেলে তাহাদের এ অক্ষমতাজনিত ভ্রম দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। স্বামীজীর পরিচয় সম্বন্ধেও তাহাদের অদ্ভুত সব ধারণা ছিল। সংবাদপত্রে কখনও বলা হইত তিনি রাজা, কখনও বা বলা হইত তিনি ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী—ব্রাহ্মণ মানে তাহাদের বুদ্ধিতে উচ্চবর্ণের হিন্দু। আর নামের যেসব বিকৃতি হইত তাহা বাংলা অক্ষরে লিখিয়া বুঝানো একটা কসরতের মতোই দেখাইবে। মাস কয়েক পরে তাহারা ঠিক করিয়া লইয়াছিল, নামটা হইবে বিব্ কানন্দ, অথবা শুধু কানন্দ; অন্ততঃ ঐভাবে উচ্চারণ করা তাহাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব ছিল। যাহা হউক, আমরা আপাততঃ বস্টনের কথাই বলি। 'বস্টন ইভনিং ট্র্যান্সক্রিপ্ট' পত্রিকায় ২৫শে অগস্ট ছাপা হইল, "ইণ্ডিয়া হইতে আগত ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী স্বামী বেরে কানন্দ আগামী মাসে চিকাগোতে ধর্মমহাসভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য এই দেশে আসিয়াছেন; তিনি গতকল্য কনকর্ড-এর শ্রীযুক্ত এফ. বি. স্যানবর্নের সহিত বস্টনে আসিয়াছিলেন।" শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন স্যানবর্ন শ্রীমতী কেট স্যানবর্নের জ্ঞাতিভাই। প্রথমতঃ তিনি এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাসের চক্ষেই দেখিয়া-

ছিলেন ; কিন্তু ব্রিজি মেডোজে বার্তালাপের পর তাঁহার মত পরিবর্তিত হইল। শ্রীযুক্ত স্যানবর্ন সাংবাদিক, লেখক, পরোপকারক ও সদুদ্দেশ্যে স্থাপিত সভাসমিতির পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি বিভিন্নরূপে বস্টন সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। স্বামীজী স্বভাবতই ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সময়ে এবং পূর্বোল্লিখিত ঘটনা ও ব্যক্তিদের সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব অবগত হইবার জন্য আমরা পুনর্বার তাঁহার ২০শে অগস্টের পত্রখানি পাঠ করিব। তিনি লিখিয়াছেন : "জানিয়া রাখ, এই দেশ খ্রীষ্টানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয় করি না। আমি এখানে মেরীতনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি ; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটি জিনিস দেখিতে পাইতেছি, ইঁহারা আমার হিন্দুধর্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গ্যালিলীয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। একথা ইঁহারা আদরপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। এখন আমার কার্য এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে ও বলাবলি করিতেছে। এখানে এইরূপেই কার্য আরম্ভ করিতে হইবে।

"কাল নারী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসন মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন ; এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অতি অদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয় আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর !···ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার

বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা—সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।...সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশসমূহ অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া।...হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতের আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক' নামক মতদ্বারা সর্ব-প্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।"

লোকে বলে স্বামীজী আমেরিকার সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভারত-বহির্ভূত ভাবধারা ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর মৌলিকতা এখানেই যে, তিনি তুলনামূলক দৃষ্টিতে রোগ নির্ণয় ও ঔষধ স্থির করিতে পারিতেন। এই দৃষ্টি ও আবিষ্কার তাঁহার নিজস্ব। বাহিরের ঘটনাবলী উহাদের উদ্বোধক মাত্র। নতুবা এই অল্পবয়স্ক যুবক দিন কয়েক মাত্র আমেরিকায় থাকিয়াই এত নূতন কথা বলেন কি করিয়া? আরও দেখা যায়—আমেরিকার সামাজিক আচার-ব্যবহার যেরূপই হউক, বেদান্ত-সম্মত দার্শনিক ভিত্তিতে সামাজিক চিন্তা সেখানে তখনও অজ্ঞাত—উহা স্বামীজীরই অবদান; আর সে চিন্তাকে তিনি মনোজগতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কার্যে পরিণত করিতে চাহিয়া-ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুদেবেরই ন্যায় মন-মুখ এক করিতে চাহিয়াছিলেন—অধ্যাত্মজগতের চিন্তার সহিত বহির্জগতের ব্যবহারে কোন সামঞ্জস্য থাকিবে না,

পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় চলিবে, ইহা তিনি ভাবিতেই পারিতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্মকে সামাজিক দুর্নীতি, অত্যাচার ইত্যাদির জন্য দায়ী করা চলে না, দায়ী ক্ষমতায় আসীন শাসকবর্গ ও পুরোহিত-কুলাদির স্বার্থপরতা। ইহাও এক নবীন দৃষ্টি।

বস্টনের গ্রামে শ্রীমতী স্যানবর্নের আতিথ্য লাভের ফলে যদিও স্বামীজীর অর্থব্যয় হ্রাস পাইল, তথাপি অন্যদিকে ব্যয়বাহুল্যে তিনি তখনও নিপীড়িত। আমরা জানি, তিনি শীতবস্ত্র আনেন নাই। পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতেই পাই: "এখন শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে, আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। ...এই গ্রাম হইতে কাল আমি বস্টনে যাইতেছি। সেখানে একটি বৃহৎ মহিলা-সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে। ইহারা (খ্রীষ্টান) রমাবাঈকে সাহায্য করিতেছে। বস্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। সেখানে যদি বেশী দিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব পোশাক চলিবে না। রাস্তায় আমায় দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। সুতরাং আমাকে কালো রং-এর লম্বা জামা পরিতে হইবে। কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিব।...এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে আমার সম্বল দাঁড়াইবে ষাট সত্তর পাউণ্ড। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে কিছুদিন এখানে থাকা দরকার।...আমাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এত চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পারো, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পারো, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব।...যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে অন্ততঃ ছয় মাস এখানে রাখিতে পারো, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতোমধ্যে আমিও যে-কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাই, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি আমার ভরণ-পোষণের কোন উপায় করিতে পারি, তৎক্ষণাৎ তোমায় তার করিব।" বাস্তবিক স্বামীজীর আর্থিক অবস্থা তখন বড়ই দুশ্চিন্তাজনক বা ভয়াবহ। দরজীর নিকট পোশাকের ফরমাশ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া এই পত্রেই আবার লিখিতেছেন: "এইমাত্র দরজীর কাছে গিয়াছিলাম, কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে তিনশত টাকা বা তাহারও বেশী পড়িবে। ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও

না, অমনি চলনসই গোছের হইবে।...যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পারো, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতোমধ্যে যদি অনুকূল কিছু ঘটে, লিখিব বা তার করিব। কেবল 'তার' করিতে প্রতি শব্দে পড়ে চারি টাকা।"

স্বামীজীর আমেরিকায় গমনকালে খেতড়ি-রাজের সাহায্যের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরেও তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ আলোচ্য অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে মন্মথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পত্রে ঐ সংবাদ পাইয়া রাজাজী তৎক্ষণাৎ তারযোগে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন (বেণী শঙ্করজীর পুস্তক, ৮৬-৯১)। আলাসিঙ্গাও আরও তিনশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন; কারণ স্বামীজীর ২রা নভেম্বরের (?) পত্রে আটশত টাকা পাঠাইবার উল্লেখ আছে ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৮২)। ঐ সময়ের ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করিয়া মনে হয়, স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে প্রেরিত পূর্বোল্লিখিত অগস্ট মাসের পত্র ছাড়া আরও পত্র বা 'তার' অপর বন্ধুদিগকে উহার পূর্বে বা পরে পাঠাইয়াছিলেন। তার যে তিনি করিয়াছিলেন, ইহা স্বমুখোক্ত পরবর্তী ঘটনা হইতে জানা যায়।

মাদ্রাজে 'আমার সমরনীতি' নামক বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি বলেন, "আমি আমেরিকায় পৌঁছিলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্পই ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সব খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিতেছে। আমার শুধু গ্রীষ্মোপযোগী পাতলা পোশাক ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ যদি রাস্তায় ভিক্ষায় বাহির হই, তবে আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মাদ্রাজে কয়েকটি বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওসফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্র মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।' ('বাণী ও রচনা', ৫।৯৬)।

থিওসফিস্টদের ক্রোধের কারণও ঘটিয়াছিল—ইহার প্রমাণ স্বামীজীর ২০শে অগস্টের পত্রেই রহিয়াছে। উহাতে স্বামীজী লিখিতেছেন, কুমারী স্যানবর্নের ভ্রাতা থিওসফিস্টদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পরে উহাদের ছাড়িয়া দেন। এইটুকু লিখিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "এই তো এখানে থিওসফির প্রভাব

এবং উহার প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা !" উক্ত ভদ্রলোক—শ্রীযুক্ত এফ. বি. স্যানবর্ন—স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি স্বামীজীকে লইয়া ২৪শে অগস্ট বস্টনে উপস্থিত হন। পরে তিনি তাঁহাকে সারাটোগায় লইয়া গিয়াছিলেন।

মানিতে হইবে যে, বস্টনে এই আগমন দৈবপ্রেরণাতেই ঘটিয়াছিল ; কেননা ইহাকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজীর আমেরিকায় আসার প্রথম উদ্দেশ্য—চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করা—সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া স্বামীজীর মনে এককালে ঐ সঙ্কল্প-ত্যাগের কল্পনাও উঠিয়াছিল। তিনি ২০শে অগস্ট লিখিয়াছিলেন, "যদি আবার চিকাগো যাই, তবে উহার (ভট্টাচার্য মহাশয়ের ফনোগ্রাফের) জন্য চেষ্টা করিব। আমি চিকাগোয় আর যাইব কিনা, জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন, আর বরদ রাও যে ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো মেলার একজন কর্তা। কিন্তু আমি প্রতিনিধি হইতে অস্বীকার করি, কারণ চিকাগোয় একমাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল ফুরাইয়া যাইত।"[১] ঐ আশা ছাড়িয়া দিয়াই তিনি বস্টনে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ধর্মমহাসভার আশা ত্যাগ করিলেও বিদেশে কার্য করার সঙ্কল্প তখনও অব্যাহত ছিল। ঐ পত্রেই আছে : "প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব ; এখানে অকৃতকার্য হইলে ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব।" কিন্তু আমেরিকায় তাঁহার সাফল্যের পূর্বাভাস তিনি অচিরেই পাইতে আরম্ভ করেন।

২৪শে অগস্ট বস্টনে শ্রীযুক্ত স্যানবর্নের গৃহে থাকা কালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জন হেনরি রাইট মহোদয় তাঁহার অ্যানিস্কোয়ামের বাসস্থান হইতে যদিও বস্টনে আসিয়াছিলেন এবং তিনি পূর্বেই স্বামীজীর গুণাবলীর কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে ব্যগ্র

১ স্বামীজীর জীবনীকারগণ বলেন, স্বামীজীর সঙ্গে নিদর্শনপত্র না থাকায় এবং প্রতিনিধি-গ্রহণের দিন অতীত হওয়ায় তিনি প্রতিনিধি হইতে পারেন নাই। এই বিবরণ পড়িয়া কিন্তু অন্য কারণও ছিল বলিয়া মনে হয়—প্রতিনিধি হইলে তাঁহাকে দীর্ঘকাল চিকাগোতে থাকিতে হইত নিজ ব্যয়ে ; অথচ তেমন সম্বল তাঁহার ছিল না।

ছিলেন, তথাপি দৈববশে সেদিন মিলন ঘটিল না। ইহাতে বরং লাভই হইল; কারণ অধ্যাপক মহাশয় ঐ সপ্তাহের বাকি দিনগুলি তাঁহার অ্যানিস্কোয়ামে অবস্থিত বাড়িতে বাস করার জন্য স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং স্বামীজীও উহা গ্রহণ করিলেন। অ্যানিস্কোয়াম অতলান্তিক মহাসাগরের তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; বায়ুপরিবর্তনের জন্য শহরের লোক সেখানে যায়; অধ্যাপকও ঐ উদ্দেশ্যেই সেখানে ছিলেন। স্বামীজীর এই পল্লীবাসের বিবরণ অধ্যাপক-পত্নীর ২৯শে অগস্ট তারিখের এক পত্র হইতে পাওয়া যায়: "হিন্দু-সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য জন বস্টনে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা না হওয়ায় তাঁহাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি শুক্রবার আসিয়াছিলেন। তাঁহার গায়ে ছিল এক লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা—সকলে দেখিয়া তো অবাক্।·· তিনি সোমবার পর্যন্ত ছিলেন। আমি এর পর যত বিশেষ উল্লেখযোগ্য লোক দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। আমরা সারাদিন, সারারাত আলাপ করিয়াছি, পরদিন সকালে আবার সাগ্রহে আলাপ শুরু করিয়াছি। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সারা শহরে যেন আগ্রহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কুমারী লেনের বাড়ির অতিথিরা উল্লাসে আত্মহারা হইয়াছিলেন—তাঁহারা সব সময়ই ঐ বাড়ির ভিতর-বাহির করিতেছিলেন; ক্ষুদ্রকায়া শ্রীযুক্তা মেরিলের নয়নদ্বয় উল্লাসে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আর তাঁহার কপোলদ্বয় হইয়াছিল রক্তিম। আমরা প্রধানতঃ ধর্মসম্বন্ধে আলাপ করিতাম। তারপর জন তাঁহাকে রবিবারে গির্জায় ভাষণ দিতে লইয়া গেলেন এবং সকলে মিলিয়া এমন একটি অখ্রীষ্টান মহাবিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা তুলিল, যাহা একেবারে অখ্রীষ্টান ধারায় পরিচালিত হইবে। আমি ততক্ষণ এক কোণে সরিয়া গিয়া এত হাসিলাম যে, আমার চক্ষে জল দেখা দিল।···

"দেখিয়া শুনিয়া গ্রামবাসীরা ঠিক করিল, ইনি ব্রাহ্মণ। অথচ নৈশাহারের সময় ইনি সানন্দে মাংস ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া তাহাদের ধারণা কোথায় ভাসিয়া গেল! এ সমস্যার সমাধান আবশ্যক ছিল, অতএব নৈশভোজনান্তে তাহারা তাঁহার বাক্যালাপ শুনিতে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল।···

"তিনি তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'এই তো সেদিন, মাত্র সেদিন—চার-শো বছরের আগে হবে না।' তারপর (ভারতের) একটা সহনশীল জাতির উপর, একটা নিপীড়িত জনসমষ্টির উপর যে নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চলিতেছে এবং ইহার পরিণতিস্বরূপ (ইংরেজ) উৎপীড়কদের উপর

যে সাজা নামিয়া আসিবে তাহা তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, 'ইংরেজদের কথা কি আর বলব? এই কদিন আগেও তারা ছিল জঙ্গলী···তাদের ভদ্রমহিলাদের গায়ে উকুন ঘুরে বেড়াত···আর তারা গায়ের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্য সুগন্ধি মাখত।···কি বিছ্-ছি-রি! এখনও তারা তো সবে জঙ্গলীপনা থেকে বেরুচ্ছে।' শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'কি বাজে কথা! ও তো অন্ততঃ পাঁচ-শো বছর আগেকার কথা!' 'তা আমি কি বলিনি—এই কদিন আগে? জীবাত্মার দীর্ঘ ইতিহাসের কথা মনে রাখলে কয়েক-শো বছরটা কি খুব লম্বা নাকি?' তারপর সুর পাল্টাইয়া খুবই সুবিবেচক ও শান্ত মানুষটির মতো তিনি বলিয়া চলিলেন, 'ওরা একেবারে জঙ্গলী।' বলার সঙ্গে সঙ্গে কথার জোর ও তোড় বাড়িয়াই চলিল, আর তিনি কহিতে থাকিলেন, 'দুর্জয় শীত এবং তাদের উত্তরাঞ্চলের অনটন ও অনাহার তাদের জঙ্গলী বানিয়ে দিয়েছে। এরা কেবল পরকে হত্যা করার কথাই ভাবে।··· কোথায় তাদের ধর্ম? তারা মুখে সেই মহাপুরুষের নাম নেয়, তারা দাবি করে যে, তারা মানুষকে ভালবাসে, তারা সভ্যতার বিস্তার করে—খ্রীষ্টধর্মের সাহায্যে করে কি? না; ভগবান ওদের সভ্য করেননি, ওদের সভ্য করেছে ওদের অন্নাভাব।'···ক্রমে তাঁহার কথাগুলি মন্থরতর হইল, তাঁহার মিষ্ট স্বর গম্ভীর হইতে হইতে যেন ঘণ্টারাবের ন্যায় শুনাইতে লাগিল এবং তিনি বলিলেন, 'কিন্তু ভগবানের বিচার তাদের উপর নেমে আসবে—প্রভু বলেছেন, "প্রতিশোধ নেব আমি, প্রতিদান আমি দেব"।···ঐ কোটি কোটি চীনাদের দিকে চেয়ে দেখ —ওরাই হচ্ছে প্রভুর প্রতিশোধ, যা তোমাদের উপর নেমে আসবে। আবার হুনদের আক্রমণ হবে', আর একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'তারা ইউরোপ ছেয়ে ফেলবে, তারা ইটের উপর ইট খাড়া থাকতে দেবে না। নারী, পুরুষ, শিশু—সব যাবে, আবার অন্ধকারের যুগ ফিরে আসবে।···আমার কথা?— আমি মোটে নিজের জন্য ভাবিই না।' অমনি একজন প্রশ্ন করিলেন, 'একি খুব শীগ্‌গির হবে নাকি?' এ হতে হাজার বছরও লাগবে না। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন—তবে এখনই হইবে না!···তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'কেহ যদি ভগবানের প্রতিশোধে বিশ্বাস নাও করে, ইতিহাসের প্রতিশোধে বিশ্বাস করতেই হবে। আর এ প্রতিশোধ ইংরেজদের উপর নেমে আসবেই। তারা পা দিয়ে আমাদের ঘাড় চেপে রেখেছে। তারা নিজেদের স্ফূর্তির জন্য

আমাদের শেষ রক্তবিন্দু চুষে খেয়েছে। তারা আমাদের কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়েছে। আর আমাদের গ্রামের পর গ্রাম প্রদেশের পর প্রদেশ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে! এখন চীনেরা পড়বে তাদের উপর প্রতিশোধরূপে—আর এতে ন্যায়সঙ্গত বিচার ছাড়া আর কিছুই হবে না'।"

এখানে পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া চলে যে, ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁহার স্মৃতিকথায় স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাঁকে মনে হত, তিনি যেন ভবিষ্যদ্‌-দ্রষ্টা ঋষিরূপে বিরাজমান; এমনিভাবে একদিন তিনি এই কথাগুলি বলে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন—এর পর যে বিরাট অভ্যুত্থানের ফলে নবযুগের সূত্রপাত হবে, তা আসবে রাশিয়া বা চীনদেশ থেকে।[২] ঠিক যে কোন্ দেশ তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না—তবে তা রাশিয়া বা চীনই হবে।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২০৩)। আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইংরেজরা চলিয়া যাইবার পর চীনদেশ হইতে ভারতাক্রমণের একটা বড় আশঙ্কা রহিয়াছে।' ('নিউ ডিসকভারিজ', ২৬)।

২৭শে অগস্ট অ্যানিস্কোয়াম গির্জায় বক্তৃতা দিয়া ২৮শে অগস্ট, সোমবার তিনি সালেমের 'থট অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাবে' বক্তৃতা দিবার জন্য অ্যানিস্কোয়াম ত্যাগ করিলেন। সালেমে তিনি ১৬৬ নং নর্থ স্ট্রীটে অবস্থিত শ্রীযুক্তা কেট ট্যানাট উড স-এর গৃহে অতিথিরূপে এক সপ্তাহ বাস করেন। শ্রীযুক্তা উড্‌স বিদুষী সাহিত্যসেবিকা ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শিশুপাঠ্য কিছু পুস্তকও ছিল। তখন তাঁহার বয়স আটান্ন বৎসর। ঐ বাড়িতেই তাঁহার পুত্র প্রিন্সও থাকিতেন; ইনি তখন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

২৮শে অগস্ট অপরাহ্ণে তিনি সালেমের ওয়েসলি চ্যাপেলে 'হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বৈদিক ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, জাতিবিভাগ-প্রথার সহিত ধর্মের কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। ভারতের দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ভারতে ধর্মের অভাব নাই, অভাব অন্নের ও কার্যকরী শক্তির, আর এই বিষয়ে আমেরিকার লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণার্থই

---

২ তিনি কুমারী ম্যাকলাউডকে বলিয়াছিলেন, "আমেরিকার ধারাও ঠিক অনুরূপ"; আমেরিকা ঐ কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত যন্ত্র হতে পারবে না—কিন্তু চীনদেশ বা রাশিয়া তা হতে পারবে"—অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সম্মিলিত বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করিবে। ('দি লাইফ অব বিবেকানন্দ'—রোমাঁ রোলাঁ, ৭৩)।

তিনি সেদেশে পদার্পণ করিয়াছেন ; ভারতে মিশনরী না পাঠাইয়া বরং কারিগরি বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি সতীদাহ, মূর্তিপূজা, জগন্নাথের রথের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রান্তধারণা দূর করেন। পরদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্তা উড্‌স-এর উদ্যানে এক বালক-বালিকা সম্মেলনের সম্মুখে ভারতীয় বালক-বালিকাদের জীবনরীতি, ক্রীড়া-কৌতুক, বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি ইস্ট চার্চে যে বক্তৃতা দেন উহার বিষয় ছিল, 'ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র স্বদেশবাসী'। এখানেও তিনি তাঁহার এই বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন যে, ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রচারক না পাঠাইয়া বরং শিল্পোন্নতির জন্য প্রচারক পাঠানো বাঞ্ছনীয়। সালেম ছাড়িয়া যাইবার সময় স্বামীজী কিছু জিনিসপত্র এই গৃহে রাখিয়া যান এবং চিকাগো ধর্মসভার অনেক পরে আর একবার আসিয়া এখানে সপ্তাহাধিক বাস করেন। দ্বিতীয়বার এই গৃহত্যাগের সময় তিনি ভারতে যে যষ্টিটি ভ্রমণকালে ব্যবহার করিতেন উহা প্রিন্সকে এবং স্বীয় ট্রাঙ্ক ও একখানি কম্বল শ্রীযুক্তা উড্‌সকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দিয়া যান। জিনিসগুলি দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "যাঁরা আমার এদেশে বাসকালে গৃহসুখের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের আমার সবচেয়ে ভাল জিনিসই দেওয়া উচিত!" যষ্টিটি ও কম্বলখানির সহিত স্বামীজীর পবিত্র পরিব্রাজক-জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত ছিল।

অতঃপর সারাটোগা স্প্রিংস নামক স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন স্যানবর্নের আমন্ত্রণে সালেম হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে তথায় যাত্রা করিলেন। সারাটোগায় তিনি স্যানাটোরিয়াম নামক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বোর্ডিং হাউসে অবস্থান করেন ও ৫ই সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দেন। তখন সারাটোগায় 'আমেরিকান সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের' অধিবেশন চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত স্যানবর্ন ছিলেন ঐ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, আর উহার সভ্য ছিলেন আমেরিকার বুধমণ্ডলীর অনেকে। অতএব এই আমন্ত্রণ হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, স্যানবর্ন স্বামীজীর প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নতুবা একজন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক সন্ন্যাসীকে কৃতবিদ্যসমাজে আহ্বান করিবেন কেন? স্বামীজী এই অ্যাসোসিয়েশনের সম্মুখে তিনবার এবং অপর এক ভদ্রলোকের গৃহে দুইবার বক্তৃতা করেন। অ্যাসোসিয়েশনের আলোচ্য বিষয় ছিল— ইহলৌকিক সমস্যা। তদনুযায়ী ৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার ও ৬ই সেপ্টেম্বর পূর্বাহ্ণের

অধিবেশনদ্বয়ে স্বামীজীর বক্তব্য বিষয় ছিল—'ভারতে মুসলমান রাজত্ব', 'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার'। ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তিনি কি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, জানা নাই। ভদ্রলোকের বাটীতে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়ও অজ্ঞাত।

আমরা এ পর্যন্ত জানিতে পারিলাম, তিন সপ্তাহে স্বামীজী এগারটি বক্তৃতা দেন এবং বস্টনের চারিদিকের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য সমাজে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ঐ সময় মধ্যে তিনি আমেরিকার জনমনের সহিতও পরিচিত হন। তিনি রমাবাঈ-চক্রের মহিলাদের সম্মুখে বক্তৃতা দেন, বিভিন্ন গির্জায় ভাষণ দেন, মহিলা-সংশোধনাগার দর্শন করেন, বালক-বালিকাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন এবং বিভিন্ন পরিবার মধ্যে বাস করিয়া আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে কেবল অনাবিল প্রশংসালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। সালেমের ওয়েসলি চ্যাপেলে বক্তৃতা-কালে একদিকে তিনি যেমন মিশনরীদের সমালোচনা করেন, অপরদিকে তথায় সমবেত মিশনরীরাও নানারূপ কটাক্ষপূর্ণ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ভাবী শত্রুদের সম্বন্ধে অবহিত করাইয়া দেন। মোটের উপর বলিতে পারা যায়, যদিও স্বামীজী বাধ্য হইয়াই বস্টন অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এবং ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের বাসনা মন হইতে প্রায় মুছিয়াই ফেলিয়াছিলেন, তথাপি এই কয়টি দিন অলক্ষিতে তাঁহাকে মহাসভায় বক্তৃতা দিবার জন্যই যেন প্রস্তুত করিয়া দিল। ইহার পর স্বামীজী ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তাঁহার সারাটোগার শেষ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সম্ভবতঃ ৮ই সন্ধ্যায় আলবানি হইতে ট্রেন ধরিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে চিকাগোয় উপস্থিত হইলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর পুনর্বার সালেমে ফিরিয়া যান এবং সেখান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া ৮ই সেপ্টেম্বর বস্টনে ট্রেন ধরেন।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, স্বামীজী মহাসভায় যোগদানের আশা বা ইচ্ছা, অথবা উভয়ই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ইহার কারণও অবগত আছি। তিনি কেমন করিয়া চিকাগো যাইতে আবার রাজী হইলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও ইহারও মূলে ছিল বস্টন অঞ্চলে আগমন ও কুমারী স্যানবর্নের সাহায্যে অধ্যাপক রাইটের সহিত পরিচয়। অধ্যাপক রাইটই তাঁহাকে বুঝাইয়া-শুনাইয়া চিকাগো যাইতে সম্মত করাইয়াছিলেন, আর তিনিই বন্ধু-দিগকে পত্র লিখিয়া স্বামীজীর মহাসভায় প্রতিনিধিত্বের পথ পরিষ্কার করিয়া

দিয়াছিলেন। মহাসভায় যোগদানের আশা পরিত্যাগপূর্বক স্বামীজী যখন অন্তভাবে স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবার কল্পনা করিতেছেন, তখন অধ্যাপক রাইট তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার জনসাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় দিবার পক্ষে মহাসভাই উপযুক্ত ক্ষেত্র: "বিরাট জাতির নিকট পরিচিত হইতে হইলে এই আপনার সুযোগ।" স্বামীজী নিজের অসুবিধার কথা খুলিয়া বলিলেন—পরিচয়পত্রের অভাব, অর্থের অনটন ইত্যাদি সবই শুনাইলেন। শুনিয়া গুণমুগ্ধ অধ্যাপক বলিলেন, "আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তাহার কিরণ-বিকিরণের কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা।" স্বামীজীকে মহাসভায় প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত করার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে লইয়া প্রতিনিধি-নির্বাচক কমিটির সেক্রেটারিকে পত্র লিখিলেন, "ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সকল অধ্যাপককে একত্র করিলেও তাঁহারা ইঁহার সমকক্ষ হইবেন না।" স্বামীজীর অর্থাভাব আছে জানিয়া তিনি তাঁহাকে চিকাগো পর্যন্ত একখানি রেল টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং মহাসভার যে কমিটি প্রাচ্য প্রতিনিধিদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার নামেও একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। অধ্যাপকের লিখিত পরিচয়পত্রখানি স্বামীজী সালেমে অবস্থানকালে পাইয়াছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি লিখিয়াছিলেন, "আপনার প্রদত্ত পরিচয়পত্র পেয়েই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চিকাগোর শ্রীযুক্ত থেলিস-এর কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছি, যাতে মহাসভার কয়েকজন প্রতিনিধির নাম ও অন্যান্য সংবাদ আছে।"

ভগবদ্বিধানে সমস্ত যোগাযোগ হইয়া গেলে স্বামীজী সানন্দে ও নিশ্চিন্তমনে চিকাগোয় চলিলেন। ট্রেনে একজন ব্যবসাদারের সহিত আলাপ হইলে তিনি আশা দিলেন, চিকাগোয় পৌঁছিয়া কোন্ পথে কেমন করিয়া ডাঃ ব্যারোজ[১] যে অঞ্চলে থাকেন সেখানে যাইতে হইবে—তিনি সব বলিয়া দিবেন। সন্ধ্যাগমে ট্রেন যখন চিকাগো স্টেশনে থামিল, তখন কিন্তু সে ভদ্রলোক ব্যস্ততার মধ্যে সব ভুলিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে স্বামীজী পকেটে হাত দিয়া দেখেন

১। রেভারেণ্ড জন হেনরী ব্যারোজ, চিকাগোর ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের প্যাস্টর এবং ধর্মমহাসভার জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান। মহাসভা-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থার ভার ইঁহারই উপর অর্পিত ছিল।

ব্যারোজের ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পথচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু উহা ছিল—জার্মানদের অধ্যুষিত শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল; তাহারা তাঁহার প্রশ্ন না বুঝিয়া নীরবে নিজপথে চলিয়া যাইতে লাগিল। রাত্রি আসিয়া পড়িতেছে, তবু তিনি শুধু এই কথাটুকুও কাহাকেও বুঝাইতে পারিলেন না যে, তিনি কোন হোটেলে যাইতে চান। এমন অবস্থায় নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করিলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে রেলের মাল রাখার জায়গায় একটা প্রকাণ্ড খালি বাক্স[১] দেখিয়া উহাতে আশ্রয় লইয়া ও ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত দুর্ভাবনামুক্ত-চিত্তে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দুইদিন পরে যাঁহার কণ্ঠস্বর-শ্রবণে আমেরিকা তথা বিশ্ববাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে এবং তাহারা উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার শ্রীবদননিঃসৃত নবীন সজীব বার্তা শুনিবে, তিনি আজ ভাগ্যবশে নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, বন্ধুহীন ও অবজ্ঞাতরূপে এমনিভাবে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলেন, অথবা স্বদেশে পরিব্রাজকজীবনে সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যাগমে তিনি যেমন বৃক্ষতল আশ্রয়পূর্বক ভূশয্যা গ্রহণ করিতেন, ঐশ্বর্যের নিলয় চিকাগো নগরেও আজ তাঁহাকে সেই ধারাই অব্যাহত রাখিতে হইল।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার চোখে-মুখে "মিঠা-জলের হাওয়া" লাগিল; তিনি সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইবামাত্র হ্রদতীরবর্তী ধনীদিগের বাস-গৃহসুশোভিত রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। এই 'লেক শোর ড্রাইভ'-এর ধারে ধারেই সব ক্রোড়পতি বণিকদের অট্টালিকা। তিনি তখন ক্ষুধায় কাতর; অতএব সন্ন্যাসীরই মতো দ্বারে দ্বারে অন্নের জন্য এবং মহাসভার আফিসের ঠিকানা জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ময়লা পোশাক, কালো রং এবং ক্লান্ত চেহারা দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দিল; অন্যত্র ভৃত্যেরা হাসিঠাট্টা করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সুসভ্য আমেরিকায় ভিক্ষুকের বিশেষতঃ কালো আদমীর স্থান নাই! হৃদয় বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। টেলিফোন প্রভৃতির সাহায্য কিরূপে লইতে হয়, তাহাও তাঁহার জানা ছিল না। অবশেষে হতাশমনে পথিপার্শ্বে বসিয়া তিনি শ্রীভগবানের নির্দেশের

১। ইহা বাংলা ও ইংরেজী জীবনীদ্বয়ের মত। কাহারও মতে তিনি একটা খালি মালগাড়িতে শুইয়াছিলেন।

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ঠিক সম্মুখবর্তী এক ধনীর গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং রাজরানী-সদৃশা এক মহীয়সী মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া অতি মৃদু ভদ্রতাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?" স্বামীজী নিজ বিপদের কথা খুলিয়া বলিলেন, অমনি সেই ভদ্র-মহিলা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, একটি কক্ষে যেন আরামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তিনি স্বামীজীকে বলিয়া রাখিলেন যে, প্রাতরাশের পর তিনি তাঁহাকে লইয়া মহাসভার আফিসে যাইবেন। এ যেন রূপকথার কাহিনীরই ন্যায় বিপদ হইতে মুক্তিলাভ। আর ভগবানের লীলাখেলা কি অচিন্তনীয়। স্বামীজীর হৃদয় বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল। এই মহিলাটি ছিলেন শ্রীযুক্ত জর্জ ডব্লিউ. হেল-এর পত্নী; সেদিন হইতে তিনি, তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ স্বামীজীর অতি নিকট আত্মীয়ে পরিণত হইলেন। শ্রীযুক্ত হেল ও শ্রীযুক্তা হেল ছিলেন অতি ধর্মপ্রাণ; তাই স্বামীজী তাঁহাদের বলিতেন 'ফাদার পোপ' (পোপ-বাবা) ও 'মাদার চার্চ' (মা-গির্জা)! আর হেলের কন্যাদ্বয় ও ভাগিনেয়ীদ্বয় ছিলেন তাঁহার ভগিনী।[১]

স্বামীজীর হৃদয়ে তখন নবোৎসাহের সঞ্চার হইল। এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, ভগবান তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন; অতএব সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তিনি ঋষির দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শ্রীযুক্তা হেলের সহিত তিনি মহাসভার আফিসে উপস্থিত হইলেন, অধ্যাপক রাইটের প্রদত্ত পরিচয়পত্র দেখাইলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিনিধি-রূপে গৃহীত হইলেন। তাঁহার বাসস্থানও নির্দিষ্ট হইল—২৬২ নং মিশিগান অ্যাভিনিউস্থিত শ্রীযুক্ত জে. বি. লায়ন-এর গৃহে। সৌভাগ্যক্রমে এই গৃহে অবস্থানের কিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত লায়নের দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা কর্নেলিয়া কোঙ্গার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা উহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম:

"মহাসভার অধিবেশনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাঁহারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিনিধিদিগকে অতিথিরূপে স্ব স্ব গৃহে রাখিতে সম্মত হন। আমার মাতামহ গোঁড়া ধার্মিকদের পছন্দ না করিলেও দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন বলিয়া আমার মাতামহী এইরূপ একজন প্রতিনিধিকে

১। হ্যারিয়েট হেল, মেরী হেল, হ্যারিয়েট ম্যাককিণ্ডলি ও ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি।

অতিথিরূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহার মন খুব উদার। আমাদের গৃহ তখন অতিথিতে পরিপূর্ণ, কারণ আমার মাতামহ ও মাতামহী অতিথিপরায়ণ ছিলেন এবং বিশ্বমেলাটি ছিল খুবই উৎসাহবর্ধক ও চমকপ্রদ। আমরা যখন সংবাদ পাইলাম যে, আমাদের প্রতিনিধি সন্ধ্যাকালে আসিবেন, তখন আমাদের বাড়িতে এত স্থানাভাব যে, আমার মাতামহী তাঁহার মেজো ছেলেকে নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়া এক বন্ধুর বাড়িতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সংবাদ আসিল, আমাদের সম্প্রদায়ের—ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের—এক সভ্য দ্বিপ্রহর রাত্রির পরে অতিথিকে লইয়া আসিবেন। মাতামহী ছাড়া আর সকলেই শুইয়া পড়িল। দরজার ঘণ্টা শুনিয়া তিনি যখন দরজা খুলিলেন, তখন লম্বা গেরুয়া আলখাল্লাদি-পরিহিত স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি পূর্বে কখনও কোন ভারতবাসী দেখেন নাই। তিনি স্বামীজীকে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকার ঘর দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু শয়ন করিতে গিয়া এক দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। আমাদের অনেক অতিথি ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলীয়, যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে নারাজ। দাদামশাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি তাঁহাকে সমস্যাটি জানাইয়া বলিলেন, স্বামীজী ও দক্ষিণাঞ্চলীয় অতিথিদের একসঙ্গে থাকা চলিবে কিনা স্থির করিতে হইবে। দরকার হইলে দিদিমা স্বামীজীকে আমাদের নিকটবর্তী অডিটরিয়াম হোটেলে রাখার কথাও বলিলেন। প্রাতরাশের আধ ঘণ্টা আগে পোশাক পরিয়া দাদামহাশয় লাইব্রেরী ঘরে দৈনিক কাগজ পড়িতে গেলেন। সেখানে স্বামীজীর সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং প্রাতরাশ পরিবেশিত হওয়ার পূর্বেই তিনি দিদিমাকে বলিলেন, 'এমিলি, আমাদের সব অতিথি চলে গেলেও আমার এতটুকু দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ঘরে এযাবৎ যত লোক এসেছেন তাঁর মধ্যে এই ভারতবাসীটি সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও চিত্তাকর্ষক; তিনি যতদিন খুশী এখানে থাকবেন।' তখন হইতে তাঁহাদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইল এবং তাহারই ফলে চিকাগো ক্লাবে অপর বন্ধুদের সম্মুখে স্বামীজী যখন বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যত লোক দেখেছি, আমার বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত লায়ন সর্বাধিক খ্রীষ্টসদৃশ', তখন দাদামহাশয় খুবই বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন। স্বামীজী আমার দিদিমাকে শ্রদ্ধা করিতেন, কারণ তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার মায়ের কথা মনে পড়িত। আমার বয়স তখন

ছয় বৎসর; আমি আমার বিধবা মায়ের সঙ্গে ঐ পরিবারেই থাকিতাম। স্বামীজী মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। দাদা-মহাশয় ও দিদিমা স্বামীজীর প্রায় প্রতি বক্তৃতাতেই উপস্থিত থাকিতেন।

"আমার ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত আছে তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু, মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং অতি আপনার জনের মতো মৃদু হাস্য। তিনি আমাকে ভারতবর্ষের গল্প—বাঁদর, ময়ূর, ঝাঁক ঝাঁক টিয়া, কলাগাছ, রাশি রাশি ফুল ও সবুজ তরিতরকারি এবং ফলে ভর্তি বাজারের কথা শুনাইতেন। তিনি বাড়িতে ফিরিবামাত্র আমি ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে উঠিতাম এবং আবদার করিতাম, 'স্বামীজী, একটা গল্প বলুন।' তাঁহার পাগড়িটা আমার কাছে বড় মজার জিনিস বলিয়া মনে হইত, কেমন জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধা। আমি তাঁহাকে বলিতাম, 'দেখান তো কেমন করে বাঁধেন।' আমাদের আমেরিকার খাদ্যে বেশী মশলা থাকে না। আমার দিদিমার ভাবনা ছিল, তিনি হয়তো এসব পছন্দ করিবেন না। কিন্তু স্বামীজী বলিলেন, তিনি যেখানে থাকেন, সেখানকার খাদ্যাদির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতেই চেষ্টা করেন। তিনি যাহা পাইতেন তাহাই সন্তুষ্ট মনে খাইতেন। দিদিমা স্যালাড তৈরি করার সময় কিছু ঝাল সস ব্যবহার করিতেন, স্বামীজীকে ঐ বোতল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে এ থেকে দুই এক ফোঁটা আপনার খাবারের সঙ্গে মেশাতে পারেন।' স্বামীজী উহা হাতে লইয়া খাবারের উপর এত বেশী পরিমাণে ছড়াইয়া দিলেন যে, আমরা ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'এত চলবে না, এ যে ভয়ানক ঝাল!' তিনি শুধু হাসিলেন এবং বেশ আনন্দ করিয়া খাইলেন। অতঃপর দিদিমা ঐ সসের একটি বোতল তাঁহার কাছে রাখিয়া দিতেন।"

স্বামীজী ঠিক কোন্ তারিখে ঐ গৃহে আসিয়াছিলেন জানা নাই, হয়তো মহাসভার অধিবেশনের প্রথম দিন (১১ই সেপ্টেম্বর) আসিয়াছিলেন। ঠিক কতদিন ঐ বাড়িতে ছিলেন, তাহাও জানা নাই, তবে সম্ভবতঃ মহাসভার সব কয়টি দিন এবং আরও কিছু কাল সেখানেই ছিলেন। কেননা শ্রীযুক্তা কোঙ্গারের বিবরণেই পাওয়া যায়, স্বামীজী এক শুক্রবারে ঐ পরিবারের সহিত সিম্ফনি কন্সার্টে গিয়াছিলেন এবং আরও বিবিধ প্রকারে তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা বজায় রাখিয়াছিলেন। কোঙ্গারের বিবরণে যদিও মহাসভার পরবর্তী

কিছু ঘটনাও আছে, তবু বর্ণনার সুবিধার জন্য আমরা এখানেই উহার প্রায় সবটাই উপস্থিত করিতেছি। কোঙ্গার লিখিয়াছেন :

"এক শুক্রবার অপরাহ্ণে আমার মা তাঁহাকে সিম্ফনি কনসার্ট শুনিতে লইয়া গেলেন—পূর্বে তিনি আর কখনও ইহা শুনেন নাই। তিনি খুব মনোযোগ দিয়াই শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার মাথা একদিকে হেলিয়া রহিল এবং মুখে একটু কৌতুকের ভাব দেখা গেল। সব শেষে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার ভাল লেগেছে তো ?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ, বেশ চমৎকার।' মা তবু বুঝিলেন, কথাটা ঠিক প্রাণখোলা নয়, তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি ভাবছেন ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি প্রথমতঃ বুঝতেই পারছি না, কার্যসূচীতে কেন বলা হয়েছে যে, শনিবার সন্ধ্যায়ও ঠিক একই প্রোগ্রাম অনুসৃত হবে। দেখুন ভারতবর্ষে ভোরে এক সুরের গান হয়, দুপুরের সুর আবার এক বিশেষ রকমের ; সন্ধ্যার সুরও সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কাজেই আমার অনুমান হচ্ছিল, যে সুর অপরাহ্ণের আরম্ভে ভাল লাগে, তা নিশাগমে আপনাদের কানে বেসুরো বলেই মনে হবে। আর একটা জিনিস যা আমার কাছে বেখাপ্পা মনে হয় তা হচ্ছে সঙ্গীতে মূর্ছনার অভাব, আর বিভিন্ন সুরের মধ্যে অধিক ফাঁক। আপনি আমাকে সেই যে সুইজরলণ্ডের সুন্দর চীজ খেতে দেন, তাতে যেমন শত শত ছিদ্র থাকে এও যেন তেমনি শতচ্ছিদ্র !'

"তিনি যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করিলেন, তখন লোকেরা তাঁহাকে ভারতীয় কাজের জন্য টাকা দিত। তাঁহার কোন টাকার থলি ছিল না ; তাই তিনি রুমালে বাঁধিয়া ঐসব লইয়া আসিতেন—ঠিক যেন একটি সাফল্যগর্বিত বালক ! ঘরে আসিয়া উহা দিদিমার কোলে ঢালিয়া দিতেন, তাঁহার হিসাবে রাখিয়া দিবার জন্য। দিদিমা তাঁহাকে বিভিন্ন মুদ্রার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং ঐগুলি গুনিয়া কি করিয়া থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিলেন। স্বামীজীর শ্রোতারা যাহাদের সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের না দেখিয়াও এমনিভাবে অর্থ দিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী খুব আশ্চর্য হইতেন।

"একদিন তিনি দিদিমাকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার আমেরিকা-জীবনের সর্বাধিক এক প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল। দিদিমা তাঁহাকে একটু খোঁচা দিবার মতলবেই বলিলেন, 'কে সে মেয়েটি, স্বামীজী ?' স্বামীজী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন আর কহিলেন, 'মেয়ে নয়, প্রতিষ্ঠান-গঠন ! বুঝাইতে

গিয়া তিনি বলিলেন, রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ একাকী ঘুরিয়া বেড়ান এবং কোন গ্রামে পৌঁছিলে সেখানে আসন পাতিয়া অপেক্ষা করেন, যদি কোন জিজ্ঞাসু উপদেশ-লাভের জন্য আসে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া তিনি বুঝিয়াছেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিলে কত বেশী ফল পাওয়া যায়। তবু তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল, ভারতীয়দের পক্ষে ঠিক কিরূপ প্রতিষ্ঠান গ্রহণযোগ্য হইবে, পাশ্চাত্ত্য জগতে যাহা তাঁহার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইয়াছিল, উহাকে কিভাবে ভারতীয় জীবনে গ্রহণ করা চলে এই বিষয়ে তিনি বহু চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।...তাঁহার কথাবার্তায় একটু বেশ মজাদার আইরিশ উচ্চারণভঙ্গী ছিল। আমার দাদামহাশয় তাঁহাকে ঐ টানটুকুর জন্য ঠাট্টাও করিতেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সর্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন একজন অধ্যাপক ছিলেন জাতিতে আইরিশ—ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের পাস-করা; ঐ টানটুকু তাঁহারই নিকট পাইয়া থাকিবেন।...

"বৎসর খানেক পরে তিনি যখন আবার চিকাগোয় আসিয়াছিলেন, তখন আমাদের বাড়িতে অল্পদিনই ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি তাঁহার চিরাভ্যস্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে এবং ধ্যানের প্রচুর সময় পাইলে প্রচারকার্য আরও ভালভাবে করিতে পারিবেন। আর তাঁহার সাহায্যকামীদের সহিত তিনি স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা করিতে পারেন—এরূপ ব্যবস্থারও প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। তাই দিদিমা তাঁহার জন্য একটি সাধারণ গোছের অথচ আরামপ্রদ ফ্ল্যাট খুঁজিয়া দিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্তা কর্নেলিয়া কোঙ্গার তাঁহার মাসীর মুখে আর একটি ঘটনা শুনিয়াছিলেন। মাসী ক্যাথারিন (রবার্ট ডব্লিউ. হ্যামিল-এর পত্নী) তখন স্বামীর গৃহে থাকিতেন; অতএব পিতৃগৃহে আসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মিশিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই। দুই-চারি বার দেখিয়া থাকিলেও বক্তৃতা তিনি মোটেই শুনেন নাই। তবে তিনি ও তাঁহার স্বামী সাহিত্যাদির চর্চা করিতেন এবং তাঁহাদের বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন জন কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ও সংবাদপত্রসেবী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী। "এক রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা হ্যামিল স্বামীজীর অদ্ভুত গুণাবলীর কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতেছিলেন; ইহাতে তাঁহারা বলিলেন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা এবং মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা একমুহূর্তে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারেন। মাসীমা বলিলেন, 'আমি যদি তাঁকে আগামী রবিবার সন্ধ্যায়

এখানে আসতে রাজী করাতে পারি তো আপনারা সবাই এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন তো!' তাঁহারা সম্মত হইলেন এবং একটা ঘরোয়া নৈশভোজনের আসরে স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিসব বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা মাসীমার স্মরণ নাই; তবে এইটুকু মনে আছে যে, সব সময়টাই খুব উৎসাহপূর্ণ ছিল এবং আলোচ্য বিষয় ছিল হরেক রকমের। ক্যাথারিন মাসী বলেন, বাইবেল ও কোরান এবং প্রাচ্যদেশীয় ধর্মগুলি সম্বন্ধে এবং বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অতি অপূর্ব। আসর ভাঙ্গিবার পূর্বেই সন্দেহপরায়ণ সেই পণ্ডিতের দল পরাজিত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, প্রত্যেকটি বিষয়ে স্বামীজী স্বমত স্থাপনে সক্ষম হইয়াছেন; একটা গভীর প্রশংসার ভাব ও ভালবাসা লইয়াই তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।" ('রেমিনিসেন্সেস', ১৪০-৪৬)।

চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় উপবিষ্ট স্বামীজী, ১৮৯৩

ধর্মমহাসভা

চারিশত বৎসর পূর্বে কলম্বাস স্পেনদেশ হইতে আমেরিকায় পদার্পণ করেন, উহার স্মরণে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো শহরে যে ওয়ার্ল্ড্‌স কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ তখন পর্যন্ত স্থূলজগতে যতপ্রকার উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা একত্র সমবেত করা। সেখানে পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির নিদর্শনগুলি তো অবশ্যই স্থান পাইয়াছিল, অনুন্নত দেশের সংস্কৃতির চাক্ষুষ নিদর্শনও সেখানে প্রতীকাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। তবু মনে হইল, মনোজগতে মানবের উন্নতির নিদর্শনও সেখানে স্থান পাওয়া আবশ্যক। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শ্রীযুক্ত চার্ল্‌স ক্যারল বনির মনে হইল জগতের সর্বদেশের প্রতিনিধিদের লইয়া এমন কতকগুলি কংগ্রেসের (সম্মেলনের) আয়োজন হওয়া আবশ্যক যাহাতে মানবসভ্যতার সহিত দৃঢ়সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারে। বনি একজন কৃতিমান ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার কল্পনা সাদরে গৃহীত হইয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর 'ওয়ার্ল্ড্‌স কংগ্রেস অক্সিলিয়ারী অব দি কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন' নামে একটি কমিটি গঠিত হইল এবং বনি হইলেন উহার প্রেসিডেণ্ট। এই কংগ্রেসগুলির সংখ্যা ছিল কুড়ি এবং ইহাদের অধিবেশন হয় ১৫ই মে হইতে ২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সকলের আলোচ্য বিষয় ছিল সমাজের উন্নতি, সাধারণ সংবাদপত্র, চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা, মাদকতাবর্জন, আইন ও সমাজসংস্কার, অর্থশাস্ত্র, ধর্ম ইত্যাদি। এই কংগ্রেসগুলির মধ্যে ধর্মমহাসভাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং জনসাধারণের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

অবশ্য এইরূপ ধর্মমহাসভা জগতে নূতন নহে। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে ধর্ম-সম্মেলন অনেকবার হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টানগণও বহুবার স্বীয় ধর্মমত স্থির করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছেন। মুসলমান ধর্মের ইতিহাসেও ইহার সাক্ষ্য আছে। কিন্তু জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে নির্বিবাদে একই মঞ্চ হইতে স্বীয় মত ঘোষণা করিবার সুযোগ বা অধিকার পূর্বে কেহ পান নাই। এরূপ একটি পরিকল্পনাই ছিল অচিন্তনীয়। তদানীন্তন পরমতাসহিষ্ণুতার ও জড়বাদের প্রাধান্যের দিনে যখন এই প্রস্তাব

ঘোষিত হইয়াছিল, তখন উহা মানুষের সাধ্যাতীত বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল, কিন্তু এমন অসম্ভব ব্যাপারও স্বামীজীর নিকট দৈবনির্দিষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। ভারত-ত্যাগের পূর্বে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "হরিভাই, ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) জন্য হচ্ছে। আমার মন তাই বলছে। শীগগিরই এর প্রমাণ দেখতে পাবে।"

স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে মহাসভার উদ্দেশ্য এইভাবে প্রকটিত হইলেও যাঁহারা প্রত্যক্ষতঃ ইহার আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মনে আপাতবিরুদ্ধ দুইটি ভাবের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা উদারতাসহকারে সকল ধর্মকে মহাসভায় সমাসন প্রদান করিলেও তাঁহাদের গোপন বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ এবং বক্তৃতাকালে তাহা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশও হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীজী পরে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "খ্রীষ্টধর্ম অপর ধর্মাপেক্ষা মহত্তর এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই ধর্মমহাসভার আয়োজন হইয়াছিল।" অপর এক সময় এক সাক্ষাৎকারকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয়, জগতের কাছে বিধর্মীদিগকে বিদ্রূপচ্ছলে দেখানোই ছিল ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য।" অনেকে ভাবিতে পারেন, যে মহাসভা স্বামীজীকে জগৎসমক্ষে পরিচিত করিয়া দিল, তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ বিপরীত মন্তব্য করা ঠিক হয় নাই। কিন্তু যেভাবে সভার আয়োজন ও পরিচালনা হইয়াছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই প্রমাণিত হইবে, অন্য ধর্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব যেন আয়োজকদের হৃদয়ের অন্তর-তমদেশে লুক্কায়িত ছিল, আর তাঁহারা সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন, মহাসভায় খ্রীষ্টধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য উদারচেতা লোকেরও অভাব ছিল না। প্রেসিডেণ্ট বনি ছিলেন ইঁহাদের অগ্রণী। কিন্তু অনুপ্রেরণা বনির হইলেও কার্য-ক্ষমতা ছিল ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মনেতা মাননীয় জন হেনরী ব্যারোজের হাতে ; তিনিই ছিলেন সাধারণ সমিতির সভাপতি এবং ঐ সমিতিই সমস্ত আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যারোজ এইজন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা যখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, অখ্রীষ্টান ধর্মগুলির সহিত খ্রীষ্টান ধর্মকে সমাসনে বসানো মানে খ্রীষ্টধর্মের অপমান করা, তখন তাহার উত্তরে ব্যারোজ যাহা বলিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "আমরা বিশ্বাস করি খ্রীষ্টধর্ম অপর সকল ধর্মের স্থান অধিকার করিবে, কারণ অন্য সব ধর্মে যেসব

সত্য আছে, তাহাতো খ্রীষ্টধর্মে আছেই, তদপেক্ষা অধিক সত্যও ইহাতে আছে, কারণ এই ধর্ম অদ্বিতীয় মুক্তিদাতা ভগবানের কথা বলে। সত্য বটে, আলোর সহিত অন্ধকারের বন্ধুত্ব সম্ভব নহে, কিন্তু অল্পালোকের সঙ্গে তাহার সহচারিত্ব অবশ্যই আছে। এমন দেশ নাই, যেখানে ভগবান আপনার বাণী প্রচার করেন নাই এবং যাঁহারা ক্রুশের সম্পূর্ণ আলোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উচিত এই যে, অপর যাহারা অল্পালোকে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের প্রতি যেন তাঁহারা ভ্রাতৃভাব পোষণ করেন।" ইহা অবশ্যই সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া মানা বা সমমর্যাদা দান নহে। আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরি মহাসভায় যোগদানের অনিচ্ছা জানাইয়া সোজা কথায় লিখিয়াছিলেন, "আমি নিজে যে অসুবিধা বোধ করিতেছি, তাহা দূরত্ব বা সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন নহে, পরন্তু ইহার কারণ এই যে, খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র ধর্ম। অপর যেসব সভ্য আসিতে চাহেন তাঁহাদিগকে সমমর্যাদা না দিয়া এবং তাঁহাদের মতামত ও দাবি-দাওয়ার তুল্যতা স্বীকার না করিয়া খ্রীষ্টধর্মকে কিরূপে মহাসভার অন্যতম অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হইবে, ইহা তো আমি বুঝিতে পারি না।" মহাসভার যে বিবরণ পরে মুদ্রিত হয়, তাহাতে খ্রীষ্টানদের এই অসহিষ্ণু মতই অধিক পাওয়া যায়, উদার মত ইহার তুলনায় অল্প এবং সেগুলি প্রায়শঃ সাধারণ লোকদের মুখ হইতে আসিয়াছে, ধর্মযাজকদের নহে। ব্যারোজ যেটুকু উদারতা দেখাইয়াছিলেন, কোন ধর্মযাজক তাহার অধিক যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, আর ইঁহাদেরও মনের কোণে এই আশাই ছিল যে, অবশেষে খ্রীষ্টধর্মেরই জয় হইবে এবং মহাসভা সেই ধর্মের বিশ্বময় প্রচারের সহায়ক হইবে। কিন্তু এইরূপ হইলেও পুরোহিতমণ্ডলীর বাহিরের আমেরিকান নরনারী একটি উদার ভাব লইয়াই মহাসভার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল এবং উহার জন্য অর্থাদি দান করিয়াছিল।

উদ্দেশ্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলে বাস্তব ক্ষেত্রে মহাসভাটি জগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ইহার সম্পূর্ণ প্রভাব ও তাৎপর্য বুঝিতে আরও অধিক দিন লাগিবে, কারণ ইহার ফলে মানবের মনোজগতে যে এক গভীর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে উহার পরিপূর্ণ রূপ প্রকটিত হওয়া সময়সাপেক্ষ। জগতের সর্বপ্রান্তের মানুষ উহাতে সমবেত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উহা ধর্মমহাসভা মাত্র না হইয়া যেন বিশ্বমহাসভার আকার ধারণ করিয়াছিল। এই মহা-

সভাতে আর কিছু না হইয়া শুধু যদি এইটুকুও প্রমাণিত হইত যে, মানবধর্মের বহুত্বের মধ্যেও একটা একত্ব আছে এবং মানবতারূপ একত্বের মধ্যেও বহুত্বের স্বীকৃতি অবশ্যম্ভাবী, তবু এই মহাসভার গৌরব চিরস্মরণীয় হইত। মহাসভার আর একটি বিশেষ ফলও উল্লেখযোগ্য, ইহার দ্বারা পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিতে প্রাচ্যের মর্যাদা প্রচুর বর্ধিত হইয়াছিল। মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মারউইন-মেরী স্নেল লিখিয়াছিলেন: "ইহার একটি প্রধান দান এই যে, ইহা খ্রীষ্টান জগৎকে, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে, এই অমূল্য শিক্ষা দিয়াছে যে, খ্রীষ্টধর্মের তুলনায় অধিকতর সম্মানযোগ্য আরও অনেক ধর্ম আছে যাহারা দার্শনিক চিন্তার গাম্ভীর্যে, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে, স্বাধীন চিন্তার উৎকর্ষে, মানবের প্রতি সহানুভূতির প্রসার ও অকপটতায় খ্রীষ্টধর্মকে অতিক্রম করে, অথচ নৈতিক সৌন্দর্য কিংবা কার্যকারিতার দৃষ্টিতে উহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ন্যূন নহে। আটটি অখ্রীষ্টীয় ধর্ম মহাসভার আলোচনায় উপস্থিত ছিল—হিন্দু ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, শিণ্টো ধর্ম, মুসলমান ধর্ম ও পারসিক ধর্ম।"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার সকালে চিকাগোর আর্ট-ইনস্টিটিউটে মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। বিশ্বমেলা-ক্ষেত্রে অস্থায়িভাবে আর্ট প্যালেস নামক যে বিরাট ভবন নির্মিত হইয়াছিল, ইহা তাহা হইতে ভিন্ন। চারুকলার স্থায়ী প্রদর্শনাগাররূপে পরিকল্পিত আর্ট-ইনস্টিটিউট অবস্থিত ছিল মিশিগান অ্যাভিনিউর উপর এবং উহাতে তখনও চারুশিল্প সজ্জিত হয় নাই। বিশ্বমেলার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও উহারই সুপ্রশস্ত কক্ষগুলিতে মেলাসংক্রান্ত বহু কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রস্তর-নির্মিত এই শিল্প-প্রদর্শন-শালার বৃহত্তম কক্ষে—'হল অব কলম্বাস'-এ—ধর্মমহা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঠিক দশটায় সমবেত দশটি ধর্মমতের উদ্দেশে দশটি ঘণ্টাধ্বনি হইল। প্রেসিডেণ্ট বনির মতে সেই প্রধান ধর্মগুলি ছিল—ইহুদী ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, তাও ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, শিণ্টো ধর্ম, পারসিক ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম, গ্রীক চার্চ ও প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম। ততক্ষণে হল অব কলম্বাসের গ্যালারিতে চারি সহস্রের অধিক শ্রোতা সমবেত হইয়াছেন; দ্বারদেশেও অনেকে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান। অথচ তাঁহারা এতই শান্ত যে, এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, তখন "একটি ক্ষুদ্র পক্ষী যখন মুক্ত বাতায়নপথে

প্রবেশ করিয়া শূন্য মঞ্চের উপর দিয়া উড়িয়া গেল, তখন তাহার পক্ষশব্দ পর্যন্ত শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।" মঞ্চটি লম্বায় প্রায় একশত ফুট ও প্রস্থে প্রায় পনর ফুট ছিল। মঞ্চের পশ্চাতে ছিল হিব্রু ও জাপানী ভাষায় লিখিত দুই দোদুল্যমান দীর্ঘ-লিপি, পরস্পর হইতে প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে স্থাপিত দুইজন গ্রীক দার্শনিকের বিশাল প্রতিমূর্তি, দার্শনিকের পরে দক্ষিণে একটি সরস্বতী-দেবীর সদৃশ মূর্তি উত্তোলিত-হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। দার্শনিকদ্বয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস ছিল—এক লৌহনির্মিত সিংহাসন—উহাতে বসিবেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ধর্মযাজক কার্ডিন্যাল গিবন্‌স ;—কার্ডিন্যালকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিংহাসনের একটু বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন ছিল! সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে প্রতিনিধিদের ও মহাসভার কর্মকর্তাদের জন্য তিন সারিতে ত্রিশখানি করিয়া সাধারণ কাষ্ঠনির্মিত চেয়ার সজ্জিত ছিল। বক্তাদের জন্য একটি রোস্ট্রামও ছিল। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন হইতে ঐ রোস্ট্রামের গায়ে একখানি বিজ্ঞাপন ঝুলিত—নীচে সাংবাদিকদিগের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অনুমতি ব্যতীত কাহারও প্রবেশ নিষেধ। ইহার প্রয়োজন ছিল, কারণ বিবেকানন্দ প্রমুখ বক্তাদের পরিচ্ছদ স্পর্শ করিবার আগ্রহে উৎসাহী ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃবৃন্দ মঞ্চের দিকে ভিড় করিয়া আসিত।

ঠিক দশটার সময় প্রতিনিধিরা হল অতিক্রম করিয়া মঞ্চের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুরোভাগে প্রেসিডেণ্ট বনি ও কার্ডিন্যাল গিবন্‌স হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের পশ্চাতে প্রদর্শনীর মহিলা-কার্যকরী-সমিতির প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট (যথাক্রমে শ্রীযুক্তা পটার পামার ও শ্রীযুক্তা চার্ল্‌স সি. হেনরোটিন)। তাঁহাদের পশ্চাতে প্রতিনিধিগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে হলের মধ্যবর্তী পথ ধরিয়া সর্বজাতির জাতীয় পতাকার নীচে ও তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অগ্রসর হইয়া মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করিলেন। কার্ডিন্যাল গিবন্‌স মধ্যস্থলে লৌহসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দক্ষিণে বসিলেন পাঁচজন শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত চীন-ধর্মযাজক এবং বামে বসিলেন গ্রীকচার্চের কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত উচ্চাধিকারিগণ। এতদ্ব্যতীত শ্বেত, কৃষ্ণ, হরিদ্রা, গৈরিক ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র সাজে সজ্জিত প্রতিনিধিবর্গ সে মঞ্চের শোভা বর্ধিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ হইতে আগত প্রতিনিধিরা। তথায় উপবিষ্ট

আলখাল্লা ও পাগড়ি-শোভিত সুদর্শন ও প্রতিভামণ্ডিত যুবক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন।

অকস্মাৎ অর্গ্যান বাজিয়া উঠিল এবং সকলে সমস্বরে ভগবানের স্তুতি গাহিতে লাগিলেন। সঙ্গীত শেষ হইল। তখন নিস্তব্ধতার মধ্যে কার্ডিন্যাল গিবন্‌স তাঁহার হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বাইবেলোক্ত ভগবানের 'সর্বজনীন প্রার্থনা' পাঠ করিলেন: "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আপনার নাম জয়যুক্ত হউক" ইত্যাদি। মহাসভার কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। সতর দিন ধরিয়া সকাল, দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যায় তিন বার করিয়া প্রতিদিন অধিবেশন চলিল। শ্রোতার সংখ্যা ক্রমে বর্ধিত হইয়া চতুর্থদিনে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, পার্শ্ববর্তী 'হল অব ওয়াশিংটন' খুলিয়া দিয়া তাহার মধ্যে প্রথম হলের ন্যায় প্রত্যেকটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হইতে থাকিল। পঞ্চম দিনে মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার কার্য আরম্ভ হইল এবং শ্রোতারাও এই দুই ভাগের—সাধারণ ও বিজ্ঞানের—মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িলেন। বিজ্ঞান-শাখায় অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়—ধর্মবিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচিত হইলেও সেখানে স্বামীজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রায়শঃ উপস্থিত থাকিতে হইত বলিয়া তাঁহার আকর্ষণে প্রচুর লোক সমবেত হইত; ইহার ফলে 'হল অব কলম্বাস'-এর ভিড় বেশ কমিয়া গিয়াছিল।

প্রথম দিনে প্রতিনিধিদিগকে মহাসভার কর্মকর্তারা সাদর আহ্বান জানাইলেন এবং প্রতিনিধিরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। পূর্বাহ্ণে সাতটি আমন্ত্রণজ্ঞাপক বক্তৃতা অতি বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় প্রদত্ত হইল; ইহাতেই পূর্বাহ্ণ প্রায় শেষ হইয়া গেল—শুধু আটজন প্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবার অবকাশ পাইলেন। প্রথম বক্তা ছিলেন আর্চ বিশপ অব জান্তে। "মানবমাত্রের স্রষ্টা একজন; সুতরাং ভগবানই তাহাদের সকলের পিতা"—এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া বক্তৃতাশেষে তিনি যখন বলিলেন, "আমি আমার হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও তদ্দেশবাসী সুখী জনগণকে আশীর্বাদ করি।" তখন প্রেসিডেণ্ট বনি মন্তব্য করিলেন, "এতো সত্যি অতি চমৎকার কথা!" অমনি শ্রোতৃবৃন্দের হর্ষধ্বনিতে হলটি মুখরিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দশ বৎসর পূর্বে আমেরিকায় আসিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন; 'প্রাচ্য যীশুখ্রীষ্ট' গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেও তাঁহার সুনাম ছিল। অতএব তিনিও শ্রোতাদের প্রশংসা পাইলেন। চীনদেশীয় প্রতিনিধি পুং

কুয়াং ইউর বক্তৃতার পূর্বে প্রেসিডেণ্ট বনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এদেশে আমরা চীনের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিনি।" অতএব পুং কুয়াং ইউর বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলটি প্রশংসায় মাতিয়া উঠিল।

সভার কার্য এইরূপে অগ্রসর হইতেছে; আর এদিকে স্বামীজী নীরবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, যাহাতে এই বিরাট বিদ্বৎসমাজের কাছে ভারতের বাণী প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি তিনি তাঁহাকে দেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য কয়েকবার আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি প্রতিবার বলিতে লাগিলেন, "না, এখন নয়।" বারংবার এইরূপ হওয়ায় প্রেসিডেণ্টের মনে সন্দেহ জাগিল, "ইনি কি বক্তৃতা দিতে চান না নাকি?" স্বামীজী স্বয়ং মহাসভার আরম্ভের বর্ণনা ও স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়া অধ্যাপক রাইটকে ২রা অক্টোবরের পত্রে লিখিয়াছিলেন, "সেই মহাসভায়, যেখানে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত, সেখানে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে এবং বক্তৃতা দিতে আমার যে কি ভয় হচ্ছিল!···মহাসভায় আমি শেষ মুহূর্তে একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে হাজির হয়েছিলাম।···কিন্তু প্রভু আমাকে শক্তি দিয়েছেন।" আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে আরও বিশদ বিবরণ পাই: " 'মহাসভা' খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' নামক বাটীতে সমবেত হইলাম।···এখানে সর্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং বোম্বাই-এর নাগরকর; বীরচাঁদ গান্ধী জৈনসমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনি বেসান্ত ও চক্রবর্তী থিওসফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মজুমদারের সহিত আমার পূর্বে পরিচয় ছিল, আর চক্রবর্তী আমার নাম জানিতেন। ···খুব শোভাযাত্রা করিয়া যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্ল্যাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসানো হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, আর উপরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার সুশিক্ষিত সমাজের বাছা বাছা ছয় সাত হাজার নরনারী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্ল্যাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জীবনে কখন সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইবার পর সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার

সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করি নাই।" ('বাণী ও রচনা,' ৬।৩৮০-৮১)।

অপরাহ্ণে প্রতিনিধিদের আরও চারিটি লিখিত ভাষণ সমাপ্ত হইলে স্বামীজীর আহ্বান আসিল। তিনি লিখিয়াছেন: "দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার (শ্রীধর স্বামী) সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালং'—ভগবান বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোলেন। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক! সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন 'হলে' এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই।" (ঐ, ৬।৩৮১)।

প্রথম দিনের বক্তৃতার প্রারম্ভে হর্ষধ্বনি সম্বন্ধে ব্যারোজ লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুক্ত (মিঃ) বিবেকানন্দ যখন শ্রোতৃবৃন্দকে 'ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তখন এক তুমুল করতালিধ্বনি উত্থিত হইয়া অনেক মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল।" শ্রীযুক্ত এস. কে. ব্লজেট ঐ দিনের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আমি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই যুবকটি উঠিয়া যখন বলিলেন, 'আমার আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইরা', তখন সাত হাজার নরনারী এমন কি একটা কিছুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিবেদনার্থ উঠিয়া দাঁড়াইল যাহা তাহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিল না। যখন বক্তৃতা শেষ হইল, তখন দেখিলাম, দলে দলে নারীরা তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য বেঞ্চি ডিঙ্গাইয়া অগ্রসর হইতেছে। আমি তখন মনে মনে বলিলাম: 'দেখ বাছা, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখিতে পার তো তুমি ভগবান'!"

মাথা তিনি ঠিকই রাখিয়াছিলেন, হৃদয়ও তাঁহার পূর্ববৎ ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যের চিন্তায় পূর্ণ ছিল। মহাসভায় একটা জগদ্বরেণ্য জাতির মুখপাত্রদের দ্বারা মুক্তকণ্ঠে বিজয়ী বীররূপে সংবর্ধিত হইয়াও এবং সে রাত্রে চিকাগোর এক ধনকুবেরের সুসজ্জিত গৃহে রাজোচিত যত্নাদির অধিকারী হইয়াও তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। সেই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ মধ্যে তাঁহার মন আনন্দলাভ না করিয়া বিষাদে মগ্ন হইল। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ভারতের দারিদ্র্য এবং এই অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে ভয়াবহ বিরোধ যেন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুলিল; পালকের শয্যা তাঁহার নিকট কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইল। বালিশ তাঁহার চক্ষের জলে আর্দ্র হইল। শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সুদূরের দিকে উদাসদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন—দুঃখে তিনি তখন যেন মুহ্যমান। অবশেষে ভাবাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূশয্যা গ্রহণপূর্বক কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, আমার স্বদেশ যেকালে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সেকালে মানযশের আকাঙ্ক্ষা কে করে? গরীব ভারতবাসী আমরা এমনি দুঃখময় অবস্থায় পৌঁছেছি যে, লক্ষ লক্ষ জন একমুষ্টি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করি, আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ভারতের জনতাকে কে উঠাবে? কে তাদের মুখে অন্ন দেবে? মা দেখিয়ে দাও, আমি কি করে তাদের সেবা করতে পারি।" আমাদের বিশ্বাস, এই ঘটনা লায়ন পরিবারের গৃহেই ঘটিয়াছিল এবং প্রথম দিন মহাসভার কার্যশেষে সেই সন্ধ্যায় যে অভ্যর্থনা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার পরে স্বামীজী অধিক রাত্রে ঐ বাড়িতে আসিয়াছিলেন। চিকাগোয় আগমনের দ্বিতীয় রাত্রি (১০ই সেপ্টেম্বর) তিনি হেলদের গৃহে, অথবা অন্য কোথাও কাটাইয়াছিলেন, বলা কঠিন। লায়নরা ছিলেন বেশ ধনী, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে তাঁহাদের চিনির কল ছিল।

প্রথম দিনের বক্তৃতাটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল; কিন্তু উহার ভাব এত উদার ও সর্বব্যাপী ছিল এবং প্রতিটি কথার সহিত বক্তার আবেগ, সত্যনিষ্ঠা ও

অকপটতা এমন উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, উহার প্রভাব হইয়াছিল অতি গভীর ও দীর্ঘকালস্থায়ী। প্রথম ভাষণে তিনি "পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসিসমাজের পক্ষ হইতে" যে দেশ সর্বধর্মের প্রসূতিস্বরূপ তাহার নামে আমেরিকাবাসী নরনারীকে ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, "আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।...বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয়, তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানাপথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।...এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই...একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রগামী ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বাধিক অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।" মহাসভার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা এমন বাগ্মিতাপূর্ণ সুস্পষ্ট ভাষায় আর কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই; সুতরাং বিবেকানন্দ শ্রোতাদের হৃদয় জয় করিলেন। কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, এই বিজয় শুধু বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা ও উদারদৃষ্টির বলেইলাভহইয়াছিল এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর মনগুলিকে এক অসাধারণ চেতনভূমিতে একসূত্রে সংগ্রথিত করিবার জন্য অন্য কোন অদৃষ্ট অধ্যাত্মশক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল না। আমরা বরং এ বিষয়ে 'নিউ ডিসকভারিজ'-এর গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীযুক্তা বার্কের অভিমত সমীচীন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন, "অপরদের বেলায় (হর্ষধ্বনির) কারণগুলি সুস্পষ্ট—রাজনীতিক বা সমধার্মিক সহানুভূতি, বক্তার সহিত পূর্বপরিচয়, অথবা অবহেলিত জাতির প্রতি নিজেদের পূর্বকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত। স্বামীজীর বেলায় এসবের কিছুই ছিল না। তাঁহার বাগ্মিতার ফলে হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল ইহাও বলা চলে না; কারণ সারা সকাল ও অর্ধেক অপরাহ্ণ ধরিয়াই তো বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা প্রচারিত হইয়াছিল।...শ্রীযুক্তা ব্লজেট যেমন বলিয়াছেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলে নিশ্চয়ই বলিতে পারিত না, কেন তাহারা স্বামীজীর প্রথম শব্দগুলি শুনিবামাত্র হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।...বরং বলিতে হইবে, স্বামীজী স্বয়ং এবং তাঁহার শব্দরাশিমধ্যে লুক্কায়িত কোন এক অনুচ্চারিত বস্তুই তাহাদিগকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার কথাগুলি শুধু ফাঁকা ভাবুকতার আকারে না আসিয়া বাস্তব সত্যের রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সকলের হৃদয়ে এক চিরবিস্মৃত আত্মিক ঐক্যের বোধ

উজ্জীবিত করিয়াছিল—উহা ছিল এমন এক স্মৃতি, যাহা তখন হইতে গোপনে অথচ অলঙ্ঘ্যশক্তিতে কার্য করিতে থাকিবে এবং তাহার ফলে সভ্যতার রূপ বদলাইয়া দিবে ও ধর্মসমন্বয় স্থাপন করিবে।" (৬২)।

স্বামীজীর বক্তৃতার পরে আরও চারিটি বক্তৃতা হয়; অর্থাৎ পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে মোট চব্বিশটি বক্তৃতার পর ১১ই সেপ্টেম্বরের কার্য শেষ হইল। ইহার পরও স্বামীজীকে প্রায় প্রতিদিনই হয় সাধারণ মহাসভায় না হয় উহার বিজ্ঞান-শাখায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। সব বক্তৃতাতেই লোকসমাগম হইত প্রচুর এবং স্বামীজীর বক্তৃতাশ্রবণে সমভাবেই হর্ষধ্বনি উত্থিত হইত। তিনি নিজে আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন: "একটি সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; 'মহিলা, মহিলা, কেবল মহিলা—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্যন্ত ফাঁক নাই, বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্বে অন্য যেসকল প্রবন্ধ পঠিত হইতে-ছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্যই অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়াছিল', ইত্যাদি। যদি সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যেসকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য হইবে। কিন্তু তুমি তো জানই, নাম-যশকে আমি ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইতাম, তখনই আমার জন্য কর্ণ-বধিরকারী করতালি পড়িয়া যাইত। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।"

আলাসিঙ্গা প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর একটা অতি নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ ছিল; তাঁহারা কত কষ্টে অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন! অতএব মানযশের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও স্বামীজী তাঁহাদের নিকট একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠানো স্বীয় কর্তব্য বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। পত্রখানির তারিখ ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩, মহাসভার অনেক পরে লিখিত; অর্থাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নাম জাহির করার জন্য তিনি তখনই লিখিতে বসেন নাই। ঠিক এই হিসাবেই এবং ভারতে কেন তিনি তখনই ফিরিতেছেন না, ইহা

বুঝাইবার জন্য জুনাগড়ের দেওয়ানজী সাহেবকে লিখিয়াছিলেনঃ "আমি অলস পর্যটক নহি, কিংবা দৃশ্য দেখিয়া বেড়ানোও আমার পেশা নহে। যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে আমার কার্যকলাপ দেখিতে পাইবেন এবং আমাকে আজীবন আশীর্বাদ করিবেন।...ধর্মমহাসভায় আমি কিছু বলিয়াছিলাম এবং তাহা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমার হাতের কাছে যে দুই-চারিটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা পড়িয়া আছে, তাহা হইতেই কিছু কিছু কাটিয়া পাঠাইতেছি। নিজের ঢাক নিজে পিটানো আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আপনি আমাকে স্নেহ করেন, সেই সূত্রে আপনার নিকট বিশ্বাস করিয়া আমি এ কথা অবশ্য বলিব যে, ইতঃপূর্বে কোন হিন্দু এদেশে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই এবং আমার আমেরিকা আগমনে যদি অন্য কোন কাজ নাও হইয়া থাকে, আমেরিকাবাসিগণ অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করিয়াছে যে, আজও ভারতবর্ষে এমন মানুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে যাঁহাদের পাদমূলে বসিয়া জগতের সর্বাপেক্ষা সভ্য জাতিও ধর্ম এবং নীতি শিক্ষালাভ করিতে পারে।...কয়েকটি পত্রিকা হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

" 'সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অনেকগুলিই বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভার মূলনীতি ও উহার সীমাবদ্ধতা যেরূপ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অন্য কেহই তাহা করিতে পারে নাই। তাঁহার বক্তৃতার সবটুকু আমি উদ্ধৃত করিতেছি এবং শ্রোতৃবৃন্দের উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা তিনি এবং তাঁহার অকপট উক্তিগুলি যে মধুর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশ করেন, তাহা তদীয় গৈরিক বসন এবং বুদ্ধিদৃপ্ত দৃঢ় মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় নয়।' ঐ পৃষ্ঠাতেই পুনর্বার লিখিত আছেঃ 'তাঁহার শিক্ষা, বাগ্মিতা এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মুখে হিন্দুসভ্যতার এক নূতন ধারা উন্মুক্ত করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, গম্ভীর ও সুললিত কণ্ঠস্বর স্বতই মানুষকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে এবং ঐ বিধিদত্ত সম্পদ্‌সহায়ে এদেশের বহু ক্লাব ও গির্জায় প্রচারের ফলে আজ আমরা তাঁহার মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়াছি। কোন প্রকার নোট প্রস্তুত করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন না। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়া অপূর্ব কৌশল ও ঐকান্তিকতা সহকারে তিনি

মীমাংসায় উপনীত হন এবং অন্তরের গভীর প্রেরণা তাঁহার বাগ্মিতাকে অপূর্ব-ভাবে সার্থক করিয়া তোলে।' ('নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক')।

" 'ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, এই শিক্ষিত জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা কত নির্বুদ্ধিতার কাজ!' ('হেরাল্ড'—এখানকার শ্রেষ্ঠ কাগজ)।

"আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না, পাছে আমায় দাম্ভিক বলিয়া মনে করেন। …এক্ষণে, এই সকল উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিবার পর ভারতবর্ষ হইতে একজন সন্ন্যাসী এদেশে প্রেরণ করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আপনার মনে হয় কি? অনুগ্রহপূর্বক এই চিঠি প্রকাশ করিবেন না। ভারতবর্ষে থাকিতেও যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি—অপকৌশল দ্বারা নাম করাকে আমি ঘৃণা করি। আমি প্রভুর কার্য করিয়া যাইতেছি…।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৫০৭-৯)।

যে কয়দিন মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই কয়দিনই প্রতিনিধিদিগকে বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। মহাসভায় ও মহাসভার বিজ্ঞান-শাখায় বক্তৃতাদি তো ছিলই, মহাসভার বাহিরে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট বহু সভা, সমিতি, সম্মেলন প্রভৃতিতেও তাঁহাদিগকে যোগ দিতে হইয়াছিল। মহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় বাগ্মী স্বামী বিবেকানন্দ এই কয়দিন বিশ্রাম পান নাই বলিলেই চলে। অবশ্য এই সমস্ত বক্তৃতাদির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এইটুকু প্রকাশ পায়: স্বামীজী ধর্মমহাসভায় ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতার পর, ১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার অপরাহ্ণে কূপমণ্ডুকের গল্পটি বলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লিখিত বক্তৃতাটি পাঠ করেন। ২০শে তারিখের সাধারণ আলোচনায় যোগ দিয়া তিনি খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অশোভন কার্যকলাপ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ২৬শে বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। ২৭শে সংক্ষেপে বিদায় অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা বার্কের মতে মহাসভায় প্রদত্ত এইসকল বক্তৃতা ছাড়াও স্বামীজী উহার বিজ্ঞান-শাখায় সম্ভবতঃ আটবার বক্তৃতা করেন। উহাদের মধ্যে কয়েকটি বক্তৃতার বিষয় ও তারিখ এইরূপ জানা গিয়াছে: 'শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্ত-দর্শন'—শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, পূর্বাহ্ণ সাড়ে দশটা। 'ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ'—ঐ দিন অপরাহ্ণ। পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির বিষয় সম্বন্ধে—২৩শে

সেপ্টেম্বর। 'হিন্দুধর্মের সারাংশ'—সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর। আরও কয়েকটি বক্তৃতা ও অভ্যর্থনাদির সংবাদ জানিতে পারা যায়। মহাসভার প্রথমদিনের অধিবেশনের পরে সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদিগকে চিকাগোর ভদ্রসমাজের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত ব্যারোজ শ্রীযুক্ত এস. টি. বার্টলেটের প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদে যে বিরাট অভ্যর্থনা-সম্মেলনের আয়োজন করেন তাহাতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভোজন ও আমোদ-আহ্লাদ চলিতে থাকে। দ্বিতীয় রাত্রে আর্ট ইনষ্টিটিউটের হলগুলিতে প্রেসিডেণ্ট বনি মহাসভার সমস্ত প্রতিনিধির সম্মানার্থ আর একটি বৃহত্তর প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং উহাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি যোগ দেন। মহাসভার চতুর্থ দিন রাত্রে (১৪ই সেপ্টেম্বর) বিশ্বমেলার মহিলা ম্যানেজারদের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা পটার পামার এক্সপোজি-শনের মহিলা-ভবনে মহাসভার প্রতিনিধিবর্গকে এক প্রীতি-সম্মেলনে আহ্বান করেন এবং অনেক প্রকার আমোদেরও আয়োজন করেন। এখানে স্বামীজী ভারতীয় নারী-সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশীয় নারীদের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন—আর্চবিশপ জাস্তে, ধর্মপাল, মজুমদার ও পুং কুয়াং ইউ। স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলী হইতে জানা যায়, তিনি শ্রীযুক্তা পটার পামারের সৌজন্যে চিকাগোর জ্যাকসন স্ট্রীটে অবস্থিত মহিলাভবনে প্রাচ্যদেশীয় নারীদের সম্বন্ধে আর একবার বক্তৃতা দেন এবং ঐ বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয় 'চিকাগো ডেলি ইণ্টার-ওশ্যান' পত্রিকায় (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩; অষ্টম খণ্ড, ১৯৮)। আবার ২৫শে রবিবার প্রাতে তিনি লাফলিন ও মনরো স্ট্রীটে অবস্থিত তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে 'ভগবৎ প্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ইহা ছাড়াও চিকাগোর ধনকুবেরদের ও ধর্মযাজকদের গৃহে বহু সম্মেলনের আয়োজন হয়। অতএব পরে যখন স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "এই দেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহদ্বারই আমার জন্য উন্মুক্ত," তখন তিনি বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই; তখন তিনি চিকাগো-সমাজে সর্বত্র সমাদৃত।

মহাসভা প্রতিদিন তিনবার করিয়া বসিত এবং ঐরূপ প্রত্যেকবারের অধিবেশন আড়াই ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা কাল চলিত। প্রতিদিন নূতন নূতন ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিতেন এবং প্রতিদিনের আরম্ভে সভাস্থ সকলকে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের নিকট সভার কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করিতে বলা হইত। অতঃপর উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থাতেই পূর্ব হইতে

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা" ইত্যাদি। বক্তারা সাধারণতঃ আধ ঘণ্টা সময় পাইতেন; কিন্তু জনপ্রিয় বক্তার জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। স্বামীজী ছিলেন এই বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে অন্যতম এবং সভায় শ্রোতাদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কিংবা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার এই জনপ্রিয়তার সুযোগ লওয়া হইত। 'দি বস্টন ইভনিং ট্র্যান্সক্রিপ্ট' পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল: "স্বীয় ভাবরাশির চমৎকারিত্ব এবং আকৃতির প্রভাবে তিনি মহাসভায় অত্যন্ত লোকপ্রিয়। তিনি শুধু মঞ্চের একদিক হইতে অপর দিকে অগ্রসর হইলেই করতালি পাইয়া থাকেন এবং বহু সহস্র ব্যক্তির এই সুব্যক্ত প্রশংসায় তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব প্রকাশ না করিয়া উহা শিশুসুলভ সন্তোষসহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন।...মহাসভার কর্তৃপক্ষ বিবেকানন্দকে একেবারে সর্বশেষের জন্য ঠিক করিয়া রাখিতেন, যাহাতে শ্রোতারা শেষ পর্যন্ত বসিয়া থাকেন। কোন গরম দিনে যখন কোন বক্তার নীরস প্রাণহীন দীর্ঘ বক্তৃতার ফলে শত শত ব্যক্তি কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিত, তখন সভাপতি উঠিয়া ঘোষণা করিতেন, সভান্তে ভগবানের আশীর্বাদ-প্রার্থনার ঠিক পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ কিছু বলিবেন। অমনি শত শত শ্রোতা শান্তভাবে বসিয়া থাকিত। হল অব কলম্বাসের (ঘর্মাক্ত কলেবর) ব্যজনপরায়ণ চারি সহস্র শ্রোতা আশাপূর্ণ হৃদয়ে সস্মিতবদনে একঘণ্টা দুইঘণ্টা ধরিয়া অপর বক্তাদের অভিভাষণ শুনিতে থাকিত, শুধু এই জন্য যে পনর মিনিট বিবেকানন্দের ভাষণ শুনিতে পাইবে। সর্বোত্তম জিনিসটি শেষের জন্য ধরিয়া রাখিতে হয়, সভাপতি এই প্রাচীন রীতিটি সুবিদিত ছিলেন।"

'নরথ্যাম্পটন ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল লিখিয়াছিল, "কার্যক্রমের শেষ মুহূর্তের পূর্বে বিবেকানন্দকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইত না; ইহার উদ্দেশ্য ছিল, লোককে শেষপর্যন্ত ধরিয়া রাখা। কোন গরম দিনে নীরস বক্তার সুদীর্ঘ বক্তৃতার ফলে যখন শত শত লোক সভাগৃহ ত্যাগ করিতে থাকিত, তখন বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধরিয়া রাখার জন্য শুধু এইটুকু ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট হইত যে, শেষ প্রার্থনার পূর্বে বিবেকানন্দ সংক্ষেপে কিছু বলিবেন। অমনি সেই স্বনামধন্য ব্যক্তির পনর মিনিটের বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিত।"

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে 'অ্যারেনা' নামক সাময়িক পত্রিকায় এক

প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত বীরচাঁদ গান্ধীও এই কথা প্রকাশ করেন যে, চঞ্চল শ্রোতৃবর্গকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ভারতীয় বক্তাদিগের বক্তৃতা সর্বশেষে স্থান পাইত। বলা বাহুল্য, স্বামীজী এই চিহ্নিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মহাসভার কার্যধারা অনুসৃত হইতেছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন বক্তা নিজ নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন, মহাসভার বাহিরেও বিবিধ সম্মেলনে তাঁহাদের ভাষণ চলিতেছে, আর প্রতিদিনই স্বামী বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা বর্ধিত হইতেছে। এইভাবে অখ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব মানুষের মনে কতখানি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা ১৮৯৩-এর ১২ই অক্টোবর 'ওপেন কোর্ট' নামক সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতার অংশবিশেষ হইতেই প্রকাশ পায়। কবি লিখিয়াছিলেন, "তারপর শুনলাম গেরুয়াপরা সেই সুন্দর হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা, যিনি বললেন, সকল মানুষই ভগবানের অংশ, তার চেয়ে কিছুই কম নয়। আর তিনি বললেন, আমরা পাপী নই ; কাজেই আমার মনে আবার শান্তি ফিরে এল, আর ধর্মমহাসভা এ কথায় সায় দিয়ে উচ্চ হর্ষধ্বনি করে উঠল।" ইচ্ছাপূর্বক খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ কোনও প্রাচ্যদেশীয় বক্তা না করিলেও তাঁহাদের নবীন বার্তা আমেরিকাবাসীর মন জয় করিতেছে এবং মিশনরীরা প্রাচ্য জগৎকে যেরূপ অসভ্য বলিয়া চিত্রিত করিতেন তাহা বস্তুতঃ সেরূপ নহে দেখিয়া মিশনরীদের প্রতি আমেরিকানদের শ্রদ্ধা তিরোহিত হইতেছে বুঝিয়া গোঁড়া খ্রীষ্টানরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং মহাসভায় প্রকাশ্য ধর্মবিরোধের অবকাশ নাই, ইহা জানিয়াও অপর ধর্মের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আরম্ভ করিলেন। মহাসভার প্রথম দশ দিন খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন দিক পরিপূর্ণরূপে আলোচিত হইল। এই সুযোগে অধিবেশনের তৃতীয় দিনেই 'লণ্ডন মিশনরী সোসাইটি'র ধর্মপ্রচারক টমাস এবেন্জার শ্লেটার বাইবেল ও বেদের তুলনা করিয়া দেখাইলেন, শুধু বাইবেলে ভগবানের অশেষ কৃপার কথা প্রকটিত হইয়াছে, বেদে উহা নাই। চতুর্থ দিনে বস্টনের ধর্মপ্রচারক জোসেফ কুক 'মানুষ পাপী' ইত্যাদি কথা বেশ করিয়া বুঝাইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ, জীবের মুক্তিলাভ ও পাপের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যায় জগতের কোনও ধর্মই খ্রীষ্টধর্মের ধারে-কাছেও আসিতে পারে না। সুর চড়িতে চড়িতে স্বামীজী যেদিন (১৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে) হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন, সেদিন যেন মতলব করিয়াই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ চরমে উঠিল।

মহাসভার সেই নবম দিনে যেন একটা তুমুল যুদ্ধের পূর্বাভাস পাওয়া গেল। এই দিনের ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া আইওয়ার এক সংবাদপত্র ২৯শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিল : "রেভারেণ্ড কুক হিন্দুদিগকে নির্মমভাবে সমালোচনা করিলেন এবং অধিকতর নির্মমভাবে সমালোচিত হইলেন। উক্ত 'হিন্দুধর্ম' নামক প্রবন্ধ পাঠের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করিয়া চিকাগো ডেলি ট্রিবিউন ২০শে সেপ্টেম্বর লিখিল : পরবর্তী বক্তা হিসাবে ডঃ নোবল স্বামীজীর নাম ঘোষণা করিলে সুস্মিত বদনে ও দীপ্ত চক্ষে তিনি মঞ্চের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইবার সময় বিপুল হর্ষধ্বনি হইতে থাকে। খ্রীষ্টান জাতিদিগের বিরুদ্ধে এক হিংস্র আক্রমণ করিয়া তিনি বলিলেন, আমরা যাহারা প্রাচ্য জগৎ হইতে আসিয়াছি, তাহারা এখানে দিনের পর দিন বসিয়া আমাদের প্রতি এইসব মুরুব্বিয়ানার কথা শুনিয়াছি যে, আমাদের খ্রীষ্টান হইয়া যাওয়া উচিত ; কারণ খ্রীষ্টান জাতিরা সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী। আশে-পাশে তাকাইয়া আমাদের চক্ষু পড়ে সর্বাধিক ঐশ্বর্যবান খ্রীষ্টান রাজ্য ইংলণ্ডের প্রতি, যাহা পঁচিশ কোটি এশিয়াবাসীকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে। অতীত ইতিহাসের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আমরা দেখি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইওরোপের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয় স্পেন দেশ হইতে ; আর স্পেনের ঐশ্বর্যের সূত্রপাত হয় মেক্সিকো আক্রমণ হইতে। একই রক্তমাংসের মানুষের গলা কাটিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম ঐশ্বর্য অর্জন করে। এমন মূল্যের বিনিময়ে হিন্দুরা ঐশ্বর্য চায় না'।···হর্ষধ্বনি শেষ হইলে তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।" এই যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধটি আরও পূর্বে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে স্থাপিত হইলে খ্রীষ্টধর্ম-যাজকদের বৃথা আস্ফালন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত ; কারণ তাঁহাদের সমস্ত সমালোচনা ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিদ্বেষসম্ভূত। মিশনরীরা যত নির্লজ্জভাবেই স্বামীজীকে ও তাঁহার মতবাদকে খর্ব করিতে বদ্ধপরিকর হউন না কেন, আমেরিকাবাসী জনসাধারণ তাঁহার প্রতি ক্রমেই অধিক আকৃষ্ট হইতেছিল। এমন কি ঐ দিনের হীন আক্রমণের পরও ঐ বক্তৃতাকালে লোকসংখ্যা হইল সর্বাধিক। 'চিকাগো ইণ্টার-ওশ্যানের' মতে, "মহাসভার আরম্ভের এক ঘণ্টা পূর্ব হইতেই লোকের বেজায় ভিড়—যাহার মধ্যে নারীদের সংখ্যাই ছিল অধিক—'কলম্বাস হলে'র প্রবেশদ্বারগুলির দিকে ঝাঁকিয়া আসিতে লাগিল ; কারণ পূর্বেই ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা

করিবেন। মহিলা—মহিলা—সর্বত্র মহিলাতে বিরাট গ্যালারি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।”

এই প্রবন্ধে স্বামীজী অতি সংক্ষেপে হিন্দুদের দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সাধারণ মতবাদ, বিশ্বাস, আচার-বিচার ইত্যাদির পরিচয় দিয়াছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিশাল ধর্মের এতগুলি মৌলিক তথ্য এরূপ সহজবোধ্য ভাষায় এক বিধর্মী বিজাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করা শুধু তাঁহারই পক্ষে সম্ভব ছিল। কেননা বহুধা বিভক্ত এবং বিদেশীর চক্ষে কোনরূপ শৃঙ্খলাবিহীন হিন্দুচিন্তারাশিকে একটা অখণ্ড সুসন্নিবদ্ধ দর্শনভিত্তিক ধর্মরূপে এমন সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ভাষায় বিধর্মীর নিকট ইহার পূর্বে আর কেহ উপস্থিত করেন নাই। মহাসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দ একমাত্র ভারতবাসী, এমন কি একক বাঙালী ছিলেন না বটে, তথাপি সমগ্র হিন্দুধর্মের প্রবক্তা ছিলেন একমাত্র তিনিই। অপর প্রতিনিধিরা সম্প্রদায়বিশেষের কথা বলিয়াছিলেন, স্বামীজীর বক্তব্য বিষয় ছিল সমগ্র সনাতন ধর্মের সর্বজনীন তথ্যরাশি। তিনি মানবাত্মা ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিন্দুমত প্রকটিত করিলেন, বেদান্ত-দর্শনের মূলকথা খুলিয়া বলিলেন এবং দেখাইলেন, ঐ ভিত্তিতেই সর্ব-প্রকার উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইতে পারে; কারণ বেদান্ত-মতে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী একই সত্যলাভের বিভিন্ন উপায়মাত্র। তিনি বলিলেন, হিন্দুদের মতে জীবাত্মা নিত্যপাপমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত; তবু সে এক এবং অসীম হইয়াও মায়াপ্রভাবে বহু, বিচিত্র ও বদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়। বহু জন্ম ধরিয়া সাধনার ফলে ভগবদ্দর্শন বা একত্বানুভূতি হইয়া থাকে। আত্মা সৃষ্ট বস্তু নহে; মৃত্যুর অর্থ শুধু দেহের পরিবর্তন। বর্তমান জীবন অতীতের কর্মফলে এবং ভবিষ্যৎ জীবন বর্তমানের কর্মফলে হইয়া থাকে। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের জন্য ক্ষুদ্র ‘আমি ও আমার’ ভাব ত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু ইহাতে জীবাত্মার বিনাশ না হইয়া বরং পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। স্বার্থপরতার মূলীভূত ক্ষুদ্র আমিত্বের ভাব বর্জন করিয়া জীব তখন স্বীয় পূর্ণস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু তখনই দূরীভূত হয়, যখন কোন প্রাণী বিশ্বপ্রাণের সহিত একীভূত হয়; দুঃখ তখনই নিঃশেষিত হয়, যখন মানুষ আনন্দের সহিত একাত্মতা লাভ করে; ভ্রম তখনই তিরোহিত হয়, যখন মানুষ চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়; আর ইহাই হইল বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় সসীম-ব্যক্তিত্ব একটা ভ্রান্তিসম্ভূত মিথ্যা ধারণা; মানবদেহ যেমন একটা অখণ্ড জড়রাশির মধ্যস্থিত নিত্যপরিবর্তনশীল

জড়খণ্ডমাত্র, মানবের আত্মারূপ যে অপরাংশ উহাও তেমনি একটা অখণ্ড সত্তা হইতে বাধ্য। স্বামীজীর বক্তৃতার প্রধান বক্তব্যই ছিল এই একত্ব; আর তিনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, ভগবৎসত্তার সহিত একত্বানুভূতির অর্থ হইল একত্ব লাভ এবং তাহার ফলে সর্বত্রই এক ভগবৎসত্তার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ভারতীয় ঋষিদের ন্যায় "অমৃতের পুত্র" বলিয়া সম্বোধনপূর্বক মহাপুরুষোচিত স্বর ও ভাষায় বলিলেন, "অমৃতের পুত্র—কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। এইরূপে বেদ (যাহা) ঘোষণা করিতেছেন (তাহা)—কতকগুলি নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্যকারণের কারাবন্ধন নয়; কিন্তু এই সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন এক বিরাট পুরুষ, 'যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে'। তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান—সকলের উপরেই তাঁহার করুণা।...ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্রহৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়।" ('বাণী ও রচনা', ১।১৮-২৩)।

ইহা তো দর্শনের কথা। কিন্তু ইহার সহিত হিন্দুদের বহু দেবদেবী-পূজার সামঞ্জস্য কোথায়? স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন, মানবমনের গঠনানুযায়ী নিম্নতর স্তরের ধার্মিক ধারণা, পূজা, প্রার্থনা, আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতিও ভগবৎসান্নিধ্য-লাভের সহায়করূপে সার্থক হইয়া থাকে; মনকে একাগ্র করার জন্য মূর্তি-পূজাও আবশ্যক। যেখানে মনকে আত্মসমাহিত করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরপ্রতীকরূপে

প্রতিমাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়, সেখানে পৌত্তলিকতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর তিনি বলিলেন, "আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়া জ্ঞানী হিন্দু বলেন, 'আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।' সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই একমাত্র নিদর্শন। কোন মতবাদ বা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র; শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই—উহা জীবনে পরিণত করাই ধর্ম।" (ঐ, ১।২১)। প্রতিমা বা আচার-অনুষ্ঠানাদি উচ্চতর ধর্মানুভূতির সহায়কমাত্র—ধর্মজীবনের শৈশবাবস্থায় ঐগুলি অনেকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও সকলের পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য নহে। তিনি ধর্মের বিচিত্রতার মধ্যেও একত্বের সন্ধান পাইয়া বলিয়াছিলেন, "বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে।...হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ধর্মই জড়-ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্যস্বরূপ—দেবত্ব বিকশিত করে এবং সেই এক চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা।...হিন্দু বলেন, আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে।" এইরূপে জগতের মানবমাত্রকে—অসভ্য হইতে সুসভ্য পর্যন্ত সকলকে, পৌত্তলিক হইতে নির্গুণ-নিরাকারবাদী মানবমাত্রকে—এক মহাসমন্বয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীজী অবশেষে বলিলেন, "এইরূপ এক ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অনুবর্তী হইবে। অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মসভা ঐ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হইলেও উহা বৈঠকী আলোচনামাত্র। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন—সমগ্র জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল। যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসিকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টান-দের 'স্বর্গস্থ পিতা', তিনি তোমাদের এই মহান ভাব কার্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্বগগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল—কখনও উজ্জ্বল, কখনও অস্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উহা পশ্চিম গগনের দিকে চলিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূর্বগগনে সানপোর

(ব্রহ্মপুত্রের) সীমান্তে উহা উদিত হইতেছে। স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়া, তুমি কখনও প্রতিবেশী শোণিতে নিজহস্ত নিমজ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব-হরণরূপ ধনশালী হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকা বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে।" (ঐ, ১৷২৫-২৮)।

ইহা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবে না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্বামীজীর এই সুস্পষ্ট ভাষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহাতে বিঘোষিত হইয়াছিল সর্বধর্মের একত্বের যাথার্থ্য, মানুষের ব্রহ্মত্ব এবং সর্বত্র অদ্বৈতানুভূতির সত্যতা। তিনি যখন বলিলেন যে, জগতের সমস্ত ভাবধারা এক সর্বব্যাপী আদর্শের বিভিন্ন অভিব্যক্তিরূপে বিবেচিত হইতে পারে ও উহারই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তখনই বুঝিতে হইবে—যে একদেশদর্শিতা ও ধর্মান্ধতার পরিণতিস্বরূপে মানবসভ্যতার প্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে ও ভগবানের নামে রক্তপাতাদি হইয়াছে, উহার মূলোচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে। স্বামীজীর কথায় দুইটি বিষয় প্রাধান্য পাইয়াছিল—পরমতসহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা। ইহাতে পরমত খণ্ডনের কোন প্রয়াস ছিল না, ইহাতে শুধু ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপনের উপযুক্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবেশ রচিত হইয়াছিল। তাঁহার সার্বভৌম ধর্মের ধারণা এমনই অভিনব ছিল—বিচিত্রতা স্বীকার করিয়া তাহারই মধ্যে একত্বের সূত্র আবিষ্কারের আগ্রহ এতই প্রবল ছিল যে, উহার সম্মুখে সাম্প্রদায়িকতা হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। আবার তাঁহার কথাগুলি বুদ্ধিসম্ভূত না হইয়া অনুভূতিপ্রসূত ছিল, তাই তাহাদের একটা নিজস্ব শক্তি ছিল, যাহার ফলে তাহারা স্বতই শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া যেন দৈবশক্তি সেই মহাসভার উপর বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অতএব পূর্বে যাঁহারা ধর্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন, আজ তাঁহাদেরও হৃদয়দ্বার খুলিয়া যাওয়ায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের নবীন আলোক নির্বিবাদে তথায় প্রবেশপূর্বক একটা নবীন সংস্কৃতির পূর্বাভাস আনিয়া দিয়াছিল। আজ হইতে সর্ব ধর্ম সত্য, সব মানুষ এক—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই ব্রহ্মসত্তার বিচিত্র প্রকাশ। স্বামীজীর বক্তব্য ছিল হিন্দুধর্ম, কিন্তু সংস্থাপিত হইল সেদিন বিশ্বধর্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর।

স্বামীজীর গৌরবময় জীবনের সে এক অতি মহিমমণ্ডিত ক্ষণ। তখন তিনি

মহাসভার মাধ্যমে প্রচার করিলেন—মানবপ্রকৃতির মহত্ত্ব, মানবতার একত্ব এবং ঈশ্বরের সহিত উহার অভেদ। বিভিন্ন দেশের জনসমাজ সেদিন তাঁহাকে জানিল একজন নববার্তাবহ মহাপুরুষরূপে, নবীন ধর্মপ্রচেষ্টার ও ধর্মপ্রগতির অগ্রদূতরূপে। তিনি তখনই এক বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির পদে সমারূঢ় হইলেন, তাঁহার নাম চিরতরে মানবের দেবত্ববিঘোষক নববার্তার সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল। শুধু এই একটি বক্তৃতা-প্রভাবে তিনি ধর্মজগতে নবীন চিন্তাধারা আনয়ন করিলেন, খ্রীষ্টান জগৎ বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি আর একবার পরীক্ষা করিতে ও পুনর্বিন্যস্ত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্ম প্রচারের ফলে এবং উক্ত ধর্মের চমকপ্রদ চিন্তারাশি সম্বন্ধে বহির্জগৎকে অবহিত করার ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল ভারতবর্ষ। মহাসভায় স্বামীজীর ভাষণের তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাশীল লেখনীমুখে যাহা নির্গত হইয়াছিল তাহা অতীব সত্য:

"ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে।...কেননা সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদ্গত হয় নাই, এমনকি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী! যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবন-কালে—মধ্যাহ্নসময়ে—বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ উষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিতে-ছিল—যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিবে তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গূঢ় রহস্য। একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামীজীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও অনেকে—বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারূপে। কিন্তু এ গৌরব তাঁহারই যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি ধর্ম, যাহার নিকট—তাঁহার নিজেরই ভাষায়—ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 'বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার অভিযাত্রা বা

অগ্রগতির প্রচেষ্টা।' তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের সকলের কথাই বলিয়াছেন ; তাহাদের একটি বা অপরটি—এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্য কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরন্তু 'এগুলি সবই সূত্রে মণিগণের মতো আমাতেই অনুস্যূত।···যেখানেই দেখিবে, কোন অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্য শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে 'মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।' এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ—সেই আদেশ : 'ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া মানুষকে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইবে' ; ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, যিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মাসমূহ যাঁহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে।

"ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার নিকট—যাহা সত্য, তাহাই 'বেদ'। তিনি বলেন, 'বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না, উহা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাণ্ডারই বুঝায়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি সনাতন ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন : 'যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহও প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণসমন্বিত নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত সবকিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।' তাঁহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ—ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের বাহুপাশের বহির্ভূত হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের

নিকট ঐ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক। তাঁহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে।...কিন্তু এই সর্বাবগাহিত্ব—প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহিমা বলিয়া পরিগণিত হইত না, যদি না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইত; 'শোন অমৃতের পুত্রগণ, যাহারা দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন! আমি সেই মহান পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে, সকল অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে! তাঁহাকে জানিয়া তোমরাও মৃত্যু অতিক্রম করিবে।' এই তো সেই বাণী, যাহার জন্য বাকি সব কিছু আছে এবং চিরদিন রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়া যাইতে পারে।" ('বাণী ও রচনা', ১ম, ভূমিকা)।

পরদিন ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি মহাসভাকে বুঝাইয়া দেন যে, "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভাব ধর্ম নহে।" তিনি বলিলেন, "ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ককণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে; তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদের প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।...আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম; খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে অখ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষরূপে তাহা উপলব্ধি করিতেছি।" (ঐ, ১।২৯)। কথাগুলি শুনিয়া আর কিছু না হউক, মহাসভা বুঝিতে পারিল, বিবেকানন্দ শুধু সুবক্তা সন্ন্যাসী নহেন, তিনি হৃদয়বান দেশপ্রেমিক। ঐ বক্তৃতাশেষে তিনি পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধেও কিছু বলেন।

মহাসভায় তিনি ২৬শে সেপ্টেম্বর 'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই পরিপূরক' এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইহাতে স্বামীজীর চিন্তাধারার একটা নিজস্ব ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ইহার আলোকে বুদ্ধের আগমনের পরবর্তী ভারতীয় ধর্মেতিহাস সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছিলেন—হিন্দুধর্মের দুইটি প্রধান অংশ আছে—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বুদ্ধ লোকসমাজে আধ্যাত্মিক দিকটাই প্রকাশ করেন এবং সমাজে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া আবশ্যক

তাহা ব্যাখ্যা করেন। জগতে তিনিই প্রচারমূলক ধর্মের প্রথম পথিকৃৎ এবং তিনিই ধর্মান্তরিত-করণ প্রথার প্রবর্তক। তবু "শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিগত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সম্মত বিকাশ।...ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করে;...কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিকঠিক বুঝিতে পারেন নাই।...শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই, যীশুর মতো তিনিও পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই।...বুদ্ধদেবের শিষ্যগণই তাঁহার শিক্ষার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই।" (ঐ, ১।৩০-৩১)। পরিশেষে তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না।...ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতের অবনতির কারণ।" (ঐ, ১।৩২)।

মহাসভার শেষদিনে ২৭শে সেপ্টেম্বর—স্বামীজী বিদায় অভিভাষণের শেষে বলিলেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত হইবে। যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই: ইহা প্রমাণ করিয়াছে—সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতিরই মধ্যে অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় লোকেদের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে: 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।" (ঐ, ১।৩৪)।

মহাসভা ও উহার বিজ্ঞান-শাখার বাহিরে স্বামীজী যেসকল বক্তৃতা দেন তাহার মধ্যে প্রাচ্য নারী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির

হইয়াছিল ২৩শে সেপ্টেম্বরের 'চিকাগো ডেলি ইণ্টার-ওশ্যান' পত্রিকায় এবং ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতার বিবরণ বাহির হইয়াছিল ২৫শে সেপ্টেম্বরের 'চিকাগো হেরাল্ড' পত্রিকায়। প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেন: ভারতীয় নারীরা খুবই ধর্মপ্রাণা ও আধ্যাত্মিকসম্পদ্‌বিভূষিতা। সতীত্বকে ভারতে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। ভারতীয় নারীর এই পবিত্রতার সহিত বুদ্ধির উৎকর্ষ যোগ দিতে পারিলেই বিশ্বের আদর্শ নারীজীবন গঠিত হইবে। ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি বলেন: সকলেই বিভিন্ন নামে ভগবানের চিন্তাদি করিয়া থাকে এবং ভগবৎপ্রেমই সমস্ত বিশ্বের মূল একত্বসূত্র। ভগবান শুধু বিশেষ ব্যক্তির সহিত নহে, তাঁহার প্রত্যেক সন্তানেরই সহিত আলাপাদি করিয়া থাকেন। আমরা সকলেই ভাই-বোন; কারণ আমরা একই ভগবানের সন্তান।

মহাসভা শেষ হইল, বিজ্ঞান-শাখার দিনগুলিও ফুরাইয়া গেল। এই কয়দিনে মহাসভার শ্রোতৃবৃন্দ ও অপর সভাসমিতির সভ্যবৃন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে কিরূপ সোল্লাসে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমেরিকার সংবাদপত্রে তাঁহার বিজয়বার্তা কিভাবে বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহার অনেকটা আভাস আমরা পাইয়াছি। তথাপি এই বিষয়ে আরও দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

মহাসভার প্রথম দিনই অজ্ঞাতপরিচয়, ভিক্ষামাত্রজীবী সন্ন্যাসী বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হইলেন। ভারতের পর্বতকন্দরবাসী, অরণ্যবিহারী নিঃসঙ্গ বিবেকানন্দ তখন নববার্তার বাহক, নবসংস্কৃতির অগ্রদূত। মহাসভায় অর্জিত সাফল্য উহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দিকে দিকে বিস্তৃত হইল—বিবেকানন্দের নাম তখন সর্বত্র প্রতিধ্বনিত। তাঁহার পূর্ণাবয়ব মানুষপ্রমাণ ত্রিবর্ণচিত্র তখন চিকাগোর রাজপথে দৃষ্টিগোচর হইত, আর তাহার নিম্নে লিখিত থাকিত "ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ"। পথচারীরা তদ্দর্শনে স্থির হইয়া দাঁড়াইত এবং মস্তক অবনত করিয়া শ্রদ্ধা জানাইত। পত্রিকাসমূহ তাঁহার প্রশংসায় তখন মুখর। নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে তাঁহাকে ঋষি ও ভগবৎপ্রেরিত পুরুষরূপে অভিনন্দিত করা হইল। আমরা পূর্বে স্বামীজীর পত্রের উদ্ধৃতি-মধ্যে এবং অন্যত্র 'দি নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক', 'হেরাল্ড' ও 'বস্টন ইভনিং ট্র্যান্সক্রিপ্ট'-এর মন্তব্যাংশের উল্লেখ পাইয়াছি। মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মারউইন-মেরী স্নেল লিখিয়াছিলেন:

"মহাসভার উপর এবং আমেরিকার জনসাধারণের উপর হিন্দুধর্ম যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আর কোনও ধর্মগোষ্ঠী সেরূপ করিতে পারে নাই। ...আর হিন্দুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র; আবার তিনিই ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধরূপে মহাসভার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। মহাসভাকক্ষে এবং আমারই সভাপতিত্বে পরিচালিত উহার বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন এবং প্রতিবারই খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের বক্তা অপেক্ষা সর্বাধিক উৎসাহ সহকারে গৃহীত হইতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতিটি কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।...যাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীষ্টান, তাঁহারাও বলেন, 'তিনি সত্যই নরসমাজে নরেন্দ্র'।"

বিশ্বমেলার অন্তর্গত কংগ্রেসের সাধারণ সমিতির সভাপতি জে. এইচ. ব্যারোজ বলিয়াছিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ শ্রোতাদের উপর এক অত্যাশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।"

দীর্ঘকাল পরে মহাসভায় স্বামীজীর উপস্থিতি সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীমতী এনি বেসান্ত লিখিয়াছিলেন, "এক চিত্তাকর্ষক মূর্তি—হরিদ্রা ও কমলালেবুর বর্ণের বেশ পরিহিত, চিকাগোর ভারী আবহাওয়ার মধ্যে জাজ্বল্যমান ভারতীয় সূর্যসদৃশ, সিংহতুল্য মস্তক, সুতীক্ষ্ণ নয়নদ্বয়, সক্রিয় ওষ্ঠদ্বয়, চকিত ও দ্রুত পদসঞ্চারণ—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রাথমিক ধারণা, যখন প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট মহাসভার একটি কক্ষে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। লোকেরা যে তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিত, তাহা মিথ্যা নয়; কিন্তু তিনি ছিলেন বীর-সন্ন্যাসী, আর প্রথম সাক্ষাৎকালে সন্ন্যাস অপেক্ষা বীরত্বের দিকটাই আমার মনের উপর অধিক ছাপ পড়িয়াছিল; কারণ তিনি তখন আর মঞ্চের উপর উপবিষ্ট নহেন; তখন তাঁহার সমস্ত দেহ জুড়িয়া দেশের গর্বের, জাতির গর্বের ছাপ রহিয়াছে—তিনি সজীব সর্বপ্রাচীন ধর্মের প্রতিনিধি, তাঁহার চারিদিকে প্রায় নবীনতম জাতির আগ্রহশীল দ্রষ্টার ভিড় এবং তিনি একথা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ যে, তিনি যে প্রাচীন ধর্মের প্রবক্তা, তাহা মহাসভায় উপস্থিত সর্বোত্তম ধর্ম অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও হীন। কর্মচঞ্চল দ্রুতগামী দাম্ভিক পাশ্চাত্ত্যের সম্মুখে ভারতকে তাহার বার্তাবহ সন্তানের উপস্থিতি-দ্বারা কোনও রূপেই লজ্জাস্পদ করা চলিবে না। তিনি ভারতের বাণী বহন করিয়া

আনিয়াছিলেন, তিনি সে বাণী ভারতেরই নামে প্রচার করিয়াছিলেন এবং যে রাজ-সম্মান-সমন্বিত দেশ হইতে তিনি প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন, তাহার মর্যাদা তিনি সর্বদা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যে অবিচল, উদ্যমশীল, শক্তিমান—তিনি মানুষের মধ্যে মানুষ বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেন—আর সব সময়ে সক্ষম ছিলেন স্বমত সমর্থন করিতে।

"মঞ্চোপরি তাঁহার আর একটি রূপ প্রকটিত হইত। তাঁহার স্বীয় মর্যাদা, গুণাবলী ও শক্তি সম্বন্ধে একটা আজন্ম বিশ্বাস সেখানেও বিরাজ করিত; কিন্তু যে আধ্যাত্মিক বার্তা তিনি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার অনুপম সৌন্দর্যের কাছে, ভারতের হৃদয়স্বরূপ—ভারতের জীবনস্বরূপ—প্রাচ্যদেশীয় সেই অতুলনীয় বার্তার, সেই অত্যাশ্চর্য আত্মবিদ্যার গাম্ভীর্যের তুলনায় উহা চাপা পড়িয়া থাকিত। আকৃষ্টচিত্ত বিশাল জনসমষ্টি তাঁহার উচ্চারিত শব্দরাশির জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত—উহার একটি বর্ণও যেন বাদ না পড়ে, একটু উচ্চারণভঙ্গীও যেন অলক্ষিত না থাকে। জনৈক শ্রোতা সভাগৃহ ত্যাগকালে বলিলেন, 'এমন ব্যক্তিকেও বলে বিধর্মী! আর আমরা তাঁরই জাতের কাছে মিশনরী পাঠাই, বরং ওঁরা যদি আমাদের দেশে মিশনরী পাঠান, তবে আরো শোভন হয়'।"

আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত কবি শ্রীমতী হ্যারিয়েট মনরো মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং পরে স্বীয় আত্মজীবনীতে স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "এই শেষোক্ত ব্যক্তিই, এই সুমহিম স্বামী বিবেকানন্দই ধর্মসভাকে গ্রাস করিয়াছিলেন, গোটা শহরটাকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য বিদেশীরা ভালই বলিয়াছিলেন—গ্রীক, রাশিয়ান, আর্মেনিয়ান, কলিকাতার মজুমদার, সিংহলের ধর্মপাল ইত্যাদি—যাঁহাদের কেহ কেহ দোভাষীরও সাহায্য লইয়াছিলেন।...কিন্তু কমলা-বস্ত্র-ভূষিত সুদর্শন সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরেজীতে আমাদের সর্বোত্তম বস্তু দিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড ও আকর্ষণীয়; তাঁহার কণ্ঠস্বর ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনিরই মতো গম্ভীর ও মধুর; তাঁহার সংযত আবেগের অন্তর্লীন প্রবলতা, প্রতীচ্য জগতের সামনে প্রথম উচ্চারিত ও আবির্ভূত তাঁহার বাণীর সৌন্দর্য—এই সমস্ত কিছু মিশ্রিত হইয়া চরম অনুভূতির একটি নিখুঁত বিরল মুহূর্ত আমাদের জন্য আনিয়া দিল। মানবভাষণের এই ছিল সর্বোত্তম উৎকর্ষ।"

স্বামীজীর আগমনের পূর্ব হইতেই গীতা ও উপনিষদের ভাবরাশি পাশ্চাত্ত্য জগতের বিশেষ বিশেষ বিদগ্ধ-সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নবীন ধর্মান্দোলনের পথ সৃজন করিতেছিল। স্বামীজী আসিয়া তাঁহাদের ও অপর অনেকের প্রাণে উৎসাহবহ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। নবোদ্যমে তাঁহারা আপন মত প্রচারে ও উহার পরিবর্তন পরিবর্ধনাদিতে নিরত হইলেন। এমার্সন-পন্থী, কংগ্রিগেশন-মণ্ডলী, ট্র্যানসেণ্ডেণ্টালিস্ট, নব-খ্রীষ্টান, থিওসফিস্ট, ইউনিভার্স্যালিস্ট প্রভৃতি কত সম্প্রদায়ই না জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার বার্তায় প্রভাবিত হইলেন এবং মুখে মুখে তাঁহার কীর্তি শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—ইনি প্রাচীনের পুনরুদ্বোধক ও নবপ্রাণসঞ্জীবক আচার্য। এত সম্মান পাইয়াও স্বামীজী কিন্তু পূর্বেরই ন্যায় সরল নিরহঙ্কার সন্ন্যাসীই থাকিয়া গেলেন। প্রতীচীর মান ও ঐশ্বর্যাদি তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র বিকার উপস্থিত করিল না।

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, ভগবানের নির্দেশে এবং গুরুকৃপায় তিনি বিশ্ববিজয়ী হইয়াছেন, অতএব তিনি নির্ভীকহৃদয়ে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইবেন। মহা-সভায় বক্তৃতাকালে তিনি একদিন হঠাৎ থামিয়া অনুরোধ করিলেন—সভার মধ্যে যাঁহারা হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ ধর্মের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা যেন হস্ত উত্তোলন করেন। মাত্র তিন চারিটি হস্ত উত্তোলিত হইল, যদিও সে সভাগৃহে বহু বিশ্ববরেণ্য ধর্মপ্রবক্তা উপস্থিত ছিলেন। তখন স্বামীজী সভার প্রতি যেন ব্যঙ্গদৃষ্টি করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন এবং "তবু আপনাদের এমনি সাহস যে, আমাদের সমালোচনা করিতে অগ্রসর হন," এই কয়টি কথা এমন স্বরে বলিলেন যে মনে হইল শ্রোতাদিগকে উহা যেন তীরবৎ বিদ্ধ করিতেছে। এমনই ছিল তাঁহার সাহস। খ্রীষ্টান মিশনরীদিগকে বাক্যচ্ছলে কশাঘাত করার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই দিয়াছি। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যায়, একদিকে যদিও তিনি প্রশংসা পাইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি শত্রুসৃষ্টিও হইয়াছিল প্রচুর।

তাঁহার প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন খ্রীষ্টান মিশনরীরা এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইঁহাদের সঙ্গে বস্টনের রমাবাঈ-মণ্ডলীও পরে যোগ দিয়াছিলেন। এইসব বিষয়ে আমাদিগকে পরে আরও অনেক কথা বলিতে হইবে। তবে মজুমদার মহাশয়ের সহিত বিরোধের দুই-চারিটি কথা এখানেই বলিয়া রাখিলে স্বামীজীর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী বুঝা সহজ

হইবে। স্বামীজীর পত্রাবলী পড়িয়া মনে হয়, মজুমদার মহাশয় স্বামীজীর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া বিরোধাচরণ করেন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজী জীবনীতে আছে, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে "একজন ছিলেন তাঁহারই স্বদেশবাসী এবং তিনি ছিলেন এক প্রগতিশীল ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা। তিনি দেখিলেন, তাঁহার নামযশ এক নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি মহাসভার কর্তৃপক্ষকে কানে কানে বলিলেন, 'স্বামীজী ভারতের এমন এক ভবঘুরে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের কোন সামাজিক মর্যাদা বা প্রভাব নাই; বস্তুতঃ তিনি ভণ্ড।' কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদার মন ঐ সকল কথায় বিচলিত হয় নাই, তাঁহারা স্বামীজীর প্রবল ব্যক্তিত্ব অবলম্বনেই তাঁহার মর্যাদার মূল্যায়ন করিয়াছিলেন।"

ঈর্ষা তো ছিলই; উহার সঙ্গে ছিল ভাবের সংঘর্ষ। মজুমদার সম্বন্ধে ৯ই সেপ্টেম্বর (১৮৯৩) তারিখের 'অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় এই তথ্য পরিবেশিত হইয়াছিল, "ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রবক্তা (মজুমদার) সতর্কতাসহকারে এই কথা বলেন যে, তিনি স্বীয় ধর্মমত মিশনরীদের হস্তে প্রাপ্ত হন নাই; কিন্তু উহা হিন্দুধর্মেরই পরিণতি মাত্র। উহা অধুনা হিন্দুধর্মে যাহা কিছু সত্য এবং অন্যান্য ধর্মেও যাহা কিছু সত্য তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকিলেও যীশুখ্রীষ্টকে ভগবানের পুত্ররূপে এবং জগতের উদ্ধারকর্তারূপে গ্রহণ করাতেই হইবে উহার চরম পরিণতি।" বলা বাহুল্য স্বামীজী যীশুখ্রীষ্টকে শতমুখে প্রশংসা করিলেও হিন্দুধর্মকে হীন করিয়া অপর ধর্মকে উচ্চতর স্থান দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। খ্রীষ্টানদের সহিত সুর মিলাইয়া ব্রাহ্মরা বলিতেন হিন্দুরা পৌত্তলিক; স্বামীজী উহা মানিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য জগতের অনুকরণে ব্রাহ্মরা হিন্দুর বহু সামাজিক প্রথা ও আচার-ব্যবহারকে নিন্দা করিতেন এবং সংস্কারের আশু প্রয়োজন অনুভব করিয়া তাহার পরিপোষক পন্থা অবলম্বন করিতেন। সংস্কারের প্রয়োজন মানিয়াও স্বামীজী প্রত্যেক প্রথার অন্তর্নিহিত আদর্শের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেন, 'আদর্শভ্রষ্ট হইয়া সমাজ বিপথে চলিয়া থাকিলেও গালাগালির পথে সংস্কার হয় না; বরং আদর্শের পুনরুজ্জীবন আবশ্যক।' সতীদাহ প্রভৃতির সমর্থন না করিয়াও তিনি উহাদের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যদেশীয় অনুরূপ অত্যাচার ও অনাচারের

প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতেন। বস্তুতঃ, তিনি অযথা সমালোচনা হইতে স্বসমাজকে প্রাণপণে রক্ষা করিতেন। এরূপ কার্যধারা ব্রাহ্মদের অনুমোদিত ছিল না। তাঁহারা মনে করিতেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রগতিশীল, আর বিবেকানন্দ বৃথা তর্কজাল সহায়ে প্রাচীনের পৃষ্ঠপোষক, অতএব প্রগতি-পরিপন্থী। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী।

থিওসফিস্টরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন ; কারণ থিওসফিস্টদের 'মহাত্মা-বাদ' প্রভৃতি তাঁহার নিকট উদ্ভট ঠেকিত। আর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে তিনি তেমন আমল দিতেন না ; অন্ততঃ তাঁহার দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত ছিল ভোজবাজীরই সমশ্রেণীভুক্ত, উহাদের আধ্যাত্মিক মূল্য অতি অল্প। সিদ্ধাই তাঁহার নিকট ধর্মের সম্মান পাইত না।

আবার সকল বিরোধী সম্প্রদায়ই হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে অতিরঞ্জিত কুৎসিত চিত্র পাশ্চাত্ত্য জগতে উপস্থাপিত করিয়া উহার নিরোধকল্পে অর্থসংগ্রহ করিতেন, বিবেকানন্দের উপস্থিতি ও ভাষণের ফলে সে সমস্ত বিকৃত চিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়ায় সকলে সমস্বরে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। মজুমদারও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। সেসব কথায় আমরা পরে আসিতেছি। আপাততঃ ধর্মমহাসভার কালে মজুমদারের কীর্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজের একটি মন্তব্য তুলিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব। ১৮৯৪-এর প্রারম্ভে (জানুআরি ?) কোন এক সময়ে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন ঃ

"প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগোসুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়তে লাগলো তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্ব'লল।·· দাদা, আমি দেখে শুনে অবাক্। বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি ? তোর খাতির তো যথেষ্ট এদেশে। তবে আমার মতো তোদের হ'ল না, তা আমার কি দোষ ?···আর মজুমদার পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, 'ও কেউ নয়, ঠগ, জোচ্চোর ; ও তোমাদের দেশে এসে বলে—আমি ফকীর' ইত্যাদি ব'লে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে। ব্যারোজ প্রেসিডেন্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কয় না। তাদের পুস্তকে প্যাম্ফলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা ; কিন্তু গুরু সহায়

বাবা! মজুমদার কি বলে? সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মতো মানে—মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-কাদ্রীর কি কর্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে 'আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুল-পূজা করি না'—এসব আর চলে না—পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে। ভায়া, এরা চায় ফিলসফি, বিদ্যা; ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।...ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না।"

মহাসভার অব্যবহিত পরে

স্বামীজী নামযশের জন্য লালায়িত ছিলেন না ; বরং নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকজীবন যাপন ও ধ্যানাধ্যয়নাদিতে সময় অতিবাহিত করার আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে প্রায়ই উত্থিত হইত ও বাক্যালাপকালে বা পত্রাদিতে প্রকাশ পাইত। কিন্তু দৈবনির্দেশ ছিল অন্য প্রকার—তাঁহাকে আচার্যরূপে দেশ-বিদেশে ভগবদ্বার্তা প্রচার করিতে হইবে এবং তজ্জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। আনুষঙ্গিকভাবে ভারতের কল্যাণচিন্তাও তাঁহার মনে সর্বদা জাগরূক ছিল ; কিন্তু সমস্ত কর্মোদ্যমের পশ্চাতে বিরাজিত ছিল ভগবানের প্রতি অসীম বিশ্বাস এবং তাঁহারই অঙ্গুলি-সংকেতে চলিবার দৃঢ়সংকল্প। অতএব আমেরিকার প্রাথমিক অবস্থায় স্বীয় চিরন্তন ভাবধারা ও জীবনপ্রণালীর সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকিলেও তিনি ক্রমে আমেরিকার সাধারণ রীতিনীতির সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে যত্নপর হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই অভিনব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও মৌলিক ভারতীয় ভাবগুলিকে অব্যাহত রাখা চলে। এই তথ্যই তাঁহার তৎকালীন বিভিন্ন পত্রে প্রকাশ পায়। ২রা অক্টোবর (১৮৯৩) তিনি অধ্যাপক রাইটকে লিখিয়াছিলেন :

"আমি এখন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। সমস্ত জীবন সকল অবস্থাকে তাঁরই দান ব'লে গ্রহণ করেছি এবং শান্তভাবে চেষ্টা করেছি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। আমেরিকায় প্রথম দিকে আমার অবস্থা ছিল ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। আমি প্রভুর দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি—আমার আশঙ্কা হ'ল, সেই এত দিনের অভ্যস্ত জীবনের ধারা এবার বোধ হয় ত্যাগ করতে হবে, এবার বোধ হয় নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে—এ ধারণাটি কী জঘন্য অন্যায় আর অকৃতজ্ঞতা ! আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি যে, যিনি আমাকে হিমালয়ের তুষার-শৈলে কিংবা ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দেখিয়েছেন, তিনিই এখানে পথ দেখাবেন, সাহায্য করবেন।...সুতরাং আমি আবার আমার পুরাতন রীতিতে শান্তভাবে গা ঢেলে দিয়েছি। কেউ এগিয়ে এসে আমাকে খেতে দেয়, হয়তো কেউ দেয় আশ্রয়, কেউ বলে—তাঁর কথা শোনাও আমাদের। আমি জানি, তিনিই তাদের পাঠিয়েছেন—আমি শুধু

নির্দেশ পালন ক'রে যাব। তিনি আমাকে সব যোগাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৭৬-৭৭)।

এইভাবে তাঁহার সন্ন্যাসোচিত মানসিক পরিবেশ সংরক্ষিত হইলেও তাঁহাকে স্বীয় পরিকল্পিত কার্যধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ভারতীয় ভাবের প্রচার করিয়া ও ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূরীভূত করিয়া বিনিময়ে আমেরিকা হইতে অর্থলাভ করিবেন এবং এইরূপে ভারতে শিল্পাদি উৎপাদনের উপায় প্রবর্তনের দ্বারা দারিদ্র্য দূর করিবেন। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি প্রকাশ্য অর্থ ভিক্ষা করার সিদ্ধান্ত আপাততঃ ছাড়িয়া দিলেন। হয়তো তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহলৌকিক উদ্দেশ্যকে বেশী আগ্রহসহকারে অনুসরণ করিলে পারমার্থিক বিষয়ের জন্য আকুলপ্রাণ শ্রোতার সংখ্যা কমিয়া যাইবে; ইহার পরিণতিস্বরূপে স্বামীজীর উভয় উদ্দেশ্য বিফল হইবে। সুতরাং ভারতের উন্নতিসাধনের অভিপ্রায় অব্যাহত থাকিলেও তিনি উহা প্রকাশ্যে বলা উচিত মনে করিলেন না। তাই তিনি অধ্যাপক রাইটকে ২৬শে অক্টোবর লিখিলেন, "নানা দূরদেশ থেকে বহু মানুষ এখানে বহু পরিকল্পনা, ভাব ও আদর্শ প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে এবং আমেরিকাই একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। তবে আমার পরিকল্পনার বিষয় একদম আর কিছু না বলাই ঠিক করেছি। সেই ভাল। কারণ দেখিতেছি, পরিকল্পনা অপেক্ষা পরিকল্পক বিধর্মীকে লোকে বেশী চায়। পরিকল্পনার জন্য একান্তভাবে খেটে যাওয়াই আমার ইচ্ছা—পরিকল্পনাটা থাকবে আড়ালে, বাইরে কাজ ক'রে যাব অন্যান্য বক্তার মতো।" (ঐ, ৩৭৯)। অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত পরিশ্রম হইতে ন্যায্যভাবে লব্ধ অর্থেই ভারতীয় কার্য সম্পাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

ইতোমধ্যে স্বামীজী ঐ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করায় চিকাগো ও চিকাগোর বাহিরের বহুস্থান হইতে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমও হইতে থাকিল। তিনি ১০ই অক্টোবর শ্রীযুক্তা উড্‌সকে লিখিলেন, "এখন আমি চিকাগোর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি—আমার বিবেচনায় তা বেশ ভালই হচ্ছে। ত্রিশ থেকে আশি ডলারের মধ্যে প্রতি বক্তৃতায় পাওয়া যাচ্ছে; সম্প্রতি মহাসভার দরুন চিকাগোয় আমার নাম এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই ক্ষেত্রটি ত্যাগ করা বর্তমানে যুক্তিযুক্ত হবে না।"

(ঐ, ৩৭৮)। অধ্যাপক রাইটকে লিখিত পূর্ব পত্রেও আছে, "চিকাগোয় আমি খুবই জনপ্রিয়, সুতরাং এখানে আরও কিছু সময় থাকতে ও টাকা সংগ্রহ করতে চাই।" (ঐ, ৩৭৯)।

ঐ সময় স্বামীজী কোনও নির্দিষ্ট গৃহে থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না। মহাসভার সময়ে তিনি লায়ন পরিবারের সহিত বাস করিতেন; কিন্তু ২রা অক্টোবর অধ্যাপক রাইটকে লিখিত পত্র হইতে মনে হয়, তিনি তখন আর সেখানে থাকিতেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন, "চিকাগোয় এলেই আমি মিঃ ও মিসেস লায়নকে দেখিতে যাই।" ঐ বৎসরের নভেম্বরের মাঝামাঝি হইতে তাঁহার পত্রাবলীতে শ্রীযুক্ত হেলের বাড়ির ঠিকানা—৫৪১নং ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউ, চিকাগো—দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ঠিকানা লায়নদের বাড়ি। লায়ন-গৃহে প্রথম আগমন ও মহাসভার অধিবেশনকালে অবস্থানের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। সেখানে আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, মহাসভার পরেও ইঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। স্বামীজী যখন প্রথম প্রথম বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন তখন তিনি অন্ততঃ আর দুইবার লায়নদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত লায়নের কন্যা ভারতীয় সাধনধারার সহিত পরিচয়লাভে উদ্যত হন এবং একজনের সাহায্যে কিছুদিন চেষ্টার পর দেখেন, কাহারও পত্র হাতে লইবামাত্র নিমেষের জন্য লেখকের চেহারা সুস্পষ্টভাবে তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। বৎসরখানেক পরে স্বামীজী একবার চিকাগোয় তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া উহা জানিতে পারেন এবং লায়ন-দুহিতাকে বলেন—তাঁহারও জীবনে একবার অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন এবং লোক-কল্যাণব্যতীত অন্য কোন কারণে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন।

প্রথম দিকে আমেরিকার কোন কোন মহিলা স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চিত্তজয়ে সচেষ্ট হইতেছে, ইহা টের পাইয়া শ্রীযুক্তা লায়ন স্বামীজীর জন্য চিন্তিত হন ও তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু স্বামীজী বলেন, "শ্রীযুক্তা লায়ন—আপনি আমার আমেরিকার স্নেহময়ী মা! আপনি আমার জন্য ভয় পাবেন না। সত্য বটে আমি এককালে বটতলায় শুয়ে এবং কোন চাষার দেওয়া একপাত্র অন্ন খেয়ে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু আমিই আবার কোন মহারাজের বাড়িতেও অতিথি হয়েছি, আর দাসীরা সারা রাত আমার গায়ে ময়ূরপুচ্ছের

পাখার হাওয়া করেছে। প্রলোভন আমি ঢের দেখেছি—আমার জন্য আপনার ভাবনা নেই।”

মহাসভার পরে তিনি কতদিন চিকাগোয় ছিলেন এবং কোথায় কোথায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সঠিক জানা যায় না। তবে তিনি সেখানে অন্ততঃ দুইমাস ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ঐ কালে বক্তৃতা তো দিতেনই, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সমাজব্যবস্থা ও উন্নতির কারণাবলী সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতেন, যাহাতে উহার ভাল দিকগুলি ভারতে প্রচলিত হইতে পারে। মহাসভার এক বৎসর পরে, ১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোর ‘ইণ্টার-ওশ্যান’ পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এই কথাগুলি ছিল: “বিরাট মহাসভার পরেও স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক মাস চিকাগোতেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশবাসীদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যেমন অকাট্য প্রমাণ এদেশে আনিয়াছিলেন, তেমনিভাবে তাহাদের নিকট যাহাতে আমেরিকার বিষয়ে অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিদ্যাভ্যাসে ও সভ্যতায় ঐহিক উন্নতি-বিষয়ক অনেক তত্ত্বান্বেষণেও নিরত ছিলেন।”

তিনি স্বীয় পরিকল্পনার জন্য তখন কেন খোলাখুলিভাবে অর্থভিক্ষা করিতেন না, তাহার একটা কারণ শ্রীমতী লুসি মনরোর লেখায় পাই। ইনি কবি হ্যারিয়েট মনরোর ভগিনী এবং স্বয়ং সুলেখিকা। তিনি লিখিয়াছেন: “বিবেকানন্দ এখনও এই শহরে আছেন। তাঁহার এদেশে আসার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকাবাসীদিগকে উৎসাহিত করা। তিনি উহা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়াছেন; কেননা তিনি দেখিতেছেন, ‘আমেরিকানরা জগতের মধ্যে সর্বাধিক পরোপকারী জাতি’, তাই যে কোন ব্যক্তির যে কোন পরিকল্পনা আছে, সে তাহারই জন্য সাহায্য পাইতে এদেশে আসে।...তাঁহার মার্জিত রুচি, বাগ্মিতা এবং চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে নূতন ধারণা দিয়াছে।”

শ্রীযুক্তা বার্ক-এর অনুসন্ধানের ফলে (‘নিউ ডিসকভারিজ’) ঐ কালের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, চিকাগো-মহাসভার ঠিক পরেই স্বামীজী ঐ শহরের উত্তরে অবস্থিত ইভানস্টোন নামক নগরে তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেখানে মহাসভার অধিবেশনকালে স্বামীজীর সহিত

পরিচিত এবং অধ্যাপক রাইট-এর বন্ধু ডাঃ ব্র্যাডলি বাস করিতেন। ইভানস্টোনে সুইডেনের (স্টকহল্‌ম-এর) প্রতিনিধি ডাঃ কার্ল ভন বার্জেনও বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতার তারিখ ও বিষয়—৩০শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, 'হিন্দুদের পরমতে শ্রদ্ধা'। দ্বিতীয় বক্তৃতার তারিখ ও বিষয়—৩রা অক্টোবর, মঙ্গলবার, 'অদ্বৈতবাদ'। তৃতীয় বক্তৃতার তারিখ ও বিষয়—৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, 'পুনর্জন্ম'। বক্তৃতাগুলি হয় কংগ্রিগেশনাল চার্চে।

স্বামীজীর পত্রাবলীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি স্ট্রিয়াটরেও বক্তৃতা দেন। ৯ই অক্টোবর স্ট্রিয়াটর হইতে চিকাগোতে ফিরিয়া তিনি ১০ই অক্টোবরের পত্রে শ্রীযুক্তা ট্যানাট উড্‌সকে জানাইয়াছিলেন, স্ট্রিয়াটরের বক্তৃতায় তিনি ৮৭ ডলার পাইয়াছিলেন। ঐ পত্রে আরও আছে, "এই সপ্তাহে প্রতিদিনই আমার বক্তৃতা আছে। সপ্তাহের শেষে আরও আমন্ত্রণ আসবে বলে আমার বিশ্বাস।" স্ট্রিয়াটরের বক্তৃতায় অন্ততঃ ছয়শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতাটি প্রদত্ত হইয়াছিল 'প্লাম্ব অপেরা হাউসে' ৭ই অক্টোবর। স্ট্রিয়াটর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মহানগর এবং উহা চিকাগোর নব্বই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রিপোর্ট-দৃষ্টে অনুমান করা চলে, বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতের রীতিনীতি। উহাতে বর্ণাশ্রমপ্রথা, সন্ন্যাস, আর্যজাতির সহিত অপরদের সম্বন্ধ ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

ইহার পর স্বামীজীর ২৬শে অক্টোবরের পত্র হইতে জানা যায় : "আগামী কাল শহরের (চিকাগোর) সবচেয়ে প্রভাবসম্পন্ন মহিলাদের 'ফর্টনাইটলি ক্লাবে' বক্তৃতা দিতে যাব।" ২৭শে অক্টোবর প্রদত্ত এই বক্তৃতার বিষয় ছিল "বুদ্ধধর্মের ইতিহাস"। অতঃপর চিকাগোয় অবস্থানকালে স্বামীজীর জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

স্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একসময়ে চিকাগোয় অবস্থানকারী স্বামী বিশ্বানন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন : "স্বামীজী আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, এক জ্যোৎস্না-রাত্রে তিনি যখন মিশিগান হ্রদের ধারে ছিলেন, তখন তাঁহার মন ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইতে থাকে। অকস্মাৎ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পান এবং তাঁহার মনে পড়ে, তিনি এক বিশেষ কাজের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; অমনি তাঁহার মন নামিয়া আসে এবং জীবনের ব্রতের প্রতি ধাবিত হয়। আমি এই ঘটনা আমার দিনলিপিতে লিখিয়া

রাখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকাশ্যে বলার প্রয়োজন বোধ করি নাই ; শুধু আপনাকে জানাইতেছি।"

শ্রীযুক্ত হেলের বাড়ি হইতে স্বামীজী শ্রীযুক্তা উড্‌সকে ১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৩ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয়, তিনি ঐ সময় সেখানেই ছিলেন। হেলদের বাড়ি হইতে লিঙ্কন পার্ক সামান্য দূরে। স্বামীজী সেখানে বেড়াইতে এবং রোদ পোহাইতে যাইতেন। লিঙ্কন পার্কের মধ্য দিয়া একটি মহিলা তাঁহার ছয় বছরের মেয়েকে লইয়া বাজার করিতে যাইতেন। কন্যাটিকে লইয়া বাজার করিতে অসুবিধা হয়, এদিকে একজন ভদ্রলোক নিত্য ঐ সময় পার্কে বসিয়া থাকেন দেখিয়া ভদ্রমহিলাটি স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুক্ষণের জন্য মেয়েটির ভার লইতে পারেন কিনা। স্বামীজী সহজেই রাজী হইলেন এবং মহিলা তাঁহার কন্যাকে স্বামীজীর হাতে সঁপিয়া দিয়া বাজার করিতে চলিয়া গেলেন। এইরূপ অনেক দিনই ঘটিল। কন্যাটির বয়স যখন পনর কি ষোল, তখন উক্ত মহিলা স্বামীজীর একখানি ছবি পাইয়া পরিষ্কার চিনিতে পারিলেন এবং কন্যার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বন্ধুকে মনে পড়ে কি ?" কন্যাও বেশ চিনিতে পারিল। স্বামীজীর যশ তখন দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যশের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বামীজীকে যে একবার দেখিয়াছে, তাহার পক্ষে নয় দশ বৎসর পরেও ভুলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল। আরও পরে ঐ মেয়েটি বিবাহ করিয়া ফিলাডেলফিয়ায় যায় এবং রামকৃষ্ণ মঠের জনৈক সাধুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে।

চিকাগোতে অবস্থানকালে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় অনেকেই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বা আশীর্বাদ লাভের জন্য আসিতেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী গায়িকা মাদাম এমা কালভেও একদিন এইভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন, ইহা কালভের আত্মজীবনী হইতে ও কালভের নিকট শুনিয়া মাদাম পল ভার্ডিয়ার যে স্মৃতিলিপি রাখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায়। সম্ভবতঃ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কালভে যখন 'মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানী'র সহিত চিকাগোয় আসেন, তখন তিনি যশের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিতা। কিন্তু তিনি ছিলেন উগ্রস্বভাবা, একগুঁয়ে এবং ভোগপরায়ণা ; অতএব জীবনে শান্তি ছিল না। এই সময়ে আবার তাঁহার একমাত্র কন্যা অগ্নিদগ্ধ হইয়া চিকাগোতেই দেহত্যাগ করে।

কালভে তখন আত্মহত্যার চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং জনৈকা বন্ধু তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট লইয়া যাইতে চাহিলেও প্রথমটা রাজী হইলেন না। চারিবার আত্মহত্যার চেষ্টায় বিফল হইয়া তিনি পঞ্চম বারে যেন দৈবনির্দেশেই যে বান্ধবীর গৃহে স্বামীজী ছিলেন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বাটলার তাঁহাকে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইল। চেয়ারে কালভে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসিয়া আছেন, এমন সময় পার্শ্বের ঘর হইতে কে যেন ডাকিলেন, "ভেতরে এসো বাছা, ভয় পেয়ো না।" যন্ত্রচালিতবৎ কালভে সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উহা স্বামীজীর পাঠগৃহ। তিনি একটা বড় টেবিলের পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। কালভের নিজের ভাষায় পরবর্তী ঘটনাটি এইরূপ : "যাইবার পূর্বে আমায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি কথা বলার পূর্বে আমি যেন কিছু না বলি। আমি ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণমাত্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি তখন অতি শান্ত ভাবে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার গেরুয়া রঙের পোশাক সোজা মেঝে পর্যন্ত ঝুলিয়া ছিল, মস্তকে ছিল পাগড়ি এবং উহা একটু সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া ছিল। তাঁহার চক্ষু ছিল নিম্নদৃষ্টি। একটু পরেই তিনি চক্ষু না তুলিয়াই বলিলেন, 'বাছা, কি ঝড়ো আবহাওয়াই না তুমি নিয়ে এলে! শান্ত হও, এটা একান্ত আবশ্যক।' অতঃপর অতি শান্তস্বরে, উদাসীন ও উদ্বেগহীন ভাবে এই ব্যক্তিটি—যিনি আমার নাম পর্যন্ত জানিতেন না, তিনি—আমার জীবনের গোপন রহস্য ও উদ্বেগ সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে লাগিলেন। এমন সব কথা তিনি বলিলেন, যাহা মনে হয়, আমার নিকটতম বন্ধুরাও জানিত না। মনে হইল এ যেন অলৌকিক ব্যাপার, অপ্রাকৃতিক। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি এসব জানলেন কি করে? কে আপনাকে আমার সম্বন্ধে বলেছে?' তিনি মৃদু হাস্যসহকারে চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন, যেন আমি একটি শিশুরই মতো কোন অর্থহীন প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছি। তিনি মৃদুভাবে বলিলেন, 'কেউ আমাকে কিছু বলে নি। আর বলার প্রয়োজন আছে কি? আমি খোলা বইয়ের মতোই তোমার ভেতরটা পড়তে পারি।'

"অবশেষে আমার ফিরিবার সময় আসিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন, 'তোমাকে সব ভুলে যেতে হবে। আবার খুশী ও সুখী হও, শরীরটা সুস্থ কর। চুপ করে বসে শুধু দুঃখের কথা ভেবো না। তোমার অন্তরের ভাবাবেগকে বাইরে কোনো একটা রূপ দাও। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের

জন্য এটা দরকার, তোমার শিল্পকলার জন্য এটা অত্যাবশ্যক।' তাঁহার কথায় এবং ব্যক্তিত্বে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া আমি বিদায় লইলাম। আমার মনে হইল যেন তিনি আমার ব্যাধিগ্রস্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের সমস্ত জটিলতা দূর করিয়া দিয়া তাহার স্থলে নিজের পবিত্র ও শান্ত ভাবরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সুদৃঢ় ইচ্ছাপ্রভাবে আমি আবার প্রাণবতী ও আনন্দপরিপূর্ণা হইয়া উঠিলাম। তিনি যে কোন সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার চরিত্রের প্রভাব, তাঁহার উদ্দেশ্যের নির্মলতা ও দুর্বার ক্ষমতাই আমার মনে বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইবার পরে দেখিয়াছিলাম তিনি লোকের বিশৃঙ্খল চিন্তারাশিকে শান্ত করিয়া ধীরভাবে স্বমতগ্রহণের উপযোগী করিতেন, আর ইহার ফলে তাহারা তাঁহার কথাগুলি পূর্ণ ও অচঞ্চল মনোযোগসহকারে শুনিতে পারিত।

"তিনি অনেক সময় ছোট গল্পের সাহায্যে উপদেশ দিতেন, একটু কবিত্বময় দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের প্রশ্নের উত্তর বা তাঁহার নিজের বক্তব্য সহজে বোধগম্য করিয়া তুলিতেন। একদিন আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল আত্মার অমরত্ব এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর চিরস্থায়িত্ব। তিনি স্বীয় উপদেশের একটা মৌলিক কথা, পুনর্জন্মবাদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ও ভাবটা আমার মোটেই ভাল লাগে না, আমার ব্যক্তিত্ব নগণ্য হলেও আমি তাকেই ধরে থাকতে চাই। আমি একটা শাশ্বত একত্বের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলতে চাই না। ও চিন্তাটাই আমার কাছে ভয়াবহ!' স্বামীজী উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন, 'একদিন এক ফোঁটা জল মহাসমুদ্রে পড়েছিল। নিজেকে তেমন অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে তোমারই মতো কাঁদতে ও অভিযোগ জানাতে লাগল। মহাসাগর সে জলবিন্দুর দিকে চেয়ে হেসে উঠল এবং জিজ্ঞাসা করল: তুই কাঁদছিস কেন? তুই যখন আমাতে মিশে গেলি তখন তো অপর যেসব জলবিন্দু নিয়ে আমি তৈরী হয়েছি, আর যারা হচ্ছে তোরই ভাই-বোন, তাদেরই তো সঙ্গে তুই মিশে গেলি, তুই মহাসাগরই হয়ে গেলি। আমাকে যদি তোর ছেড়ে যেতেই ইচ্ছা হয় তো সূর্যরশ্মি ধরে মেঘের দিকে উঠে যা, সেখান থেকে আবার ক্ষুদ্র জলবিন্দু হয়ে নেমে আসবি, এসে তৃষ্ণার্ত ধরণীর মঙ্গল সাধন করবি'।"

আমেরিকার ধনকুবের জন ডি. রকফেলার সম্বন্ধীয় আর একটি ঘটনা মাদাম

কালভের মুখে শুনিয়া মাদাম ভার্ডিয়ার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা বার্কের পুস্তক ('নিউ ডিসকভারিজ', ১১৩-১৪) হইতে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম :

"যে ভদ্রলোকের বাড়িতে স্বামীজী বাস করিতেন তিনি অংশীদার হিসাবে বা অন্য কোন সূত্রে জন ডি. রকফেলারের সহিত কোন কারবারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রকফেলার বন্ধুদের মুখে বহুবার তাঁহাদের অতিথি ঐ অত্যাশ্চর্য ও অসাধারণ হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের আমন্ত্রণও পাইয়াছিলেন। কিন্তু একটা না একটা অছিলায় তিনি বরাবর পাশ কাটাইতেছিলেন। রকফেলার তখনও ঐশ্বর্যের উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় হন নাই, তবু তিনি ইতোমধ্যে বেশ শক্তিশালী ও দৃঢ়মনা হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহাকে কাহারও মতানুযায়ী চালানো বা কোন পরামর্শ দেওয়া বিশেষ কঠিন কাজ ছিল। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের আগ্রহ না থাকিলেও একদিন কি একটা ভাবাবেগ তাঁহাকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করিল, তিনি সোজা বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বাটলার দরজা খুলিয়া দিলে তাহাকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীকে দেখিতে চান। বাটলার তাঁহাকে শয়নকক্ষে লইয়া গেলে তিনি স্বামীজীকে খবর দেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত না করিয়া পার্শ্ববর্তী পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন যে, স্বামীজী তাঁহার লিখিবার টেবিলের পশ্চাতে বসিয়া আছেন, কে ঘরে আসিল তাহা দেখিবার জন্য চক্ষু পর্যন্ত উঠাইলেন না।

"কিছুক্ষণ পরে, মাদাম কালভের বেলায় যেমন ঘটিয়াছিল, রকফেলারের বেলায়ও স্বামীজী তেমনিভাবে তাঁহার অতীত জীবনের এমন সব ঘটনা বলিয়া যাইতে লাগিলেন যাহা একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহ জানিত না। স্বামীজী তাঁহাকে আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সঞ্চিত অর্থ তাঁহার নহে, তিনি ঐ অর্থের শুধু অছি এবং তাঁহার কর্তব্য হইতেছে জগতের হিতসাধন। ভগবান তাঁহাকে এই উদ্দেশ্যে ধনদৌলত দিয়াছেন যে, তিনি ঐভাবে লোককে সাহায্য করার ও তাহাদের কল্যাণসাধনের সুযোগ পাইবেন। এইভাবে কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারে এবং কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে সাহস পায়— এই কথা ভাবিতেও রকফেলার বিরক্তি বোধ করিলেন। ক্রোধভরে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন, বিদায়সম্ভাষণেরও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। কিন্তু আবার এক সপ্তাহ পরে ঠিক তেমনি ভাবে খবর না দিয়াই তিনি স্বামীজীর

পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে ঠিক পূর্বদিনেরই মতো পাঠনিরত দেখিয়া টেবিলের উপর একখানি কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, যাহাতে লিখিত ছিল যে, তিনি সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উহাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিবেন। তিনি বলিলেন, 'এই নিন মশায়, এখন আপনার সন্তোষ হবে, আর এর জন্য আপনি আমায় ধন্যবাদ দিতে পারেন।' স্বামীজী চক্ষু তুলিলেন না, একটু নড়িলেনও না। অতঃপর কাগজখানি লইয়া তিনি উহা ধীরভাবে পড়িলেন এবং বলিলেন, 'ধন্যবাদ তো আপনারই আমাকে দেওয়া উচিত।' এইটুকু মাত্র। উহাই ছিল সর্বসাধারণের জন্য রকফেলারের প্রথম বড় দান।"

ইহারই এক সময়ে স্বামীজী একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তিনি একটি বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন যে, তিনি তিন বৎসর উহার সহযোগিতায় আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবেন। মেমফিস-এর সংবাদপত্র 'অ্যাপিল অ্যাভালাঞ্চ'-এ ২১শে জানুআরি, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ "তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) চিকাগোর স্লেটন লাইসিয়াম ব্যুরোর সহিত এই দেশে তিন বৎসরের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন।" এই সংবাদ হইতেই আমরা কোম্পানীটির নাম ও চুক্তির মেয়াদ অবগত হই। ভগিনী ক্রিষ্টিন তাঁহার স্মৃতিকথায় 'পণ্ডস লেকচার ব্যুরো'র নাম করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার পক্ষে অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।[১] ঠিক কোন্ সময়ে স্বামীজী এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হন তাহাও অজ্ঞাত। ইংরেজী জীবনীর মতে ইহা হেমন্তের অথবা শীতের আরম্ভে হইয়া থাকিবে। হয়তো ইহা নভেম্বর মাসের মধ্যভাগের কথা, কারণ ২রা নভেম্বরের পত্রে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালটা থাকিব, তারপর ইওরোপ যাইব।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৮৪)। অর্থাৎ তখনও তিন বৎসর আমেরিকায় থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। ইহার পরবর্তী ১৯শে নভেম্বরে তিনি মিসেস উড্‌সকে লিখিতেছেন, "আগামী কাল ম্যাডিসন ও মিনিয়াপোলিস রওনা হচ্ছি" (ঐ, ৩৮৬), অর্থাৎ তখন চিকাগো হইতে দূরদূরান্তরে বক্তৃতাপ্রদান আরম্ভ

১ স্বামীজী ১২।৩।৯৪ ও ১৫।৩।৯৪-এর পত্রদ্বয়ে মিঃ হল্‌ডেন-এর নাম উল্লিখিত আছে (বর্তমান গ্রন্থের ১০০ পৃঃ দ্রঃ)। ইনি কোনও বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত যুক্ত ছিলেন কিনা জানা নাই।

হইয়া গিয়াছে। আবার ২৮শে ডিসেম্বরের পত্রে পাই, "আমি এদেশে এসেছি দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে—যদি ভগবান সহায় হন।... কবে দেশে যাব জানিনা, প্রভুর ইচ্ছা বলবান।" (ঐ, ৩৮৯)। এই তিনটি পত্রাংশ মিলাইয়া পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, নভেম্বরে চুক্তি সম্পাদিত হইয়া গেলেও তিনি তাহা ভারতীয় বন্ধুবর্গকে জানান নাই, অথবা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। হয়তো ভাবিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী অর্থোপার্জনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ একটি ব্যাপার তখনকার দিনের হিন্দু সমাজের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন, আর এই নবীন উদ্যমের সাফল্য যখন অনিশ্চিত, তখন অত জানাজানিরই বা আবশ্যক কি?

অতঃপর প্রশ্ন এই—তিনি এরূপে চুক্তিবদ্ধ হইতে গেলেন কেন? ইংরেজী জীবনীতে বলা হইয়াছে, "তাঁহার মন যে ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা প্রচারিত করার সর্বোত্তম উপায়রূপে এবং ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মনে যেসব ভ্রান্ত ধারণা ছিল, উহা দূরীভূত করার অভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। অর্থ সম্বন্ধে স্বাধীন হওয়ার জন্য এবং ভারতে যেসকল ধর্মকার্য ও সেবাকার্য পরিচালনা করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন উহাদের উদ্দেশ্যে অর্থসঞ্চয়ের জন্য উহা অন্যতম উপায় ছিল।" (৩১৬ পৃঃ)। শ্রীযুক্তা বার্ক ইহাও বলিয়াছেন যে, এখন যেমন, তেমনি স্বামীজীর কালেও সারা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সুচিন্তিত কার্যধারা অবলম্বনে কাজ করিতে হইলে এইরূপ একটি লোকচার ব্যুরোর সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক ছিল, কিন্তু তবু তিনি তিন বৎসরের চুক্তি কেন করিতে গেলেন, আর এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠানের কথানুযায়ী চলিতে গেলে তাহারা যে তাঁহাকে ঠকাইয়া বা অবাঞ্ছিতরূপে খাটাইয়া অধিক লাভ করিতে যত্নপর হইবে, ইহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কিনা, কিংবা তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে এই বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন কিনা তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ফল যে ইহাতে ভাল হয় নাই, তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

স্বামীজী এই বক্তৃতা-কোম্পানীর সাহায্যে বা সহযোগে এক অতি পরিশ্রম-সাধ্য কার্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং অতঃপর আমেরিকান সংবাদপত্রের ভাষায় কিছুদিন 'ঝঞ্ঝাবাত'-প্রায় আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমরা প্রথমে তাঁহার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের নগরগুলিতে বক্তৃতার

কথাই বলিব। ইহার পরে তিনি দক্ষিণাঞ্চলে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলির কাল ধরা যাইতে পারে মোটামুটি ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৩ হইতে এপ্রিল, ১৮৯৪। তাঁহার ১৯শে নভেম্বরের পত্রে আছে, "আগামী কাল ম্যাডিসন এবং মিনিয়া-পোলিস রওনা হচ্ছি।" ইহাই তাঁহার ইলিনয়েস স্টেটের (যাহার রাজধানী চিকাগো) বাহিরের বক্তৃতাবলীর আরম্ভ বলা যাইতে পারে। এই দুইটি শহর ছাড়াও তিনি আইওয়া স্টেটের ডিময়েন নগরে বক্তৃতা করেন। ইহার পর ১৮৯৪-এর জানুআরি মাসে টেনেসি স্টেটের মেমফিসে এবং ফেব্রুআরিতে ডেট্রয়েটে বক্তৃতা করেন। এইগুলি ছাড়া অন্য কোন বক্তৃতার সংবাদ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইংরেজী জীবনীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি আইওয়া সিটিতেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ম্যাডিসনের বক্তৃতা সম্বন্ধে 'উইসকন্সিন স্টেট জার্নালে' এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছিল: "বিবেকানন্দের বক্তৃতা অতীব চিত্তাকর্ষক ছিল এবং উহাতে সৎ-ধর্ম ও যুক্তিপূর্ণ দর্শনের কথা প্রচুর ছিল। তিনি অখ্রীষ্টান হইলেও খ্রীষ্টধর্ম তাঁহার অনেক উপদেশই গ্রহণ করিতে পারে। তাঁহার ধর্মবিশ্বাস বিশ্বেরই মতো সুবিস্তৃত, উহাতে সকল ধর্মই অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সত্য যেখানেই প্রকাশিত হউক না কেন, স্বীকৃত হয়। তিনি বলেন, ভারতের ধর্মে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার এবং অর্থহীন অনুষ্ঠানের স্থান নাই।"

'মিনিয়াপোলিস স্টারে' তাঁহার ঐ শহরের বক্তৃতার বিবরণ এইরূপ প্রদত্ত হয়: "স্বামী বিবেকানন্দ যখন ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন তখন শ্রোতারা অতীব মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে চিন্তাশীল পুরুষ ও নারীরা ছিলেন···বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরাও ছিলেন।" এই বক্তৃতার তারিখ সম্ভবতঃ ২৪শে নভেম্বর। ২৬শে নভেম্বর সকালে তিনি ঐ গির্জাতেই আর একটি বক্তৃতা দেন। ঐ ভাষণ সম্বন্ধে 'মিনিয়াপোলিস জার্নাল' লিখিয়াছিল: "কাল সকালে ইউনিটেরিয়ান চার্চ আগ্রহশীল শ্রোতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা স্বামী বিবেকানন্দের মুখে প্রাচ্য ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিতে আসিয়াছিল।" 'পেরিপ্যাটেটিক ক্লাব'-এর আনুকূল্যে প্রদত্ত এই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি পাঁচটি অন্ধের হাতী দেখার গল্পটি শুনাইয়া কহিলেন, "ধর্মও এইরূপ এক বিবাদের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতীচ্যের লোকেরা মনে করেন, ভগবদ্ধর্মের তাঁহারাই একমাত্র অধিকারী,

আবার প্রাচ্যদেরও তেমনি কুসংস্কার। উভয়েই ভ্রান্ত, ভগবান সব ধর্মেই আছেন।...হিন্দুরা ভগবানের মাতৃত্বে বিশ্বাস করে।...আমরা ভালবাসারই জন্য ভগবানকে ভালবাসি এবং কোন জাতি, কোন লোকসমষ্টি বা কোন ধর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানকে পাইতে পারে না, যতক্ষণ না তাঁহাকে ভালবাসার জন্য ভালবাসা হয়।...পাশ্চাত্ত্য জগৎ ব্যবসা-বাণিজ্যাদিতে দক্ষ; আমরা ধর্মে সুদক্ষ।...ভারতে কুসংস্কার আছে; কিন্তু তাহা নাই কোন্ দেশে?" ইত্যাদি।

মিনিয়াপোলিসে একদিনও বিশ্রাম না করিয়া স্বামীজী আইওয়া স্টেটের ডিময়েন-এর দিকে যাত্রা করিলেন। উহার দূরত্ব ২৫০ মাইলেরও অধিক। ২৭শে নভেম্বর অপরাহ্ণে সেখানে এক ঘরোয়া বৈঠকে একটি ভাষণ ও সন্ধ্যায় জনসাধারণের জন্য বক্তৃতা হইল। প্রকাশ্য বক্তৃতার বিষয় ছিল: হিন্দুধর্ম। ২৭শে নভেম্বর অপরাহ্ণে একটি প্রীতিসম্মেলনও হইয়াছিল। উহাতে আলোচ্য বিষয় ছিল: ভারতের রীতিনীতি। বক্তৃতার পরে স্বামীজীকে বহু প্রশ্ন করা হইয়াছিল। 'ডিময়েন-নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ্য বক্তৃতার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহার সারাংশ এই: "পাকা খ্রীষ্টান হইতে হইলে সকল ধর্মকেই মানা উচিত। এক ধর্মে যাহা নাই অপর ধর্মে তাহা মিলে; সে সবই সত্য এবং ভাল খ্রীষ্টানের পক্ষে সবই স্বীকার্য।...আমি ধর্মান্তরিত করার ভাবটা পছন্দ করি না।...আমাদের দেশে দুইটি শব্দ আছে—ধর্ম ও সম্প্রদায়—যাহাদের অর্থ ঠিক তোমরা যাহা বোঝ তাহা নহে। আমাদের মতে ধর্ম বলিতে সব ধর্মকেই বুঝায়। আমরা পরমতে অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর সবই সহ্য করি।...আর সম্প্রদায় বলিতে তাহাদের বুঝায়, যাহারা বলে, 'আমরা ঠিক, তোমরা ভুল'। এই বলিয়া তিনি কূপমণ্ডূকের গল্পটি শুনাইলেন। ডিময়েন-এ তাঁহার আর একটি বক্তৃতা হয় ২৮শে নভেম্বর রাত্রে খ্রীষ্টান চার্চে। বিষয় ছিল: পুনর্জন্ম।

স্বামীজী ডিময়েন-এ যে স্বল্পকাল ছিলেন, তাহাতে তিনি যেন নগরময় এক বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়াছিলেন। 'আইওয়া স্টেট রেজিস্টারে' এই বিবরণটি মুদ্রিত হইয়াছিল: "হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ডিময়েন-এ তিন বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় যে, তিনি আরও পশ্চিমে যাওয়ার দিন পিছাইয়া দিয়া এখানে অধিক দিন থাকিতে পারিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি শহরের শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইঁহারাও তাঁহার সহিত দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে আলাপাদিতে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে

পারিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ যদি ঐ সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার নিজের গণ্ডির মধ্যে ঢুকিয়া বিরোধ করিতে চাহিতেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত দুর্ভোগ; আর যাঁহারা প্রতিস্পর্ধার ভরসা কিছুমাত্র রাখিতেন, তাঁহারা ঐ পথই ধরিতেন। তাঁহার উত্তর আসিত বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো এবং দুঃসাহসী তার্কিক ঐ ভারতবাসীর অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধিভল্লের দ্বারা অবশ্যই বিদ্ধ হইতেন। তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও সমুজ্জ্বল, এত সমৃদ্ধ ও সুপরিমার্জিত যে উহার গতিবিধি শ্রোতাদিগকে ধাঁধা লাগাইয়া দিত, অথচ উহা সর্বদাই সাগ্রহে লক্ষ্য করার মতো জিনিস ছিল। তিনি ব্যথা দিবার মতো কিছুই বলিতেন না, কেননা ঐরূপ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সকলেই দেখিতেন, তিনি অতি অমায়িক ও ভালবাসার যোগ্য; এত সৎ, সরল, অকপট এবং সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহারের জন্য সর্বদা এমনি কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি! সত্যকারের যাঁহারা খ্রীষ্টান তাঁহারা সকলেই বিবেকানন্দ ও তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।”

ইহার পর জানুআরির মধ্য ভাগে মেমফিস যাওয়া পযন্ত দীর্ঘ দেড় মাস তিনি কি করিয়াছিলেন তাহার কোন বৃত্তান্ত এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই। এই সময় মধ্যে লিখিত পাঁচখানি পত্রে তিনি তখন পর্যন্ত আমেরিকান সমাজকে কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং ভারতের উন্নতির জন্য কি উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। আমরা পাঁচখানি পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। প্রথম পত্রখানি শিষ্য হরিপদ মিত্রকে লিখিত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে। দ্বিতীয় পত্রখানি জানুআরি মাসের গোড়ার দিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লেখা। তৃতীয় পত্রের তারিখ ২৪শে জানুআরি; উহা মাদ্রাজের ভক্তদিগকে লিখিত। চতুর্থ পত্রখানি ২৯শে জানুআরি জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখিত। তারিখবিহীন পঞ্চম পত্রখানি খেতড়ির রাজাকে লেখা।

প্রথম পত্রে আছে: “এদেশে আশ্চর্যের বিষয় অনেক। বিশেষ এদেশে দরিদ্র ও স্ত্রী-দরিদ্র নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই! সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মতো মেয়ে বড়ই কম।...আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! পঁচিশ বৎসর ত্রিশ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন।...তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচবে

না। দ্বিতীয় দরিদ্র-লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার!... হে ভগবান, আমরা কি মানুষ!...এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।...এদের অনেক দোষও আছে। ফল এই, ধর্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চে। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম শিক্ষা দিব।" অনেকগুলি মৌলিক কথাই এখানে পাইলাম—নারীসমাজ ও দরিদ্রের উন্নয়ন, ছুঁৎমার্গবর্জন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নবীন আদান-প্রদানের ধারা। রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত পত্রখানিতে স্বামীজী আমেরিকার নারীদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য ভারতীয় নারী ও অবনত জনসাধারণের উন্নতিবিধানের নির্দেশ করিয়াছেন।[১]

তৃতীয় পত্রখানিতে স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া উহা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছেন, যাহাতে হিন্দুজাতি তাহার নিজস্ব মৌলিক ভাবগুলি সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে। নিজের অর্থাভাব নাই, এই কথা জানাইয়া মাদ্রাজে সংগৃহীত অবশিষ্ট অর্থ এই কার্যে ব্যয় করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং একটি শাখাবিদ্যালয়-সহ একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতে বা ভারতের বাহিরে মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্যন্ত প্রচার করা। তারপর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত কিনা, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।" সমাজ-সংস্কারে তিনি সরাসরি অংশ গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদ্বারা মানুষ গড়িয়া তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বাধীন, সক্ষম, সুশিক্ষিত মানুষ নিজের পথ নিজেই গড়িয়া লইতে পারে। "আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষ হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এবং অন্যান্য জাতি জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা সকলে জানুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক—অপরে

১। এই দীর্ঘ পত্রখানির অনেকাংশ প্রথম খণ্ডের "দক্ষিণ ভারতে" অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এক্ষণে কি করিতেছে। তারপর তাহারা কি করিবে, স্থির করুক।...আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—'ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান।' মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।...অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর।" প্রাচ্যে প্রচার-নিরত মিশনরীদের ও 'নীলনাসিক' (ব্লু-নোজ) প্রেসবিটেরিয়ান গোঁড়াদের 'ইন্টিরিয়র' সংবাদপত্র অবলম্বনে শত্রুতার কথাও এই পত্রে উল্লিখিত আছে। স্বামীজী জানিতেন, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা সাধারণতঃ তাঁহার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, আমেরিকান জাতিও তাঁহাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল; অতএব তখন পর্যন্ত তিনি এই বিদ্বেষকে বড় একটা আমল দেন নাই—বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভারতীয় মিশনরীদের উষ্মার কারণও তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন, "প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে অনেক আসাতে—তাহাদের (মিশনরীদের) ভারতে গিয়া বড়মানুষি করিবার উপায় (আয়) অনেক কমিয়া আসিয়াছে।"

চতুর্থ চিঠিতে একটা ব্যক্তিগত সুর আছে, যাহা পূর্বোক্ত পত্রত্রয় হইতে ভিন্ন অথচ যাহা স্বামীজীর জীবনে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। একদা তাঁহার জীবনে এক ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া জননী প্রভৃতিকে দুঃখে ভাসাইবেন, অথবা তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সংসারে থাকিবেন। তিনি কেন সংসারত্যাগের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া লিখিয়াছেন, "যদি আমি সংসার-ত্যাগ না করিতাম, তবে আমার মহান্ গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।" অতঃপর স্বীয় জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস ও সাফল্যাদি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি যতক্ষণ খাঁটি আছি, ততক্ষণ কেহই আমার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ তিনিই আমার সহায়। ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই। আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়াপরার ধরাবাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডিই যে কখন অতিক্রম করিতে

পারে না! কেবল আপনার ন্যায় মহৎ-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র আমার গুণগ্রাহী।…কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের যশ-খ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ, তাহা কোনকালে কোথাও দেখা যায় নাই। যদি আপনি কখন পাশ্চাত্ত্য দেশে আসেন, তবে এতদ্দেশবাসীর মধ্যে এই হিংসার অভাবই সর্বপ্রথম আপনার নজরে পড়িবে!"

পঞ্চম পত্রে স্বামীজী সহৃদয় ব্যবহার ও আতিথেয়তার জন্য আমেরিকান নারীদের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহাদের বিভিন্ন গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন ('বাণী ও রচনা', ৮।৩৯)।

আমেরিকান মিশনরীদের ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা তৃতীয় পত্রে উল্লিখিত আছে। তবু যে স্বামীজী বিদ্বেষরাহিত্যের কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমেরিকার জনসাধারণের পরস্পরের প্রতি প্রীতির কথা ভাবিয়াই লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; জন কয়েক মিশনরীদের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বামীজী নিজেও তখন পর্যন্ত সকলেরই সাহায্য ও প্রশংসাদি পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এসকল কথার অর্থ ইহা নহে যে, সঙ্কীর্ণমনা ও ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসারটনাকারী মিশনরীরা আমেরিকার জনগণের মনকে ভারতের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করেন নাই। ইহাই আশ্চর্য এবং এখানেই স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য যে, তিনি তবু অধিকাংশ লোকের বন্ধুত্ব পাইয়াছিলেন। তাই আমেরিকার তৎকালীন মনোভাবের সহিত একটু পরিচয় না পাইলে স্বামীজীর সাফল্যের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নহে।

নবীন স্বাধীনতালব্ধ আমেরিকা নবোদ্যমে ইহলৌকিক উন্নতিমার্গে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি ও তৎসহগামী নবীন চিন্তাধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক বিষম সমস্যার জন্ম দিয়া খ্রীষ্টান সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। উগ্রপন্থী প্রাচীনরা নবালোককে অস্বীকারপূর্বক বাইবেলের আক্ষরিক অর্থকেই সত্য বলিয়া বুকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। উদারপন্থীরা মানবের নবাবিষ্কারের মর্ম উপলব্ধি করিয়া তাহার সহিত ধর্মের সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হইলেও ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক ভুলিয়া সামাজিক উন্নতির জন্য ধর্মের প্রয়োগে অত্যধিক উৎসুক হইলেন; ধর্মনেতাদের তখন কর্তব্য হইল, মজদুরদের সমস্যাসমাধান, বস্তী-পরিষ্কার, সামাজিক হিতের বিরুদ্ধ উপায়ে অর্থোপার্জনের

অনৈতিকতা প্রদর্শন, রাজনীতিক অসদাচার নিবারণ ইত্যাদি। সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে নৈতিক আচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব এখন পড়িল ধর্মের স্কন্ধে। জড়বাদ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নামক অপর যে মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষ উপায় অবলম্বনে বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক ভিত্তিতে সমাজগঠনে উন্মুখ ছিল, উদারপন্থী খ্রীষ্টানদের অনেকেই তাহার সহিত একটা রফা করিয়া চলিতে অতিমাত্র আগ্রহশীল ছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিকে তখন প্রকৃত সামাজিক উন্নতির ভিত্তি মনে না করিয়া বরং সামাজিক ও আর্থিক প্রাচুর্যকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ বা লক্ষণ বলা হইত। উদারপন্থীদের প্রভাব বেশী ছিল পূর্বাঞ্চলে অতলান্তিক মহাসাগরের কূলে, আর প্রাচীনপন্থীরা আদৃত হইতেন মধ্যপশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে। পূর্বাঞ্চলীয়দের আগ্রহ ছিল সামাজিক ও আর্থনীতিক সংস্কারের দিকে, আর দ্বিতীয় অঞ্চলের ঝোঁক ছিল পাপ ও মাদকতানিবারণের দিকে।

মধ্যপশ্চিম ও দক্ষিণে ছিল গির্জাপন্থী নারীসমাজের আধিপত্য। ইঁহারা যুক্তির প্রাধান্য না মানিয়া ভাবাবেগকেই অধিক মর্যাদা দিতেন এবং পাপ বা কল্পিত অনৈতিকতা আবিষ্কার ও উহার সংস্কারকেই ধর্মের সার মনে করিয়া উহাতেই নিরত থাকিতেন। ইঁহাদের ভয়ে সমাজ ছিল সন্ত্রস্ত এবং মিশনরীরা ইঁহাদের নিকট অর্থ ভিক্ষা পাইতেন। নারীসমাজে যে নবীন সংস্কৃতি ও প্রগতির আভাস দেখা দিয়াছিল, উহাকে ইঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং একটা কাল্পনিক প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন নারীসমাজের আদর্শই সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। সমস্ত সামাজিক প্রচেষ্টায় ইঁহাদেরই মতের জয় হইত। আর পুরুষরা নীরবে ইঁহাদের নেত্রীত্ব স্বীকার করিতেন।

এইরূপ পরিস্থিতির সাহায্যে লব্ধবল মিশনরীরা ভারতীয় ধর্মকে আমেরিকায় কতখানি হীন বলিয়া প্রচার করিতেন তাহা ধারণা করাও এখন অসম্ভব। ছবি আঁকিয়া ও কবিতা লিখিয়া বলা হইত, "পবিত্র গঙ্গার স্রোত যেখানে প্রবাহিত হয়, দেখ, সেখানে অধার্মিক হিন্দু নারী কেমন করিয়া স্বহস্তে নিজ শিশুকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতেছে! আর সে শিশুকে যখন কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তু লইয়া যায়, তখন কি মর্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনিই না উত্থিত হয়! সে ক্রন্দন ক্রমে দূরদূরান্তরে মিলাইয়া যায়, কিন্তু জননীর হৃদয় তখন বজ্রকঠিন, সে নির্বিকার-চিত্তে তাহা শুনে। সে দেশে বাইবেল পাঠাও, পাঠাও শীঘ্র করিয়া। খ্রীষ্টের বাণী মায়েদের মর্মে প্রবেশ করুক, তাহা হইলে তাহারা আর রাক্ষসীর মতো

সন্তানের জীবননাশ করিবে না, মায়েরই মতো তাহাদের চিত্ত তখন কোমল হইবে।" এই প্রচারকদের মতে ভারতীয় স্বামীরা স্বীয় হস্তে চিতাগ্নি প্রস্তুত করিয়া পত্নীদিগকে দগ্ধ করিত, জননীরা সদ্যোজাত শিশুকে মাংসাশী পক্ষীদের ভোজনের জন্য বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিত, মানুষ স্বেচ্ছায় জগন্নাথের রথচক্রনিম্নে নিষ্পেষিত হইয়া আত্মহত্যা করিত—এইরূপ আরও কত কি আজগুবি কাহিনী। এইজাতীয় মিথ্যা অপবাদে মর্মাহত হইয়া স্বামীজী যখন বলিয়াছিলেন যে, প্রতীচ্য প্রাচ্যের বিরুদ্ধে যেরূপ মিথ্যাপ্রচার ও নিন্দাবাদের আশ্রয় লইয়াছে, তাহার প্রতিশোধকল্পে ভারত যদি ভারতমহাসাগরের তলদেশের সমস্ত কাদা পাশ্চাত্ত্যের দিকে ছুঁড়িয়া মারে, তবু যথেষ্ট প্রতিশোধ হইবে না, তখন তিনি একটুও অত্যুক্তি করেন নাই। এইরূপ বিরুদ্ধভাবের মধ্যেও স্বামীজী যেরূপ সাহস অবলম্বনে স্বীয় উদার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অত্যাশ্চর্য। অবশ্য ইহা ঠিক যে, তাঁহার মত একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, এরূপ লোকের সংখ্যা তখন খুব কমই ছিল, কিন্তু তিনি এমন এক শক্তিশালী ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন যে, শত্রু ও মিত্র সকলকেই উহার প্রতি আগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী নিজ নিজ কর্মধারা ও চিন্তাপ্রণালীকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নূতন করিয়া সুবিন্যস্ত করিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা অতীব সত্য: "গত দশ বৎসর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এমন গির্জা-বেদী খুব কমই ছিল যেখানকার ধর্ম-বক্তারা জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু না কিছু বলিতে বাধ্য হন নাই।" অধিকন্তু আমরা বলিতে পারি, এই শত্রুভাবে বা মিত্রভাবে সাধনার দ্বারা আমেরিকায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছিল এবং উহার প্রভাব হইতে অনুদার মধ্যপশ্চিমও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই।

নবীন আলোকের ছটা ও গতি যেখানে ক্ষীণ ও মন্থর সেই মধ্য-পশ্চিমের পরে স্বামীজী গিয়াছিলেন অধিকতর নবালোকোদ্ভাসিত মেমফিস নগরে 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' ক্লাবের আমন্ত্রণে। স্বামীজী তখন বক্তৃতা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকায়, ঐ কোম্পানী বক্তৃতায় লব্ধ সমস্ত অর্থের একটা মোটা অংশ আত্মসাৎ করিত। অথচ প্রাথমিক ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় লোকের সহিত স্বামীজীর পত্রালাপ ইত্যাদির দ্বারা স্থিরীকৃত হইত। এইরূপেই 'পেরিপ্যাটেটিক

ক্লাবে'র আমন্ত্রণে তিনি মিনিয়াপোলিস গিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ এইচ. ও. ব্রিডেন তাঁহার ডিময়েন-এর বক্তৃতার প্রাথমিক আয়োজন করিয়াছিলেন এবং পরে 'ইউনিটি ক্লাব' তাঁহার ডেট্রয়েট গমনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মেমফিসে স্বামীজী শ্রীযুক্ত এইচ. এল. ব্রিঙ্কলির অতিথি হইয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক 'লা স্যালিট অ্যাকাডেমি' বা শ্রীমতী (ভার্জিনিয়া) মুনের বাসগৃহাবলী নামে পরিচিত একটি স্থানে বাস করিতেন। কুমারী ভার্জিনিয়া মুন-এর 'বোর্ডিং হাউস'-এর বৈঠকখানাতেই স্বামীজী আগন্তুকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন এবং ঐ কক্ষে দুইবার বক্তৃতাও করেন।

১৩ই জানুআরি স্বামীজী মেমফিসে উপস্থিত হন এবং সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা এস. আর. শেফার্ড-এর গৃহে তাঁহার জন্য একটি প্রীতিসম্মেলন আহূত হয়। পরদিন রবিবারে তিনি স্থানীয় এক সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকারকালে যাহা বলেন তাহা 'মেমফিস কমার্শিয়াল' পত্রিকায় ১৫ই জানুআরি মুদ্রিত হয়। এই সাক্ষাৎকারকালে স্বামীজী বলেন: চিকাগোর ধর্মমহাসভা মানুষের মনকে পূর্বাপেক্ষা উদার করিয়াছে। সকল ধর্মই সত্য, অতএব বিবাদের প্রয়োজন নাই। যে কোন ধর্মাবলম্বী সাধুব্যক্তির মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সিদ্ধাই-এর প্রতি হিন্দুরা শ্রদ্ধাশীল নহেন। ধর্মের সহিত এই সকলের কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই।

১৫ই জানুআরি, সোমবার অপরাহ্ণে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হইল 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী ক্লাব'-এর সৌজন্যে তাহাদেরই ক্লাব-গৃহে। ঐ বক্তৃতার পরে একটি প্রীতি-সম্মেলন আয়োজিত হয়। পরদিন তিনি 'অডিটরিয়াম'-এ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সকল ঘটনার বিবরণ প্রদানকালে 'অ্যাপিল অ্যাভাল্যাঞ্চ' পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়: " 'বক্তৃতামঞ্চের অন্যতম অতিমানব', 'তিনি তাঁহার জাতির আদর্শ মুখপাত্র', 'বিশ্বমেলার অন্তর্ভুক্ত মহাসভার ইনি এক অতি চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি', 'দৈবশক্তিসম্পন্ন বাগ্মী ইনি'—এই সমস্ত এবং এতদপেক্ষাও অধিকতর বিশেষণ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রযোজ্য।" ঐ সংবাদপত্র হইতেই জানা যায়, তিনি কর্নেল আর. বি. স্নোডেন-এর গৃহে রবিবারে নৈশভোজনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে সহকারী বিশপ টমাস এফ. গেলর, রেভাঃ ডাঃ জর্জ প্যাটারসন ও অন্যান্য ধর্মযাজকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

১৬ই জানুআরি 'অডিটরিয়ামে' হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী যে বক্তৃতা করেন

তাহার বিবরণ ১৭ই তারিখের 'মেমফিস কমার্শিয়াল' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। উহার সারাংশ এই: পরমতসহিষ্ণুতাই ছিল তাঁহার বক্তব্য, আর সার্বভৌম দৃষ্টি লইয়াই তিনি ইহা বলিয়াছিলেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুধর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রীতি ও পরমতের প্রতি সহানুভূতিই সর্বধর্মের সার হওয়া উচিত। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির কথা না বলিয়া তিনি বরং মৌলিক তত্ত্ব-কথাই অধিক বলিয়াছিলেন। যে কয়টি অনুষ্ঠানের কথা তিনি তুলিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে এবং মানবজীবনের সহিত একটা মৌলিক পাপ মিশ্রিত আছে, বাইবেলোক্ত এইরূপ পাপবাদে বিশ্বাস করে না। মানুষ পবিত্র ছিল এবং পবিত্রতাতে ফিরিয়া যায়। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তুলিয়া তিনি দেখাইয়া দিলেন, হিন্দুরা শুধু কথায় নহে, বাস্তবক্ষেত্রেও কত পরধর্মসহনশীল। হিন্দুরা কত উদার ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিলেন যে, একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ইষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেই ভগবত্তত্ত্বের মূলগত প্রেমের পূজারী বলিয়া সকলে বস্তুতঃ একই ভগবানের ভক্ত। হিন্দুদের প্রতীক শুধু ভগবদ্‌গুণাবলীরই স্মারক ও ভগবদ্ধ্যানের অবলম্বন। "তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করা অসম্ভব, কিন্তু ইহা ছিল সৌভ্রাত্র স্থাপনের জন্য একটি অত্যুৎকৃষ্ট আবেদন এবং একটি মনোরম ধর্মমতের বাগ্মিতাপূর্ণ সমর্থন। আর সমাপ্তিটিও উল্লেখযোগ্যরূপে মনোরম হইয়া উঠিল, যখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি যীশুখ্রীষ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধের সম্মুখে অবশ্যই মস্তক অবনত করিবেন। পরে তিনি সভ্যতার নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিলেন আর বলিলেন, এই প্রগতিমুখে কৃত অপরাধরাশির জন্য তিনি যীশুখ্রীষ্টকে দায়ী করিতে প্রস্তুত নহেন।"

১৭ই জানুআরি 'ওম্যানস কাউন্সিল'-এর বাড়িতে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানুষের ভাগ্য'। 'অ্যাপিল অ্যাভাল্যান্স'-এ উহার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল উহা সংক্ষেপে এই: "কানন্দের (স্বামী বিবেকানন্দের) ভগবান সম্বন্ধে ধারণা ও পাপের শাস্তির ধারণা খ্রীষ্টানদের মতো নহে। মনকে তিনি অমর বলিয়া মানেন না। ভগবান দূরে স্বর্গে অধিষ্ঠিত নহেন, 'আমি ব্রহ্ম'। মানুষ পূর্ব হইতেই পবিত্র, কিন্তু স্বরূপ ভুলিয়া কষ্ট পাইতেছে। অতঃপর তিনি সিংহ-মেষশাবকের গল্পটি শুনাইলেন। এবং তিনি বস্টনে যে মহিলা-সংশোধনাগার

দেখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ক্ষমা, ভালবাসা ও বিশ্বাসের দ্বারাই মানুষ সংশোধিত হয়, দণ্ডের দ্বারা তেমন ফল হয় না। ধর্ম দুর্বলতা হইতে উদ্ভূত নহে—ধর্মের অর্থ ক্রমবর্ধমান, ক্রমপ্রকাশমান, ক্রমবিস্তারশীল প্রেম। একত্ব ও বৈচিত্র্য—দুইই থাকা আবশ্যক। অতঃপর তিনি ছয় অন্ধের হস্তিদর্শনের গল্পটি শুনাইয়া বলিলেন: অজ্ঞতা ও ধর্মোন্মত্ততা কখনও সত্যকে পিষিয়া মারিতে পারে না।…আসুন, আমরা সকলের সাহায্যে রত হই, ধ্বংসে নহে।"

মেমফিসে স্বামীজীর অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল এবং ইঁহাদের অনুরোধে তাঁহাকে সেখানে আরও তিনটি বক্তৃতা দিতে হইল। প্রথম দুইটি 'লা স্যালিট অ্যাকাডেমি'তে হইয়াছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় বক্তৃতার বিষয় ছিল: পুনর্জন্ম। তিনি বলিলেন, প্রাচীন সব ধর্মেই পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইত; এখন হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ইহা স্বীকৃত। পাশ্চাত্ত্যেরা মনে করেন—পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিলে অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু নীতির উৎসরূপে যে ন্যায়পরায়ণ ভগবানকে মানা হয়, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই। ন্যায় থাকিলেই অন্যায় থাকিবে। ভগবান যদি জগতের অন্যায়ের জন্য দায়ী না হন, তবে দায়ী কে? জন্মান্তরবাদে ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। জগৎ শূন্য হইতে আসে নাই। কারণ-পরম্পরাই কার্যপরম্পরা সৃজন করে; এইরূপে মানুষের বর্তমান জন্ম পূর্বজন্মের ফলে রচিত। "আমি যখন ট্রেনে মিনিয়াপোলিস হইতে আসিতেছিলাম, তখন এক গোপালক, যে ছিল রুক্ষ স্বভাবের এবং 'নীল-নাসিক' শ্রেণীর প্রেসবিটেরিয়ান, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি। আমি বলিলাম, ভারত হইতে। 'আপনার ধর্ম কি?'—সে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, 'হিন্দু'। 'তাহা হইলে আপনাকে নরকে যাইতে হইবে!'—সে বলিয়া উঠিল। আমি তখন তাহাকে এই জন্মান্তরবাদের কথা শুনাইলাম। সে বলিল, সে উহাতে সর্বদাই বিশ্বাসী, কারণ সে যখন একদিন কাঠ কাটিতেছিল, তখন তাহার ছোট বোনটি তাহার পোশাক পরিয়া আসিয়া বলিল, 'সে পূর্বে পুরুষ ছিল।' পুনর্জন্মবাদের আর একটা সৌন্দর্য এই যে, ইহা বলে, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তো আপসোস করিয়া লাভ নাই বরং প্রতিমুহূর্তে আবার শুভ কর্ম করার যে নূতন অবকাশ আসে তাহা গ্রহণ করা উচিত।"

পরদিন অপরাহ্ণে একই স্থলে বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'ভারতের রীতিনীতি'।



চিকাগো — ১৮৯৪

(সম্ভবতঃ হেল-পরিবার বাসভবনে)

সেদিন লোকসমাগম অধিক হয় নাই; কারণ আবহাওয়া ছিল খারাপ। বক্তৃতার বিবরণ দিতে গিয়া সাংবাদিক লিখিলেন: খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী আমেরিকার একটা প্রধান কর্তব্য ছিল অখ্রীষ্টান ও তমসাচ্ছন্ন ভারতকে আলোকোজ্জ্বল করা; কিন্তু মনে হয় প্রাচ্য জ্যোতিতে ভাস্বর বিবেকানন্দের ধর্ম আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের নিকট প্রাপ্ত প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের সৌন্দর্যকে রাহুগ্রস্তপ্রায় করিয়াছে এবং অধিকতর শিক্ষিত অনেক আমেরিকানদের হৃদয়ে প্রসার লাভের জন্য উহা অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইবে। "মেমফিসে আজ পর্যন্ত যত বক্তা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কানন্দ সর্বাধিক আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছেন।" বক্তৃতাকালে মহিলারা তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনিও সদুত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু এইসব বাধা সত্ত্বেও তিনি কখনও মূল বিষয় হইতে বিচ্যুত হন নাই।

অবশ্য স্বামীজীকে সকলেই সাদরে গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ ধর্মযাজকগণ তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। সুলিভান নামক এক ধর্মযাজক ঐ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ২১শে জানুআরি তিনি গির্জায় যে ভাষণ দেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি বাইবেলকে সর্বধর্মশাস্ত্রের শীর্ষে স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর; তাঁহার মতে ধর্মমহাসভা একটা প্রকাণ্ড ঠগবাজী এবং পুনর্জন্মবাদে আত্মার অমরত্ব স্বীকৃত হয় না, বরং বলা হয়, মানুষ মরিয়া পশুপক্ষী হইবে; তাই যদি হয়, তবে মানুষ না হইয়া শূন্যে বিলীন হওয়া বরং ভাল।

২১শে জানুআরি, রবিবারে স্বামীজী 'লা স্যালিট অ্যাকাডেমি'তে একটি আলোচনাসভায় উপস্থিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদদাতা লিখিয়াছেন: পাশ্চাত্যসমাজের দোষত্রুটি স্বামীজীর নজরে পড়িলেও তিনি অজিজ্ঞাসিতভাবে কখনও সমালোচনা করিতেন না; বরং বলিতেন, উহা হইতে ভারত যাহা কিছু গ্রহণ করিতে পারে, তিনি তাহা ভাল করিয়া শিখিতেছেন। একজন প্রশ্ন করিলেন, হিন্দুরা যদি অতই ধার্মিক ও নীতিপরায়ণ হয়, তবে তাহারা অপর জাতির তুলনায় অমন অধঃপতিত কেন? উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, জাগতিক উন্নতিবিধান ধর্মের কাজ নয়, আর ধর্ম তো খ্রীষ্টানজগতেরও উন্নতিসাধন করে নাই, প্রত্যুত খ্রীষ্টধর্ম পাশ্চাত্য জগতে প্রতিপদে বিজ্ঞানের নবালোকের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তবে তিনি ইহাও বলিলেন যে, *পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও কর্মধারার সহিত প্রাচ্য চিন্তা ও কর্মধারার মিলনেই* উভয় প্রান্তের হিতকর নবীন পন্থার সৃষ্টি হইতে পারে।

সেই রাত্রেই তিনি তাঁহার সর্বাধিক প্রেরণাময় একটি ভাষণ প্রদান করিলেন। উহার স্থান ছিল 'ইয়ং মেনস হিব্রু অ্যাসোসিয়েশন হল' এবং বিষয় ছিল: 'তুলনামূলক ঈশ্বরবাদ'। এই বক্তৃতার ২২শে জানুআরির বিবরণ হইতে জানা যায়, "এ পর্যন্ত বিবেকানন্দ যত বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে লব্ধ অর্থ কোন না কোন সৎকার্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে এবং ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু গত রাত্রের বক্তৃতাটি তিনি নিজের জন্য দিয়াছিলেন ও উহার আয়োজন করিয়াছিলেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এইচ. এল. ব্রিঙ্কলি। ঐ বক্তৃতায় স্বামীজী ইতিহাস অবলম্বনে ধর্মচিন্তার ক্রমোন্নতির ধারা দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, কোন না কোন আকারে ধর্ম সর্বত্র, এমন কি অসভ্যদের মধ্যেও আছে। মানবাত্মা যেন বায়ুবিন্দুর ন্যায় জলের নিম্নদেশে পতিত হইয়া স্বভাবতঃই উপরে উঠিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেছে। আর এই চেষ্টাই ধর্মের রূপ ধারণ করে।

২২শে জানুআরি স্বামীজী মেমফিস ছাড়িয়া চিকাগোয় চলিলেন কারণ ২৫শে সেখানে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। চিকাগোতে ২৫শে রাত্রে তিনি কি বিষয়ে কোথায় বলিয়াছিলেন, কিছুই জানা নাই। তেমনি অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবনের কর্মচঞ্চল অনেকগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আমরা দেখিয়াছি মহাসভার কার্যসমাপনান্তে তিনি নভেম্বরের প্রায় তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চিকাগো ও পার্শ্ববর্তী নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পরে নভেম্বরের শেষে, সম্ভবত: 'স্লেটন লাইসিয়াম ব্যুরো'র ব্যবস্থানুসারে ম্যাডিসন, মিনিয়াপোলিস, ডিময়েন, আইওয়া সিটি ইত্যাদি স্থলে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পর মেমফিসে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আর কোন খবর না পাওয়া গেলেও আমরা মধ্যপশ্চিম ও মেমফিস সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাই, উহা হইতে যদি তাঁহার কর্মব্যস্ততার কোন অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে বলিতে হইবে, মধ্যবর্তী ছয় সপ্তাহে তিনি আরও অন্তত: বারটি শহরে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আর ইহার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহার একখানি পত্রে পাওয়া যায়। ১৯শে মার্চ (১৮৯৪) তারিখে চিকাগো হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত এক পত্রে অসহ্য শীতের বর্ণনার পরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল তারপর গরজের দায়ে একদিন রেলে ক'রে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র লেকচার করে বেড়াচ্চি।" সময়ের হিসাব—একদিনে উত্তর হইতে

দক্ষিণে যাওয়ার কথা—ছাড়িয়া দেওয়া চলে ; ঐরূপ একটু অত্যুক্তি বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হইয়াই থাকে। কিন্তু বাকি যেটুকু তথ্য পাই, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি দারুণ শীতেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই—অবিরাম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আরও তথ্য পাই ভগিনী ক্রিস্টিন-এর স্মৃতি-কথায় : "ধর্মমহাসভার পরে 'পণ্ডস লেকচার ব্যুরো' (?) নামক একটা বক্তৃতা-কোম্পানীর পরিচালনাধীনে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে সম্মত করানো হইল।…সাধারণ প্রথানুযায়ী স্থানীয় কমিটিকে এইসব বিষয় হইতে একটি বিষয় বাছিয়া লইতে বলা হইত—'মানবের দেবত্ব', 'ভারতের রীতিনীতি', 'ভারতীয় নারীসমাজ', 'আমাদের পরম্পরাগত সংস্কৃতি'।…সব সময়েই দেখা যাইত বক্তৃতা-স্থানটি যদি কোন খনির নিকট অবস্থিত থাকিত, যেখানে বুদ্ধির চর্চা অল্পই হয়, তবে সর্বাধিক কঠিন বিষয় বাছিয়া লওয়া হইত। বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ারূপে শ্রোতাদের মুখে একটুও বুদ্ধির আলোক উদ্দীপিত না হইলে বক্তৃতা দেওয়া যে কত কঠিন, তাহা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।" রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় বলিতে গেলে বক্তৃতা-কোম্পানী "তাঁহাকে যেন কোন সার্কাসের দ্রষ্টব্য বস্তুর ন্যায় আমেরিকার শহরে শহরে ঘুরাইত ; আর তিনি শীতে রেলভ্রমণ, জিনিসপত্র সামলানো, দীপ্তিহীন মুখবিশিষ্ট শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান, টাকার হিসাব রাখা, পরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘ বক্তৃতার পর বাজে সব বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া—মানুষের দেবত্বের কথা বলার পরেই—হিন্দুরা কেন কুমীরের মুখে ছেলে অর্পণ করে, কেন স্ত্রীকে স্বহস্তে পোড়ায়, কেন জগন্নাথের রথচক্রে আত্মহত্যা করে—ইত্যাদি কাল্পনিক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি সহ্য করিয়াও অবিরাম ভ্রমণ করিতেন। সত্য বলিতে গেলে, তাঁহার শক্তিসামর্থ্যকে তখন যেন নির্মম ভাবে স্বকার্য সাধনে নিযুক্ত করিতেই ঐ কোম্পানী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। স্বামীজীও কার্যের উৎসাহে এবং ধর্ম ও ভারতকথা শুনাইবার আগ্রহে নিজ সুখসুবিধা বা স্বাস্থ্যের কথা মোটেই ভাবেন নাই।"

ইহারই কোন এক সময়ে হেল-পরিবারের গৃহ স্বামীজীর চিকাগোয় স্থায়ী ঠিকানা ও আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীযুক্তা হেল ও শ্রীযুক্ত হেল তখন তাঁহার মাতা ও পিতা এবং তাঁহারাও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ও সাদরে স্বগৃহে রাখিতেন। হেলদের দুইটি কন্যা—হ্যারিয়েট হেল ও মেরী হেল এবং

দুইটি "বোনঝি"—হ্যারিয়েট ম্যাককিণ্ডলি ও ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি ছিলেন তাঁহার চারিটি স্নেহের ভগিনী—সহোদরা-সদৃশা। এই চারিটি বোনকে তিনি প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেন, তাঁহারাও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বিশেষতঃ মেরী হেল ও ইসাবেলের সহিত তাঁহার স্নেহসম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড়। ইঁহাদের নিকট তিনি বহু পত্র লিখিয়াছিলেন এবং উহার অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়া 'বাণী ও রচনা'তে মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রগুলি পড়িলেই দেখা যাইবে উহাতে কোন সামাজিকতা নাই, আছে কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসম্ভূত স্বাভাবিক ভাববিনিময়, হাসি-ঠাট্টা, কান্না, সহানুভূতি ইত্যাদি। হেলদের পরিচয় দিতে গিয়া স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ তারিখে লিখিয়াছিলেন: "তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তাঁর স্ত্রী—বুড়ো-বুড়ী। আর দুই মেয়ে, দুই বোন-ঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধই সম্বন্ধ !…চারজনেই যুবতী —বে-থা করেনি।…মেয়ে দুইটির চুল সোনালি অর্থাৎ (তারা) ব্লণ্ড, আর বোনঝি দুটি ক্রুনেট, অর্থাৎ কালো চুল। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— এরা সব জানে। বোনঝিদের ততো পয়সা নেই—তারা একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল করে; মেয়েরা কিছু রোজগার করে না।…মেয়েরা আমাকে দাদা বলে; আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়িতে—আমি যেখানেই কেন যাই না। তারা সব ঠিকানা করে।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৪৮৩)। তখনকার দিনে দরিদ্রদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন স্কুল তেমন অপরিচিত না থাকিলেও ধনীদের সন্তানদের জন্য ঐরূপ কিণ্ডারগার্টেন অতি বিরল ছিল। অতএব সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ম্যাককিণ্ডলি ভগিনীদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এইজন্য তাঁহারা সমাজে বিশেষ প্রশংসাও অর্জন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন এক সংবাদপত্রে ইসাবেল সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল, "শ্রীমতী ম্যাককিণ্ডলি তাঁহার কার্য সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল এবং খোকাখুকীদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ স্নেহ ও বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী যেরূপ হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপই বটে। তাঁহার মনটি অতি সুন্দর এবং তাঁহার বাক্যালাপ অতীব চিত্তাকর্ষক।"

হেলদের সহিত স্বামীজীর এই আত্মীয়তা জীবনব্যাপী ছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তাঁহার লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্‌কালে 'হেল ভগিনীদের' নিকট বিদায় লইবার জন্য লিখিত এক পত্রে আছে: "আমার

মনে হয়, পৃথিবীতে তোমাদের চার জনকে আমি সবচেয়ে ভালবাসি এবং তোমরাও আমাকে ঐরূপ ভালবাস।" আরও পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ বেলুড় মঠ হইতে মেরী হেলকে লিখিয়াছিলেন, "তোমরা এবং তোমাদের পরিবারের সকলেই আমাকে এত ভালবাস যে, তাহাতে মনে হয় (আমরা হিন্দুরা যেমন বলে থাকি) আমি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই তোমাদের পরিবারের কেহ ছিলাম।"

ডেট্রয়েট

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে ইরি হ্রদের তীরে এবং চিকাগোর পূর্বে অবস্থিত ডেট্রয়েট এখন ঐ রাষ্ট্রের ও বিশ্বের অতিবৃহৎ শিল্প-মহানগর। স্বামীজীর সময়ে উহা এত সমৃদ্ধ না হইলেও নানা কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তখন সেখানে মোটরগাড়ি প্রস্তুত না হইলেও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নিত্যনূতন শিল্পের আয়োজন করিয়া উহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রকার প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার মিশ্রণ এবং ঘাত-প্রতিঘাতও সেখানে চলিতেছিল। অতএব স্বামীজীর তথায় অবস্থানজনিত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াও অনুরূপ প্রবল ও বিপরীতমুখী ছিল। মহাসভার পরে সর্বোচ্চ খ্যাতি যেমন তিনি এখানে অর্জন করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধ সমালোচনাও তেমনি এখানেই প্রবলতম বা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ ডেট্রয়েটের দিনগুলি বিশেষ স্মরণীয়। এখানে তিনি কয়েক বার আসিয়াছিলেন এবং প্রতিবারই শত্রু ও মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া পরিশেষে জয়টীকা তাঁহারই ললাটে অঙ্কিত হইয়াছিল। অবশ্য ধর্মমহাসভায়ও বিরুদ্ধভাব মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সেখানে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ অখ্রীষ্টান ধর্মের সমালোচনায় ক্ষণে ক্ষণে মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ব্যাপার অধিক দূর গড়ায় নাই। অতএব খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনসাধারণ অখ্রীষ্টান বক্তাকে অভিনন্দিত করিতেছেন দেখিয়াও পুরোহিতকুল কোন প্রকারে ভ্রাতৃভাবের ও পরমতসহিষ্ণুতার মুখোশ পরিয়া যথাসম্ভব শান্তিভঙ্গ করেন নাই। মহাসভার পরে সেই রাজনীতিক প্রয়োজনসম্ভূত নীরবতা ভঙ্গে আর কোন আপত্তির কারণ ছিল না। চিকাগোর প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের একখানি সংবাদপত্র স্পষ্টই লিখিয়া বসিল: "মহাসভায় তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন ছিলেন, তখন ছিলেন তিনি আমাদের অতিথি; কিন্তু এখন তো মহাসভা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদের কর্তব্য হইতেছে তাঁহার ও তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধে উৎসাহ-সহকারে আক্রমণ চালানো।" কার্যতঃও দেখা গেল, মধ্যপশ্চিমে স্বামীজীর খ্যাতি যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, পুরোহিতকুলের আক্রমণও তেমনি কঠোরতর হইতে লাগিল। মেমফিসে আমরা ইহার পূর্বাভাস পাইয়াছি। হয়তো অন্যান্য নগরেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল,

কিন্তু সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশ পায় নাই। ডেট্রয়েটের আক্রমণ আরম্ভ হইল আরও প্রণালীবদ্ধরূপে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই সঙ্ঘবদ্ধ শত্রুতার বিরুদ্ধে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কারণ তাঁহার স্বভাবই ছিল এই যে, তিনি বাধা পাইলে অধিকতর শক্তি প্রকাশ করিতেন; কারণ তিনি জানিতেন, তিনি যে সংগ্রামের সম্মুখীন হইতেছেন, উহা স্বার্থশূন্য ও নৈর্ব্যক্তিক; তিনি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, প্রত্যুত তিনি মানবসমাজকে সত্যের রাজপথে সুপরিচালিত করার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জীবনপাতে উদ্যত। আর দেখাও গেল যে, তাঁহার বিজয়ের দিনেও উহাতে লাভবান হইয়াছিল ভারতের ও অন্যান্য দেশের অগণিত নরনারী। ডেট্রয়েটে পুরোহিতকুল ও পুরোহিতকুল-প্রভাবিত একদল লোকের শত্রুতা তাঁহার আদর্শ ও কার্য এবং ব্যক্তিগত চরিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা শেষোক্ত বিষয়ের আলোচনা না করিয়া পরে সেসব কথা তুলিব।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজী যখন ট্রেন হইতে ডেট্রয়েটে নামিলেন, তখন তুষারঝঞ্ঝা চলিতেছে—যেন স্বামীজীর জীবনের ভাবী দুর্যোগেরই গৌরচন্দ্রিকা। অবশ্য বন্ধুদের নিকট তিনি সাদর অভ্যর্থনাই পাইলেন। ডেট্রয়েট সমাজে বহুসম্মানিতা, সুশিক্ষিতা, অভিজাতকুল-সম্ভবা ও মিশিগানের ভূতপূর্ব গবর্নরের স্ত্রী শ্রীযুক্তা জন জে. ব্যাগলি তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। ছয় মাস পূর্বে ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ইঁহার সহিত পরিচিত হন। স্বামীজীর ডেট্রয়েটে আগমনের পরদিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা ব্যাগলি এক বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিলেন এবং ঐ আমন্ত্রণে নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কেহই বাদ পড়িলেন না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তালিকা হইতে জানা যায়, নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা ছিল তিন শতাধিক এবং তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ডেট্রয়েট সমাজের চূড়ামণিরা—বিশপ, মেয়র, উকিল, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ইত্যাদি। স্বামীজী তখনই ঐ সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রীতিসম্মেলনের মধ্যেও অকস্মাৎ যে একটু বেসুরো আওয়াজ শোনা গেল, একটু ঝড়ো হাওয়া ঢুকিয়া পড়িল তাহাতে স্বামীজী হয়তো ভাবী ঝঞ্ঝাবাতের পূর্বলক্ষণ দেখিতে পাইলেন। "জনসাধারণের সম্মুখে স্বামীজী একটি মাত্র শব্দও উচ্চারণ করার পূর্বেই, অতি লজ্জার সহিত

বলিতে হইতেছে যে, এক নির্লজ্জা মহিলা, যে গৃহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই গৃহে বসিয়াই স্বামীজীর সাক্ষাতে এবং তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়া তাঁহারই মুখের উপর নিষ্ঠুরভাবে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন।" ('নিউ ডিসকভারিজ', ১৮৩)।

ঐ সম্মেলনে আর কোন বিরুদ্ধ মত উচ্চারিত না হইলেও নগরবাসীরা সকলে স্বামীজীকে নিশ্চয়ই শ্রীযুক্তা ব্যাগলির ন্যায় সাদরে গ্রহণ করে নাই। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার নাতনী শ্রীযুক্তা ফ্রান্সেস ব্যাগলি ওয়ালেস (যাঁহার বয়স তখন ছিল মাত্র নয় বৎসর) পরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাড়িতে বিধর্মীকে রাখা হইয়াছিল বলিয়া বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্‌চাইত। কিন্তু ব্যাগলি পরিবারের প্রতিপত্তি এমনিই ছিল যে, তাঁহারা এই সমস্ত সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া সমাজকে তাঁহাদেরই মতে চলিতে বাধ্য করিতে পারিতেন। স্বামীজী সেই গৃহে বাস করিয়া ঐ পরিবারের সামাজিক প্রতিপত্তির সুযোগে এমন অনেক জিজ্ঞাসুর সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, যাঁহারা অন্যথা পুরোহিতকুলের ভয়ে তাঁহার সহিত দেখাই করিতেন না। শ্রীযুক্তা ব্যাগলি অশেষ গুণের অধিকারিণী ছিলেন। নানা বিদ্বৎসমাজের তিনি সভ্যা ছিলেন, বহু ধর্ম-শিক্ষালয় তিনি পরিচালনা করিতেন, অনেক সেবা-প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে পুষ্ট হইত; এবং তাঁহার স্বামী যখন গবর্নর ছিলেন, তখন সর্বতোমুখী বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। চিকাগোর বিশ্বমেলায় তিনি অন্যতমা মহিলা ম্যানেজার ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই সূত্রেই স্বামীজীর সহিত পরিচিতা হইয়াছিলেন। ভ্রমণও করিয়াছিলেন তিনি প্রচুর এবং ইহার ফলে তিনি ছিলেন অতি উদার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স সম্ভবতঃ একষট্টি হইয়া গিয়াছিল।

স্বামীজীর আগমনের পূর্বে 'ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস' পত্রিকার ঘোষণার মধ্যে ছিল: "(বিশ্বমেলায় যেসকল হিন্দু প্রবক্তা আসিয়াছিলেন) তাঁহাদের অন্যতম সর্বজন-প্রিয় প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিব্‌কানন্দ। যিনি পূর্বে একজন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ[১] ছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে যোগদানের জন্য ঐ পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ সন্ন্যাসীদের প্রথম নিয়মই হইতেছে এই যে, অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইবার

১। আমেরিকানরা তখন এরূপ ভ্রম করিতেন। তাঁহাদের ভাষায় ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। স্বামীজী কখনও এভাবে আত্মপরিচয় দেন নাই।

জন্য ব্রাহ্মণোচিত বিশেষ অধিকারাদি বর্জন করিতে হইবে। মহাসভায় তিনি নিজেকে অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তারূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং কোনরূপ নোটের সাহায্য ব্যতীত বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন; তাঁহার উচ্চারণ এমনই মিষ্ট ছিল যে, অনেক শ্রোতার মতে তাঁহার কোন শব্দ বোধগম্য না হইলেও ঐ স্বরই সঙ্গীতরূপে উপভোগ্য হইত। মহাসভার পরে তিনি বহু নগর ও মহানগরের বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন; আর সেসব শ্রোতারা এই বিষয়ে সকলেই একমত এবং সকলেই এইজন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর যে, তাঁহার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে ও যে-কোন বিষয়েই তিনি আলোচনা করুন না কেন, তিনি ঐ বিষয়গুলিকে প্রাণবান ও আলোকোজ্জ্বল করিয়া তোলার একটা বিশেষ উপায় জানেন। কঠিন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য তাঁহারই মতো পৃথিবীর অপর গোলার্ধ হইতে আসিয়াছে বলিয়া স্বভাবতঃই আমেরিকাবাসীদের নিকট প্রেরণাপূর্ণ ও নবালোকপ্রদ। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কৃষ্ণকেশ-মণ্ডিত ও মর্যাদাসম্পন্ন এই ভদ্রলোকটি যখন হরিদ্রাবর্ণের বেশে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান হন এবং আমেরিকাবাসীদেরই ভাষায় পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ নিজ বক্তব্য বলিতে থাকেন, তখন সকলে এক আনন্দপূর্ণ বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়।" ঐ ঘোষণায় বলা হইয়াছিল—তিনি বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যায় ইউনিটে-রিয়ান চার্চে বক্তৃতা করিবেন।

স্বামীজীর অবস্থানকালের দ্বিতীয় দিনে (১৩ই ফেব্রুআরি) পূর্বোক্ত পত্রিকার প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "এমন এক নবীন মনুষ্যজাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাদের মধ্যে ঐহিক শক্তির সহিত আধ্যাত্মিক শক্তির মিশ্রণ ঘটিবে, যাহারা নিজ জীবনে সিংহবিক্রম ও মেষসুলভ নিরীহভাবের মিলন ঘটাইবে এবং পূর্ব ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সৃজন করিবে।" তিনি প্রকৃত ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বিভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে পৌছানো চলে এবং আমার পথ আমার প্রতীচ্য প্রতিবেশীর নিকট উপযোগী নাও হইতে পারে।…আমাদের চেষ্টার অপেক্ষা না রাখিয়াই হিন্দুধর্মের অনেক জিনিস দূর দূরান্তরে ছড়াইতেছে, আর এই সকলের বহিঃপ্রকাশরূপে পাই 'খ্রীষ্টান সায়েন্স', 'থিওসফি', এড্উইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এসিয়া'। খ্রীষ্টধর্ম…সোজা হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত। ক্যাথলিক ধর্মও তাহার সমস্ত রীতিনীতি আমাদের নিকট পাইয়াছে—যথা উহাদের পাপ-স্বীকারের

জন্য পুরোহিত-কক্ষ, মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাস ইত্যাদি।" ধর্মান্তরিতকরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে স্বামীজী অশোকের শিলালিপি হইতে পড়িয়া শুনাইলেন যে, সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে।

ডেট্রয়েটে স্বামীজী প্রথমবারে ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে ২৩শে ফেব্রুআরি এবং দ্বিতীয়বারে ৯ই মার্চ হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। এই সময়মধ্যে নিকটবর্তী নগরগুলিতে যেসব বক্তৃতা দেন তাহা ছাড়িয়া দিলে ডেট্রয়েটে মোট আটটি বক্তৃতা দেন। তা ছাড়া অনেক ঘরোয়া বৈঠকেও ভাষণ দেন। ভগিনী ক্রস্টিন তখন সেখানে থাকিতেন এবং স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ হইতে যে শক্তি নির্গত হইত তাহা এতই প্রবল ছিল যে, সকলে যেন উহার সংস্পর্শে আসিতে ভীতসন্ত্রস্ত হইত। এ যেন একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইত।" আমেরিকার মহাকবি সারা বার্ড-ফিল্ড (অথবা শ্রীযুক্তা চার্লস আরস্কিন স্কটউড) ডেট্রয়েটের এক উচ্চ বিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মার্গ্যেরাইট কুকের মুখে শুনিয়াছিলেন, স্বামীজীর এক বক্তৃতান্তে শ্রীমতী কুকের জীবনে সেই প্রথমবার অকস্মাৎ মনে হইল যে, তিনি বক্তাকে অভিনন্দন জানাইবেন। স্বামীজীর সহিত করমর্দন করিতে গিয়া তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। স্বামীজী কয়েক মিনিট তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন। ঐ সময়ের অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীমতী কুক বলিয়াছিলেন, "তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমার মনে এমন ছাপ পড়িয়াছিল যে, আমি তিন দিন ধরিয়া আমার হাত ধুইবার কথা ভাবিতেই পারিলাম না।" স্বামীজীর এই বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে মহানগরে শত্রু ও মিত্রের মধ্যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

প্রথমবারে ডেট্রয়েটে প্রদত্ত চরিটি বক্তৃতার যে বিবরণ 'ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, উহা স্বামীজীর ডেট্রয়েট-নিবাসিনী ভক্তমহিলা শ্রীযুক্তা মেরী সি. ফাঙ্কি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং উহা পরে স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে ছাপা হয়। এই বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে স্বামীজীর অন্যতমা ডেট্রয়েট-নিবাসী ভক্তমহিলা ভগিনী ক্রস্টিন লিখিয়াছিলেন, "এইসব শোনা ও অনুভব করা, অথচ ঠিক পূর্বেরই মতো অপরিববর্তিত থাকিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল কি ? শ্রোতার সমস্ত ধারণা অন্যরূপ হইয়া যাইত, আধ্যাত্মিকতার

বীজ উপ্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিত এবং সারা জীবন ধরিয়া বৃদ্ধিই পাইত যতক্ষণ না উহা ফলবান হয়।"

প্রথম বক্তৃতা হইয়াছিল ১৪ই ফেব্রুআরি, বুধবার, ইউনিটেরিয়ান চার্চে। শ্রীযুক্তা ফাঙ্কির মতে, "প্রকাণ্ড বাড়িটি আক্ষরিক অর্থে বোঝাই হইয়া গিয়াছিল এবং স্বামীজীকে তুমুল হর্ষধ্বনি সহ অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। এখনও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে, তিনি কেমন করিয়া মঞ্চে অধিরূঢ় হইলেন—যেন একটি নরপতিসদৃশ জমকাল মূর্তি—প্রাণবান, ওজোময় ও সর্বাধীশস্বরূপ। আর যেমনই প্রথম অপূর্ব শব্দটি উচ্চারিত হইল—যাহা ছিল সঙ্গীততুল্য, কখনও তারযন্ত্রের মৃদুগুঞ্জনপ্রায় এবং কখনও গম্ভীর, ঝঙ্কারময় ও সুদূরপ্রসারী—অমনি সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল, এমন এক নীরবতা বিরাজিত হইল যাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়, এবং সে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্বাস-প্রশ্বাস সমতালে বহিতে লাগিল।" বক্তৃতাটি ইংরেজী গ্রন্থাবলী অষ্টম ভাগে 'ভারত' নামে ছাপা হইলেও বস্তুতঃ বিষয়টি ছিল, 'ভারতীয় রীতিনীতি'। বিশপ নিণ্ডে স্বামীজীকে পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিধর্মীরা একদিন সত্যের আলোক দেখিতে পাইবে এবং মনে মনে ধরিয়া লইয়াছিলেন, স্বামীজী ঐ বিধর্মীদের সম্বন্ধে হয়তো এমন বর্ণনা দিবেন যাহা শ্রবণসুখকর ও কৌতুকজনক হইবে, আবার পরোক্ষভাবে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজন প্রমাণ করিবে। সম্ভবতঃ এইরূপ মুরুব্বীয়ানা দেখিয়া স্বামীজী খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বক্তব্য বিষয় 'ভারতের রীতিনীতি' অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিতে ভুলিলেন না: "নৈতিক বিষয়ে ভারতীয়েরা অপর সব জাতি অপেক্ষা অতি উচ্চে অবস্থিত।...এরূপ দেশে খ্রীষ্টান মিশনরীদের যাইয়া কতকগুলি ভাব ছড়াইবার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ হিন্দুর ধর্ম মানুষকে ভদ্র, বিনয়ী এবং ভগবৎসৃষ্ট অপর সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রীতিপূর্ণ করিয়া থাকে।...সে দেশে যাইয়া মিশনরীদের উচিত এই পবিত্র বারি পান করা এবং লক্ষ্য করা, কেমন করিয়া শত শত সাধু মহাত্মার জীবন একটা গোটা সমাজের উপর অতি মনোরম প্রভাব বিস্তার করিতেছে।"

বলা বাহুল্য সেদিন হইতেই সংবাদপত্র, বৈঠকখানা ইত্যাদিতে এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ ও বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ হইল। বিশপ নিণ্ডে খবরের কাগজের মারফতে জানাইলেন, তিনি সে সভায় ভ্রমক্রমে এবং অপরের প্ররোচনায় উপস্থিত

হইয়াছিলেন। নিণ্ডে ছিলেন গোঁড়া মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের অতি প্রতিপত্তিশালী ধর্মপ্রচারক। অতএব স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় বক্তৃতায় লোকসমাগম পূর্ববৎ হইলেও বহু সংবাদপত্রে ঐ বক্তৃতার বিবরণ বিশপের ভয়ে বিশেষ কিছুই প্রকাশিত হইল না। যেটুকু প্রকাশিত হইল, তাহাও বিদ্বেষপূর্ণ ও বিকৃত। তবে 'ডেট্রয়েট ট্রিবিউন' পত্রিকা অধিকতর নিরপেক্ষতা দেখাইয়া বক্তৃতার বিবরণ সংক্ষেপে হইলেও বন্ধুভাবেই প্রকাশ করিল। অবশ্য এই বক্তৃতাতেও পাশ্চাত্ত্য মনোভাবের প্রতি একটু কটাক্ষ ছিল, কিন্তু কটাক্ষের বিষয় ছিল প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম নহে, পরন্তু মিশনরীদের এই দাবি যে গোটা জগৎকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে, নতুবা মুক্তি তাহাদের পক্ষে অলভ্য। স্বামীজীর এই সব যুক্তিপূর্ণ কথার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া মিশনরীরা যেসব উদ্ভট যুক্তির অবতারণা করিলেন তাহাতেই বরং তাঁহাদের মুখোশ অধিকতর উন্মোচিত হইল; ঐ বিষয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা অপেক্ষা নিজেদের মূর্খতা ও অতীতের ভ্রমই তাঁহাদের বিপক্ষে অধিকতর কার্যকর হইল। আর যে পরমত-অসহিষ্ণুতার নিন্দা স্বামীজী করিতেছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমেরিকাবাসীরা পূর্ব হইতে ঘরে বসিয়াই পাইতেছিলেন; কারণ বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পরস্পর প্রকাশ্য বিরোধে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইতোমধ্যেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সকল কথা প্রকাশ করিতে গিয়া ও. পি. ডেলডক এই ছদ্মনামধারী এক সংবাদপত্রসেবী ১৭ই ফেব্রুআরির 'ফ্রী প্রেস' পত্রিকায় লিখিলেন, "বিশপ (নিণ্ডে) আরও বলেন, ভারতে যে নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিরাজিত, উহা 'হিন্দুসমাজের অন্তর্নিহিত নিজস্ব শক্তি হইতে উদ্ভূত হয় নাই। পরন্তু যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত বাণীর অপরোক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে হইয়াছে।' বিশপ যদি প্রাচীন ইতিহাস পড়িয়া থাকেন, (আর তাঁহার পড়াই উচিত), তবে অবশ্যই জানেন যে, ইহা মিথ্যা। বুদ্ধ, ব্রহ্ম, কনফুসাস ও অপর যাঁহারা নৈতিক সংস্কারে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মৌলিক নীতিকথা ও ধর্মমত খ্রীষ্টের আগমনের বহু পূর্বেই সুবিদিত ছিল। বহুযুগ পূর্বেই মানবভ্রাতৃত্ব এবং মানবের দেবোপমত্ব প্রচারিত হইয়াছে; বিশপ নিণ্ডে যদি প্রকৃত মিশনরীরূপে প্রাচ্যদেশে যাইতে চান, তবে শান্তি ও প্রেমের আনন্দময় বার্তা প্রকৃতভাবে প্রচার করিবার পূর্বে তাঁহাকে 'মানবের দেবত্ব' সম্বন্ধীয় তথ্যটি প্রধানতঃ শিখিয়া লইতে হইবে।" এই সময়ে আরও কয়েকখানি প্রতিবাদপত্রে স্বামীজীর সমর্থন করা হইয়াছিল।

তৎকালীন বৈদেশিক সমাজে আর একটা বড় ভ্রম এই ছিল যে, হিন্দু যোগীরা নানা প্রকার অলৌকিক অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটাইতে পারেন। হিন্দুধর্মকে প্রকৃত ধর্মরূপে গ্রহণ না করিয়া তখন অলৌকিকতার ভাণ্ডাররূপেই গ্রহণ করা হইত এবং প্রকৃত ধর্ম বলিতে খ্রীষ্টধর্মকেই বুঝাইত। স্বামীজীকে স্পষ্টভাষায় এই মনোভাব খণ্ডন করিতে হইয়াছিল এবং বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি স্বীয় মত প্রচারের জন্য অলৌকিকতার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

এইভাবে বাদ-প্রতিবাদের সাহায্যে ডেট্রয়েটের আবহাওয়া অনেকটা পরিষ্কার ও স্বামীজীর অনুকূল হইল। অতঃপর তিনি যখন ১৭ই ফেব্রুআরি তারিখে ইউনিটেরিয়ান চার্চে 'মানবের দেবত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, তখন অনেকগুলি সংবাদপত্রই তাঁহার মতবাদকে চাপিয়া রাখার বা প্রকাশ্যভাবে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রয়োজন বোধ করিল না। এই বক্তৃতার বিবরণ দিতে গিয়া ১৮ই তারিখের 'ফ্রী প্রেস' পত্রিকায় লেখা হইল: "(প্রাকৃতিক) আবহাওয়া প্রতিকূল হইলেও প্রাচ্য ভ্রাতার (ইনি এইভাবেই সম্বোধিত হইতে চান) আগমনের আধঘণ্টা পূর্বেই গির্জার দরজা পর্যন্ত লোকপরিপূর্ণ হইয়া গেল। সমুৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেণীর এবং সর্বব্যবসায়ের ব্যক্তিদেরই সমাবেশ হইয়াছিল; সেখানে ছিলেন উকিল, জজ, খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী, ইহুদী-ধর্মপ্রচারক; আর মহিলাদের তো কথাই নাই, কারণ ইঁহারা বারংবার বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিয়া এবং গভীর মনোযোগসহ উহা শ্রবণ করিয়া ইহাই জানাইয়া দিতেছিলেন যে, এই অশ্বেতাঙ্গ অতিথির প্রতি তাঁহারা তাঁহাদের প্রশংসা প্রকাশ করিতে সমুৎসুক। আর ইনি ঘরোয়া বৈঠকে যেমন প্রকাশ্য বক্তৃতায়ও তেমনি সমভাবে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। গতরাত্রের বক্তৃতাটি পূর্ব বক্তৃতাগুলির মতো তত বর্ণনাময় ছিল না; প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া বিব্ কানন্দ মানবীয় ও দৈব তথ্যাবলী লইয়া এমন একটি দার্শনিক পটচিত্র অঙ্কিত করিলেন এবং তাহা এমনই যুক্তিযুক্ত যে, তিনি বিজ্ঞানকেও সাধারণ ব্যাপারসদৃশ সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। যে পটখানি তিনি চিত্রিত করিলেন তাহা বড়ই মনোরম, উহাতে এত উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ ছিল এবং ভাবিতে ও দেখিতে তাহা এতই চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদ ছিল, যেন উহা তাঁহার স্বদেশের চিত্রিত একখানি বহুবর্ণরঞ্জিত গালিচা, আর প্রাচ্যদেশেরই মতো মনভুলানো সুবাস-বাসিত ছিল উহা। এই ময়লা রঙের ভদ্রলোকটি চিত্রকরের বর্ণ-প্রয়োগেরই মতো কাব্যিক অলঙ্কার

ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যেখানে যে রংটি দরকার ঠিক সেখানেই তাহা প্রয়োগ করেন। ফলে যে ছবি দাঁড়ায়, উহা হয়তো অনেকটা অদৃষ্টপূর্ব কিন্তু তবু বিশেষ চমকপ্রদ। যেসকল ন্যায়পূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি পরপর বলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা ছিল বিচিত্রবর্ণময় বস্তুর দ্রুত পরিবর্তনেরই মতো, আর যে কৌশলী ব্যক্তি উহাদের নাড়িতেছিলেন, তিনি প্রায়ই এই পরিশ্রমের জন্য আবেগপূর্ণ প্রশংসাধ্বনি পাইতেছিলেন।"

বক্তৃতার প্রারম্ভে স্বামীজী বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হইয়াছে, উহাদের উত্তর তিনি ঘরোয়া ভাবে দিবেন, শুধু তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ্য সভায় দিবেন। প্রশ্নগুলি এই: "ভারতের লোকেরা কি নিজের সন্তানকে কুমীরের মুখে ফেলিয়া দেয়?" "তাহারা কি জগন্নাথের রথের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করে?" "তাহারা কি স্বামীর সহিত স্ত্রীকেও পোড়াইয়া মারে?" প্রথম প্রশ্নটি তিনি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলেন; তবু অতি সরলপ্রাণ এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, ওরা শুধু মেয়ে সন্তানকেই ওভাবে কুমীরকে দেয় কেন?" স্বামীজী ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিলেন, "হয়তো জলজন্তুরা মেয়েগুলোকেই খেতে ভালবাসে, ওদের শরীর খুব কোমল কিনা!" জগন্নাথের রথ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "অতি উৎসাহী কেহ কেহ হয়তো ভিড়ের মধ্যে রথের দড়ি ধরিতে গিয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়া গিয়া দেহত্যাগ করে; আর এইসব আকস্মিক ঘটনাকেই ফাঁপাইয়া বড় বড় গল্প তৈয়ার করা হইয়াছে।" সতীদাহের প্রসঙ্গে "বিবকানন্দ অস্বীকার করেন যে, বিধবাদের পোড়ানো হয়; তবে এটা সত্য যে, সতীরা স্বেচ্ছায় চিতারোহণ করিতেন। অল্প যেসব ক্ষেত্রে সতীদাহ হইত, সেখানেও প্রথমে সতীকে নিরস্ত করা হইত; এবং তখনও তিনি আগ্রহ দেখাইলে তাঁহাকে আগুনে হাত দিয়া পরীক্ষা দিতে হইত, তিনি অগ্নিদাহ সহ্য করিতে পারিবেন কি না। এ জাতীয় ধর্মান্ধতা সব দেশেই আছে যদিও অতি বিরল।" স্বামীজী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "না, ভারতের লোকেরা মেয়েদের পোড়াইয়া মারে না; (মধ্যযুগের পাশ্চাত্যদের মতো) তাহারা কোন দিনই ডাইনীদেরও পোড়ায় নাই।"

মূলবক্তৃতাকালে তিনি আত্মার স্বরূপ, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ, সর্বধর্মের সত্যতা, বিভিন্ন স্বভাবানুযায়ী বিবিধ ধর্মের প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন। খ্রীষ্টান-জগতে 'গোল্ডেন রুল'-এর (সুবর্ণময়-

নীতির) কথা বলা হয় : নিজের প্রতি যেমন ব্যবহার পাইতে চাও, পরের প্রতি তেমনি ব্যবহার করিও। "কিন্তু বিব্ কানন্দ বলিলেন, এই সুবর্ণময়ী নীতিও কত কুৎসিত! সব সময়েই স্বার্থচিন্তা। খ্রীষ্টান ধর্মটাই যেন স্বার্থময়! নিজের প্রতি যেমন ব্যবহার আশা কর, তেমনি ব্যবহার পরের প্রতি করিবে—এতো অতি জঘন্য বর্বরোচিত কথা। এই নীতি না মানিয়া হিন্দুরা বলে সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগই উত্তম ধর্ম, সমস্ত স্বার্থচিন্তাই মন্দ। হিন্দুধর্ম দেখাইয়া দেয়, সর্বদা ক্ষুদ্র আমিকে ধরিয়া থাকা ঠিক নহে, স্বার্থত্যাগের ফলে মানুষ অসীমতা প্রাপ্ত হয়।"

স্বামীজীর এই তিনটি বক্তৃতা—'ভারতের রীতিনীতি', 'হিন্দুধর্ম', 'মানবের দেবত্ব'—সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া ১৮ই ফেব্রুআরির 'ডেট্রয়েট ট্রিবিউন' লিখিল, "ইহা অতি সুলক্ষণ যে, খ্রীষ্টানরা স্বধর্ম ব্যতীত অপর ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা চলে তাহা শুনিতে ইচ্ছুক। ইহা এই যুগধারার একটা আশাপ্রদ লক্ষণ যে, স্বনামধন্য খ্রীষ্টানও বিশ্রুতকীর্তি হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তিনি যাহা দিতে চাহেন তাহা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। চিকাগোর ধর্মমহাসভা ধর্মনিষ্ঠার রাজ্যে এক নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে বলা চলে।" অবশ্য ইহা উদার-পন্থী খ্রীষ্টানদের মত। উগ্রপন্থী খ্রীষ্টানরা ইহাতে আনন্দিত না হইয়া দুশ্চিন্তা-গ্রস্তই হইয়াছিলেন, আর মিশনরীদের তো কথাই নাই। এই মহলে সক্রিয় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে দুই-চারিদিন বিলম্ব হইয়াছিল, কারণ গোঁড়ারা বক্তৃতায় আসেন নাই এবং তাঁহাদের মতবাদী সংবাদপত্রে বিকৃত বিবরণ বাহির হইতে একসপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছিল। ইতোমধ্যে স্বামীজী অন্যত্র চলিয়া গেলেও তাঁহার পক্ষের সংবাদপত্র ও গির্জা প্রভৃতিতে তাঁহার প্রচারিত মতের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠিতে থাকিল। ১৮ই তারিখ রবিবারে ইউনিটেরিয়ান চার্চে শ্রদ্ধেয় রিড স্টুয়ার্টের বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'প্রাচ্যাভিমুখে উন্মুচ্যমান কপাট' আর র‍্যাবাই গ্রোসম্যানের 'টেম্পল বেথএল'-এ আলোচ্য বিষয় ছিল, 'বিব্ কানন্দ আমাদের কি শিখালেন।' ২০শে তারিখেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 'ইভনিং নিউজ' এভাবে 'প্রাচ্যের দিকে আলোকের অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকা' বরদাস্ত করিতে পারিল না এবং পরিষ্কার জানাইয়া দিল, বিবেকানন্দ ডেট্রয়েটবাসীকে এমন কোন কথা শুনাইয়া যান নাই, যাহা স্বর্গ বা মর্ত্য সম্বন্ধে নূতন, যদিও তাঁহার অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও শালীনতার মোহে পড়িয়া অনেকে বাজে বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শনিবারের শেষ বক্তৃতা—'মানবের দেবত্ব'—সম্বন্ধে পরবর্তী রবিবারেই কিছু বলিবার সুযোগ না পাইলেও বিরুদ্ধ পক্ষের ধর্মযাজকগণ পূর্ববর্তী দুইটি ভাষণ অবলম্বনে যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করিতে পারিয়াছিলেন, যাহার প্রতিবাদকল্পে 'জাস্টিসিয়া' ছদ্মনামে একজন ২৩শে ফেব্রুআরির 'ফ্রী প্রেস' পত্রিকায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, "এই সকল সমালোচনা বৃথা, কারণ বিব্‌কানন্দ যীশুখ্রীষ্ট বা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন, এইরূপ বলা নিছক কল্পনা। তিনি শুধু তথা-কথিত খ্রীষ্টধর্মের যেসকল বহিঃপ্রকাশের ফলে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস, পুরোহিত-প্রচারিত মতবাদ, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির দ্বারা আমাদের ধর্ম অবনতিপ্রাপ্ত হয় এবং অসততা, নিষ্ঠুরতা, পরমতে অসহিষ্ণুতা এবং নিরাবরণ স্বার্থপরতায় আমাদের সামাজিক জীবন ও ব্যবসায়ক্ষেত্র কলুষিত হয়, তিনি তাহারই নিন্দা করিয়াছিলেন।" ঐ লেখিকার প্রবন্ধে আরও প্রকাশ, "এই নগরে প্রায় প্রতি ডাকে বহু অপমানজনক পত্রে তাঁহার উপর আক্রমণ চালানো হইয়াছে।··· আমাদের আইন এবং রীতিনীতি না জানায় বক্তৃতার আয়োজনাদি বিষয়েও তাঁহাকে ঠকাইয়া এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে অপরকে পরাজিত করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের পক্ষে যাহা কিছু করা সম্ভব তাহা করা হইয়াছে। আমাদের অনেক গোঁড়া ধর্মমন্দিরের বেদী হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে অতি অসভ্যোচিত ভাষায় প্রচার করা হইয়াছে। আবার এইরূপ করিয়াছেন সেইসব ধর্মযাজকেরা যাঁহারা সংবাদপত্রের বিবরণ ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কিছুই জানেন না, আর আমার মতে সে সমস্ত বিবরণ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমোৎপাদক। এইসব লোক প্রথমে তাঁহার স্বমুখের কথা না শুনিয়া তাঁহার সমালোচনা করিতে সাহস পায় কি করিয়া? 'নিজের দোষত্রুটির সমালোচনা হইতে বাঁচিতে চাও তো অপরের সমালোচনা করিও না।'···'(হে ভগবান), আমাদিগকে আরও বেশী কানন্দ আনিয়া দাও, কম নহে, যাহাতে অপরে যে চক্ষে আমাদের দেখে, তাহা আমরা জানিতে পারি'—এই আমার মত।" এই বিবাদ-বিসংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে সারা ফেব্রুআরি মাস ধরিয়াই চলিয়াছিল এবং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, 'নীল-নাসিক', 'শক্ত-খোলস' ও 'নরম খোলস' গোঁড়াদিগকে তিনি যেমন একদিকে খেপাইয়া তুলিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার বন্ধুও জুটিয়াছিল অনেক। তাঁহার বক্তৃতা ও বৈঠকে তো অনেকে আসিতেনই, অনেকে আবার স্বগৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া 'চা,

মধ্যাহ্নভোজন বা নৈশভোজনে আপ্যায়িত করিতেন এবং ঐ সঙ্গে বহু গুণগ্রাহীও আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেন। 'ডেট্রয়েট জার্নালে' লিখিত হইয়াছিল, "সমাজে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিব্ কানন্দের সম্মানার্থ গত সপ্তাহে বহু আধুনিক রুচিসম্মত ঘরোয়া প্রীতিসংবর্ধনার আয়োজন হইয়াছিল।...এইসব সংবর্ধনাই খুব জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।" এইরূপ এক বৈঠকের সংবাদ হইতে জানা যায় বিভিন্ন প্রশ্নকর্তাদের জিজ্ঞাসা অনুসারে স্বামীজী তাঁহাদের পাঠ্য রসায়নশাস্ত্রের ও নক্ষত্রবিদ্যার গ্রন্থাবলীর এক তালিকা মুখে মুখে বলিয়া দিয়াছিলেন, যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধেও অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন। অবশেষে জনৈকা চতুরা মহিলা কৌশলক্রমে ভারতে ইংরেজ-শাসন ও সিপাহীযুদ্ধের কথা তুলিয়া স্বামীজীকে উত্তেজিত করিলেন এবং তিনিও যখন ভাবাবেগে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তখন মহিলাটি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমি ভেবেইছিলাম, আমি আপনার দার্শনিকতাপূর্ণ প্রাচ্য গাম্ভীর্য ভেঙ্গে দিতে পারি।" সত্যই স্বামীজী তাঁহার সাধের ভারতজননীর কথায় মাতিয়া উঠিতেন, আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিতেন। ভারতের উন্নতিকল্পে অর্থসংগ্রহের ইচ্ছা তখনও তাঁহার মনে ছিল এবং আমেরিকা হইতে ভারত কি শিখিতে পারে তাহা আবিষ্কার করিতেও তিনি সতত উদ্গ্রীব ছিলেন। 'ডেট্রয়েট ট্রিবিউন'-এ ১৮ই ফেব্রুআরি স্বামীজীর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহার সার এই :

"তিনি স্বীকার করেন যে, ভারতের জনতা অতি দরিদ্র, অতি অশিক্ষিত এবং এমন সব সম্প্রদায়ে বিভক্ত যাহার সাধনপ্রণালী অতি নিম্নস্তরের প্রতিমাপূজা হইতে মানবভ্রাতৃত্ব ও ভগবানের একত্বরূপ সত্যের অতি উদার ও সর্বপ্রসারী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ব্রত আমাদিগকে ধর্মান্তরিত করা বা স্বমতে আনয়ন করা নহে, প্রত্যুত অর্থ সংগ্রহ করিয়া এমন একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা, যেখানে শিক্ষকগণ শিক্ষিত হইয়া সাধারণ লোকের নিকট যাইবেন এবং বর্তমানে যেসকল দোষ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সেগুলির সংশোধন করিবেন। তিনি বলেন, ভারতে পুরোহিত-প্রাধান্য মারাত্মকরূপে বিদ্যমান, পৌরোহিত্যই সত্যকে বিকৃত করিয়া অজ্ঞতাকে চিরস্থায়ী করে।...তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেও মঙ্গল দেখিতে পান।...তিনি অকপটভাবে স্বীকার করেন যে, পাশ্চাত্ত্যবাসী আমরাও পৌরোহিত্যের আধিক্যবশতঃ প্রগতির পথে প্রতিহত হইতেছি : এবং

আমরাও মূর্তিপূজামূলক উপাসনাপদ্ধতি হইতে মুক্ত নহি।···স্বামীজী এই দেশে দুইটি উল্লেখযোগ্য বস্তু লক্ষ্য করিয়াছেন—প্রথমতঃ সামাজিক মর্যাদা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের নারীদের প্রতিপত্তি। দ্বিতীয়তঃ দরিদ্রের প্রতি আমাদের দানব্যবস্থায় এবং ব্যবহারে যে রীতি অবলম্বিত হয়, তাহাতে উহাদের সমস্যার প্রায় সমাধান হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। শুধু ইহাই নহে;··· আমাদের পরিশ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রপাতিও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের ইহলৌকিক সভ্যতায় তিনি মোটেই মুগ্ধ নহেন, কারণ ইহাতে মানুষকে উৎকৃষ্টতর করে না।" অতঃপর লেখক মিশনরীদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর সমালোচনার উল্লেখ করিয়া উহার যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন।

স্বামীজীর সঙ্কল্প ছিল, তিনটি বক্তৃতা দিয়াই ডেট্রয়েট ত্যাগ করিবেন। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে ২০শে ফেব্রুআরি, মঙ্গলবারে ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে ইউনিটেরিয়ান চার্চে আর একটি বক্তৃতা দিতে হইল। এই বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা সর্বাধিক হইয়াছিল। এখানে অন্যান্য কথার মধ্যে স্বামীজী ইহাও বলিয়াছিলেন যে, প্রেম শুধু দান করে, কখনও স্বার্থচিন্তা করে না। ঈশ্বরকে শাসকরূপে বা পিতৃরূপে ভাবা চলে; কিন্তু ইহাতেও ভয়স্পর্শ থাকে। ভারতে ভগবানকে স্নেহময়ী মাতারূপে ভাবা হয়।

স্বামীজী ২১শে ফেব্রুআরি সকালে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু এবারেও যাত্রা স্থগিত হইল। তিনি সে অপরাহ্ণে শ্রীযুক্তা ব্যাগলির গৃহে যে বক্তৃতা দিলেন উহার সারাংশ স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ডে 'হিন্দুগণ ও খ্রীষ্টানগণ' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের মতে এই বক্তৃতাটি ছিল সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, শ্রোতাও ছিলেন অজস্র, আর স্বামীজী দুই ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা ব্যাগলির মতে এই ভাষণের বক্তব্য বিষয় ছিল, 'প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাঁহাদের শিক্ষা'। এই বক্তৃতাতেই স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "যখনই আপনাদের ধর্মযাজকেরা আমাদের সমালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের একথা যেন মনে থাকে—যদি গোটা ভারত উঠিয়া দাঁড়ায় এবং ভারত মহাসাগরের নীচে যত কাদা আছে সব তুলিয়া লইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির দিকে ছুঁড়িয়া মারে, তাহা হইলেও আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যাহা করিতেছেন, তাহার অতি সামান্য প্রতিশোধও হইবে না।" আমেরিকায় ভারতনিন্দা তখন এতই প্রবল ছিল!

২৩শে ফেব্রুআরি, শুক্রবার সকালে তিনি ডেট্রয়েট হইতে ওহিয়ো প্রদেশের আডা নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সেই সন্ধ্যায়ই সেখানে 'মানবের দেবত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। আডা ক্ষুদ্র শহর; সেখানে তিনি অধিক দিন ছিলেন, অথবা একাধিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ দুই-এক দিন থাকিয়াই চিকাগোর হেল পরিবারের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্বামীজী ডেট্রয়েট ত্যাগ করিলেও ডেট্রয়েট স্বামীজীকে ত্যাগ করিতে পারিল না। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব মহানগরীর উপর এতই প্রচণ্ড ছিল যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালেও শত্রু ও মিত্রভাবে তাঁহাকে লইয়া এক প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকিল। পর পর পাঁচটি উত্তম বক্তৃতা ও বহু ঘরোয়া বৈঠকে বাক্যালাপ এবং বিশিষ্ট গৃহে আপ্যায়িত হওয়া প্রভৃতি অবলম্বনে যে জনপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, মিশনরীরা তাহা সহজে হজম করিতে পারিবেন কেন? বিশেষতঃ স্বামীজী দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কোন ধর্মকেই অন্য ধর্ম অপেক্ষা বড় বলা চলে না, ভারত ধর্ম ও নৈতিকতায় অধঃপতিত ও কুসংস্কারের জন্মভূমি—ইহাও মিশনরীদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য কল্পিত চিত্র, আর স্বদেশে ও বিদেশে খ্রীষ্ট-ধর্মের নামে যে আচার বিচার ও সাম্প্রদায়িকতার অনুসরণ করা হয়, তাহাকে ধর্ম না বলিয়া ধর্মধ্বজিতা বলাই উচিত। এই কথাগুলি এত সত্য অথচ মিশনরীদের আত্মপ্রসারের এতই বিরোধী যে, তাঁহারা স্বামীজীর বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। ২৬শে ফেব্রুআরির 'ডেট্রয়েট জার্নাল' ইহা দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিল, "হিন্দু সন্ন্যাসী বিব্‌কানন্দ অন্ততঃ এইটুকু মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন যে, গতকল্য কমপক্ষে দ্বাদশ জন বা ততোধিক ধর্মযাজক তাঁহার নাম ও মন্তব্য অবলম্বনে স্বীয় বক্তৃতার বিষয় স্থির করিতে পারিয়াছিলেন।" ইঁহাদের কেহ সোজা, কেহ বা বক্রভাবে আক্রমণ করিলেন, কেহ কেহ গালা-গালিরও আশ্রয় লইলেন। 'জার্নালের' ভাষায় "কেহ কেহ কানন্দকে কোমর বা উরুতেও আঘাত করিলেন।" স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান, আমাদিগকে আমাদের দৈনিক রুটি দাও"—এ জাতীয় প্রার্থনা স্বার্থপ্রণোদিত। মিশনরী প্রচারক প্রতিবাদকল্পে বুঝাইয়া দিলেন, "হিন্দুরা প্রার্থনাই করে না, কারণ তাহাদের নির্গুণ ব্রহ্মের কানই নাই।" স্বামীজী তখন খ্রীষ্টান মিশনরীদের নিকট এক অবশ্যপরিত্যাজ্য মারাত্মক প্রাণিবিশেষ। অনেক পরে স্বামীজী সব

দেখিয়া শুনিয়া নিজেই লিখিয়াছিলেন : "এই দেশের গোঁড়া-সম্প্রদায় আত্মরক্ষার পথ খুঁজিতেছে—তাহারা আমার বিষয়ে অতিমাত্র সন্ত্রস্ত এবং বলিতেছে, 'কি মারাত্মক প্রাণীরে বাবা! হাজার হাজার নরনারী তাকে মানে! সে গোঁড়ামির উচ্ছেদ করে ছাড়বে'!"

এই মারাত্মক প্রাণীটির উচ্ছেদসাধনে ডেট্রয়েটের ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায় ৫ই মার্চ একটি জনসভার আহ্বান করিল এবং তাহাতে অন্যতম বক্তা ডাঃ ডব্লিউ. ই. বগ্‌স বলিলেন, "জগতের মধ্যে ভারত সর্বাধিক পৌত্তলিক দেশ।...ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচার ততটাই সুসমঞ্জস যতটা নাকি জাপানীদের পক্ষে গর্ব করা শোভা পায় যে, সতীত্ব ও নৈতিক পবিত্রতা জাপানীদের একটা বিশেষ গুণ।... ভারতে খ্রীষ্টান মিশন প্রেরণের প্রয়োজন বিষয়ে কোন দিনই অত্যুক্তি করা হয় নাই, হইতেও পারে না ; আর আজই হইতেছে উহার সর্বাধিক প্রয়োজন।" বগ্‌স ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ছিলেন ; অতএব শ্রোতাদের নিকট তাঁহার বার্তা ছিল প্রামাণিক! ৭ই মার্চ আর একটি মিশনরী সোসাইটির সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন, মাননীয় ডাঃ ম্যাকওয়েল, যিনি ভারতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারান্তে স্বদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। আমেরিকায় সেদিন পর্যন্ত ভারত-সম্বন্ধে যত অপপ্রচার হইয়াছিল, তাহার সবই তিনি মুক্তকণ্ঠে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন, অধিকন্তু অনেক অপরূপ নবীন তথ্য ও মুখরোচক কাহিনী পরিবেশন করিতেও ভুলিলেন না। অবশ্য এই সকল বাগাড়ম্বরের পশ্চাতে তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বামীজীর অনুরাগীরাও তাঁহার বাণীর সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; তাই এই সকল হীন আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তীব্র আপত্তি জানাইতে লাগিলেন। ১৫ই মার্চের 'ডেট্রয়েট জার্নালে' এই ম্যাকওয়েল-ভাষণের প্রতিবাদ-কল্পে অন্যান্য কথার মধ্যে একব্যক্তি লিখিলেন, "একজন বিধর্মীকে খ্রীষ্টধর্মে আনিতে গড়ে পঁচিশ হাজার হইতে বিশ হাজার ডলার খরচ পড়ে। এই ব্যয় অত্যধিক এবং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে, এই অর্থ সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হয়।...ভারত যেমন মদ চায় নাই, চীনও তেমনি আফিং চায় নাই ; তবু (খ্রীষ্টান) ইংলণ্ড কামান দাগিয়া চীনদেশে আফিং-এর ব্যবসা চালাইল, আর ব্যবসায়ীদের সাহায্যে ভারতে মদ প্রচলিত করিল। ইংলণ্ডে মিশনরী

প্রচারকের প্রচুর প্রয়োজন এবং বৈদেশিক মিশনরী সোসাইটি যেন ইংলণ্ডের কথা ভুলিয়া না যায়।"

ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাপূর্বকই হউক স্বামীজীর ডেট্রয়েট পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত ঐ নগরে 'ছাত্র স্বেচ্ছা-সেবক মিশনরী আন্দোলন'-এর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হইল। উহাতে ১১৮৭ জন প্রতিনিধি ও অপর অনেক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। চিকাগো-মহাসভার প্রতিবাদকল্পে ইহা আহূত হইয়াছিল কিনা জানা নাই; কিন্তু ইহা যে বিবেকানন্দ-বিরোধী ছিল তাহা 'খ্রীষ্টান অ্যাডভোকেট' পত্রিকার মন্তব্যেই সুস্পষ্ট: "এই অধিবেশনটি বিব্‌কানন্দ ও তাঁহার বক্তৃতাবলীর কি অপূর্ব প্রতিষেধক! ইহা ঠিক সময়েই বসিয়াছিল। বিব্‌কানন্দ মুখরোচক মিথ্যা তর্কজালের মোহ সৃজন করিয়াছিলেন, কিন্তু যেসকল বীর বিধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এ যাবৎ যুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও জীবন্ত 'অভিজ্ঞতার সম্মুখে তাহা কুজ্ঝটিকাবৎ' উড়িয়া গেল। কানন্দ বিদায়!"

বিবেকানন্দ যখন ডেট্রয়েট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন ফিরিবার চিন্তামাত্র তাঁহার মনে ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুই সপ্তাহ পরে ৯ই মার্চ তিনি পুনর্বার সেখানে উপস্থিত হইলেন। মিশনরীদের অশোভন আস্ফালনের সহিত স্বামীজীর পুনরাগমনের একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। হয়তো তাঁহার বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন তিনি আসিয়া ইহার সমুচিত উত্তর দিলে মিশনরীরা নীরব হইবেন। 'ডেট্রয়েট জার্নাল'-এর ৯ই মার্চের মন্তব্যটি এই ধারণারই অনুকূল। উহাতে আছে: "হিন্দু সন্ন্যাসী বিব্‌কানন্দ চিকাগো হইতে আজ রাত্রে ডেট্রয়েটে ফিরিবেন এবং হয় শ্রীযুক্ত জন জে. ব্যাগলি অথবা মাননীয় টি. ডব্লিউ. পামারের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। পরবর্তী রবিবারে (১১ই মার্চ) কানন্দ 'ডেট্রয়েট অপেরা হাউস'-এ 'ভারতে খ্রীষ্টীয় মিশন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন; এখানে গত সপ্তাহে যে ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকদের অধিবেশন বসিয়াছিল, উহারই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পরিকল্পিত হইয়াছে।" ইংরেজী গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ডে এই বক্তৃতাটির কিয়দংশ 'ভারতে খ্রীষ্টধর্ম' নামে ছাপা হইয়াছে। প্রায় একসহস্র শ্রোতা আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী এই ভাষণটি শ্রদ্ধাসহকারে শুনিয়াছিলেন। 'ডেট্রয়েট ট্রিবিউনে' বক্তৃতার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রথমেই বলা হয়: গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলিয়া-

ছিল, ইহা তাহারই প্রত্যুত্তর। স্বামীজী প্রথমে ভারতের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করেন, পরে স্পেন ও পর্তুগাল হইতে আগত খ্রীষ্টানদের ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর ইংরেজ মিশনরীরা আসিলেন; কিন্তু ভারতীয়দের সহিত না মিলিয়া স্বীয় আভিজাত্য রক্ষায় ব্যস্ত রহিলেন এবং গরীবের অন্নবস্ত্রহীনতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, অধিকাংশ মিশনরীরা ভারতীয় শাস্ত্রের সহিত অপরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, বা স্বকার্যের অনুপযুক্ত। তিনি প্রকৃত ধার্মিক মিশনরীর বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তেমন স্বার্থহীন ধার্মিক মিশনরী কোথায়? উহারা তো জীবিকা অর্জনের জন্য ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়। আর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিগুলির কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহারা পৃথিবীতে রক্তনদী প্রবাহিত করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সকল ধর্মই মূলতঃ সত্য। অতএব মিশনরীরা যেন কোন জাতীয় গর্ব, কোন সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার না রাখেন। কারণ ভগবানের সন্তানদের আবার সম্প্রদায় হইবে কিরূপে?

এই বক্তৃতা দিয়া স্বামীজী নিজেও বেশ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। পরদিন হেল ভগিনীদিগকে তিনি পত্রে জানাইলেন, "আমি এখন মিঃ পামারের অতিথি। ইনি বড় চমৎকার লোক। পরশু রাত্রে ভোজ দিলেন এঁর একদল প্রাচীন বন্ধুকে; তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের উপর। দলটিকে ইনি বলেন, 'পুরানো বন্ধুদের আড্ডা'। এক নাট্যশালায় বক্তৃতা দিলাম আড়াই ঘণ্টা। সকলেই খুব খুশী।...এযাবৎ যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছি, তার মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে ভাল। শুনে মিঃ পামার তো আনন্দে আত্মহারা। আর শ্রোতারা এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান যে, বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পর তবে আমি জানতে পারলাম—এত দীর্ঘকাল ধরে বলেছি। শ্রোতার অমনোযোগ বা চাঞ্চল্য বক্তার অগোচর থাকে না।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৪০৩)।

স্বামীজীর পরবর্তী বক্তৃতা হয় ১৯শে মার্চ, সোমবার, অডিটরিয়াম-এ। বিষয় ছিল: বৌদ্ধধর্ম। ইহাতে তিনি ভারতের প্রাচীন ধর্মেতিহাসের কথা তুলিয়া বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এই বক্তৃতার পরই তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন; কারণ ২০শে মার্চ বে-সিটিতে ও ২২শে মার্চ স্যাগিনোতে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। এই উভয় নগরই মিশিগান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ডেট্রয়েটের বন্ধুদের

আগ্রহে তিনি ঐ দুই বক্তৃতান্তে পুনর্বার সেখানে ফিরিয়া আসেন এবং ২৪শে মার্চ শনিবার, ইউনিটেরিয়ান চার্চে 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন: "ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক আদর্শ অতি উচ্চ। বিভিন্ন দেশের নারীসমাজকে নিজ নিজ আদর্শানুযায়ী বিচার করা কর্তব্য। প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে প্রাচ্যের নারীর পরীক্ষা করা চলে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে নারীর মর্যাদা স্ত্রীরূপে, কিন্তু পূর্বদেশে তাহার মর্যাদা মাতৃরূপে স্বীকৃত হয়। ভারতে সতীত্বের সম্মান সর্বাধিক। নারীর দেহাবলম্বনে জগন্মাতাই আত্মপ্রকাশ করেন।"

এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতা ছাড়া ঘরোয়া বৈঠকে স্বামীজী পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন। আর বক্তৃতা অপেক্ষা এইসব ব্যক্তিগত বার্তালাপের ফলই হইয়াছিল অধিক। ভারতীয় নারী সম্বন্ধে এইরূপ একটি আলোচনার দীর্ঘ বিবরণ ১লা এপ্রিলের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকারই ১৭ই মার্চের আর একটি বিবরণ হইতে জানা যায় যে, জনৈক প্রশ্নকর্তা ভারতীয় পতিতা নারীদের সম্বন্ধে রাডিয়ার্ড কিপ্লিং-এর মতামত উল্লেখ করিলে স্বামীজী সরলভাবে ভারতীয় অবস্থা বুঝাইয়া দেন এবং দেখাইয়া দেন যে, পতিতাবৃত্তি মানবসমাজের একটা কঠিন সমস্যা; এইজন্য শুধু ভারতকে টিটকারি দেওয়া বৃথা।

ভারতীয় নারী সম্বন্ধে বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই তিনি ডেট্রয়েট ত্যাগ করেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আর সেখানে ফিরেন নাই। ঐ বৎসরের প্রথম ভাগে ডেট্রয়েটে আসিয়া তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং বক্তৃতা ও ক্লাস পরিচালনা করেন। ঐ কালের অবস্থিতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি ('দেববাণী', ৩১-৩৪) লিখিয়াছিলেন: "তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সাংকেতিক লেখক ও তাঁহার সুবিশ্বস্ত গুডউইন। বিভিন্ন পরিবারের বাসের জন্য সেখানে যে ক্ষুদ্র রিশিলিউ হোটেলটি আছে, উহারই এক কক্ষে তাঁহারা থাকিতেন এবং ক্লাস ও বক্তৃতার জন্য বৃহৎ বৈঠকখানাটি ব্যবহার করিতে পারিতেন। ভিড় যেরূপ হইত তাহার তুলনায় ঐ ঘরটি তেমন বড় ছিল না; তাই আমাদের দেখিয়া দুঃখ হইত যে, অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। ঘরখানি, হলঘর ও সিঁড়িঘর—সব লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। সে সময় তিনি শুধু ভক্তিতেই পূর্ণ থাকিতেন—ভগবৎপ্রেমের জন্য তিনি ছিলেন বুভুক্ষিত ও পিপাসিত। তিনি যেন একটা

ভগবদুন্মাদনায় আত্মহারা হইয়াছিলেন—যেন স্নেহময়ী জগজ্জননীর জন্য ব্যাকুলতায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। সর্বসাধারণসমক্ষে তাঁহার শেষ বক্তৃতা হইয়াছিল 'টেম্পল বেথ এল'-এ। উহার ধর্মযাজক ছিলেন র‍্যাবাই লুই গ্রোসম্যান; তিনি ছিলেন স্বামীজীর অতি একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী। সেদিন ছিল রবিবার এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমরা একটা কিছু দুর্ঘটনার ভাবনায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। গায়ে গায়ে ঠাসা লোকের সারি রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আর কত শত জনকে যে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল! বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। (ঐ গির্জায় প্রদত্ত) তাঁহার বক্তৃতাদ্বয়ের বিষয় ছিল: 'পাশ্চাত্ত্যের নিকট ভারতের বাণী' ও 'বিশ্বধর্মের আদর্শ'। তাঁহার মুখে আমরা এক অতি মনোরম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শুনিলাম। আচার্যদেবকে সে রাত্রে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তেমনটি আর কখনও দেখি নাই। তাঁহার সে সৌন্দর্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ জগতের নহে।"

শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লেখা গুডউইনের পত্র (৫ই মার্চ, ১৮৯৬) হইতে জানা যায় যে ৪ঠা মার্চ সকালে ও সন্ধ্যায় 'বিশ্বধর্মের আদর্শ' সম্বন্ধে স্বামীজী দুইবার বক্তৃতা করেন। গুডউইনের ১১ই মার্চের পত্রে আছে "১৫ই মার্চ স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'পাশ্চাত্ত্যের নিকট ভারতের বাণী'।"

শ্রীযুক্তা ব্যাগলির বাড়িতে না উঠিয়া স্বামীজী সেবারে কেন হোটেলে উঠিলেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু তখন শ্রীযুক্তা ব্যাগলির একটি কন্যা যক্ষ্মা রোগ হইতে সারিয়া উঠিতেছিলেন বলিয়া তিনি কন্যাসহ কোলোরেডোতে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিতেছিলেন। ইহারও দুই বৎসর পরে তিনি অকস্মাৎ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি ডেট্রয়েটে থাকিলে স্বামীজীকে কখনই বাহিরে বাস করিতে দিতেন না। যাক, কথায় কথায় আমরা বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। ইহার কারণ এই যে, একই স্থলে ডেট্রয়েট-পর্ব শেষ করা সুবিধাজনক। আর এই বিবরণ হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৬-এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত পূর্ণ দুই বৎসরকাল অতীত হইলেও ডেট্রয়েটে স্বামীজীর প্রভাব ম্লান না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কথাটা মনে রাখার মতো, কারণ পরে আমরা যে অপ্রিয় বিষয়গুলির আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি, তাহার মূল্যায়নের পক্ষে এই দীর্ঘকালব্যাপী অটুট জনপ্রিয়তা একটা বিশেষ

প্রামাণিক বস্তু। সে আলোচনায় আসার পূর্বে ১৮৯৪-এর আরও দুই-একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক।

অত্যুচ্চ সম্মান ও সাফল্যের মধ্যেও স্বামীজীর বৈরাগ্য কিরূপ আত্মপ্রকাশ করিত, তাহার পরিচয় ঐ কালের একখানি পত্রে পাই। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তিনি লিখিয়াছিলেন, "মিঃ হলডেন আজ প্রাতে খুব বোঝাচ্ছিলেন আমাকে—মিশিগানে বক্তৃতা দেবার জন্য। আমার কিন্তু এখন বস্টন ও নিউ ইয়র্ক একটু ঘুরে দেখবার আগ্রহ। সত্য কথা বলতে কি, যতই আমি জনপ্রিয় হচ্ছি এবং আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষ হচ্ছে, ততই আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।…এসব বাজে জিনিস থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন—আর এসব ভাল লাগে না। ঈশ্বর করেন তো বস্টন বা নিউ ইয়র্কে বিশ্রামের অভিপ্রায়।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৪০৩)। এই হলডেন ব্যক্তিটি কে জানা নাই, হয়তো কোনও বক্তৃতা-কোম্পানীর কেহ হইবেন। কারণ আমরা জানি যে, ঠিক এই সময়েই স্বামীজী মিঃ পামার ও অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী ডেট্রয়েটবাসী বন্ধুদের সাহায্যে বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। ১৫ই মার্চের পত্রে আছে, "প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে বন্দোবস্ত ঠিক হয়নি। হলের ভাড়াই লেগেছিল একশো পঞ্চাশ ডলার। হলডেনকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্য একজন জুটেছে; দেখি এর ব্যবস্থা ভাল হয় কিনা।" (ঐ, ৪০৪)।

বক্তৃতা-বিষয়ক চুক্তি-সমাপ্তি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা বার্ক লিখিয়াছেন, "স্বামীজী যখন শ্রীযুক্ত পামারের বাড়িতে ছিলেন সম্ভবতঃ সেই সময়েই বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত তাঁহার চুক্তির অবসান ঘটে। চুক্তিটি ছিল তিন বৎসরের, কিন্তু চারি মাসের মধ্যেই উহা তাঁহার নিকট এক বন্ধনস্বরূপ হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ স্বামীজীর ব্যবসায়ী বন্ধুরাই তাঁহাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কারণ ভগিনী ক্রস্টিনের মতে, প্রভাবশালী বন্ধুরা হস্তক্ষেপ না করিলে, বাহির হইবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু চুক্তি নাকচ করার ফলে আর্থিক ক্ষতি হইল প্রচুর। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, স্বামীজী ঐ পর্যন্ত ভারতীয় কাজের জন্য যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমস্তই খোয়াইতে হইয়াছিল।" ('নিউ ডিসকভারিজ', ৩০১)।

স্বামীজী বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন কেন? পূর্বের পত্রাংশ ও শ্রীযুক্তা বার্কের বাক্য হইতে আমরা কয়েকটি প্রধান কারণ পাই:

স্বামীজীর প্রকৃতিগত বৈরাগ্য এভাবে অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে ও অবিরাম কর্ম-কোলাহলে মত্ত থাকার বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল। আর এ তো ছিল এক বন্ধন, এক পরাধীনতা! ২০শে ফেব্রুআরি (১৮৯৪) শ্রীমতী হেলকে লেখা স্বামীজীর চিঠি হইতে জানা যায় যে বক্তৃতা-কোম্পানী চুক্তি-অনুযায়ী বক্তৃতার সুব্যবস্থা তো করেই নাই, অধিকন্তু অর্জিত টাকার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়া স্বামীজীকে সামান্য অংশই দিতেছিল বলিয়া মিঃ পামার প্রভৃতি বন্ধুদের সহায়তা লইয়াছিলেন। এইসব ভাবগুলি স্বামীজী ১৫ই মার্চ মেরী হেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি বলিতেছেন: "এ পর্যন্ত সব ভালই যাচ্ছে। কিন্তু জানি না কেন, এখানে আসা অবধি আমার মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। বক্তৃতা প্রভৃতি বাজে কাজে একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। শত বিচিত্র রকমের মনুষ্যনামধারী কতকগুলি জীবের সহিত মিশে মিশে উত্যক্ত হয়ে পড়েছি। আমার বিশেষ পছন্দ বস্তুটি যে কি তা বলছি: আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতাও করতে পারি না; কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর তার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই, তখন বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করতে পারি; কিন্তু তা অল্প—অতি অল্পসংখ্যক বাছাইকরা লোকের মধ্যেই হওয়া উচিত। তাদের যদি ইচ্ছা হয় তো আমার ভাবগুলি জগতে প্রচার করুক—আমি কিছুই ক'রব না। কাজের এ একটা যুক্তিযুক্ত বিভাগ মাত্র। একই ব্যক্তি চিন্তা ক'রে তারপর সেই চিন্তালব্ধ ভাব প্রচার ক'রে কখনও সফল হতে পারেনি। ঐরূপে প্রচারিত ভাবের মূল্য কিছুই নয়। চিন্তা করবার, বিশেষ ক'রে আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার এই দাবি এবং মানুষ যে যন্ত্রবিশেষ নয়—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই যেহেতু সব ধর্মচিন্তার সারকথা, অতএব বিধিবদ্ধ যান্ত্রিক ধারা অবলম্বন ক'রে এই চিন্তা অগ্রসর হ'তে পারে না। যন্ত্রের স্তরে সবকিছুকে টেনে নামাবার এই প্রবৃত্তিই আজ পাশ্চাত্ত্যকে অপূর্ব সম্পৎশালী করেছে সত্য, কিন্তু এই প্রবৃত্তিই আবার তার সব রকম ধর্মকে বিতাড়িত করেছে। যৎসামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাকেও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিমত কসরতে পরিণত করেছে। আমি বাস্তবিকই 'ঝঞ্ঝাসদৃশ' নই, বরং ঠিক তার বিপরীত। আমার যা কাম্য, তা এখানে লভ্য নয় এবং ঐ 'ঝঞ্ঝাবর্তময়' আবহাওয়াও আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পূর্ণত্বলাভের পথ এই যে, নিজে ঐরূপ চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যান্য স্ত্রীপুরুষ

যারা সচেষ্ট, তাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে হবে। বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়ে সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যয় করা আমার কর্ম নয়—মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহামানব সৃষ্টি করাই আমার ব্রত।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৪০৪-৫)।

মানসিক অবস্থা যাঁহার এইরূপ, তাঁহার পক্ষে বক্তৃতা-কোম্পানীর তাগিদ অনুযায়ী অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য ঝঞ্ঝাবাতপ্রায় আমেরিকার নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়ানো অসম্ভব—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব অন্য কোন কারণ না ঘটিলেও বিচ্ছেদ ছিল অবশ্যম্ভাবী। অন্য কারণও ঘটিয়াছিল—যদিও উহা গৌণ। চিরাচরিত সন্ন্যাসপ্রথার বিরুদ্ধ হইলেও তিনি বক্তৃতা দিয়া ভারতের উন্নতিকল্পে অর্থোপার্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রয়োজন-স্থলে স্বাস্থ্যের কথা না ভাবিয়া অবিরাম কর্মস্রোতে গা ভাসাইতেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না, আপাততঃ আত্মমুক্তির চিন্তা ভুলিয়া জনকল্যাণসাধনে জীবনব্যয় করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই, কিন্তু তাঁহার এই হৃদয়াবেগ ও বাগ্মিতাশক্তির অপব্যবহার করিয়া বক্তৃতা-কোম্পানী কিংবা হলডেন প্রভৃতি অপর কেহ নিজের কোলে ঝোল টানিবে এবং পদে পদে তাঁহাকে ঠকাইবে, ইহা বরদাস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মানবজীবনের এমন অবমাননা সহ্য করা অপেক্ষা সমস্ত অর্থ ছুঁড়িয়া ফেলাই বাঞ্ছনীয়। আমরা দেখিয়াছি, বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত বিচ্ছেদের মূল্যস্বরূপ তিনি তাঁহার কষ্টার্জিত প্রায় সমস্ত অর্থই অকাতরে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-কোম্পানী কিরূপ ঠকাইত, তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া স্বামীজী ১১ই জুলাই (১৮৯৪) আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "ডেট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০৲ টাকা পেয়েছিলাম।[১] অন্যান্য বক্তৃতার একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০৲ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা-কোম্পানী আমায় ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি।" (ঐ, ৪৬১)। তখনকার দিনে ডলারের দাম ছিল তিন টাকা।

সদুদ্দেশ্যে অর্থ অর্জনের তুলনায় নীতির মানকে উচ্চতর স্থান দিয়া এবং আধ্যাত্মিকতার দাবিকে প্রাধান্য দিয়া স্বামীজী বক্তৃতা-কোম্পানীর কবল হইতে

১। তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় ব্যক্তিগত আয় সম্বন্ধে ১৫ই মার্চের চিঠিতে আছে, "মাত্র একশো সাতাশ ডলার পেয়েছি।" হল ভাড়ার জন্য সামান্য কিছু দেওয়ার পর বাকী অর্থ অপরেরা আত্মসাৎ করিয়াছে।

মুক্ত হইলেও ভারতের চিন্তা এবং ঐ জন্য চেষ্টা করা হইতে বিরত হইতে পারেন নাই, যদিও ইহাও স্বীকার্য যে, এই স্বাধীন পন্থা অবলম্বনের পরও তিনি এই দিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন নাই। শত্রুপক্ষ অবশ্য অনেক কিছুই কল্পনা করিত, কিন্তু বাস্তব সত্য অন্যরূপ। ভারতের কার্যের জন্য এই কালে অযাচিত দান হিসাবে তিনি তেমন কিছু পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই, শুধু এইটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, ফ্রিয়ার নামক জনৈক ডেট্রয়েটবাসী ব্যবসায়ী তাঁহাকে দুই শত ডলার (ছয় শত টাকা) দিয়াছিলেন। বাকি প্রায় সমস্তই তাঁহার কষ্টার্জিত বলিয়া মনে হয়। এই স্বোপার্জিত অর্থও আবার অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিতেন—ইহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, পরেও বলিব। আর আমেরিকার ব্যয়াধিক্য তো জানাই আছে। অতএব মোটের উপর তাঁহার সঞ্চয় কিরূপ হইতেছিল এই বিষয়ে ২৫শে মার্চের 'ডেট্রয়েট ক্রিটিক' পত্রিকায় যে মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়, তাহা অনুধাবনযোগ্য ঃ "অখ্রীষ্টান ধর্মের মহান সত্য এবং সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রচারোদ্দেশ্যে কানন্দ ডেট্রয়েট শহরে কতকটা যে রোমাঞ্চকর অভিযান চালাইয়া যাইতেছেন, উহা হইতে তিনি প্রচুর অর্থলাভ করিতেছেন বলিয়া অনেক কথা শুনিতে পাই। আমি ঘটনাক্রমে জানিতে পারিয়াছি, আমাদের বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বৈদেশিক মিশনগুলি হইতে যেসকল ধর্মপ্রচারক ভারতে প্রেরিত হন, বিবেকানন্দের যৎসামান্য আয় তাঁহাদের বেতন অপেক্ষা অধিক নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে সঞ্চয় তিনি তেমন কিছুই করিতেছেন না। তিনি এখানে প্রায় ছয় সপ্তাহ আছেন এবং ঐ কালমধ্যে জনসাধারণের জন্য তিনি অপেরা হাউসে একটি, অডিটরিয়ামে একটি, একটি গির্জায় একটি এবং এই প্রদেশের অন্যত্র দুই একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতায় লব্ধ অর্থের প্রায় সবটাই অপেরা হাউস আত্মসাৎ করিয়াছে। অডিটরিয়ামটি ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়তো শ্রীযুক্তা ব্যাগলি করিয়াছিলেন, কারণ তিনি (বিবেকানন্দ) তাঁহারই অতিথি। যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে কিনি খরচ চালাইতে পারিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিব। গির্জাতে তিনি কিরূপ করিয়াছিলেন জানি না, হয়তো অন্যান্য স্থানের তুলনায় ভালই হইয়াছিল। বিকালবেলা ঘরোয়া বৈঠকে তিনি যেসব বার্তালাপ করেন, আর যাহারই ফলে তাঁহার এত খ্যাতি, সেগুলি তো মুক্ত বায়ুরই মতো দাবি-দাওয়া-শূন্য। অতএব গত ছয় সপ্তাহে আয়ব্যয়ের

সমতারক্ষা ছাড়া কানন্দ বিশেষ কিছু করিয়াছেন বলিয়া তো আমার হিসাবে পাই না।” (‘নিউ ডিসকভারিজ’, ৩০২-৩)।

মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজী যদিও দ্বিতীয়বারে ডেট্রয়েটে আসিয়া প্রথমে মাননীয় (ভূতপূর্ব সেনেটর) পামারের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন, তপাপি তিনি পরে শ্রীযুক্তা ব্যাগলির বাড়িতে চলিয়া যান। পামারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও ব্যাগলির বাড়িতে চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে তিনি ১৫ই মার্চ ও ১৭ই মার্চের পত্রদ্বয়ে লিখিয়াছিলেন, ‘বুড়ো পামারের সঙ্গে আমার বেশ জমেছে। বৃদ্ধ সজ্জন ও সদানন্দ।…হাঁ, আমার সম্বন্ধে সবচেয়ে মজার কথা লিখেছে এখানকার এক সংবাদপত্র: ঝঞ্ঝাসদৃশ হিন্দুটি এখানে মিঃ পামারের অতিথি, পামার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন ; তবে তাঁর জেদ, দুইটি বিষয়ে কিছু অদল-বদল চাই—জগন্নাথদেবের রথ টানবে তাঁর লগ-হাউস ফার্মের ‘পারচেরন’ জাতীয় অশ্ব, আর তাঁর জার্সি গাভীগুলিকে হিন্দুর গোদেবী-সম্প্রদায়ভুক্ত ক’রে নিতে হবে। এই জাতীয় অশ্ব ও গাভী মিঃ পামারের লগ-হাউস ফার্মে বহু আছে এবং এগুলি তাঁর খুব আদরের।” (‘বাণী ও রচনা’, ৬।৪০৪)। “মিঃ পামারের সঙ্গে বেশী সময় থাকার ব্যাপারে মিসেস ব্যাগলি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আজ তাঁর বাড়িতে ফিরেছি। পামারের বাড়িতে বেশ ভালই কেটেছে। পামার সত্যি আমুদে দিলখোলা মজলিশী লোক, ‘ঝাঁঝালো স্কচ’ (মদ)-এর ভক্ত।[১]…আমি চলে আসতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। কিন্তু আমার অন্য কিছু করবার ছিল না।” (ঐ, ৪০৬)।

ডেট্রয়েট ও আমেরিকার অন্যান্য স্থানে স্বামীজীর এইরূপ অকৃত্রিম বন্ধু অনেকেই জুটিয়াছিলেন। অপরদিকে আবার একমাত্র চিকাগো-বিজয়ের সঙ্গে তুলনীয় এই ডেট্রয়েটের বিজয়যাত্রার পরিণামস্বরূপ শত্রুবৃদ্ধিও হইয়াছিল প্রচুর এবং ক্রমে উহা স্বামীজীর জীবনে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দুঃখ ঘটাইয়াছিল। সেসব ঘটনায় ক্রমে আসিতেছি। আপাততঃ এই দ্বিতীয়বারে ডেট্রয়েটের মিশনরী সমাজ একেবারে চুপ করিয়া রহিল, যদিও ভারত-প্রত্যাগত আর. এ. হিউম নামক এক মিশনরী ডেট্রয়েটের বাহির হইতে স্বামীজীর নামে ২১শে মার্চ একখানি পত্র লিখিয়া বিষোদ্গার করিলেন। এই বিজ্ঞ মিশনরীপুঙ্গব হিউমই

১। পামার পরে মদ্যপান-নিবারণ-আন্দোলনে যোগ দেন।

চিকাগো ধর্মসভায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "বর্তমান পুরুষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ও প্রতিপত্তিশালী কার্যের ভার ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের হাতে আসিয়া পড়িবে।" ('নিউ ডিসকভারিজ', ৩১৯)। হিউম-এর পত্র পাইয়া স্বামীজীর বিস্তারিত উত্তর দিবার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি একটা উত্তর লিখিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া যান। ঐ ২৯শে মার্চের উত্তর 'বাণী ও রচনা'তে মুদ্রিত হইয়াছে। হিউম উভয় পত্র ডেট্রয়েটের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন এবং তাহার ফলে হিউম ও স্বামীজীর বন্ধুদের মধ্যে দীর্ঘ বাদপ্রতিবাদ চলিতে থাকে। স্বামীজী ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

স্বামীজীর পত্রাবলী হইতেই প্রকাশ, তিনি মধ্যপশ্চিমের কাজ সারিয়া পূর্বাঞ্চলে যাইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। ঐ অঞ্চলে যাইবার পূর্বে তিনি ডেট্রয়েট হইতে ২৩শে ফেব্রুআরি ওহিয়ো প্রদেশের আডা শহরে এবং পুনর্বার ডেট্রয়েটে ফিরিয়া সেখান হইতে ২০শে মার্চ মিশিগান প্রদেশের অন্তর্গত বে-সিটি ও স্যাগিনোতে যান।

আডা ক্ষুদ্র নগর হইলেও সেখানে ওহিয়ো নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি অবস্থিত থাকায় শ্রোতার অভাব ছিল না। তাঁহারা মনোযোগসহকারে স্বামীজীর কথা শুনিয়াছিলেন এবং প্রশ্নও করিয়াছিলেন বহু। বক্তৃতা হইয়াছিল 'অপেরা হাউসে' শুক্রবার সন্ধ্যায়, ২৩শে ফেব্রুআরি। বিষয় ছিল, 'মানবের দেবত্ব'। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন: মন ও জড় বস্তু হইতে আত্মা পৃথক্; মন নিজে বিনাশী ও উহা আত্মার যন্ত্রমাত্র। আত্মা স্বভাবতঃ পবিত্র, কিন্তু ভ্রমে নিজেকে অন্যরূপ মনে করেন। এই ভ্রম দূর করাই মানুষের কর্তব্য। সকল আত্মাই মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট। কোন বিশেষ ধর্মকে একমাত্র সত্য বলা অন্যায়। বক্তৃতা অর্ধঘণ্টা ব্যাপী হইলেও সভাপতির ঘোষণানুযায়ী প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরে বহু সময় ব্যয়িত হইল। এই প্রশ্নোত্তরকালে স্বামীজী বলিলেন: হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী; শ্রীকৃষ্ণজীবনের সহিত খ্রীষ্টজীবনের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে; সৃষ্টি অনাদি; মুক্তির অর্থ কোথাও যাওয়া নহে, প্রত্যুত স্বরূপের অনুভূতি; ধর্ম মানে আত্মার স্বরূপের অভিব্যক্তি; পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা বড়ই কর্মচঞ্চল, শান্তভাবে থাকাও সভ্যতাবিকাশের একটা প্রধান অবলম্বন; হিন্দুরা নিজের দুঃখাদির জন্য ভগবানকে দায়ী করে না, ইত্যাদি।

বে-সিটির কোন গির্জায় বক্তৃতার অনুমতি না পাইয়া স্বামীজী অগত্যা

'বে-সিটি অপেরা হাউসে' বক্তৃতা দেন। কিন্তু মিশনরীরা বিরোধী হইলেও তাঁহার শ্রোতার অভাব হয় নাই। বক্তৃতা হয় ২০শে মার্চ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। বক্তৃতার সংবাদ ঘোষণা করিতে গিয়া 'বে-সিটি টাইমস প্রেস' পত্রিকায় লিখিত হইল: "হিন্দু সন্ন্যাসী ডেট্রয়েটে টি. (আর?) জি. ইঙ্গারসোল[১] অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক শ্রোতাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতা, বিশুদ্ধ ইংরেজী এবং চিন্তার গাম্ভীর্য এই দেশের সর্বত্র শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।" ('নিউ ডিসকভারিজ', ৩৪৪)। বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমেরিকায় অর্থকৌলীন্য স্বীকৃত হয়, ঘোর অপরাধীও অর্থবলে সমাজে উচ্চ স্থান পাইতে পারে। ভারতে সেরূপ কৌলীন্য স্বীকৃত হয় না। ভারতীয় জাতিপ্রথার ভিত্তি অন্যরূপ। হিন্দুধর্ম পরমতসহিষ্ণু। মিশনরীরা সকল ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মকে অধিক গালি দিতে পারে শুধু এই কারণেই যে, হিন্দুরা ধর্মমত-প্রকাশে কাহাকেও বাধা দেয় না। সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি ইহাও বলেন যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ খ্রীষ্টান হইতে চায় না, তবে অর্থলোভে কেহ কেহ স্বধর্ম ত্যাগ করে। সামাজিক অপরাধে অপরাধী সব দেশেই আছে, এবিষয়ে ভারতও যেমন আমেরিকাও তেমনি; তাছাড়া সকল মানুষই দেবতা এরূপ মনে করা অযৌক্তিক।

বে-সিটি হইতে স্বামীজী স্যাগিনো শহরে যান এবং সেখানে বুধবার সন্ধ্যায় (২১শে মার্চ) বক্তৃতা দেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তখনকার দিনে আমেরিকার জনসমাজ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের পার্থক্য বুঝিত না এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীজীকে বৌদ্ধ বলিয়া ভাবিত। স্যাগিনোর সংবাদপত্রগুলিও এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় 'বৌদ্ধধর্ম বা এশিয়ার জ্যোতিঃর ধর্ম' হইতেও এই বিভ্রান্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকিবে। স্বামীজী পরে বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া 'ধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। বক্তৃতার স্থান ছিল—'অ্যাকাডেমি অব মিউজিক'। শ্রোতার সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহারা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলেন। বক্তৃতায় তিনি ভারতের বাস্তব সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমন্বয়ের বিপুল প্রভাবের কথা ঐতিহাসিক তথ্যসহায়ে বুঝাইয়া দেন। পরে এই তথ্যের প্রয়োগে অপর দেশ ও ধর্মগুলি

১। ইঁহার প্রকৃত নাম রবার্ট গ্রীন ইঙ্গারসোল। ইনি সমসাময়িক আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ অজ্ঞেয়বাদী বক্তা। ইঁহার সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কিরূপে লাভবান হইতে পারে তাহাও ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইহাও দেখাইয়া দেন যে, ক্যাথলিকদের অনেক অনুষ্ঠানপ্রথা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং তিনি বলেন যে, অপরের নিন্দায় মাতিয়া উঠিলেও খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যাহা প্রচার করেন, কার্যতঃ তাহা পালন করেন না ; বিশ্বভ্রাতৃত্ব মুখে প্রচারিত হইলেও আমেরিকার দক্ষিণাংশে নিগ্রোরা অবহেলিত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানে যেমন. এখানেও তেমনি স্বামীজী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিশনরীরা তাঁহার বার্তাকে নস্যাৎ করিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন, যদিও সাফল্য তেমন কিছুই হইল না।

এখানে স্বামীজীর আমেরিকা-ভ্রমণকালের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া রাখি। আমরা দেখিয়াছি, চিকাগো হইতে ডেট্রয়েট পর্যন্ত, এমন কি স্যাগিনো পর্যন্ত সর্বত্র সংরক্ষণশীল সঙ্কীর্ণমনা অনেক পাদ্রী এবং তাঁহাদের অনুগামী সাধারণ জনসমাজ স্বামীজীর প্রচারের বিরুদ্ধাচরণকল্পে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার আরও বীভৎস পরিচয় আমরা পরে পাইব। অথচ মনে রাখিতে হইবে, নবীন বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত আমেরিকা ঐ সময়মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অনেক উদার হইয়াছিল ; কিছুদিন পূর্বেও চিকাগোর সমাজে ঐরূপ বক্তৃতা দেওয়া মোটেই সম্ভব হইত কিনা কে জানে ? আমেরিকার জনপ্রিয় অজ্ঞেয়বাদী সুবক্তা রবার্ট ইঙ্গারসোলের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হইলে ইঙ্গারসোল তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন, তিনি যেন অতিসাহসী বা অতিস্পষ্টবাদী না হন। তাঁহার নবীন মতবাদ প্রচারকালেও প্রচলিত রীতিনীতির সমালোচনাবিষয়ে যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ইঙ্গারসোল বলিয়াছিলেন, "পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার করিতে আসিলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হইত বা পুড়াইয়া মারা হইত। এমন কি আরও কিছু পরে আসিলেও আপনাকে ঢিল মারিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত।" এই তিক্ত অভিজ্ঞতা স্বামীজীর ভাগ্যে অনেকখানি ঘটিয়াছিল। তবু ইহাও সত্য যে, স্বামীজীর অভিজ্ঞতা ও ইঙ্গারসোলের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা প্রভেদ ছিল। ইঙ্গারসোল ধর্মমাত্রের বিরোধী ছিলেন, স্বামীজী নিজে ছিলেন আস্তিক, ঈশ্বরপ্রেমিক এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল। ইঙ্গারসোল ছিলেন অতীন্দ্রিয় সত্যে অবিশ্বাসী, স্বামীজী ছিলেন বিশ্বাসী ; ইঙ্গারসোল ছিলেন ধর্মধ্বংসী, স্বামীজী ছিলেন শুধু সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মধ্বজিতার বিরোধী। অতএব স্বামীজীর

ভাগ্যে বিরোধের সহিত সমর্থনও যথেষ্ট মিলিয়াছিল। একটি ঘটনায় ইঁহাদের পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হয়। একবার এক ক্লাসের ছাত্রদের স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "ইঙ্গারসোল একদিন আমাকে বলিলেন, 'আমি এই জগৎ হইতে যথাসম্ভব ভোগ আদায় করাতেই বিশ্বাসী, আমি চাই কমলানেবুটাকে নিংড়াইয়া কাঠ করিয়া ফেলিতে, কারণ এই জগৎ ভিন্ন অপর কোন কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত নহি।' আমি উত্তর দিলাম, 'এই জগদ্রূপ কমলানেবুটাকে আপনি যেভাবে নিংড়াইতে চান আমি তদপেক্ষা উত্তম উপায় জানি, আর আমি তাহাতে রসও পাই বেশী। আমি জানি যে, আমার নাশ নাই; অতএব আমার ব্যস্ততাও নাই। আমি জানি যে, আমার কোন ভয় নাই; অতএব নিংড়াইতে আমি সুখও পাই। আমার কোন কর্তব্য নাই—কোন স্ত্রী, পুত্র বা সম্পত্তির বন্ধন নাই; অতএব আমি সকল নরনারীকেই ভালবাসিতে পারি; আমার নিকট সকলেই ভগবান। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, মানুষকে ভগবদ্-জ্ঞানে ভালবাসিতে পারিলে আনন্দ কিরূপ হয়! আপনার কমলানেবুটিকে এইভাবে নিংড়ান দেখি এবং তাহা হইতে সহস্রগুণ অধিক রস বাহির করুন—প্রত্যেক বিন্দু রস বাহির করিয়া ফেলুন'।"

পশ্চিম প্রান্তের একটা নগরে অবস্থানকালে স্বামীজী আপনাকে স্বীয় জীবনের একটা বিকটতম পরিস্থিতি-মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন। হিন্দুদর্শনের কথা ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, যিনি সর্বোত্তম সত্যে উপস্থিত হন, তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করেন, বাহিরের কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কথাগুলি শুনিল কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যাহারা তখন গোচারণ-কার্যে নিযুক্ত ছিল; আর ঐ প্রান্তের গোচারকগণ (কাউ বয়েজ) খুব বেপরোয়া ও উগ্রপ্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা ঠিক করিল স্বামীজীরই উপর এই কথার পরীক্ষা চালাইতে হইবে। তিনি উহাদের গ্রামে বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইলে তাহারা একটা কাঠের টবের তলাটা উপর দিকে উলটাইয়া তাঁহাকে উহার উপর দাঁড় করাইয়া দিল। স্বামীজী ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তত্ত্বকথায় ডুবিয়া আর সব ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় শোঁ শোঁ শব্দে তাঁহার কানের নিকট দিয়া বন্দুকের গুলি ছুটিতে লাগিল। ইহাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি নির্বিকারচিত্তে আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতে থাকিলেন। ভাষণ শেষ হইলে

ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সোৎসাহে করমর্দন করিয়া বলিতে লাগিল, "হাঁ, সাচ্চা আদমী বটে!"

স্বামীজী কৌতুকচ্ছলে একটা মজার ঘটনা বলিতেন। তখন তিনি বক্তৃতায় ব্যস্ত—একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ মাত্র সম্বল লইয়া অবিরাম একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঐসকল স্থানে বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ থাকিলেও স্বামীজীর সুখ-সুবিধার দিকে সব সময় বিশেষ নজর দেওয়া হইত না। এমনি ভাবে মধ্য পশ্চিমের একটি ক্ষুদ্র শহরে তিনি বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইলেন। শরীর তখন খুবই অবসন্ন—একটু বসিয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক। অভ্যর্থনা-সমিতির কর্মসচিব তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য একটি অন্ধকার ছোট ঘর দেখাইয়া দিলেন। স্বামীজী উহাতে প্রবেশ করিয়া আরাম-কেদারায় বসিতে গিয়াছেন, অমনি সেটা মাঝখান হইতে খসিয়া গিয়া এমন বেখাপ্পা গোছের হইয়া গেল যে তাঁহার সর্বশরীর উহাতে ঢুকিয়া গেল। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও আপনাকে ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না; বরং দেখিলেন, অধিক নড়া-চড়া করিলে পোশাক ছিঁড়িয়া এবং চামড়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবস্থা আরও সঙ্গীন হইবে। অগত্যা সেই অস্বস্তিকর অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিতে হইল। অবশেষে যথাকালে কর্মসচিব মহাশয় যখন সেখানে ফিরিয়া তাঁহাকে বক্তৃতামঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিলেন, "স্বামীজী চলুন, শ্রোতারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে," তখন তিনি ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনি যদি আমাকে আমার বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার না করেন, তাহলে শ্রোতাদিগকে বরাবর এমনিতর অপেক্ষা করেই থাকতে হবে।" কথা শুনিয়া কর্মসচিব তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিলেন এবং স্বামীজীকে ঐ অবস্থা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর একচোট খুব হাসি হইল। স্বামীজী এমনভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন যে, তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুরা হাসিয়া খুন হইতেন।

আর একটি ঘটনায় স্বামীজীর মহত্ত্ব ও মানবতার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। আমেরিকার দক্ষিণপ্রান্তের অনেকেই তাঁহাকে নিগ্রো বলিয়া ভ্রম করিত। একবার ঐ অঞ্চলে তিনি ট্রেন হইতে অবতরণমাত্র বিপুল ভাবে সংবর্ধিত হইতেছেন দেখিয়া একজন নিগ্রো কুলি তাঁহার নিকটে আসিয়া জানাইল যে, সে শুনিয়াছে, তিনি তাহারই স্বজাতীয়

লোক এবং তাঁহার গৌরবে নিগ্রোসমাজ গৌরবান্বিত, অতএব সে তাঁহার করমর্দনের সৌভাগ্য লাভ করিতে চায়। স্বামীজী সাগ্রহে সেই রেলওয়ে কুলির হাত স্বহস্তে লইয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ, ভাই তোমাকে ধন্যবাদ।" তিনি তাঁহার প্রতি নিগ্রোদের এইরূপ ব্যবহারের আরও দৃষ্টান্ত দিতেন এবং তাহারা তাঁহাকে নিগ্রো ভাবিতেছে জানিয়া একটুও বিরক্ত হইতেন না। এমনও ঘটিয়াছে যে, দক্ষিণের হোটেলওয়ালা তাঁহাকে নিগ্রো ভাবিয়া হোটেলে ঢুকিতে দেয় নাই এবং অভদ্রভাবে তাড়াইয়া দিয়াছে। তথাপি তিনি একথা কখনও বলেন নাই যে তিনি নিগ্রো নহেন, পরন্তু ভারতবাসী হিন্দু। অতঃপর অন্যত্র আশ্রয় লইয়া স্বামীজী যখন সেই নগরেই সুন্দর বক্তৃতা দিলেন, তখন পরদিন সংবাদপত্রে উহা পড়িয়া হোটেলওয়ালা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। এমন কি আমেরিকার উত্তরাংশেরও নাপিতের দোকান হইতে তাঁহাকে অপমানিত হইয়া সরিয়া যাইতে হইয়াছে। বহুকাল পরে এইসব শুনিয়া যখন একজন পাশ্চাত্ত্য শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেন তিনি এইসব স্থলে আত্মপরিচয় দেন নাই, তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "কি, অপরকে ছোট ক'রে আমি বড় হব? আমি তো পৃথিবীতে সেজন্য আসিনি!"

চর্মের আভিজাত্য তিনি জীবনে কখনও প্রকাশ করেন নাই; কেহ ঐরূপ করিতে গেলে বরং বিদ্রূপই করিতেন। তিনি নিজে বরং বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার জাতির রক্তে বিভিন্ন ধারা মিশ্রিত হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন: "পৃথিবীর সৌভাগ্যবান জাতিগুলি স্বয়ং উচ্চাধিকার লাভ করিয়া যে মিথ্যা জাতিতত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, উহার প্রতি তিনি ছিলেন অবজ্ঞাপূর্ণ। 'আমার শ্বেতচর্ম আর্য পূর্বপুরুষের জন্য যদি গর্বের কারণ থাকে, তো আমি আমার পীতচর্ম পূর্বপুরুষের জন্য আরও অধিক গর্বিত এবং ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো পূর্বপুরুষদের জন্য আমি অধিকতম গর্বিত'—এইরূপই ছিল তাঁহার কথা। নিজ দেহের মঙ্গোলিয়ান সদৃশ চোয়ালের জন্য তিনি অতিশয় গর্ব অনুভব করিতেন, কারণ তিনি মনে করিতেন, উহা একটা কিছুতে বুলডগেরই মতো মরণকামড় দিয়া লাগিয়া পড়িয়া থাকারূপ মনোভাবের দ্যোতক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আর্য নামে খ্যাত প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই মঙ্গোলীয় গুণটি মিশ্রিত হইয়া আছে; তাই একদিন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'দেখতে পাচ্ছ না? তাতাররা

যেন প্রতি জাতির রক্তের উত্তেজক মদ্যস্বরূপ! সে প্রত্যেক জাতির রক্তে উৎসাহ ও উদ্যম সংক্রামিত করে'।"

বাগ্মিতার ফলে তিনি এতই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, বক্তৃতার নিমন্ত্রণের যেন শেষ ছিল না। সবগুলি স্বীকার করা তাঁহার সময় ও শরীরের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। তবু যেগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহাকে সপ্তাহে বার-চৌদ্দটি করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। শরীর ও মন ইহাতে অবসন্ন হইয়া পড়িত; কিছুদিন পরে তাঁহার মনে হইত, তাঁহার বুদ্ধির ভাণ্ডার যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে—বক্তৃতার বিষয় পর্যন্ত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিতেন, "কি করি? কাল তাহলে কি বলব?" এমন চরম অবস্থায় উপস্থিত হইলে যেন দৈবানুকূল্য অপ্রত্যাশিতরূপে নামিয়া আসিত। ইহার ফলে হয়তো তিনি মধ্যরাত্রে শুনিতে পাইতেন, কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতেছে, পরদিন বক্তৃতায় কি কি বলিতে হইবে। কখনও মনে হইত যেন এই দৈববাণী সুদূরে ধ্বনিত হইতেছে এবং দূরপথ বাহিয়া উহা ক্রমে নিকটে আসিতেছে। অথবা দেখিতেন, তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন এবং অপর একজন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। কিংবা দুইজন দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্মুখে বক্তব্য বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকিত এবং উহাই তাঁহার পরদিনের বক্তব্যের খোরাক জোগাইত। আবার এইসব চিন্তারাশি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার নিকট অজ্ঞাতপূর্ব বলিয়া প্রতিভাত হইত। অনেক সময় একই বাটীতে বাসকারী অপরেরাও এইসব কথাবার্তা শুনিয়া হয়তো পরদিন প্রশ্ন করিতেন, "স্বামীজী, আপনি কাল কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন?" তখন তিনি মৃদু হাস্য করিয়া ও এমন দুই-চারিটি কথা বলিয়া এড়াইয়া যাইতেন যে প্রশ্ন-কর্তার মনে সব ব্যাপারটা আরও রহস্যময় হইয়া উঠিত। বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে তিনি ব্যাখ্যাকল্পে বলিতেন, উহা কিছুই নহে, কেবল- স্বয়ংক্রিয় মনের স্বকেন্দ্রিক ক্রিয়া; সে নিজেকে ঐরূপে আপাততঃ বিভক্ত করিয়া উপদেশ দেয়, কথা বলে, বিচার করে। ইহা আত্মারই অসীম শক্তির পরিচায়ক। আত্মাতে যে অসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে, নিদ্রাকালে উহা ঐভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক রহস্য নাই। ঘনিষ্ঠ শিষ্যদিগকে তিনি ইহাও বলিতেন, "একেই বলে দৈবপ্রেরণা।" তবে প্রায়ই কথাবার্তায় তিনি এই সকলের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না, বা ইহা অলৌকিক বলিয়া

স্বীকার করিতেন না, বরং যুক্তিসহায়ে বুঝাইয়া দিতেন, মনের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

এই সময়ে তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তিও প্রকাশ পাইয়াছিল। মাদাম কালভের ঘটনায় উহার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি এই শক্তির প্রয়োগ করিতেন না; যে সকল বিরল স্থলে প্রয়োগ করিতেন, সেখানে কোন না কোন বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকিত। তাঁহার মধ্যে এরূপ শক্তি ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে স্পর্শমাত্র অপরের জীবনগতি পরিবর্তিত করিতে পারিতেন, ঘরে বসিয়া তিনি সুদূরের সংবাদ পাইতেন এবং অপরের মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইত, প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি জিজ্ঞাসুর সন্দেহ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং উহা ভঞ্জন করিতেছেন। অপরের দিকে তাকাইয়া তিনি তাহার অতীত জীবনরহস্যও উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিতেন। যৌগিক শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহবান চিকাগোর এক ধনী ব্যক্তি একবার স্বামীজীকে কতকটা বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন, "মশায়, আপনি যা বলছেন, এসব যদি সত্যি হয় তো আমার মনের গঠন বা আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন দেখি।" স্বামীজী এক মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঐ ব্যক্তির চক্ষুর উপর স্বীয় তীক্ষ্ণদৃষ্টি এমনই ভাবে নিক্ষেপ করিলেন, যেন অদম্য শক্তিতে উহা ঐ ব্যক্তির দেহমন ভেদ করিয়া নিরাবরণ জীবাত্মার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ঐ ব্যক্তি অমনি সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "স্বামীজী, আপনি আমায় এ কি করছেন? আপনি যেন আমার গোটা আত্মাকে মথিত করছেন বলে মনে হচ্ছে, আর আমার জীবনের সব গোপন রহস্য জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠছে।" এরূপ শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি উহার অপপ্রয়োগ করিতেন না, কিংবা উহা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়াও ভাবিতেন না।

ফলতঃ স্বামীজীর নিকটে আগত ব্যক্তি আত্মোৎকর্ষের ও ধর্মানুভূতির পথেরই সন্ধান পাইত এবং ঐ জন্য জীবনে নূতন অনুপ্রেরণাও লাভ করিত। তখনকার দিনে তিনি যেন আর সব ভুলিয়া আমেরিকার অধ্যাত্মচেতনার উদ্বোধনেই বিশেষভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমেরিকার জনসাধারণ তাঁহাকে ঐ দৃষ্টিতেই দেখিত; তিনি তাঁহাদের নিকট ছিলেন সাধু, মহাপুরুষ—আমেরিকার নিকট ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বকল্যাণময় অবদান। ভারতের বরপুত্রকে তাই আমেরিকার সমাজ নিতান্ত আপনার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল।

আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে

ডেট্রয়েট ত্যাগের পূর্ব হইতেই স্বামীজী পত্রাদিতে বন্ধুদের জানাইতে-ছিলেন, শ্রীমতী স্মিথ ও অন্যান্যদের আমন্ত্রণে তিনি প্রথমে নিউ ইয়র্কে যাইবেন ও পরে ১৭ই এপ্রিল নাগাদ তিনি আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে লীন যাইতে ইচ্ছুক। সম্ভবতঃ ডেট্রয়েটে থাকা-কালেই কিংবা তাহার অব্যবহিত পরে তাঁহার নরথ্যাম্পটন, লীন ও বস্টন যাওয়া স্থির হইয়া যায়। ডেট্রয়েট হইতে ১৫ই মার্চের চিঠিতে তিনি মেরী হেলকে লিখিয়াছিলেন, মেরীর মাতার ইচ্ছানুসারে লীন যাইবার পূর্বে ঐ বিষয়ে আরও সংবাদ চান এবং ৩০শে মার্চের চিঠিতে মেরীকে জানান যে, তিনি লীন নগরে যাইবেন, শ্রীযুক্তা ফ্রান্সিস ডব্লিউ. ব্রীডের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে। শ্রীমতী হেলকে লিখিত ২রা এপ্রিলের পত্র হইতে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কে অবস্থিতির কথা জানা যায়। শ্রীমতী হেলকে লেখা ১০ই এপ্রিলের পত্র হইতে ডাঃ গার্নসীর বাড়িতে তাঁহার অবস্থান ও ১৩ই এপ্রিল বস্টন যাওয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। নরথ্যাম্পটন ও বস্টন যাওয়া কিভাবে স্থির হইয়াছিল জানা না থাকিলেও সংবাদপত্রে এইরূপ ঘোষণা বাহির হইয়াছিল :

"১৪ই এপ্রিল, শনিবার নরথ্যাম্পটনের লোকেরা অতি সুপণ্ডিত হিন্দু সন্ন্যাসী বিব্ কানন্দের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইবে। যদিও ধর্মের দিক হইতে অল্প লোকই তাঁহার সহিত একমত, তথাপি এমন কেহই নাই যিনি ঔৎসুক্যবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে তাঁহার কথা শুনিতে না চাহেন।" ('নরথ্যাম্পটন ডেলি হেরাল্ড', ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৪)।

"কমলা বর্ণের পাগড়ি-পরা এবং বৌদ্ধিক ও নৈতিক সর্ববিষয়ে প্রগতিশীল মতের জন্য লব্ধকীর্তি স্বামী বিব্ কানন্দ বস্টন আসিতেছেন। চিকাগোয় অবস্থানকালে ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে যাঁহারই কোন আগ্রহ ছিল, তিনিই 'ভাই বিব্ কানন্দের' কথা শুনিয়াছেন। (তিনি ঐ নামেই পরিচিত হইতে চান)। তিনি ব্যক্তিগতভাবেই ধর্মপ্রচারের ব্রত লইয়া আমেরিকায় আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, যাহাতে এই জড়বাদী ও অর্থোপাসক ভূমিতে ধর্মবিশ্বাস পুনঃসংস্থাপিত করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই একজন উচ্চ-স্তরের মানুষ—ভদ্র, সরল, অকপট এবং আমাদের অধিকাংশ পণ্ডিত অপেক্ষা

এতই অধিক বিদ্বান যে, তুলনাই করা চলে না। লোকে বলে যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, 'আমাদের সকলকে একসঙ্গে ধরিলেও তিনি তদপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্।' তিনি বস্টনের সর্বাধিক পরিচিত প্রায় দ্বাদশ জন ব্যক্তির নামে চিকাগোর চিন্তা, কার্য ও হালরুচির নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া আসিতেছেন—কারণ এইসব বিষয়েও চিকাগোতে হাল ফ্যাশন বলিয়া একটা জিনিস আছে।" ('বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট', ৫ই এপ্রিল, ১৮৯৪)।

'নরথ্যাম্পটন ডেলি হেরাল্ডের' ১৩ই এপ্রিলের এক সংবাদে বলা হয়, "বস্টনের জনৈকা খ্যাতনামা ও সামাজিক জীবনে সুপরিচিতা মহিলা বিবেকানন্দের জন্য এক বৈঠকের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অতিথিবর্গকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন দর্শন, বিজ্ঞান অথবা ধর্ম সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার জটিল প্রশ্ন হিন্দু সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহারা আসিলেন, প্রশ্ন করিলেন, উত্তর পাইলেন এবং যাইবার কালে বলিয়া গেলেন, 'সত্যি বলিতে কি, ইনি যা বললেন, তার অর্ধেকও আগে বলা হয়নি'।"

১৪ই এপ্রিল তিনি নরথ্যাম্পটন শহরে সর্বসাধারণের জন্য এবং পরদিন ঐ শহরের স্মিথ কলেজে বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর নরথ্যাম্পটনে উপস্থিতি সম্বন্ধে স্মিথ কলেজের তদানীন্তন ছাত্রী শ্রীযুক্তা মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কের দীর্ঘকাল পরে (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত স্মৃতিলিপিতে আছে: "১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সোফিয়া স্মিথ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্মিথ কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন এই কলেজে প্রবেশ করি, তখন আমি অপক্কবুদ্ধি অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা—কোন শৃঙ্খলে বদ্ধ নহি, কিন্তু মনোরাজ্যের ও আত্মরাজ্যের সত্যলাভের জন্য অতীব সমুৎসুক। কলেজের ছাত্রী-নিবাসে সকলের স্থান-সঙ্কুলান হইত না বলিয়া আমি আরও তিনজন ছাত্রীসহ এক সমচতুষ্কোণ বাদামী রং-এর বাড়িতে থাকিতাম।...এপ্রিলের বুলেটিনে প্রকাশিত হইল, স্বামী বিবেকানন্দ দুইটি সন্ধ্যায় বক্তৃতা করিবেন। আমরা এইটুকু জানিতাম যে, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী, আর কিছুই জানিতাম না, কারণ সাম্প্রতিক ধর্মমহাসভায় তিনি যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। তারপর অতি উদ্দীপনাময় এই সংবাদটি বাহির হইয়া পড়িল যে, তিনি আমাদেরই বাড়িতে থাকিবেন, আমাদের সহিত আহার করিবেন এবং আমরা যে কোন প্রশ্ন করিতে পারিব।

আমাদের যিনি গৃহস্বামিনী ছিলেন, তাঁহার উদারতার পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যায় যে, তিনি ময়লা রং-এর এমন এক ব্যক্তিকে স্বগৃহে স্থান দিলেন, যিনি নিশ্চয়ই কোন হোটেলে স্থান পান নাই। নির্দিষ্ট দিন আসিল, অতিথিকক্ষ সজ্জিত হইল, আর এক দিব্য সুঠাম মূর্তি সেখানে প্রবেশ করিলেন।...তাঁহার পরিধানে ছিল কালো রং-এর প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট, কালো প্যাণ্টালুন, হরিদ্রা-বর্ণের পাগড়ি জড়াইয়া জড়াইয়া মস্তকোপরি সুশোভিত। তাঁহার বদনে ছিল এক অজ্ঞেয় ভাব, চক্ষুতে ছিল আলোক-বিচ্ছুরক জ্যোতিঃ এবং সমস্ত অঙ্গে ছিল একটা শক্তির অভিব্যক্তি, যাহা বর্ণনাতীত। আমরা তো নীরব ও হতভম্ব হইয়া গেলাম, কিন্তু আমাদের গৃহকর্ত্রী অত সহজে ভয়চকিত হইবার পাত্রী ছিলেন না, তিনি উদ্দীপনাময় বাক্যালাপে মাতিয়া গেলেন।...বক্তৃতার বিষয় আমার কিছুই মনে নাই, কিন্তু বিদ্বৎ-সম্মেলনের কথা মনে আছে। আমাদের গৃহে আসিলেন কলেজের প্রেসিডেন্ট, দর্শনবিভাগের কর্তা এবং আরও অনেক অধ্যাপক, নরথ্যাম্পটন গির্জাগুলির ধর্মযাজকবর্গ ও একজন গ্রন্থকার।...আমার দৃঢ় ধারণা সেদিনকার বিষয় ছিল, খ্রীষ্টধর্ম ও উহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন? স্বামীজী যে বিষয়টি নির্বাচিত করিয়াছিলেন তাহা নহে।...সুদূর ভারত হইতে আগত একজন হিন্দু কি করিয়া নিজশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ইঁহাদের বিরুদ্ধে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন? ...কিন্তু যে আশ্চর্য ফল দেখা গেল তাহার প্রতিক্রিয়া আমার একান্ত নিজস্ব হইলেও উহার তীব্রতা সম্বন্ধে আমি বাড়াইয়া বলিতে পারি না। বাইবেলের উদ্ধৃতির প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বাইবেল হইতেই আলোচ্য বিষয়ের অধিকতর অনুরূপ উদ্ধৃতি দিলেন। স্বীয় মত প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক ইংরেজ লেখকদের মতসমূহের উল্লেখ করিলেন। কবিদের সঙ্গেও যেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টমাস গ্রের কবিতা উদ্ধৃত করিলেন। আমি যে জগতের লোক সে জগতেরই প্রতি সহানুভূতিশীল না হইয়া, বরং স্বামীজী যখন ধর্মের গণ্ডি প্রসারিত করিতে করিতে সমস্ত মানবজাতিকে উহার মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন, তখন সে কক্ষে যে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইল, আমি কেন তাহারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম বলিতে পারি না।...আমি শুধু বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, আমি তাঁহার বিজয়ে গর্বানুভব করিতেছি। বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে স্বামীজী মূর্তিমান প্রেম। আমার নিকট তিনি সে রাত্রে ছিলেন যেন মূর্তিমতী শক্তি।...ইহা নিঃসন্দেহ যে

আমাদের কলেজের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত এই ব্যক্তিরা ছিলেন সঙ্কীর্ণমনা, তাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বার ছিল অবরুদ্ধ।...তাঁহারা (গীতার) একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিবেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'?... তাঁহারা প্রেমের মর্যাদা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু শক্তিসহায়ে মিলন না ঘটাইতে পারিলেও উহার দ্বারা ত্রাস জন্মানো চলে।...তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করিলেন।

"পরদিবস প্রত্যূষে স্নানাগার হইতে জলপতনের উচ্চ শব্দ ও অজানা-ভাষায় গম্ভীর সুরে উচ্চারিত মন্ত্র শুনিতে পাইলাম। আমরা দল বাঁধিয়া দরজায় কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রাতরাশের সময় এই মন্ত্রোচ্চারণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি প্রথমে কপালে ও পরে বুকে জলস্পর্শ করাই এবং প্রতিবার জগতের কল্যাণসূচক মন্ত্রপাঠ করি।' কথাটি আমার মনে বসিয়া গিয়াছিল। আমিও সকালে প্রার্থনা করিতাম, প্রথমে নিজের জন্য এবং পরে আমার পরিবারের জন্য। কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজকে আমার পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়া নিজের চিন্তা ভুলিয়া যাইবার কথা আমার মনেই উঠিত না।

"প্রাতরাশের পরে স্বামীজী একটু বেড়াইতে চাহিলেন। তখন আমরা উভয়পার্শ্বে দুই দুই জন করিয়া চারিজন ছাত্রী, সেই রাজপ্রায় ব্যক্তিটিকে লইয়া সগর্বে রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে সলজ্জভাবে একটু কথা বলিতে চেষ্টা করিলে তিনি শুভ্রদন্ত প্রকাশিত করিয়া স্মিতবদনে উত্তর দিতে লাগিলেন। আমার শুধু একটি কথা মনে আছে। তিনি খ্রীষ্টানদের মতবাদের কথা তুলিয়া বলিলেন, সদা সর্বদা 'যীশুখ্রীষ্টের রক্তের' উল্লেখটা তাঁহার নিকট বড় জঘন্য বলিয়া মনে হয়। উহা আমার চিন্তার খোরাক জোগাইল। 'রক্তে পূর্ণ রয়েছে একটি ফোয়ারা, যা উচ্ছ্বসিত হচ্ছে ইম্যানুয়েলের ধমনী থেকে'—এ স্তোত্রটাকে আমি বরাবর ঘৃণাই করিতাম; কিন্তু একি দুঃসাহস যে, ইনি সাম্প্রদায়িকভাবে চিরাদৃত একটি মতবাদকে সমালোচনা করিতেছেন! সেই স্বাধীনতাপ্রিয় আত্মাটি আমার চিত্তে যেন জাগরণ আনিয়া দিলেন; সত্যি বলিতে কি, সেইদিন হইতেই আমার স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত।"

দীর্ঘকাল পরেও ফিঙ্কে স্বামীজীকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আকর্ষণে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর প্রচারিত জীবের ব্রহ্মত্ব তাঁহাকে জীবনের দুঃখমধ্যেও শান্তি প্রদান করিয়াছিল। শাস্ত্র বলিয়াছেন,

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"; ফিক্সের জীবন তাহারই প্রমাণ।

নরথ্যাম্পটনের সিটি হলে ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার প্রারম্ভে স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন, ভাষা, বর্ণ, রীতিনীতির পার্থক্য থাকিলেও জগতের প্রধান জাতিগুলি মূলতঃ এক। অতঃপর হিন্দুদের রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি যেন গল্পচ্ছলে, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এমন অনেক কিছু বলিয়া গেলেন, যাহা শ্রোতাদের মন সহজেই জয় করিল। মধ্যে মধ্যে তিনি ইংরেজী ভাষাভাষী দেশের রীতিনীতির সহিত তুলনা করিয়া স্বদেশের রীতিনীতির মর্ম বা উৎকর্ষ প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, হিন্দুসমাজে মাতার স্থান সর্বোচ্চ এবং নারীকে তাহারা জগন্মাতারই প্রতিমূর্তি মনে করে। জগৎশাসনকারী ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যে বিলাসিতা, অর্থগৃধ্নুতা ও অর্থকৌলীন্য দেখা যায়, উহাই অবশেষে তাহাদের বিনাশের কারণ হইবে—এই কথাটি শ্রোতাদের খুবই হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল। এই সমস্ত কথার বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য 'নরথ্যাম্পটন ডেলি হেরাল্ড' স্থলবিশেষে স্বামীজীর সমালোচনা করিতেও ছাড়িল না। তবে পরিশেষে বলিল, "কিন্তু বিব্ কানন্দকে দেখিতে পাওয়ার সুযোগ কোন বুদ্ধিমান ও বিচারশীল আমেরিকানের পক্ষেই হারানো উচিত নহে—যদি সে আমেরিকানের ইচ্ছা থাকে যে, তিনি এমন একজাতির মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সর্বোত্তম ফলস্বরূপ এক সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেখিবেন, যে জাতির বয়স সহস্রসংখ্যায় গণিত হয়, আমাদের মতো শতসংখ্যায় নহে এবং যে জাতির কথা প্রত্যেক মনের পক্ষেই চিন্তা করিয়া দেখা অতীব সুফলপ্রদ।"

পরদিবস সন্ধ্যায় তিনি স্মিথ কলেজের ছাত্রীদের সম্মুখে ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। এই বক্তৃতাটিও বিশেষ মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকার মতে "সমস্ত চিন্তারাশির মধ্যে অনুস্যূত ছিল সত্য-ধর্মবিষয়ক ভাব ও বাণীর এক প্রশস্ততম উদারতা; এবং সকল শ্রোতাই বলেন যে, বক্তৃতাটিতে তাঁহারা সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছেন।" 'স্মিথ কলেজ ম্যাগাজিনে' লেখা হইয়াছিল: "আমরা মানব-ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বর-পিতৃত্বের অনেক কথা বলিয়া থাকি; কিন্তু অল্প লোকই ইহার অর্থ বুঝিয়া থাকেন। প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব কেবল তখনই সম্ভব যখন জীবাত্মা জগৎপিতার এত নিকটে উপস্থিত হয় যে, ঈর্ষা ও

প্রাধান্যবিষয়ক সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র দাবি-দাওয়া নিশ্চিতরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়; কারণ স্বভাবতঃই আমরা ঐ সকলের বহু ঊর্ধ্বে। আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে যাহাতে আমরা হিন্দুদের প্রাচীন গল্পের কূপমণ্ডূকের মতো না হইয়া যাই, যে দীর্ঘকাল একটি কূপের মধ্যে থাকার ফলে পরিশেষে বৃহত্তর স্থানের অস্তিত্বই অস্বীকার করিত।"

নরথ্যাম্পটন হইতে স্বামীজী ম্যাচাচুসেট্‌স-এর অন্তর্গত লীন নগরে গিয়া শ্রীযুক্তা ফ্রান্সিস ডব্লিউ. ব্রীড-এর বাড়িতে অতিথি হইলেন। লীন নগর চামড়ার কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং শ্রীযুক্ত ব্রীডের একটা নিজস্ব কারখানা ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন বিশেষ ধনী। স্বামীজী সেখানে দুইটি বক্তৃতা দেন—প্রথমটি ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্নে 'নর্থ শোর ক্লাবে'। উহা ছিল মহিলাদের একটি সমিতি এবং শ্রীযুক্তা ব্রীড ছিলেন উহার সভ্যা। দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় 'অক্সফোর্ড হলে'। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতের রীতিনীতি'।

বস্টনেও শ্রীযুক্তা ব্রীডের বাড়ি ছিল; স্বামীজী সেখানেও কিছু দিন ছিলেন। লীন হইতে বস্টনের দূরত্ব মাত্র দশ মাইল। এই সুযোগে স্বামীজী বস্টন-বাসী অধ্যাপক রাইট ও অপরাপর বন্ধুদের সহিত মিশিতে এবং আরও নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতী ইসাবেল ম্যাক-কিণ্ডলিকে নিউ ইয়র্ক হইতে লিখিত স্বামীজীর ২৬শে এপ্রিলের পত্রে এই সময়ের কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারা যায়। উহার শেষাংশে আছে: "বস্টনে মিসেস ব্রীড-এর বাড়িতে আমার সময় কেটেছে চমৎকার। অধ্যাপক রাইট-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি আবার বস্টনে যাচ্ছি। দরজীরা আমার নূতন গাউন তৈরী করছে। কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে (হার্ভার্ড) বক্তৃতা দিতে যাব। সেখানে অধ্যাপক রাইট-এর অতিথি হব। বস্টনের কাগজপত্র আমাকে বিরাট ক'রে স্বাগত জানিয়েছে। এইসব আজে-বাজে ব্যাপারে আমি পরিশ্রান্ত। মে মাসের শেষের দিকে চিকাগো যাব। সেখানে কয়েক দিন কাটিয়ে আবার ফিরব পূর্বদিকে। গত রাত্রে ওয়ালডর্ফ হোটেলে বক্তৃতা দিয়েছি। মিসেস স্মিথ প্রতি টিকেট দু-ডলার ক'রে বেচেছেন। ঘর-ভরতি শ্রোতা পেয়েছিলাম—যদিও ঘরটি বেশী বড় ছিল না।...লীন-এ যে একশ ডলার পেয়েছি, তা পাঠালাম না, কারণ নূতন গাউন তৈরী ইত্যাদি বাজে ব্যাপারে খরচ করতে হবে।

বস্টনে টাকার ভরসা নেই। তবু 'আমেরিকার মস্তিষ্ক'টিকে স্পর্শ করতেই হবে, তাতে নাড়া দিতেই হবে, দেখি যদি পারি।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৪২১-২২)। বস্টন নগর তখন আমেরিকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল—বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র।

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের ওয়ালডর্ফ হোটেলে শ্রীযুক্তা আর্থার স্মিথ-এর 'আলোচনা-চক্র'-এর ব্যবস্থানুযায়ী 'ভারত ও হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে স্বামীজীর যে বক্তৃতা হইয়াছিল, উহাতে 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন'-এর বিবরণ অনুযায়ী পুনর্জন্মবাদ আলোচিত হইয়াছিল। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "যেসব ধর্মযাজকের বিদ্যা অপেক্ষা পরমতকে আক্রমণের প্রবৃত্তি অধিকতর, তাঁহাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'পূর্বজন্ম বলিয়া কিছু যদি থাকেই, তবে মানুষ সে বিষয়ে সচেতন নহে কেন?' উত্তর হইল এই: 'সচেতন থাকাকে (সত্যের) ভিত্তি বলিয়া ধরা ভুল হইবে, কারণ মানুষ এই জীবনেও স্বীয় জন্ম সম্বন্ধে এবং অতীত অনেক ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন নহে।' হিন্দুধর্মে 'শেষ বিচারের' দিন বলিয়া কিছু নাই। এবং হিন্দুর ভগবান শাস্তি বা পুরস্কার দেন না। কোন দোষ করিলে শাস্তি স্বাভাবিক নিয়মে অবিলম্বেই আসে। জীবাত্মা বিভিন্ন যোনিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে এবং দেহবন্ধন অতিক্রম করে।"

স্বামীজী ২৪শে এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে ছিলেন এবং নিশ্চয়ই বহু বক্তৃতা দিয়াছিলেন বা ঘরোয়া আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে ২রা মে (যথার্থতঃ ১লা মে) তারিখে নিউ ইয়র্ক হইতে যে পত্র লিখেন, তাহাতে তাঁহার গতিবিধি, কার্যাবলী ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। পত্রাংশে আছে: "সেদিন ওয়ালডর্ফের বক্তৃতায় সত্তর ডলার পেয়েছি। আগামী কালের বক্তৃতা থেকে আরও কিছু পাবার আশা রাখি। সাত থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত বস্টনে বক্তৃতাদি আছে, তবে সেখানে তারা খুব কমই পয়সা দেয়। গতকাল তেরো ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনেছি—দোহাই, ফাদার পোপকে (শ্রীযুক্ত হেলকে) বলো না যেন। কোটের খরচ পড়বে ত্রিশ ডলার।...সময় মোটের উপর চমৎকার কাটছে—কেবল ঐ জঘন্য, অতি জঘন্য, বিরক্তিকর বক্তৃতা বাদে।...হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে যাব। বস্টনে তিনটি বক্তৃতা এবং হার্ভার্ডে তিনটি—সকলেরই ব্যবস্থা করেছেন মিসেস ব্রীড। এখানে ওরা কিছু ব্যবস্থা

করছে। সুতরাং চিকাগোর পথে আমি আর একবার নিউ ইয়র্কে আসব—কিছু কড়া বাণী শুনিয়ে, টাকাকড়ি পকেটস্থ করে সাঁ করে চিকাগোয় চলে যাব। চিকাগোয় পাওয়া যায় না, এমন কিছু যদি নিউ ইয়র্ক বা বস্টন থেকে তোমার দরকার থাকে, সত্বর লিখবে। আমার এখন পকেট-ভরতি ডলার। যা তুমি চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে, কখনও মনে করো না। আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই, তো ভাইই। পৃথিবীতে একটি জিনিস আমি ঘৃণা করি—বুজরুকি।"

স্বামীজীর নিউ ইয়র্ক-এর দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ২রা মে শ্রীমতী মেরী ফিলিপ্স-এর গৃহে (১৯ পশ্চিম, ৩৮ নম্বর স্ট্রীট)। ইনি ওয়ালডর্ফে'র বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন এবং ক্রমে স্বামীজীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ ভক্তরূপে স্বামীজীকে স্বগৃহে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে স্বামীজী ইঁহার গৃহকেই নিউ ইয়র্কের স্বীয় হেড-কোয়ার্টার বলিয়া বিবেচনা করিতেন। শ্রীমতী ফিলিপ্স মহানগরীর বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন এবং এইসব বিষয়ে তাঁহার সুনাম ছিল। ২রা মের বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'ভারত ও পুনর্জন্মবাদ'। নিউ ইয়র্কের এইসব আলোচনা ও বক্তৃতার ফলে শ্রীমতী ফিলিপ্স ছাড়াও তাঁহার আরও কয়েকজন একান্ত অনুরাগী বন্ধু জুটিয়াছিলেন—ডাক্তার গার্নসী ও তাঁহার স্ত্রী, যাঁহাদের গৃহে স্বামীজী বহুদিন বাস করিয়াছিলেন; লিয়ঁ ল্যাণ্ডসবার্গ, যিনি ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক এবং পরে স্বামীজীর নিকট দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণান্তে কৃপানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং সুগায়িকা শ্রীমতী এমা থার্সবি। তাঁহার আর একজন বন্ধু ছিলেন লীম্যান এবট; ইনি অতি সুপরিচিত ধর্মযাজক, ব্রুকলিনের কংগ্রীগেশনাল চার্চের অধিপতি এবং সুপ্রসিদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী 'আউটলুক' নামক সাময়িক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। এই ভদ্রলোক একদিন স্বামীজীকে স্বগৃহে আহার করাইয়াছিলেন। স্বামীজীর নিউ ইয়র্কে অবস্থানকালের কিছু বিবরণ শ্রীযুক্তা কন্সটান্স টাউন (বিবাহের পূর্ববর্তী নাম কুমারী গিবন্স)-এর স্মৃতিলিপি হইতে পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ ২৯শে এপ্রিল ডাক্তার গার্নসীর বাড়িতে স্বামীজীকে এক ভোজসভায় দেখিতে পান:

"আমি যখন তাঁহার দর্শন পাই, তখন তাঁহার বয়স সাতাশ (?)। তিনি যেন প্রাচীন গ্রীকদেশীয় দেবমূর্তিরই সদৃশ ছিলেন সুন্দর। তাঁহার বর্ণ অবশ্য ছিল

মলিন এবং তাঁহার চক্ষু ছিল বৃহৎ, যাহা দেখিয়া মধ্যরাত্রের তারকাখচিত নীলাকাশের স্মৃতি জাগিত।...তাঁহার মাথা ছিল কোঁকড়ানো ছোট ছোট চুলের রাশিতে পূর্ণ।...তিনি তখন ছিলেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এগবার্ট গার্নসীর বাড়িতে অতিথি—আর গার্নসী ছিলেন অমায়িক, সাহিত্যসেবী ও সত্যই আদর্শ অতিথিপরায়ণ। তাঁহার প্রশস্ত ও সুদৃশ্য বাড়িটি অবস্থিত ছিল ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ-এর চুয়াল্লিশ নম্বর রাস্তায়।...ডাক্তার গার্নসী এক রবিবার অপরাহ্ণে ডিনারের ব্যবস্থা করিলেন। কথা রহিল, উহাতে প্রত্যেক অতিথি বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তা হইবেন এবং ইঙ্গারসোল ঐ সময় শহরে না থাকায় ডাক্তার স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।...আমি ছিলাম ক্যাথলিক, এই হিসাবেই সেই স্মরণীয় অপরাহ্ণ-ভোজনে উপস্থিতির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ডাক্তার গার্নসী ছিলেন আমার চিকিৎসক; তাই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ক্যাথলিক মতের পৃষ্ঠপোষণ করিতে। ডাঃ পার্কহার্স্ট সেখানে ছিলেন এবং আমেরিকার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিনি ম্যাডার্ন ফিস্কেও ছিলেন। আমার মনে আছে, সর্বসুদ্ধ চৌদ্দজন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য পরস্পরের মধ্যে একটা নীরব চুক্তি ছিল যে, স্বামীজীর অখ্রীষ্টান মতবাদ সম্বন্ধে সকলেই একটা ভদ্রোচিত মনোভাব দেখাইবেন। কিন্তু হায়! ভোজপর্ব যেমন চলিতে লাগিল, সর্বাধিক উত্তেজনাময় আলোচনা চলিল স্বামীজীর সঙ্গে নহে, বরং বাইবেল-অবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমার আসন ছিল স্বামীজীরই পার্শ্বে, আমরা দুইজন নীরবে ও সকৌতুকে এই হাস্যকরপ্রায় সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিতেছিলাম।... স্বামীজী মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সাহায্যে প্রত্যক্ষতঃ স্বীয় জন্মভূমি ও উহার রীতিনীতি বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সর্বদাই কোন না কোন দার্শনিক বা ধর্মীয় বিষয়ে স্বমতের প্রাধান্য স্থাপন করা।...এই ভোজকালেই আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। পরে বৈঠকখানায় তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, 'মিস গিবন্স, আপনার ও আমার দার্শনিক মত একই, আমাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলকথা একই।...'

"আমি বাড়ি ফিরিয়া মাকে স্বামীজীর কথা শুনাইলাম। মা বলিলেন, 'কি বিকট ভোজসভারে বাবা—যত সব মেথোডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট এবং প্রেসবিটেরিয়ান, আবার এক কমলা রং-এর পোশাক-পরা কৃষ্ণবর্ণ বিধর্মী!' কিন্তু মা ক্রমে বিবেকানন্দকে পছন্দ করিতে ও তাঁহার মতবাদের প্রতি সম্মান দেখাইতে

শিখিয়াছিলেন, এমন কি পরে এক বেদান্তকেন্দ্রেও যোগ দিয়াছিলেন। স্বামীজীর কাছে মা ছিলেন অতিশয় কৌতুকোদ্দীপক এবং এতদিন পরে আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে, নিজের সম্বন্ধে মায়ের মন্তব্য শুনিয়া স্বামীজী কেমন সানন্দে হাসিতেছেন।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এই বসন্তকালে না হইলেও কিছু পরে এক রাত্রে কুমারী গিবন্স স্বামীজীকে 'মেট্রোপলিটান অপেরাতে' 'ফাউস্ট'-এর অভিনয় দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী পূর্বে কখনও অপেরা দেখেন নাই। কিন্তু কুমারী গিবন্স-এর মাতা আপত্তি তুলিলেন, "কিন্তু আপনি যে কালো! বিশ্বের লোক বলবে কি?" সে অপেরাতে সমাজের সব সেরা লোকদিগের আসিবার কথা ছিল। স্বামীজী ঐ কথায় হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি আমার বোনের কাছে বসব; ও ওতে কিছু মনে করে না।" স্বামীজীকে সেদিন যেমন সুন্দর দেখাইতেছিল, এমন বোধ হয় আর কোনও দিন নয়। অপেরা-গৃহে তাঁহাদের "আশেপাশে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এমন ভাবে দেখিতে-ছিলেন" যে, কুমারী গিবন্স-এর মতে "সে রাত্রে তাঁহারা অপেরা মোটে শুনেনই নাই।" "আমি বিবেকানন্দকে ফাউস্ট-এর কাহিনীটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। মা বলিয়া উঠিলেন, 'হে ভগবান, যুবতী মেয়ে হয়ে তোর পক্ষে এমন একটা হতচ্ছাড়া গল্প একজন পুরুষের কাছে বলা উচিত নয়।' 'ভালই যদি না হয় তো তাকে আপনি এখানে আসতেই বা বললেন কেন?'—স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, 'দেখুন, অপেরা দেখতে যাওয়া একটা সামাজিক চাল। সব পালাই জঘন্য। কিন্তু পালা নিয়ে আলোচনা না করলেও তো চলে!'···অপেরা চলিতে থাকিলে স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা বোন, ঐ যে ভদ্রলোকটি গান গেয়ে ঐ সুন্দরী মেয়েটির কাছে প্রেম নিবেদন করছেন, ইনি কি সত্যি তাকে ভালবাসেন?' 'হাঁ, স্বামীজী।' 'কিন্তু ভদ্রলোক তো মেয়েটির প্রতি অন্যায় করেছেন, আর তাকে দুঃখ দিয়েছেন!' আমি বিনীতভাবে উত্তর দিলাম, 'হাঁ।' স্বামীজী তখন বলিলেন, 'এইবারে বুঝেছি! ও ভদ্রলোক সুন্দরী মহিলাটিকে যে ভালবাসেন, তা নয়, কিন্তু লাল পোশাক-পরা ও লেজ-বিশিষ্ট ঐ যে সুন্দর ভদ্রলোকটি রয়েছেন, তাঁকেই তিনি ভালবাসেন—কি নাম যেন ওঁর—শয়তান!' এই ভাবেই স্বামীজীর পবিত্র মনটি বিচারের ধারা অবলম্বনে সবটা যেন ওজন করিয়া দেখিল এবং বুঝিল অপেরা ও শ্রোতাদের

সবই ফাঁকা! সমাজের একটি অল্পবয়স্কা যুবতী মেয়ে দুই অঙ্কের অবসরকালে মার কাছে আসিয়া বলিল, 'ঐ কমলা রং-এর গাউন-পরা ভদ্রলোকটি, যাঁকে অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ন্যায় দেখাচ্ছে, তাঁর পরিচয় পাবার জন্য আমার মা খুবই উতলা।"

নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউতে বাসকালে স্বামীজী জনসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ মহিলা-কবি হ্যারিয়েট মনরো-র আত্মচরিতে লিখিত এই বিবরণ হইতেও পাওয়া যায়: "(চিকাগো ধর্ম-মহাসভার) পরে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং কয়েক বৎসর পরে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউতে তাঁহার সহিত আমার যে কথাবার্তা হয়, তাহা আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। সে সময় তাঁহার দৃষ্টি উর্ধ্বে এক গগনচুম্বী সৌধের শীর্ষবিন্দুতে উত্থিত হইলে তিনি এমন কিছু বলিয়াছিলেন, যাহা হইতে আমার এই অনুভূতি জাগিয়াছিল যে, এই সমস্ত অভিনব সৃষ্টি তাঁহার নিকট তেমনি কল্পনারাজ্যের অপরূপ বস্তুসদৃশ মনে হইত, যেমন প্রাচীন বস্তুগুলি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। আবার যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে তিনি এই বিশ্বকে আরও নিবিড়তররূপে একত্র ও অধিকতর মহিমমণ্ডিত বলিয়া দেখিতেন, সেই আশাপূরণের ভারও তিনি আমাদের নবীন উৎসাহের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ স্বামীজী সর্বপ্রকার কল্যাণময় শক্তির বিকাশকেই ভগবচ্ছক্তির বহিঃপ্রকাশরূপে দেখিতেন; গগনচুম্বী প্রাসাদও (স্কাই-স্ক্রেপার) তাঁহার নিকট মহাশক্তির বার্তাই আনিয়া দিত।" সত্য কথা বলিতে কি, স্বামীজী যেখানেই প্রাণবত্তা ও সৃজনশক্তির বিকাশ দেখিতেন, সেখানে জগদম্বারই প্রাণস্পন্দন ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যের আভাস পাইতেন। যে বিশ্ব-শক্তি জগদ্রচনা ও জগৎসংরক্ষণে নিয়োজিত আছে এবং মানবীয় যে শক্তিতে আকাশচুম্বী সৌধের পরিকল্পনা ও সংগঠন হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই।

স্বামীজীর সহিত আরও বহু কৃতবিদ্য প্রথিতযশা ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহাদের কাহারও কাহারও আত্মজীবনীতে স্বামীজীর স্মরণে দুইচারি পঙক্তি লিপিবদ্ধ আছে। কারণ স্বামীজীর স্মৃতিমাত্রই ছিল সর্বদা চিরভাস্বর—অমর। মহিলা-ভাস্কর মালভিনা হফম্যান তাঁহার 'হেড্‌স এণ্ড টেলস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "ভারত আমার শৈশবের এক অতি পরিষ্কার ও আনন্দচঞ্চল

সান্ধ্যস্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সে সন্ধ্যাটি আমি আমার পিতার জনৈক আত্মীয়ের গৃহে কাটাইয়াছিলাম। তিনি পশ্চিম আটত্রিশ নম্বর রাজপথের উপরে অবস্থিত একটি সাধারণ গোছের বোর্ডিং হাউস-এ থাকিতেন। মহানগরবাসী প্রাচীনপন্থী এই দলটির মধ্যে অকস্মাৎ একজন নবাগতকে উপস্থিত করা হইল—তিনি ছিলেন প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিক ও আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলে সব নীরব হইয়া গেল। তাঁহার কৃষ্ণাভ গৌরকান্তি ও হস্তদ্বয়ের সহিত তুলনায় তাঁহার আলগাভাবে জড়ানো বিশাল পাগড়ি ও বিরাট অঙ্গাবরণের একটা অসামঞ্জস্য সহজেই লক্ষিত হইল। তাঁহার কৃষ্ণচক্ষু তারকাদ্বয় পার্শ্ববর্তী লোকদের দেখিবার জন্য যেন একবারও ঊর্ধ্বে উঠিল না ; কিন্তু তাঁহার সর্ববিষয়ে এমন একটা শান্তি ও শক্তির ছাপ ছিল যে, উহা আমার মনে অনপসরণীয় দাগ আঁকিয়া দিল। মনে হইল, তিনি যেন সমস্ত প্রকৃত ব্রহ্মপ্রবক্তাদের রহস্যের ও আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার মূর্ত বিগ্রহ ; অথচ ইহারই সহিত তাঁহার সর্বমানবের প্রতি একটা সারল্যমণ্ডিত সদয় ও বিনম্র ব্যবহারের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বহু বৎসর পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কলিকাতার বাহিরে বেলুড় মঠে বহু সহস্র ভক্তের অর্থে নির্মিত এই ব্যক্তিরই স্মৃতিমন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন তাঁহার বেদীতে অর্পণের জন্য একছড়া মালতী-মালা তুলিয়া ধরিলাম, তখন আমার আবেগময় হৃদয়ে এই কথাই জাগিল, জীবনে যে একবারমাত্র আমি এই সাধুপুরুষের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম, সেই একমুহূর্তের মধ্যেই তিনি একটি কথা না বলিয়াও আমার নিকট ভারতের মর্মকথা এমন ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, যাহার অধিকতর আভাস আমি অতঃপর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বহু বক্তৃতাতে বা ভারতবাসীর বক্তৃতাতেও পাই নাই।"

প্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক অ্যালবার্ট স্পল্ডিং-এর 'রাইজ টু ফলো' নামক পুস্তকে এই আমোদজনক বিবরণটি পাওয়া যায় : "একবার এক ভারতবর্ষীয় সাধু আহার করিতে আসিলেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহ নহেন। মাসিমা (বা খুড়ীমা) স্তালী তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইলেন, যদিও স্বামীজীর অসংখ্য ভক্তেরা তাঁহাকে যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারী মনে করিতেন তিনি তাহার তেমন কিছুই বুঝিতেন না ; চারিদিকে যে প্রশংসাবাক্যের ছড়াছড়ি শুনিতেন, তিনি তাহা দু-একটি চুটকি কথাতেই উড়াইয়া দিতেন। স্বামীজীর বিলাসবর্জিত কঠোরতা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'কঠোর জীবনই বটে !

আমি তোমাদের সাদা কথায় বলে দিচ্ছি—এই ব্যক্তি ভারতবাসী বা অন্যদেশ-বাসী, ধর্মযাজক বা অন্য যাহা কিছুই হউন না কেন, ইনি বনফুল চুষে এমন বিরাট বপুটি পান নি।' আপত্তি হইল, 'কিন্তু মাসিমা, আপনি নিজেও জানেন যে, আপনি এঁকে পছন্দ করতেন। আপনার আচরণেও আপনি তাই দেখিয়ে-ছিলেন।' 'পছন্দ তো তাঁকে অবশ্যই করি', মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, 'অনেককেই তো পছন্দ করি; কিন্তু পছন্দ করলেই যে তাঁদের ন্যাজারেথের যীশুখ্রীষ্ট মনে করতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই!'···আমাদের সান্ধ্য আসরগুলিতে প্রায়ই সঙ্গীত হইত, এমন কি স্বামীজীও বাদ পড়িতেন না—যদিও আমার মার বিবেক-বুদ্ধি অধিক রাত্রি পর্যন্ত সঙ্গীত চলার বিরোধী ছিল।"

স্বামীজী ২রা মে মিস ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখিয়াছিলেন, "৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত বস্টনে বক্তৃতাদি আছে।" আবার ৪ঠা মে অধ্যাপক রাইটকে লিখিয়াছিলেন, "আমি রবিবার (৬ই মে) বস্টনে যাব। মিসেস হাউ-এর উইমেন্স ক্লাবে (মহিলা-সংসদে) সোমবার বক্তৃতা দেবার কথা।" শ্রীযুক্তা জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ তখন বৃদ্ধা হইলেও বহু সৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল এবং বিদুষী বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার সুব্যবস্থায় সোমবারে মহিলা-সংসদে যে বক্তৃতা হয় উহার কোনও বিবরণ সংরক্ষিত হয় নাই। পরদিবস স্বামীজী র‍্যাডক্লিফে একটি মহিলা-মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। উহা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। অধ্যাপক রাইট-এর স্ত্রীর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়:

"৭ই মে, ১৮৯৪। স্বামী বিবেকানন্দ নামক এক প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিকে ঐ পরিবারে এক সপ্তাহ থাকিবার জন্য শ্রীযুক্ত রাইট নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী বস্টনের একটা হোটেলে থাকাই পছন্দ করিয়াছিলেন।···পূর্বের গ্রীষ্ম-কালেও তিনি এই পরিবারে বাস করিয়াছিলেন।

"শনিবার, ১২ই মে, ১৮৯৪। মঙ্গলবারে (৮ই মে) স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় ধর্মমত সম্বন্ধে মহিলা-মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি ছিল খুব কবিত্বময় ও শ্রদ্ধাপরিপূর্ণ এবং উহাতে এমন একটা আবেগ ছিল যাহা অন্ততঃ তৎক্ষণের জন্য অপরকে মতান্তর হইতে স্বমতে লইয়া আসিতে পারিত। যেসকল মেয়ের মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ নাই, এমনও অনেক মেয়ের মুখ গাম্ভীর্যপূর্ণ হইল ও তাহারা এমন মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনিতে লাগিল যে, মনে হইল বক্তার

কথাগুলি বুঝিবার জন্য তাহারা সর্বতোভাবে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যখন তিনি আমাদের দোষগুলি দেখাইতে লাগিলেন এবং আমাদের আহাম্মকির ও পাপের কথা খুলিয়া বলিতে থাকিলেন তখন তাঁহার চিন্তা নিম্নতর স্তরে নামিয়া আসিল, এবং খোঁচা খাইয়া মানুষ যেমন কাষ্ঠহাসি হাসে, মেয়েরা তেমনি হাসিতে লাগিল। তিনি বলিলেন: 'উচ্চবর্ণের ভারতীয় বিধবাদের বিবাহ হয় না, শুধু নিম্নজাতির বিধবারা পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে, (স্বচ্ছন্দে) আহার-বিহার করিতে পারে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে, এককথায় এদেশের (আমেরিকার) সমৃদ্ধ সমাজে লভ্য সর্বপ্রকার সুবিধাই তাহারা পায়।' আমরা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

বৃহস্পতিবারে (১০ই মে) বিবেকানন্দ শ্রীযুক্ত কলিজ-এর গৃহে রাউণ্ড টেবিলে বক্তৃতা করিলেন। এখানেও তিনি আমেরিকানদের বিরুদ্ধে টিপ্পনী কাটিয়া আবার আনন্দ-সম্ভোগ করিলেন। কথার খোঁচা সব ছিল হাস্যরসপূর্ণ, তিক্ত ও তীব্র, অথচ যথাযোগ্য, সুন্দরভাবে প্রকাশিত এবং সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর অনুযায়ী। কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব পরিবেশনের ক্ষমতাও তিনি রাখিতেন। হরিদ্রাবর্ণের পাগড়ি ও কমলা-রং-এর আলখাল্লায় তাঁহাকে বেশ সুন্দর মানাইতেছিল এবং কথাগুলিও তিনি বলিতেছিলেন বেশ মান বজায় রাখিয়া। আমেরিকাকে তিনি ধনমর্যাদা, অনৈতিকতা ও ধর্মহীনতার জন্য নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমরা যখন ধর্মান্ধ হই, আমরা বিরাট রথতলে নিজেদের নিষ্পেষিত করি, নিজেদের গলায় ছুরি দিই বা কণ্টকশয্যায় শয়ন করি। আর তোমরা যখন ধর্মান্ধ হও, তখন তোমরা অপরের গলায় ছুরি দাও, তাহাদের আগুনে পোড়াইয়া যন্ত্রণা দাও এবং তাহাদের জন্য কণ্টকশয্যা রচনা কর। কিন্তু নিজেদের চামড়া তোমরা খুবই সাবধানে বাঁচাইয়া চল'।"

স্থলবিশেষে স্বামীজী কঠিন সত্যকে নিরাবরণরূপে আমেরিকান সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অধিকাংশক্ষেত্রেই ইহার ফল আশানুরূপ হইত, অর্থাৎ বুদ্ধিমান শ্রোতারা নিজের স্বরূপ আলোচনা-মুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়া নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের জন্য বক্তার প্রশংসা করিতেন এবং নিজজীবনে দোষসংশোধনে প্রবৃত্ত হইতেন। তবে উন্মোচিত সত্যের উজ্জ্বল আলোক সকলে সহ্য করিতে পারে না, বিশেষতঃ মোহান্ধকারের পর যখন উহা

অকস্মাৎ বিপরীত দিক হইতে চক্ষের উপর আসিয়া পড়ে। অতএব ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে যে, স্থলবিশেষে তাঁহার সমালোচনা শ্রুতিমধুর হইত না, এমন কি শ্রোতারা যতখানি সহ্য করিতে পারিবে, তাহার মাত্রা অতিক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া স্বামীজী নিজেও দুঃখিত হইতেন। ইংরেজী জীবনীতে উল্লিখিত আছে যে, একদিন বস্টনের এক বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট 'মদীয় আচার্যদেব'[১] বিষয়ে ভাষণ দিবার সময় এইরূপ এক শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা আমরা পরে বলিব। এই বক্তৃতাটি ঠিক কবে বস্টনে প্রদত্ত হয়, জানা নাই। সম্ভবতঃ ইহা এই সময়ের নহে, কারণ তিনি ১লা মে তারিখে ইসাবেলকে জানাইয়াছিলেন, তিনি বস্টনে ছয়টি বক্তৃতা দিবেন। 'মদীয় আচার্যদেব' ঐ ছয়টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হয় ৭ই মে শ্রীযুক্তা হাউ-এর মহিলা-সংসদে, দ্বিতীয় বক্তৃতা পরদিন র‍্যাডক্লিফ মহাবিদ্যালয়ে এবং তৃতীয় বক্তৃতা ১০ই মে শ্রীযুক্ত কলিন্স-এর রাউণ্ড-টেবিলে। ('নিউ ডিসকভারিজ', ৩৮৬)।

অতঃপর 'বস্টন ইভনিং ট্র্যান্সক্রিপ্ট' পত্রিকা হইতে জানা যায়: "টাইলার স্ট্রীটে অবস্থিত ডে নার্সারীর (দিবাভাগে পরিচালিত শিশু-বিদ্যালয়ের) সাহায্য কল্পে শ্রীযুক্ত স্বামী বিব্‌কানন্দ সোমবার (১৪ই মে) অপরাহ্ণে অ্যাসোসিয়েশন হলে ভারতের রীতিনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। ১৬নং ওয়ার্ডের ডে নার্সারীর সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ বুধবার (১৬ই মে) অপরাহ্ণে অ্যাসোসিয়েশন হলে ভারতের ধর্মসমূহসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। তাঁহার ব্যাখ্যাতব্য বিষয়মধ্যে থাকিবে পৌত্তলিকতা ও প্রতিমাপূজার পার্থক্য, ভগবান সম্বন্ধে ভারতীয়দের বিভিন্ন ধারণা এবং প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের মতবাদ।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বামীজী ভারতের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আসিয়াও আমেরিকার সৎ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

ভারতের রীতিনীতি সম্বন্ধীয় বক্তৃতার সারমর্ম এই: "হিন্দুজাতি নারী-সমাজকে ঘৃণা করে বলিয়া যে বিবাহ হইতে বিরত হয়, তাহা নহে, কিন্তু ইহার

১। বর্তমানে 'বাণী ও রচনাতে' ঐ নামীয় যে বক্তৃতা আছে, উহা প্রদত্ত হয় নিউ ইয়র্কে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুআরি; ঐ বৎসরের শেষে ইংলণ্ডের উইম্বলডনেও স্বামীজী ঐ বিষয়ে বলেন। এই দুই বক্তৃতা একসঙ্গে মিলাইয়া 'মদীয় আচার্যদেব' প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে (ঐ, ৮।৩৭৭)।

কারণ এই যে, আমাদের ধর্ম আমাদিগকে নারীগণকে মাতৃরূপে পূজা করিতে বলে। প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যেক নারীকে মাতৃরূপে দেখিতেই শিক্ষা পায়, আর মাতাকে তো কেহ বিবাহ করিতে পারে না। ভগবান আমাদের মা। আমরা স্বর্গবাসী কোন ভগবানের ধার ধারি না, তিনি আমাদের মা। বিবাহকে আমরা অধ্যাত্মজীবনের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অবস্থাই মনে করি, আর কেহ যদি বিবাহ করে, তবে সহধর্মিণী পাইবার আশাতেই ঐরূপ করে। তোমরা বল, আমরা মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার করি। জগতের কোন্ জাতি না নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে? ইওরোপ ও আমেরিকায় অর্থলোভে লোকে স্ত্রীগ্রহণ করে, এবং অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।...আমাদের দেশে গুণকর্মানুযায়ী জাতিবিভাগ হয়, অর্থানুযায়ী নহে।...সমবর্ণের অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনীর সমান।...অর্থ জগতে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটাইয়াছে এবং খ্রীষ্টানদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে।...এখানে সব তাড়াহুড়া, কার্যব্যস্ততা ও ঠেলাঠেলি। জাতিপ্রথা মানুষকে এই সকল হইতে অব্যাহতি দেয়। ইহা মানুষকে অল্প অর্থেও জীবনধারণের উপায় দেখাইয়া দেয় এবং ইহা সকলেরই জন্য কর্মসংস্থান করিয়া দেয়। বর্ণাধীন ব্যক্তি আত্মচিন্তার সময় পায়, আর ভারতীয় সমাজ ইহারই জন্য উদ্‌গ্রীব।...যে মানুষ যত উচ্চ বর্ণে জন্ম লয়, তাহার সামাজিক শাসন ততই অধিক। বর্ণবিভাগ আমাদিগকে হিন্দুজাতি হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং ইহাতে ত্রুটি প্রচুর থাকিলেও ইহার গুণ তদপেক্ষা অধিক।...”

ভারতের ধর্মসমূহ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি মুসলমান ধর্ম হইতে আরম্ভ করেন। অতঃপর পার্সীদের ধর্মের কথা তুলেন। পরে হিন্দুদের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, “হিন্দুরা বেদকেই তাহাদের শাস্ত্র বলিয়া মানে। হিন্দুরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাতি ও আচার-বিচারের অধীন করিয়াছে বটে, পরন্তু ধর্মবিষয়ে চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে।...হিন্দুরা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী এবং প্রত্যেক সাধকের অধ্যাত্মজীবনে অগ্রগতির পক্ষে এইগুলি স্বাভাবিক ক্রমিক স্তর বলিয়া স্বীকৃত হয়।...ধর্ম পুস্তকাদিতে সীমাবদ্ধ নহে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ডুবিয়া গিয়া সেখানে ঈশ্বরের ও অমৃতের সন্ধান পাওয়াকেই বলে ধর্ম।” অবশেষে জৈনদের কথা তুলিয়া তিনি বলেন, “ইহাদের মতে অহিংসা পরমো ধর্মঃ।”

১৬ই মে অপরাহ্ণে প্রদত্ত পূর্বোক্ত বক্তৃতার পর সন্ধ্যা ৮টায় তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেন হার্ভার্ড রিলিজিয়াস ইউনিয়ন-এর নেতৃত্বে 'সেভার হলে'। বক্তৃতায় তিনি বলেন, "ভারতে বহু ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় আছে, ইহাদের কেহ কেহ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। কিন্তু হিন্দুরা যে কোন মতেরই অনুগামী হউক না কেন, তাহারা কখনই বলে না যে, একমাত্র তাহাদেরই মত সত্য এবং অপর সব ভুল। তাহারা বিশ্বাস করে, ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথ আছে।...সন্ন্যাসীর পক্ষে দুইটি ব্রত গ্রহণীয়—অটুট ব্রহ্মচর্য এবং দারিদ্র্য।"

নিউ ইয়র্কের ন্যায় বস্টনেও স্বামীজী বহু বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা ওলি বুল সর্বাগ্রগণ্যা। ইনি অতঃপর তাঁহাকে সর্বদা বহুভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা ওলি বুলের সহিত স্বামীজীর প্রথমে কোথায় কিভাবে দেখা হয় তাহা সঠিক জানা নাই। কেম্ব্রিজের বাড়িতে স্বামীজীর সহিত তাঁহার মে মাসে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই সাক্ষাৎকার না হইয়া থাকিলেও জুলাই-অগস্ট মাসে গ্রীণএকর সম্মেলনে যে শ্রীমতী বুল উপস্থিত ছিলেন তাহা স্বামীজীর ৫ই অগস্টের (১৮৯৪) পত্র হইতে জানা যায়। বস্টন হইতে স্বামীজী ২৪শে মে নাগাদ চিকাগোর হেলদের গৃহে উপস্থিত হন। সেখানে ২৭শে জুন পর্যন্ত থাকিয়া ২৮শে জুন প্রাতে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন।

অপবাদ ও প্রতিকার

আমেরিকার মধ্য ও পূর্ব প্রান্তে স্বামীজীর বিজয় বিঘোষিত হইল এবং সর্বত্র বহু বন্ধুলাভ ঘটিল সত্য, কিন্তু চিকাগো-বিজয়ের দিন হইতেই শত্রুবৃদ্ধিও হইতেছিল যথেষ্ট। ইহার কারণ ঈর্ষা, স্বার্থে বিঘ্ন ও স্বমতপ্রতিষ্ঠায় বাধা। ব্রাহ্মসমাজের ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির যে প্রতিপত্তি পূর্বে আমেরিকায় ছিল, স্বামীজীর অকস্মাৎ অভ্যুদয়ে তাহা অনেকটা ম্লান হইয়া গেল; আবার ভারতীয় সমাজের কাল্পনিক কুৎসিত চিত্র আমেরিকান সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া এই অবনত বিধর্মীদের কল্যাণকল্পে মিশনরীরা অতি সহজে অর্থসংগ্রহের যে হীন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অধিকন্তু স্বামীজী খোলাখুলিভাবেই মিশনরীদের প্রচারপ্রণালীর নিন্দা ও অর্থব্যয়ের তুলনায় তাঁহাদের সাফল্যের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইয়া মিশনরীদের অনেককে খেপাইয়া তুলিলেন। এই সমস্তের সম্মিলিত বেগ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। বিরুদ্ধ-পক্ষীয়েরা যুক্তির পথে না চলিয়া ও সত্যনির্ধারণের চেষ্টায় ব্রতী না হইয়া স্বামীজীর ব্যক্তিগত সর্বনাশের সহজ পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের আক্রমণ দুইটি বিশেষ ধারায় পরিচালিত হইল। প্রথমতঃ তাঁহারা দেখাইতে চাহিলেন, স্বামীজী দুশ্চরিত্র, অতএব আমেরিকার সম্ভ্রান্ত পরিবারে অগ্রহণীয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বমত প্রকাশ করিতেছেন মাত্র; তিনি কোনও সম্প্রদায় বা সমিতির মুখপাত্র নহেন, তাঁহার প্রচারিত মতসমূহ হিন্দুদের নিকট অগ্রাহ্য। সুতরাং আমেরিকান সমাজে তিনি ভারতের প্রতিনিধি বা প্রবক্তারূপে স্বীকৃত হইতে পারেন না।

এই আক্রমণ যে কত সফল হইয়াছিল এবং স্বামীজীকে কতটা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ঐ কালের স্বামীজীর পত্রাবলীতে সুস্পষ্ট। পত্রাবলী হইতে ইহাও প্রতীত হয় যে, প্রথমে তিনি এই শত্রুতাতে মোটেই বিচলিত হন নাই; কিন্তু পরে যখন মনে হইল, এই মিথ্যাপ্রচার এতটা প্রসারিত হইয়াছে এবং উহা এমন রূপ ধারণ করিয়াছে যে, উহাতে তাঁহার আমেরিকায় আসার উদ্দেশ্য পর্যন্ত ব্যর্থ হইতে পারে, তখন তিনি ইহার প্রতিকারকল্পে বন্ধুদের সাহায্য পাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে সরাসরি কোন প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই—উহা

তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ভারতীয় বন্ধুগণকে ইহার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইতে বলার কারণ এই ছিল যে, ভারতীয়গণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বিজয়ে উৎফুল্ল হইলেও এবং সংবাদপত্রাদি এইজন্য কিঞ্চিৎ সন্তোষ প্রকাশ করিলেও, হিন্দুসমাজ স্পষ্টতঃ তখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই কথা বলে নাই যে, বিবেকানন্দের মুখের বাণী ভারতেরই মর্মবাণী, হিন্দুসমাজ তাঁহার সহিত একমত। এই স্বীকৃতি-লাভের অভাবে বিবেকানন্দের মর্যাদা আমেরিকার সমাজে বিপর্যস্ত হইবে, এ কথা ভারতীয় বন্ধুগণ মোটে ধারণাই করিতে পারেন নাই। চিকাগো-বিজয়ের পর দীর্ঘকাল অতীত হইলেও ভারতীয় সমাজ এই বিষয়ে কিছুই করে নাই দেখিয়া স্বামীজী ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের সাহস বর্ধিত হইয়াছিল এবং বিদেশীয়দের মন সন্দেহাকুল হইয়াছিল। এই ত্রুটি অবশ্য ভারতবাসীদের ইচ্ছাকৃত নহে। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের অধীনে থাকিয়া তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিতে এবং জাতীয় গৌরব-সংরক্ষণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই স্বামীজীকে বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ স্বীয় কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছিল। এই সাধারণ বিষয়ে অপরের সাহায্য চাহিলেও তিনি স্বীয় চরিত্রসমর্থনের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হন নাই।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বামীজীর সাফল্যদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া আমেরিকায় থাকাকালেই পাদ্রীদের নিকট বলিতে থাকেন যে, স্বামীজী বস্তুতঃ অজ্ঞাত-কুলশীল ভুঁইফোড়। ১৯শে মার্চ (১৮৯৪) তারিখের পত্রে স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিয়াছিলেন, "মজুমদার পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, 'ও কেউ নয় ঠক্ জোচ্চোর, ও তোমাদের দেশে এসে বলে—আমি ফকির' ইত্যাদি বলে আমার ওপর তাদের মন বিগড়ে দিলে" ইত্যাদি ('বাণী ও রচনা', ৬।৪০৯-৪১০)। আমেরিকায় সে নিন্দাবাদ তখনই তেমন ফলপ্রসূ না হইলেও তিনি বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জলিত রাখেন এবং স্বদেশে ফিরিয়াও অপপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। স্বামীজী তাই ১৮ই মার্চের (১৮৯৪) পত্রে মেরীকে লিখিয়াছিলেন, "মজুমদার কলকাতায় ফিরে গিয়ে রটাচ্ছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় সব রকমের পাপ কাজ করছে।...এই তো তোমাদের আমেরিকার 'অপূর্ব আধ্যাত্মিক পুরুষ!'...মজুমদার বেচারীর এতদূর অধঃপতনে আমি বিশেষ দুঃখিত। ভগবান ভদ্রলোককে কৃপা করুন।" এই পর্যন্ত দেখা যায়, স্বামীজী সব শুনিয়াও প্রতিকারে নিরস্ত; ভগবানেরই

উপর নির্ভর করিতেছেন। হয়তো ইহার জন্য কোন দৈব ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন, হয়তো তিনি জানিতেন, তিনি দেবরক্ষিত। এইপ্রকার বিশ্বাসের কারণস্বরূপ: একটি ঘটনা তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছিলেন: ডেট্রয়েটে এক নৈশভোজে স্বামীজী কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে যাইবেন, এমন সময় দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "খাসনি, ও বিষ!" অলৌকিকতায় যিনি বিশ্বাসী নহেন, তিনিও এই ঘটনা হইতে অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া স্বামীজীর বিরুদ্ধে তখন এমনই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি প্রাণনাশের সম্ভাবনার কথা পর্যন্ত ভাবিতেন এবং তাঁহার অবচেতন মন এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। আর অত্যন্ত সাধারণ লৌকিকভাবে দেখিলেও মনে হয়, যেসব হীনমনা ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক মহাপুরুষের চরিত্রকে লোকচক্ষে লাঞ্ছিত করিতেও প্রস্তুত তাহারা তাঁহার প্রাণনাশে সচেষ্ট হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? স্বামীজী অবশ্য বিদেশে সম্পূর্ণ বন্ধুহীন ছিলেন না। মজুমদারের আমেরিকায় অপপ্রচারের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ সম্বন্ধে একটি ঘটনা জানিতে পারা গিয়াছে: আমেরিকায় যাইবার পূর্বে মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। স্বামীজী ঐ পুস্তিকাখানি ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়া বন্ধুমহলে বিতরণ করেন, অন্যসূত্রেও উহা শিক্ষিত ব্যক্তিদের হস্তগত হয়। অতঃপর হিংসায় মতিচ্ছন্ন হইয়া মজুমদার স্বামীজীর বিরুদ্ধে যখন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন এক সান্ধ্য মজলিশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামীজীর নিন্দায় মাতিয়া উঠিলে উপস্থিত একজন অতিথি ঐ পুস্তিকা মজুমদারের হাতে তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করেন, "আপনিই না এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন?" মজুমদার কি উত্তর দিয়াছিলেন জানা নাই, জানিবার প্রয়োজনও নাই; কারণ এইরূপ ব্যক্তি কিরূপ আবোল-তাবোল বকিতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতে অপপ্রচার কে কবে আরম্ভ করেন, তাহা অজ্ঞাত তবে মজুমদারের ইহাতে হাত ছিল, ইহা নিশ্চয়। কারণ তাঁহারই নেতৃত্বে পরিচালিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' নামক পত্রিকার এই অংশটি 'বস্টন ডেলি অ্যাডভার্টাইজার' পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়: " 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা তাহার হালের কয়েক সংখ্যায় নব-হিন্দু বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ওরফে বিবেকানন্দের

প্রশংসায় দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। এই সন্ন্যাসীর নামে এইরূপ স্তুতিবাদ মুদ্রণের বিরোধী আমরা নহি। কিন্তু যেদিন তিনি নববৃন্দাবন নাটকে অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন এবং যখন হইতে তিনি নগরের এক ব্রাহ্মসমাজে গান করিতে আরম্ভ করেন, সেদিন হইতেই আমরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ ওয়াকিবহাল আছি যে, সংবাদপত্রের কোনরূপ স্তুতিবাদই উহার উপর কোন নবীন আলোকসম্পাত করিতে পারে না। আমাদের পুরাতন বন্ধু সম্প্রতি আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত। কিন্তু আমরা ইহাও অবগত আছি যে, আমাদের বন্ধু যে নব-হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, উহা গোঁড়া হিন্দুধর্ম নহে। কালাপানি পার হওয়া, ম্লেচ্ছদের অন্ন গ্রহণ করা এবং অবিরাম সিগার টানিয়া যাওয়া ইত্যাদির কথা হিন্দুধর্ম ভাবিতেও পারে না। খাঁটি হিন্দুদের জন্য আমাদের যতখানি শ্রদ্ধা আছে, আধুনিক হিন্দুত্বের অনুগামী কেহ সে শ্রদ্ধার দাবি করিতে পারেন না। বিবেকানন্দের সুখ্যাতি-বৃদ্ধির জন্য আমাদের সহযোগী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যখন আজগুবী বাজে কথা ছাপাইতে আরম্ভ করেন, তখন আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।" এই শ্লেষপূর্ণ উক্তিগুলিতে সাদা কথায় বলা হইল—স্বামীজী অধুনা বিবেকানন্দ হইলেও আসলে তিনি বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, আর তিনি খাঁটি হিন্দু নহেন, তিনি ম্লেচ্ছাহারভোজী, তাম্রকূটসেবী, সাগর-লঙ্ঘনকারী, গায়ক ও অভিনেতা—এক কথায় স্বেচ্ছাচারী ও আমোদপ্রিয় (বোহেমিয়ান)! আর উহাতে একটি সত্য চাপিয়া যাওয়া হইল। 'নববৃন্দাবন' নাটকে কেশবচন্দ্রও রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারূপে নামিয়াছিলেন এবং যোগীর ভূমিকায় আর কাহাকেও না পাইয়া সুগায়ক সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজী নরেন্দ্রনাথকে সাধ্য-সাধনা করিয়া যোগী সাজানো হইয়াছিল। স্বামীজী তখন প্রার্থনাকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গান গাহিতেন এবং ঐ সমাজ কেশবচন্দ্রকে কপটাচারী মনে করিয়া নববিধানবিরোধী ছিল। 'বস্টন ডেলি অ্যাডভার্টাইজার'-এর এই উদ্ধৃতিটি ভারতীয় দুইটি খ্রীষ্টান পত্রিকায় মন্তব্যসহ ১৬ই মে ছাপানো হয় এবং ঐ সঙ্গে সুদীর্ঘ প্রবন্ধও বাহির হয়। এই সমস্তই আবার 'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস' পত্রিকায় ১১ই জুন তারিখে হুবহু মুদ্রিত হইয়া বিবেকানন্দের কুৎসারটনায় ইন্ধন যোগাইয়াছিল।

কিন্তু আমেরিকার শিক্ষিত সমাজকে ঠকানো অত সহজ ছিল না। স্বামীজীর পক্ষ সমর্থন করিয়া এক ভদ্রলোক ১৭ই মে তারিখের 'বস্টন ডেলি অ্যাডভার্টাই-

জারে' এক পত্রে এই মন্তব্য করেন যে, স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রচারিত তিনটি উক্তির মধ্যে দ্বিতীয়টি খ্রীষ্টানদের এবং তৃতীয়টি ব্রাহ্মসমাজের—যাহার প্রতিনিধি মজুমদার হিন্দুদের কোন সম্প্রদায়েরই প্রবক্তা ছিলেন না। ঐ সঙ্গে পত্রলেখক স্বামীজীর স্বপক্ষে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকার উক্তি হইতে প্রমাণ করিয়া দেন যে, স্বামীজী হিন্দুদেরই প্রতিনিধি। 'অমৃতবাজারে' এই উক্তি ছিল: "যাঁহারা হিন্দুদের সম্বন্ধে সর্বদা এই কথাই শুনিয়া আসিয়াছেন যে, তাহারা ভূত-প্রেতাদির উপাসক, তাঁহারা বিশ্রুতকীর্তি স্বামী বিবেকানন্দের এবং তদপেক্ষাও অতিবরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী হইতে হিন্দুধর্মের যথার্থস্বরূপ জানিতে পারিবেন।" আমেরিকান পত্রলেখক আরও উল্লেখ করিলেন যে, 'বেঙ্গলী' পত্রিকাও স্বামীজীর পক্ষসমর্থক।

একদিকে মজুমদার অপরদিকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা। চিকাগো-বিজয়ের পর হইতেই এই শত্রুতা আরম্ভ হইলেও স্বামীজী উহাতে বিচলিত হন নাই। আবার মিশনরীদের বিরোধিতার সংবাদ ভারতে পৌঁছিয়াছে জানিয়াও তিনি উহাতে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, ইহা মাদ্রাজের ভক্তদিগকে লিখিত তাঁহার ২৪শে জানুআরির (১৮৯৫) পত্রে প্রমাণিত হয়: "আমি আশ্চর্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে। 'ইন্টিরিয়র' পত্রিকার যে সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছ, তাহা সমুদায় আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোক 'নীল-নাসিক (ব্লু নোজ) প্রেসবিটেরিয়ান'দের কাগজ বলে। এ সম্প্রদায় খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। ⋯ অবশ্য ভারতীয় মিশনরীগণ যে ইহা লইয়া একটা হুজুক করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগকে বলিও— 'হে য়াহুদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে'।" মনে রাখিতে হইবে, তখনকার দিনে ডাক যাতায়াতে যথেষ্ট সময় লাগিত। অতএব 'ইন্টিরিয়র'-এর বিবরণ ভারতে প্রকাশিত হইয়া আলাসিঙ্গার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং আলাসিঙ্গা হইতে স্বামীজীর নিকট পত্র পৌঁছিতে অন্তত: তিন মাস লাগিয়া থাকিবে; অর্থাৎ 'ইন্টিরিয়রের' ঐ

অপপ্রচারের তারিখ ২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৩-এর পূর্বে বা ধর্মমহাসভার প্রায় ঠিক পরে।

মিশনরীদের খেপিয়া যাওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, স্বামীজীর বক্তৃতা হইতে বিদেশের যথার্থ সংবাদ পাইয়া আমেরিকার জনসাধারণ ধর্মান্তরিতকরণের জন্য চাঁদার পরিমাণ বিস্তর কমাইয়া ফেলে। পাদ্রীদেরই নিজস্ব বিবরণে প্রকাশ : "বিবেকানন্দের সাফল্য ও প্রচারের পরিণতিস্বরূপ মিশনরীদের তহবিলে দানের পরিমাণ এক বৎসরে দশ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় দেড় কোটি টাকা) কমিয়া গিয়াছে।" অতএব পাদ্রীপুঙ্গবদের কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জাহান্নমে যাইতে হয় তো তাহাও স্বীকার, কিন্তু নচ্ছার বিবেকানন্দের সর্বনাশ করিতেই হইবে।"

ভারতে ও আমেরিকায় যে নিন্দাবাদ চলিতেছিল, তাহার স্বরূপ ও রচয়িতাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত স্বামীজী ৯ই এপ্রিল (১৮৯৪) আলাসিঙ্গাকে লিখিলেন, "অবশ্য গোঁড়া পাদ্রীরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, আর মজুমদারবাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চয় হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদমাশ, আবার কলকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বলছেন, আমি ঘোর পাপে মগ্ন, বিশেষতঃ আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছি !!! প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন।" মহাপুরুষ যেভাবে অপবাদের উত্তর দিয়া থাকেন, স্বামীজীর এই উত্তর ঠিক তদ্রূপই বটে। কিন্তু তখন যুগপরিবর্তন ঘটিয়াছে—প্রাচীন প্রচলিত ধারায় বর্তমান যুগে কোন কার্য সুসাধিত করা অসম্ভব। যুগ-প্রয়োজনে কার্যপ্রণালী পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। বিশেষতঃ যেরূপ দুঃসাহসিকতা অবলম্বনে স্বামীজী বিদেশে প্রচারকার্যে নিরত হইয়াছিলেন, ঐরূপ কার্যের সাফল্যের জন্য ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতার আবশ্যক ছিল। এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকালেও স্বামীজীর দেশবাসীর বা ভক্তগণের মনে ইহার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কাজেই যুগধর্মের সহিত পরিচিত স্বামীজী প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও ভক্তদিগকে পত্রের মারফত এই বিষয়ে একটু কার্যকর উপদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত পত্রেই স্বামীজী তাই আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন,

"একটা জিনিস করা আবশ্যক—যদি পারো। মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পারো? রামনাদের রাজা বা ঐরূপ একজন বড়লোক কাকেও সভাপতি ক'রে ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে দিতে পারো যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (—অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাকো)। তারপর সেই প্রস্তাবটি 'চিকাগো হেরাল্ড', 'ইন্টারওশ্যান', 'নিউ ইয়র্ক সান' এবং ডেট্রয়েট (মিশিগান) থেকে প্রকাশিত 'কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজার' কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে।··· প্রস্তাবের কয়েকটি কপি ধর্ম-মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাবে।···এই সভাটা যত বড় হয়, তার চেষ্টা করবে। যত বড় বড় লোককে পারো, ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করবে; তাঁদের ধর্মের জন্য, দেশের জন্য তাঁদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজ ও তাঁর দেওয়ানের নিকট হ'তে সভা ও তার উদ্দেশ্যের সমর্থন ক'রে চিঠি নেবার চেষ্টা কর—খেতড়ির মহারাজের নিকট থেকেও ঐরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর—মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও তাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা কর।···ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা এখানে যা তা বলছে। যত শীঘ্র হয়, তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিতে হবে।" স্বামীজী ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ কার্যকুশলতায় তখনও সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন না বলিয়াই এত খুঁটিনাটি বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায়ও যাহাতে ঐরূপ সভা হয় তাহারও জন্য চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। এই সমস্তই কিন্তু আরব্ধ কার্যের খাতিরে—নিজের চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যাপবাদ-স্খালন বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলিলেন না। আবার কিছু করা না করা বিষয়েও তিনি আলাসিঙ্গা প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। তিনি লিখিলেন, "যদি পারো"—যদিও তাঁহারা ছিলেন তাঁহার আজ্ঞাবহ ভক্ত এবং ইচ্ছা করিলেই তিনি আদেশ করিতে পারিতেন। আবার সাবধান করিয়া দিলেন, "আমার পত্রগুলি প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যতদিন না আমি ভারতে ফিরছি, ততদিন এইগুলির যতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করা যেতে পারে।"

অবশ্য মাঝে মাঝে ভারত হইতে প্রশংসার ধ্বনিও তাঁহার কর্ণে পৌছিতেছিল, যদিও ইহারই মধ্যে উত্থিত বিকট বেসুরো আওয়াজগুলি বড়ই মর্মন্তুদ ছিল। ২৬শে এপ্রিল তিনি ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখিয়াছিলেন, "ভারতের কাগজ-

পত্রের যে ডাক গতকাল পাঠিয়েছ,...ওর মধ্যে কলকাতায় প্রকাশিত আমার সম্বন্ধে একটি ছোট্ট পুস্তিকা আছে, যাতে দেখা গেল—'প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি' তাঁর নিজদেশে মর্যাদা পেলেন; আমার জীবনে অন্ততঃ একবারের জন্য এটা দেখতে পেলাম। আমেরিকান ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত আমার বিষয়ক অংশগুলি তার মধ্যে রয়েছে। কলকাতার পত্রাদির অংশগুলি বিশেষভাবে তৃপ্তিকর, কিন্তু প্রশংসাবাহুল্যের জন্য সেগুলি তোমাকে পাঠাব না।" এখানেও স্বামীজী আপন ভগিনী-সদৃশা ইসাবেলের নিকটও আপনাকে বাড়াইয়া দেখাইতে ব্যস্ত নহেন, আত্মীয়তা হিসাবে শুধু খাঁটি সংবাদ দিয়া যাইতেছেন আর বলিতেছেন, "এখন আমি লোকের কথা আর গ্রাহ্য করি না, আমার নিজের দেশের লোক বললেও না। কেবল একটি কথা—আমার বুড়ী মা এখনও বেঁচে আছেন, সারা জীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন, সে সব সত্ত্বেও মানুষ আর ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ করবার বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ আশার, তাঁর সবচেয়ে ভালবাসার যে ছেলেটিকে তিনি দান করেছেন, সে দূরদেশে গিয়ে—কলকাতায় মজুমদার যেমন রটাচ্ছে তেমনিভাবে—জঘন্য নোংরা জীবন যাপন করছে, এ সংবাদ তাঁকে একেবারে শেষ ক'রে দেবে। কিন্তু প্রভু মহান্, তাঁর সন্তানের ক্ষতি কেউ করতে পারে না। ঝুলি থেকে বেরাল বেরিয়ে পড়েছে—আমি না চাইতেই। ঐ সম্পাদকটি কে জানো?—আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক (নরেন্দ্রনাথ সেন), যিনি আমার অত প্রশংসা করেছেন এবং আমেরিকায় আমি হিন্দুধর্মের পক্ষ-সমর্থনে এসেছি ব'লে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তিনি মজুমদারের সম্পর্কিত ভাই !! হতভাগ্য মজুমদার! ঈর্ষায় জ্বলে মিথ্যা কথা ব'লে নিজের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি করলে। প্রভু জানেন আমি আত্মসমর্থনের[১] কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি।"

স্বামীজীর এইসকল পত্রে দেখা যায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন প্রকাশ্য উপায় অবলম্বন না করিলেও আমেরিকান অতিনিকট বন্ধুদের নিকট অন্ততঃ অকাট্য তথ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ না করিলে তাঁহার আমেরিকায় থাকাই অসম্ভব হইয়া পড়িত—ইহা অতি সাধারণবুদ্ধির লোকও বুঝিতে পারে। তাছাড়া প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া

---

১ আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আত্মসমর্থনের জন্য নহে, হিন্দুদের আত্মরক্ষার জন্য।

দিলেও বন্ধুত্বের একটা নিজস্ব দাবি আছে। তাই তিনি মে মাসের মাঝামাঝি (১৮৯৪) অধ্যাপক রাইটকে লিখিয়াছিলেন, "ইতোমধ্যে আপনি পুস্তিকা ও চিঠিগুলি পেয়ে গেছেন। যদি আপনি চান, তাহলে চিকাগো থেকে ভারতীয় রাজা ও রাজমন্ত্রীদের কয়েকখানি চিঠি পাঠাতে পারি।...আমি যে প্রতারক নই, তা আপনাকে বিশ্বাস করাবার জন্য তাদের আপনার কাছে লিখতে ব'লব, আপনি যদি এটা পছন্দ করেন। কিন্তু ভ্রাতঃ, এসব বিষয়ে গোপনতা ও অপ্রতিকারই আমাদের জীবনের আদর্শ।...হে সহৃদয় বন্ধু, সর্বপ্রকারে আপনার সন্তোষ বিধান করতে ন্যায়তঃ আমি বাধ্য। আর বাকি পৃথিবীকে—তাদের বাতচীতকে আমি গ্রাহ্য করি না। আত্মসমর্থন সন্ন্যাসীর কাজ নয়। আপনার কাছে তাই আমার প্রার্থনা, আপনি ঐ পুস্তিকা ও চিঠিপত্রাদি কাউকে দেখাবেন না বা ছাপাবেন না।" এই পত্রের শেষাংশে স্বামীজীর ব্যথিতহৃদয় হইতে একটি অতি দুঃখ-বিষাদ-মিশ্রিত কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, "আমি কোনদিন 'মিশনরী' ছিলাম না, কোনদিন হবোও না—আমার স্বস্থান হিমালয়ে। পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে পরিতৃপ্তহৃদয়ে অন্ততঃ এ কথা আজ আমি বলতে পারি, 'হে প্রভু, আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখেছি, যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি এবং পেয়েছি—প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, প্রভু'!" অধ্যাপককে লিখিত ২৪শে মে তারিখের পত্রে আছে, "প্রিয় বন্ধু, আমি যে যথার্থই সন্ন্যাসী, এবিষয়ে সর্বপ্রকারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু সে কেবল 'আপনাকেই'। বাকি নিকৃষ্ট লোকেরা কি বলে না বলে, আমি তার পরোয়া করি না।" স্বামীজীর পত্র হইতেই জানা যায়, এই পর্যন্ত জুনাগড়ের দেওয়ানজী ও খেতড়ির মহারাজের পত্র এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ স্বামীজীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

স্বামীজীর কোন কোন পত্রে দেখা যায়, তিনি স্বদেশবাসীর নিকট স্বীয় কর্মের উপযুক্ত স্বীকৃতি না পাওয়ায় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন, আলাসিঙ্গা প্রভৃতিকে ভৎ'সনাও করিতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভারতের প্রতি প্রীতি তিনি কোন কালেই হারান নাই! ২৮শে মে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে।" কিন্তু ক্রমে তিনি দেখিতে পাইলেন, এই আদর সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ নিবৃত্ত হয় নাই। এবং তাঁহার কার্যের ক্ষতি হইতেছে। তাই তিনি

আলাসিঙ্গাকে প্রকাশ্য সভা ডাকিয়া আশু ইহার প্রতিকার করিতে লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও কিছু হয় নাই দেখিয়া ২০শে জুনের একখানি পত্রে জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝাইয়া লিখিলেন, "আমাদের হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে আমেরিকার জনসাধারণের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে একটি কথাও উক্ত না হওয়াতে ঐ সকল দুর্নাম যথেষ্ট ক্ষতির কারণই হইয়াছে। আমার দেশবাসী কেহ—আমি যে তাহাদের প্রতিনিধি—এ বিষয়ে কি একটি কথাও লিখিয়াছিল? কিংবা আমার প্রতি আমেরিকা-বাসীদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক একটি বাক্যও কি তাহারা প্রেরণ করিয়াছে? পক্ষান্তরে—আমেরিকাবাসীর নিকট তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছে যে, আমি একটি পাকা ভণ্ড এবং আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই আমি প্রথম গেরুয়া ধারণ করিয়াছি। অভ্যর্থনার ব্যাপারে অবশ্য এই সকল প্রচারের ফলে আমেরিকায় কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু অর্থসাহায্যের ব্যাপারে এই ভয়াবহ ফল ঘটিয়াছে যে, আমেরিকাবাসিগণ আমার কাছে একেবারে হাত গুটাইয়া ফেলিয়াছে। এই যে এক বৎসর যাবৎ আমি এখানে আছি—এর মধ্যে ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা লোকও এদেশবাসীকে এ কথাটি জানানো উচিত মনে করেন নাই যে, আমি প্রতারক নহি। ইহার উপর আবার মিশনরী সম্প্রদায় সর্বদা আমার ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর হইয়াই আছে এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পত্রিকাগুলিতে আমার বিরুদ্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিয়া এখানকার কাগজে ছাপা হইয়াছে। আর আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, এদেশের জনসাধারণ—ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ও হিন্দুতে যে কি পার্থক্য, তাহার খুব বেশী সংবাদ রাখে না।...আমার দেশের কেহ এই কথাটুকু আমেরিকাবাসিগণকে বলিতে পারিল না যে, আমি সত্যই সন্ন্যাসী, প্রতারক নই এবং আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি।...কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেওয়ানজী সাহেব, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি।...আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একান্তভাবেই ভালবাসি।"

মাদ্রাজবাসীদিগকে সভা ডাকিতে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রায় তিন মাসেও তাহার কিছুই হইল না দেখিয়া হতাশা ও বিরক্তির সহিত ২৮শে জুন তিনি তাহাদিগকে লিখিলেন, "বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক—যা আসুক অবনতমস্তকে স্বীকার করছি।...প্রতিমুহূর্তে আমি

ভারত থেকে কিছু আসবে, আশা করছিলাম, কিন্তু কিছুই এল না। বিশেষতঃ গত দুমাস প্রতিমুহূর্ত আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত এল না !! কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল, অনেকে আমায় ত্যাগ করলে।" চারিদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত স্বামীজী তখন বন্ধু হারাইবার ভয়েও সন্ত্রস্ত। অধ্যাপক রাইটকে তিনি ১৮ই জুন লিখিয়াছিলেন, "বস্টনের কাগজে আমার বিরুদ্ধে লেখা সেই রচনাটি দেখে মিসেস ব্যাগলি খুবই বিচলিত হয়েছেন।" ব্যাগলি 'বিচলিত' হইলেও কিন্তু স্বামীজীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পরেই দেখিব।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী স্বদেশে ফিরিয়া আসার পর তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই ?" স্বামীজী যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে প্রকৃত অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, "হয়েছিল বইকি। লোকে যখন আমায় খাতির করতে লাগল, তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল ! কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য হয় না ; তাই ঐ-সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম—অনেক সময় যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে প্রতিবাদ করে ক্ষমা চাইত। কখন কখন এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ-সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি, সব ভো ভা, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস, বাবা, সংসারে সবই দুনিয়াদারি ! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে—ওসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৭৪-৭৫)।

স্বামীজী চুপ করিয়া থাকিতেন। একবার কিন্তু তাঁহাকে মুখ খুলিতে হইয়াছিল। সেবারে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের এক বড় শহরের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ছাপানো হয় এবং ছবির নীচে হিন্দুযোগী, হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারা সম্বন্ধে জঘন্য টিপ্পনী কাটা হয়। তখন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "হায়! এ যে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিদ্বেষ!" বিরুদ্ধবাদীরা তখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বামীজীর চরিত্রে কলঙ্কলেপনের কার্যে লাগিয়া গিয়াছে।

চরিত্রবিষয়ক মিথ্যাপবাদ ক্ষালনের জন্য স্বামীজী নিজে প্রকাশ্য প্রতিবাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন না, বন্ধুদিগকেও সেরূপ করিতে বলিলেন না; শুধু মাদ্রাজের ভক্তদিগকে জানাইলেন, তাঁহারা যেন সভার মাধ্যমে তাঁহার প্রতিনিধিত্বের দাবি সমর্থন করেন ও আমেরিকার জনসাধারণকে ধন্যবাদ দেন। তিনি শুধু চাহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচারকার্য ও অর্থসংগ্রহচেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়। কিন্তু নীচ ব্যক্তি তো অত সহজে থামে না! তাহার যে স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে! এই চরিত্রগত মিথ্যা কলঙ্কারোপণ চেষ্টার ফলে স্বামীজীর যে অসহ্য মনঃকষ্ট হইয়াছিল, সেই কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার কার্যাবলী বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য যতটা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আমেরিকার কাযে নিযুক্ত থাকা-কালে তাঁহাকে এই নিদারুণ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

মিশনরীদের কর্তৃপক্ষ যখন হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, বিবেকানন্দের প্রচারের ফলে তাহাদের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তখন ক্ষিপ্তপ্রায় মিশনরীদের কেহ কেহ বিবেকানন্দকে জব্দ করিবার অত্যুৎসাহ দেখাইতে গিয়া প্রচার করিলেন, "বিবেকানন্দের অসদ্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া (মিশিগানের ভূতপূর্ব গবর্নরের স্ত্রী) শ্রীযুক্তা ব্যাগলিকে তাঁহার একটি অল্পবয়স্কা ঝিকে বিদায় দিতে হইয়াছিল; বিবেকানন্দ অসম্ভব রকম আত্মসংযমহীন।" সৌভাগ্যের বিষয়, এই জাতীয় বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারের মুখ বন্ধ করার উপযুক্ত তিনখানি পত্র ব্যাগলি পরিবারই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং উহা ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন অ্যানিস্কোয়াম হইতে জনৈক বন্ধুকে শ্রীযুক্তা ব্যাগলি লিখিয়াছিলেন :

"আপনি আমার প্রিয় বন্ধু বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি

তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করি তাহা প্রকাশ করার একটা সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। কেহ তাঁহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করিবে এমন চিন্তাও আমাকে অবজ্ঞামিশ্রিত ক্রোধে পূর্ণ করে। মানবজীবন সম্বন্ধে আমেরিকায় আমাদের যেসব ধারণা ছিল, তিনি তদপেক্ষা উচ্চতর ধারণা আনিয়া দিয়াছেন। ডেট্রয়েটের মতো একটা রক্ষণশীল প্রাচীন নগরের প্রত্যেক স্থলে তিনি এত সম্মান পাইয়াছেন, যাহা পূর্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই; এবং আমার শুধু এইটুকুই মনে হয়, যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে তাহারা তাঁহার মহত্ব ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য হিংসাগ্রস্ত হইয়াছে; অথচ কেন যে তাহারা এরূপ হয় জানি না—তিনি তো ঐরূপ হইবার কোনই কারণ ঘটান নাই।

"তিনি খ্রীষ্টানদের নিকট আসিয়াছেন এক নবীন-বার্তাবহরূপে। তিনি আমাদের সকলেরই জন্য ভগবানকে অনুসরণ করার ও ধর্মকে জীবনে পরিণত করার পথ অধিকতর সুগম করিয়া দিয়াছেন। ধর্মপ্রচারক হিসাবে ও সকলেরই পক্ষে আদর্শ পুরুষের দৃষ্টিতে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তিনি কোন বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যান, ইহা বলা বড়ই অন্যায়, বড়ই মিথ্যা। দিনের পর দিন যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার চরিত্রের অনুপম গুণাবলীর কথা সোৎসাহে বলিয়া থাকেন; ডেট্রয়েটের যেসব ব্যক্তি খুব বিচার করিয়া কথা কহেন ও কাহাকেও খাতির করিয়া চলেন না, তাঁহারাও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ।···তিনি আমার গৃহে অতিথিরূপে তিন সপ্তাহের অধিক বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আমি, আমার ছেলেরা, আমার জামাতা ও গোটা পরিবারই সর্বদা ভদ্রলোকরূপেই পাইয়াছি—সর্বদাই তাঁহার ব্যবহার অতি অমায়িক ও সৌজন্যপূর্ণ; সঙ্গী হিসাবে তিনি আনন্দময় ও অতিথিরূপে সদাবাঞ্ছিত। আমি তাঁহাকে এখানে (অ্যানিস্কোয়ামে) আমাদের গ্রীষ্মাবাসে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছি; আমার পরিবারে তিনি সব সময়ই সম্মান ও সাদর সংবর্ধনা পাইবেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সামান্য কিছু কেহ বলিলেও সে ব্যক্তির প্রতি আমার ক্রোধ অপেক্ষা বরং দয়ার উদ্রেকই অধিক হয় এই কারণে যে, ঐ ব্যক্তি যে বিষয়ে আলোচনা করিতে উদ্যত, তাহার কিছুই জানেন না। তিনি চিকাগোর বাসকালে অধিকাংশ সময়

হেলদের বাড়িতেই কাটান। আমার মনে হয়, উহাই যেন তাঁহার স্বগৃহ। তাঁহারা প্রথমে তাঁহাকে অতিথিরূপে লইয়া আসেন; কিন্তু পরে আর ছাড়িতে চাহেন না। ধর্মে তাহারা প্রেসবিটেরিয়ান।...তাঁহারা উচ্চ সংস্কৃতি-সম্পন্ন ও ভদ্র এবং তাঁহারা বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রেমপূর্ণ। তিনি একজন শক্তিমান সদ্‌গুণশালী পুরুষ—তিনি ভগবন্নির্দিষ্ট পথের যাত্রী। তিনি শিশুরই মতো সরল ও নির্ভরশীল। ডেট্রয়েটে আমি তাঁহাকে এক সান্ধ্যসম্মেলনে আপ্যায়িত করি এবং উহাতে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করি। দুই সপ্তাহ পরে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মুখে আমার বৈঠকখানায় বক্তৃতা করেন।...নিমন্ত্রিতদের তালিকামধ্যে আমি উকিল, জজ, ধর্মযাজক, সৈন্যবিভাগের কর্মচারী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী এবং তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদিগকেও রাখিয়াছিলাম। 'ভারতীয় প্রাচীন হিন্দুদার্শনিক-গণ ও তাঁহাদের বার্তা' বিষয়ে বিবেকানন্দ দুই ঘণ্টা ধরিয়া বলিয়াছিলেন। সকলেই অতীব আগ্রহসহকারে শেষ পর্যন্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি যে কোন জায়গায়ই বক্তৃতা দিয়াছেন, লোকে সানন্দে শুনিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমি কখনও কাহাকেও এমন সুন্দরভাবে কথা বলিতে শুনি নাই।' তিনি মানুষের মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন না করিয়া তাহাকে উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লন—মানুষের মনগড়া ধর্মমত ও সাম্প্রদায়িক নামের উর্ধ্ববর্তী একটা কিছুর সন্ধান তাহারা পায় এবং স্বীয় ধর্মমতের সহিত তাঁহার ধর্মমতের একত্ব অনুভব করে।

"তাঁহাকে চিনিতে পারিলে ও তাঁহার সহিত একই গৃহে বাস করিতে পাইলে যে কোন লোকের জীবন উন্নততর হইতে বাধ্য।...আমি চাই যে, আমেরিকার প্রত্যেকটি মানুষ বিবেকানন্দকে জানুক, আর ভারতে এইরূপ মানুষ যদি আরও থাকেন, তবে তাঁহাদিগকেও তাঁহারা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিন।"

শ্রীযুক্তা ব্যাগলির ন্যায় ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত বন্ধু আরও ছিলেন, যাঁহারা এই অপপ্রচারকে ঐরূপ দৃষ্টিতেই দেখিতেন। গোপন-প্রচার ও বন্ধুমহলে উহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নমুনা স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীযুক্ত হেলকে একবার একখানি বেনামী পত্রে বলা হয়, স্বামীজী দুশ্চরিত্র, অতএব হেল পরিবারের কন্যাদিগকে যেন তাহার সহিত মিশিতে না দেওয়া হয়। হেল মহোদয় উহা পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ উহা কীটপূর্ণ কোন জীর্ণ অপরিষ্কার কাগজের টুকরা যেমন লোকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলে তেমনিভাবে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। এই জাতীয়

আরও চিঠি স্বামীজীর অনেক বন্ধুগৃহেই আসিয়াছিল এবং তাহাদের গতি প্রায়শঃ এইরূপই হইয়াছিল।

স্বামীজীর বিরুদ্ধে এই স্বার্থপ্রণোদিত গোপন নিন্দাবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ শ্রীযুক্তা ব্যাগলি উক্ত বন্ধুকেই এই প্রচারের প্রতিবাদ-কল্পে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ অনুরূপ আর একখানি পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার প্রথম বক্তব্যই এই যে, স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এই সব কথা আগাগোড়া সবটাই ডাহা মিথ্যা —এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর হইতেই পারে না। তিনি যে ছয় সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে কাটাইয়াছিলেন, তাহার প্রতিটি দিন ছিল আমাদের নিকট আনন্দপূর্ণ।…ভদ্রলোকদের বিভিন্ন ক্লাবে তিনি নিমন্ত্রিত হইতেন এবং আরও অধিক সংখ্যক লোক যাহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, আলাপ করিতে পারে এবং তাঁহার কথা শুনিতে পারে এইজন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা হইত …এবং সর্বদা সর্বত্র তিনি এমন শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতেন যাহা তাঁহার সত্যই প্রাপ্য ছিল। এমন কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হন নাই, যিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চারিত্রিক সততা ও উৎকর্ষের প্রতি এবং তাঁহার গভীর ধর্মপ্রাণতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন নাই। গত গ্রীষ্মে আমরা অ্যানিস্কোয়ামে একখানি কুটিরে ছিলাম এবং বিবেকানন্দ তখন বস্টনে থাকায় তাঁহাকে আমাদের গৃহে আহ্বান করিয়াছিলাম। তিনিও আসিয়াছিলেন এবং তিন সপ্তাহ ছিলেন। ইহাতে তিনি যে শুধু আমাদিগকেই আনন্দ দিয়াছিলেন তাহা নহে, আমার বিশ্বাস, আমাদের কুটিরের আশেপাশে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও ইহাতে অনুগৃহীত হইয়াছিলেন। আমার ঝি-চাকররা অনেক বৎসরের পুরাতন এবং এখনও আমার কাছেই আছে। তাহাদের কেহ কেহ আমাদের সঙ্গে অ্যানিস্কোয়ামে গিয়াছিল, বাকিরা বাড়িতেই (ডেট্রয়েটে) ছিল। কাজেই দেখিতেছেন, এইসব কানাঘুষা কিরূপ নিছক মিথ্যা। আপনি ডেট্রয়েটের যে মেয়েটির কথা লিখিয়াছেন, সে যে কে, আমি তা জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে তাহার গল্পিবাজির সব কয়টি কথাই যতদূর মিথ্যা হওয়া সম্ভব, ততটাই মিথ্যা। …আমরা সকলে বিবেকানন্দকে জানি। উহারা আবার কে যে এতটা মিথ্যাপ্রচারে সাহস পায়?"

স্বামীজীর পক্ষসমর্থনে এইরূপ দৃঢ় অথচ ভদ্রভাষায় লিখিত পত্রই যথেষ্ট।

তবু ইহারই পরিপোষকরূপে ঠিক পরদিনই শ্রীযুক্তা ব্যাগলির কন্যা শ্রীমতী হেলেন ব্যাগলি যে আর একখানি পত্র লিখেন, তাহাতে আছে: "শ্রীযুক্ত আর—এই গল্পটি চালান নাই জানিয়া খুশী হইলাম। যদি সম্ভব হয় তো আমি শ্রীযুক্তা এস. এর সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এইরূপ বলিবার পক্ষে তাঁহার হাতে কি প্রমাণ আছে? আমি ইহা অবশ্য নীরবে করিব; কিন্তু আমি শেষবারের মতো জানিয়া লইতে চাই, বিবেকানন্দের নামে এইসব কুৎসা রটায় কে? এইসব কথা ছড়ায় খুব দ্রুত এবং যদি একবার একটাকে উন্মূলিত করিতে পারি, তবে এইসব মেয়েরা এত সহজে এজাতীয় গল্পিবাজি করার পূর্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিবে। একটু খোঁজ লইলেই তো তাহারা জানিতে পারে যে, এসব কত মিথ্যা।"

এই সকল শত্রুতার কথা স্বামীজীরও অবিদিত ছিল না, ইহা শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিত ২১শে মার্চের (১৮৯৫) পত্রেই প্রকাশ: "রমাবাঈ-এর দল আমার বিরুদ্ধে যে-সকল নিন্দা প্রচার করছে, তা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। কুৎসাগুলির মধ্যে একটি এই যে, আমার দুশ্চরিত্রের জন্য শ্রীযুক্তা ব্যাগলিকে নিজের একটি অল্প-বয়স্কা ঝিকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল।···মানুষ যেরূপই চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাকবে, যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা রচনা করে প্রচার করবেই।" (ইংরেজী জীবনী, ৪০২)। রমাবাঈ-চক্রের কথা আমাদিগকে পরেও বলিতে হইবে। ডেট্রয়েটের শ্রীযুক্তা ব্যাগলির বাড়ির সহিত স্বামীজীর নামীয় অপবাদ জুড়িয়া দিয়া উহা রটনা করার অপকীর্তির জন্য রমাবাঈ-চক্র দায়ী হইলেও এই কুৎসার প্রথম রচয়িতা ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনরীরা, এই ভাবিয়া আমরা উভয়ের কথা একসঙ্গে উল্লেখ করিলাম। মনে রাখিতে হইবে, রমাবাঈ ছিলেন খ্রীষ্টান এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষিকাবর্গও ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনরীদেরই পদানুগা।

চরিত্রের উপর কালিমা-লেপনের অভিযান যেমন দীর্ঘকালব্যাপী ছিল, উহার প্রতিবিধানও তেমনি দীর্ঘকাল ধরিয়াই চলিয়াছিল; এবং পরিশেষে স্বামীজীর বন্ধুদেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে অপর যে জাতীয় আলোচনা চলিতেছিল, তাহার প্রতিবিধান স্বামীজীর প্রস্তাবানুরূপ ভারতে আয়োজিত প্রকাশ্য সভাদির মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব ছিল এবং ঐরূপেই তাহা সাধিত হইয়াছিল, যদিও ইহাতে বিলম্ব হইয়াছিল প্রচুর এবং তজ্জন্য স্বামীজীর মনস্তাপ

ও কার্যবিঘ্নও ঘটিয়াছিল যথেষ্ট। গোটা জুন (১৮৯৪) মাসটাই স্বামীজীকে এই মর্মপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছিল, অথচ দুঃখ জানাইতে পারেন, এমন আত্মীয় বা বন্ধুও কেহ নিকটে ছিলেন না; কারণ তখন গ্রীষ্মকালে হেল-ভগিনীরা চিকাগো হইতে দূরে কোন গ্রীষ্মাবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। আবার ভারতের ঔদাসীন্যের কথা তো আমেরিকাবাসীকে বলা চলে না!

ভারতীয়দিগকে নিষ্ক্রিয় ও কার্যকুশলতাহীন ভাবিয়া স্বামীজী উত্যক্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেও তাঁহারা কিন্তু সত্য সত্যই নীরব ছিলেন না; মন্থরগতিতে হইলেও তাঁহারা স্বামীজীর নির্দেশমত কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন এবং সাফল্যও অর্জন করিয়াছিলেন। আলাসিঙ্গা প্রভৃতির অক্লান্ত উদ্যমে মাদ্রাজে ২৮শে এপ্রিল একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং রাজা স্যর রামস্বামী মুদালিয়ার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উহাতে উপস্থিত হন। বক্তৃতাগুলি খুবই আবেগময়ী হইয়াছিল কিন্তু ভ্রমবশতঃ যথা সময়ে না পাঠাইয়া জুন-জুলাই মাস নাগাদ উহার বিবরণ আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও চিকাগো মহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পাঠানো হইয়াছিল। ইহার পরে কুম্ভকোনমে (২২শে জুলাই), ব্যাঙ্গালোরে (২৬শে অগস্ট) ও অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি স্বামীজীর কার্যের প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। খেতড়ির রাজা দরবার ডাকিয়া স্বামীজীর কার্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন ৪ঠা মার্চ, ১৮৯৫। কিন্তু স্বামীজীর জন্মস্থান কলিকাতায়ই লোকের উৎসাহ সর্বাধিক দেখা গিয়াছিল। কলিকাতার সভার অধিবেশন হইয়াছিল ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪—নগরের টাউন হলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি আর তথায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দুধর্মের বহু স্বনামধন্য প্রতিনিধি—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিত, জমিদার, জজ, উকিল, ব্যারিস্টার, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, রাজনীতিক নেতা, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আরও বহু কৃতবিদ্য খ্যাতিমান ব্যক্তি। ইঁহাদের মধ্যে এই কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য: পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায় নন্দলাল বসু বাহাদুর, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি,

নন্দকুমার ন্যায়রত্ন, কৈলাসনাথ বিদ্যারত্ন, তারাপদ বিদ্যাসাগর, বেণীমাধব তর্কালঙ্কার, যদুনাথ সার্বভৌম, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, বৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যারত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি—এই সকল দেশপ্রসিদ্ধ হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও পণ্ডিতবর্গ, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কুমার দীনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধিকাপ্রসাদ রায়, রায় রাখালচন্দ্র চৌধুরী (বরিশাল), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) প্রভৃতি ভূম্যধিকারী এবং মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-সম্পাদক শ্রী এন. ঘোষ, 'মিরর'-সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, 'ডেলি নিউজ'-সম্পাদক ডাঃ জে. বি. ড্যালি, 'ন্যাশন্যাল গার্ডিয়ান'-সম্পাদক শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'হোপ'-সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায়, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু, রায় সিউ বক্স বগলা বাহাদুর, শ্রী জে. পাদশা, সিংহলের রাইট রেভারেণ্ড এন. সাধনানন্দ প্রভৃতি দেশনায়কগণ। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র এবং রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া দুঃখ-প্রকাশপূর্বক সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। মোটের উপর হিন্দুসমাজের কর্ণধারগণ হয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কিংবা সহানুভূতি জানাইয়া এই মহতী সভাকে এক সর্বজনীন সর্বানুমোদিত অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের কৃতকার্যতার প্রথম প্রত্যক্ষ সুফল লক্ষিত হইল হিন্দুসমাজের মর্যাদা-রক্ষাকল্পে এই সর্বাঙ্গীণ প্রতিক্রিয়া অবলম্বনে। সভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. এন. ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি। বঙ্গভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ভাষণ। এইসকল বক্তৃতার ফলে সনাতনধর্মাবলম্বী সকলেরই মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ও স্বধর্মনিষ্ঠার আগ্রহ প্রকৃষ্টরূপে জাগরিত হইল। সেদিন যেন হিন্দুধর্ম উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সজীবতার মূর্তি ধারণপূর্বক সমবেত সকলের হৃদয়ে পূর্ণরূপে বিরাজিত হইয়াছিল এবং বক্তাদিগের বাণীতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল।

এই সকল সভাসমিতির আনুকূল্যে বিবেকানন্দের নাম সারা ভারতে গম্ভীর আরাবে বিঘোষিত হইল; সর্বত্র তিনি এক সুমহান আচার্যের সম্মান পাইলেন। ভারত বুঝিল তাঁহার বাণী ও কার্যের দ্বারা হিন্দুসমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে এবং হইবে; তিনি যুগপ্রয়োজন-সাধনের কার্যে ব্যাপৃত,

তিনি হিন্দুধর্মের সংরক্ষক, দেশবরেণ্য নেতা। আর এই উৎসাহের মধ্যেই ভারতবাসীরা সেই নবীন উষার রক্তিমালোকের সন্ধান পাইল, যখন

ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে—
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন পূরবে।

আবার সেই নব ভারত জাগিবে যুদ্ধবিগ্রহের সাহায্যে নহে, রক্তপাতের ফলে নহে, প্রত্যুত ধর্মের শান্তিবাণীর অমৃতসিঞ্চনে। স্বামীজীর কৃতকার্যতা তাহারই পূর্বাভাস।

মাদ্রাজবাসীরা সভার আয়োজন করিয়া স্বামীজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সে পত্র ইতস্ততঃ ঘুরিয়া স্বামীজীর হস্তগত হয় জুন মাসে। উহা পাইয়া তিনি ১১ই জুলাই তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন, কিভাবে কাহাকে কাহাকে সভাব বিবরণ পাঠানো আবশ্যক। আলাসিঙ্গা কিন্তু স্বামীজীর পত্র পাইবার পূর্বেই কলিকাতা ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে সভার বিবরণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 'বস্টন ইভনিং ট্র্যান্সক্রিপ্ট' ৩০শে অগস্টে ইহা মুদ্রিত করিয়াছিল। স্বামীজীর আমেরিকায় আগমনের উল্লেখ করিয়া ও সভাপতির ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া ঐ পত্রিকাতে সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি এইভাবে ছাপা হইল: "আমাদের অতীতকালের সর্বপ্রকার বিঘ্ন ও লাঞ্ছনার মধ্যেও, আমাদের সাম্প্রতিক অধঃপতন সত্ত্বেও আমরা হিন্দুরা এখনও আমাদের প্রাচীন ধর্মমতের প্রতি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি; এবং ঐ ধর্মেরই ভিত্তিভূত সার তথ্যসমূহ অতি অপূর্ব দৃঢ়তা ও সাফল্যের সহিত আমাদের প্রতিভাবান প্রতিনিধি আপনাদের (আমেরিকানদের) সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা যাহারা বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তাহাদের মনে কখনও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ জাগে নাই যে, আপনাদের সুমহান ও স্বাধীন জাতির নিকট তিনি যে বার্তার দূতরূপে উপস্থিত হইয়াছেন উহা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইবেই এবং তাঁহার প্রতিভা, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও বাগ্মিতা ফলপ্রসূ হইবে। অতীতে ভারত যেমন বিশ্বসভ্যতার জন্মভূমি ছিল, আজিও উহা তেমনি আধ্যাত্মিকতার বাসভূমি। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা আজও আমাদের জাতির শক্তির উৎস। আর যতদিন ইহা অব্যাহত থাকিবে ততদিন আমাদের এই সনাতন বিশ্বাসও অটুট থাকিবে যে, আমাদেরই দেশ পুণ্যভূমি এবং আমাদেরই জাতি

ভগবানের আপনার জন। আমাদের অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসকবর্গ—যাঁহারা আপনাদেরই নিকট-জ্ঞাতি ও আমাদের দূরবর্তী জ্ঞাতি—এই দেশে তাঁহাদের দৈবনির্দিষ্ট কর্তব্য যথাসম্ভব শক্তি ও সততা অবলম্বনে সম্পাদন করিতেছেন। ইতোমধ্যেই পুনর্লব্ধজীবন জাতির উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের উষালোকের আভাস আমরা দেখিতেছি, আর ঐহলৌকিক অভ্যুদয় ও সুশাসনের ফলে যখন অবশ্যম্ভাবিরূপে আমাদের সর্বপ্রকার বন্ধন দূরীভূত হইবে, তখন আমাদের বিশ্বাস, আমাদের জাতি তাহার পুনরভ্যুত্থানকে সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রচারকার্যে যে বিপুল সাফল্যলাভ করিয়াছেন এবং আমাদের প্রতিভাশালী প্রবক্তার প্রতি ও তাঁহার দ্বারা ব্যাখ্যাত আমাদের মুনি-ঋষিদিগের উপদেশাবলীর প্রতি আপনাদের মহান জাতি উহার বিদ্যা, শক্তি ও স্বাধীনতার কেন্দ্রসমূহে যে সাদর ও সোৎসাহ সংবর্ধনা জানাইয়াছেন ঐ সমস্তকে হিন্দুসমাজ পূর্বোক্ত এই দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে।" ('নিউ ডিসকভারিজ', ৪১৫)।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে ৩১শে অগস্ট লিখিলেন, "প্রিয় বৎস, এ পর্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাবড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে ক'রো না। মনে ক'রে দেখ, দেশ থেকে ১৫,০০০ মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চলতে হয়েছে—এতে কখন কখন একটু ঘাবড়ে যেতে হয়।... যখন মনে নিরাশভাব আসবে, তখন ভেবে দেখো, এক বছরের ভেতর কত কাজ হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমস্ত জগৎ আমাদের দিকে আশায় চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিস আশা করছে। নির্বোধ মিশনরীরা, মজুমদার ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না।" মাদ্রাজের সভার সংবাদ 'চিকাগো ইণ্টার ওশ্যান', নিউ ইয়র্কের 'সান' ও 'ডেলি ট্রিবিউন' প্রভৃতি পত্রিকায়ও সাদরে এবং সোল্লাসে মুদ্রিত হইয়াছিল।

কলিকাতার অধিবেশনটি স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ কলিকাতা তাঁহার জন্মভূমি, কলিকাতা ভারতের রাজধানী, কলিকাতা মজুমদারের অপপ্রচারের উর্বরক্ষেত্র, কলিকাতায় তাঁহার কৃতিত্বের স্বীকৃতি বিশ্বসমাজের চক্ষে সত্যের স্বরূপ যেভাবে খুলিয়া ধরিতে

পারিত, আর কোথাও তাহা সেভাবে সম্ভব ছিল না। কলিকাতার সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

১। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় এবং পরে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের জন্য যে অত্যুত্তম কার্যসম্পাদন করিয়াছেন, এই সভা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়।

২। স্বামী বিবেকানন্দকে সাদরে ও সহানুভূতিসহকারে গ্রহণ করার জন্য এই সভা চিকাগো ধর্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত জে. এইচ. ব্যারোজকে উহার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মারউইন-মেরী স্নেলকে এবং আমেরিকার জনসাধারণকে আন্তরিকতম ধন্যবাদ জানাইতেছে।

৩। এই সভা সভাপতিকে অনুরোধ করিতেছে, তিনি যেন স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত নিম্নের পত্রসহ পূর্ববর্তী প্রস্তাবদ্বয়ের নকল শ্রীমৎ বিবেকানন্দস্বামীকে, ডাঃ ব্যারোজকে এবং শ্রীযুক্ত স্নেলকে পাঠাইয়া দেন।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দস্বামীর প্রতি

আর্য, আপনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো মহানগরীর ধর্ম-মহাসভায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করাতে ১৮৯৪ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা মহানগরী ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের অধিবাসিবৃন্দ কলিকাতা টাউন হলে একটি মহতী জনসভা আহ্বান করেন। তাহার সভাপতিরূপে আমি আপনাকে অতিশয় আনন্দসহকারে স্থানীয় হিন্দু-সমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনি হিন্দুধর্মের গৌরবধ্বজা উড্ডীন করিবার জন্য আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার কঠোর আত্মত্যাগ ও দুঃসহ কষ্ট সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ের প্রিয়বস্তু পবিত্র আর্যধর্মকে আপনি যেভাবে বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনি বিশেষভাবে তাঁহাদিগের ধন্যবাদের পাত্র।

আপনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার চিকাগো ধর্মমহাসভার সমক্ষে আপনার পঠিত প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি যেরূপ সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন, মনে হয় একটি বক্তৃতার মধ্যে ঐরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আর

হইতে পারে না। পরে আপনি ঐ বিষয়ে অন্যান্য স্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ঠিক ঐরূপ সরল ও বিশুদ্ধ। হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের ধর্ম বহুদিন হইতে জগতে অনাদৃত ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যিনি সেই অনাদর দূর ও মিথ্যাকল্পনা নষ্ট করিয়া তাহার স্থানে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাহস ও শক্তি সঞ্চয়পূর্বক বিদেশে বিভিন্নধর্মী বিচিত্রাচারী লোকের মধ্যে গমন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা না হইয়া যায় না।

যে মহোদয়গণ মহাসভার আয়োজন করিয়াছিলেন ও আপনাকে উৎসাহ ও বলিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যেসকল সদাশয় শ্রোতা ধীরসহিষ্ণু-ভাবে ও প্রসন্নচিত্তে আপনার বচনাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদের কম ধন্যবাদের পাত্র নহেন। হিন্দুধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রথম একজন এই ধর্মের প্রচারকরূপে বিদেশীদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে এই প্রচারক আপনার ন্যায় একজন কৃতী ও সর্ব-গুণান্বিত মহানুভব পুরুষ।

আপনার স্বদেশীয়গণ, স্বনাগরিকগণ ও স্বধর্মিগণ মনে করেন যে, প্রাচীন ধর্মের প্রকৃত তথ্য প্রচারের জন্য যদি তাঁহারা আপনাকে হৃদয়ের একান্ত সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা না জানান, তাহা হইলে তাঁহারা কর্তব্যহানিজনিত গুরুতর অধর্মে লিপ্ত হইবেন। আপনি যে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, ভগবান তাহাতে আপনার সহায় হউন এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য আপনার মধ্যে উপযুক্ত বল ও শক্তিসঞ্চার করুন।

নিবেদক
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
সভাপতি

'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতার কিয়দংশ এই : "কলিকাতা শহরে এই প্রকার সভা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। কারণ অদ্য আমরা কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এ স্থানে সমবেত হই নাই। যে হিন্দু সন্ন্যাসী সমুদ্রপারে গমন করিয়া তাঁহার বিদ্যা ও বক্তৃতাপ্রভাবে হিন্দুধর্মবিস্তারের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারই

সম্মানার্থ আজ আমরা মিলিত হইয়াছি। আর গৌরবের বিষয় এই যে, যাঁহার কার্যাবলী আলোচনা করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি একজন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবকমাত্র। তিনি যে এত অল্প বয়সে তাঁহার অসামান্য গুণ-গ্রামপ্রদর্শনে বর্তমান যুগের সর্বাগ্রণী জাতিকে বিস্ময়াভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, এই যুবক কিরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। কথায় বলে, সত্য ঘটনা কল্পনাচিত্র অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। আমার মনে হয় যে, সম্প্রতি যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত আখ্যায়িকা হইতে সমধিক বিচিত্র। আমার মনে সবিস্ময়ে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে—'আমরা কি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি?' নতুবা চিকাগো নগরের ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অত্যদ্ভুত কৃতকার্যতা ও তৎপরে সমগ্র মার্কিনদেশে তাঁহার কার্যাবলী কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহার সফলতায় হিন্দুজাতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহাকে তাহাদের বর্তমান অন্ধকারময় ইতিহাসে এক উজ্জ্বল রেখা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। কারণ উহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব আশার সঞ্চার হইয়াছে। যখন আমাদিগের সকল আশা উন্মূলিতপ্রায়, তখন এই প্রতিভাবান যুবকের চেষ্টায় আমেরিকায় হিন্দু-ধর্মের বিজয়লাভে আমরা অত্যন্ত আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের মতো পুরুষ জগতে অতি দুর্লভ। জাতীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ নাট্যাংশ অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার জন্ম।…আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে যে অদৃষ্টপূর্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইব, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামনা করেন, তাঁহার মূলমন্ত্র হউক 'কর্ম, কর্ম, কর্ম'—স্বদেশভক্ত স্বামীজী যেমন নিষ্কাম ও একনিষ্ঠভাবে কর্ম করিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য এবং তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী।"

'ইণ্ডিয়ান নেশন'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন. ঘোষের বক্তৃতাংশ এইরূপ: "পুরাকালের গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত অনেকানেক মনীষী আচার্য স্ব স্ব মত প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়, সাধারণ লোকে তাঁহাদের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা দূরে থাকুক অবজ্ঞাভরে সেসকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে উক্ত আচার্যগণকে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। বিবেকানন্দ ব্যতীত আর

কেহ কখন এত অল্পকাল মধ্যে এতাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বাগ্মিতার ইতিহাসে এরূপ অশ্রুতপূর্ব সিদ্ধিলাভ বিরল। তিনি তাঁহার প্রাঞ্জল, সুমধুর ও যুক্তিগর্ভ বচনবিন্যাসে শ্রোতৃবর্গকে অনায়াসে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু একপক্ষে আমেরিকাবাসীদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও গুণগ্রাহিতা এবং অপরপক্ষে বিবেকানন্দের অতুলনীয় বক্তৃতা—এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি যে অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। এরূপ অপূর্ব বিজয়লাভের বার্তা ইতিহাসে আর লিখিত হয় নাই। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, কংফুছো প্রভৃতি মহামতি জগদ্গুরুগণের মধ্যেও কেহই প্রথম উদ্যমে শতশত ব্যক্তিকে স্বীয় ধর্মমত গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই হিন্দুধর্মপ্রচারক গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী চেষ্টামাত্রেই শতশত লোকের মন হইতে বহুযুগসঞ্চিত ভ্রান্ত সংস্কারসমূহ দূর করিয়া সেই সনাতন ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াছেন—যে ধর্মের কথা তাহারা পূর্বে কখনও শুনে নাই, বা শুনিলেও ঘৃণার চক্ষে দেখিত, বিশেষতঃ (ইহা ঘটিল) এই যুগে যখন মানব-হৃদয়ে ধর্মভাব ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায়। …কিন্তু এই মহাপ্রাণ পুরুষের খ্যাতি কেবল একটি বক্তৃতার উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে; ধর্মমহাসভার বক্তৃতার ফলে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য সেখানেই শেষ হয় নাই।”…

বক্তৃতা দুইটি স্বামীজীর সাফল্য ও উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে সমসাময়িক প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন, আর এই সক্রিয়, দূরদর্শী প্রতিভাবান হিন্দু প্রবক্তাদের পশ্চাতে ছিল আকুল আগ্রহশীল, উন্নতিকামী জনগণের সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি। প্রগতিবিরোধী মুষ্টিমেয় লোকের কথা আমরা এখানে ভাবিতেছি না। কোন সমাজে এরূপ সৎকর্মে বাধা প্রদানকারীর অভাব আছে? ইহাদের কথা আমরা পরে বলিব। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই, “তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কেবল বিবেকানন্দের নামই বিঘোষিত হইতেছে। তিনি তখন আর্যাবর্তের গৌরবস্তম্ভ, আর্যজাতির আশাস্থল ও আর্যধর্মের বরণীয় আচার্যরূপে সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।” তাঁহার সিদ্ধান্ত তখন প্রামাণিক, তাঁহার নির্দেশ অবশ্যগ্রাহ্য এবং তাঁহার বাণীতে তখন জনগণের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়। বিবেকানন্দ তখন সর্বজনবন্দ্য ধর্মনেতা—ভাবরাজ্যের সম্রাট।

কলিকাতার সভাটি স্বামীজীর নিকট খুবই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, কারণ গৃহীত

প্রস্তাব ও সভাপতির পত্রে স্বামীজীর অনেকগুলি প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি ছিল। অধিকন্তু তাঁহার গুরুভ্রাতাদের—বিশেষতঃ স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতির প্রাণপণ চেষ্টাতেই অধিবেশনটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল জানিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অধিবেশনে স্বামীজীকে ধর্মপ্রচারকরূপে ধন্যবাদ প্রদানের ফলে আর একটি লাভ হইয়াছিল এই যে, শত্রুপক্ষের ঐবিষয়ক অপবাদ নিস্তব্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য মিথ্যাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এরূপও বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, স্বামীজী আমেরিকায় ধর্মপ্রচার না করিয়া রাজনীতি প্রচার করিতেছেন। আমরা এ পর্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি ধর্মেরই কথা বলিয়াছেন এবং সাধারণ লোক যেহেতু সমাজব্যবস্থাকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া বুঝিতে পারে না এবং তজ্জন্য সমাজের বাস্তবিক বা কাল্পনিক গ্লানির জন্য ধর্মকেই দায়ী করিয়া থাকে, এই জন্য তিনি বাধ্য হইয়া হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতির মূলগত আদর্শের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষের প্রমাণস্বরূপে যেসকল অযৌক্তিক কথার অবতারণা করা হয়, তাহা শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানরা যখন দাবী করিতেন যে, খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত জাগতিক ও সামাজিক উন্নতির কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, অন্য ধর্মের সহিত তদ্রূপ নাই, অতএব ঐগুলি হীনতর, তখন তিনি পাশ্চাত্ত্য সমাজের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তথাকথিত সভ্য পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি বর্বরতার সাহায্যেই পরদেশগুলিকে পদানত করিয়াছে এবং এখনও ঐ উপায়েই নিজ ক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছে, এমন কি খ্রীষ্টান জাতিগুলি পরস্পরের প্রতিও বর্বরোচিত ব্যবহারে পশ্চাৎপদ নহে; খ্রীষ্টানরা বিজ্ঞানের উন্নতিতে বাধা দিয়াছে, মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টানরা ডাইনী-জ্ঞানে বহু বৃদ্ধাকে পোড়াইয়া মারিয়াছে, ধর্মের নামে জগতে রক্তনদী বহাইয়াছে; খ্রীষ্টান ইংলণ্ড ভারতে মদ ও চীনে আফিং-এর প্রচলন করিয়াছে, ইত্যাদি। ইহাকে ঠিক রাজনীতি বলা চলে না, ইহা দুর্মুখের প্রতি পালটা জবাব মাত্র। শত্রুপক্ষ তবু স্বামীজীকে ধার্মিক না বলিয়া রাজনীতিকই বলিত। তিনি ইহা অবগত ছিলেন; তাই ২৭শে সেপ্টেম্বরের (১৮৯৪) পত্রে আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিক নই, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই।—অতএব তুমি কলকাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান ক'রে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা ক'রে আরোপিত করা না হয়। —শুনলাম রেভারেণ্ড কালীচরণ

বাঁড়ুয্যে নাকি খ্রীষ্টান মিশনরীদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্বসাধারণের সমক্ষে একথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি উহা কলকাতার যে-কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, নতুবা তাঁর ঐ বাজে আহাম্মকি কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্যধর্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার খ্রীষ্টান মিশনরীদের একটা অপকৌশল মাত্র। আমি সাধারণভাবে খ্রীষ্টান-পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য ক'রে সরলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা ঐ রকম কিছু চর্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে, অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সম্পর্ক আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐসব বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে ছাপানো একটা খুব জমকালো ব্যাপার, আর যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, 'হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর'।" কলিকাতার সভা পরোক্ষভাবে এই মিথ্যা অপবাদের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিল।

কলিকাতার এবং মাদ্রাজের সভায় স্বামীজী আর একটি বিষয়ে সমর্থন পাইয়াছিলেন; উভয় সভাই প্রত্যক্ষতঃ বলিয়াছিল, তাঁহার আমেরিকার কাজ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং পরোক্ষতঃ স্বীকার করিয়াছিল, সেদেশে আরও প্রচার আবশ্যক। স্বামীজীর ভারতীয় ভক্ত, বন্ধুবান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিলেন, তিনি যেন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার কারণরূপে যদিও তাঁহারা ভারতকেই তাঁহার কার্যের উপযুক্ততর ক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিয়া মিশনরীদের প্রদত্ত দুর্নাম হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যও উহার সহিত মিশ্রিত ছিল কিনা কে বলিতে পারে? দুর্বলচিত্ত মানুষ পশ্চাৎপদ হইয়াই আপনাকে রক্ষা করে, ইহা সর্বজনবিদিত; অতএব বন্ধুকে রক্ষার জন্যও ঐ একই উপায়ের উপদেশ দেওয়া হইবে, ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ইহা কেহ বলে নাই; সুতরাং এই বিষয়ে আলোচনাও নিরর্থক। তবু ভারতেরই মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে বলা হইয়াছিল, ইহার উল্লেখ আমরা স্বামীজীর ৯ই এপ্রিল (১৮৯৪) এর পত্রে পাই: "সেক্রেটারি সাহেব আমায় লিখেছেন, আমার ভারতে ফিরে যাওয়া অবশ্যকর্তব্য—কারণ ভারতই আমার কর্মক্ষেত্র।

এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালতে হবে, যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে।" খেতড়ি-রাজের ৭ই এপ্রিলের (১৮৯৪) চিঠিতেও ভারতে ফিরিবার প্রয়োজনের কথা উল্লিখিত ছিল, যদিও রাজা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমেরিকায় থাকাই ভাল ; কারণ "তথাকার লোকেরা জহুরী, জহর চিনে।" এইরূপ অনুরোধ আরও আসিলেও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন শত্রুর বিরুদ্ধাচরণে পথভ্রষ্ট হন নাই, অপরদিকে তেমনি হিতাকাঙ্ক্ষী, অথচ দূরদৃষ্টিহীন বন্ধুদের উপদেশেও সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। তিনি জানিতেন, দরিদ্র ভারতবাসী বা হৃদয়হীন ধনী ভারতবাসী কেহই অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার ভারতোদ্ধার-পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবে না ; অর্থের সম্ভাবনা রহিয়াছে শুধু ধনকুবের আমেরিকায়। আবার পরপদানত, পর-মুখাপেক্ষী, পরানুকরণপ্রিয় দুর্বল জাতিকে পুনরুদ্বুদ্ধ করিতে হইলে দুর্বল জাতির আদর্শের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও প্রশংসা উচ্চারণ আবশ্যক। স্বামীজী এই উভয় দিকেই সফলকাম হইয়াছিলেন ; সুতরাং ফলপ্রসূ আরব্ধকার্য তিনি অকস্মাৎ ত্যাগ করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না ; তিনি তখন আরও কিছুকাল আমেরিকায় থাকিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ ও কলিকাতার সভা তাঁহার এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক ছিল। অধিকন্তু আমেরিকাবাসীদের ধর্মলাভের আগ্রহ তাঁহার করুণার উদ্রেক করিয়াছিল ; তিনি বুঝিয়াছিলেন এই আগ্রহ মিটাইবার জন্যও সেখানে থাকা আবশ্যক।

কলিকাতার অধিবেশনের সংবাদও আমেরিকার পত্রিকাসমূহে যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহার এক সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, কলিকাতার সভায় শ্রোতৃসংখ্যা ছিল চারি সহস্র, আর সভার কার্যাবলী ও বক্তৃতা দুই সহস্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল নিউ ক্যালকাটা প্রেস হইতে।

টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনেরও পূর্বে কলিকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে ১৪ই মে (১৮৯৪) শ্রীযুক্ত ধর্মপাল "আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক বক্তৃতা দেন নগরীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে।

৯ই জুলাই-এর একখানি পত্রে হেল ভগিনীদিগকে এই সভার সংবাদ দিতে গিয়া স্বামীজী কৃতজ্ঞহৃদয়ে লিখিয়াছিলেন, "জয় জগদম্বে! আমি আশারও অধিক পেয়েছি। মা আপন প্রচারককে মর্যাদায় অভিভূত করেছেন। তাঁর দয়া দেখে আমি শিশুর মতো কাঁদছি। ভগিনীগণ! তাঁর দাসকে তিনি

কখনও ত্যাগ করেন না। আমি যে চিঠিখানি তোমাদের পাঠিয়েছি, তা দেখলে সবই বুঝতে পারবে। আমেরিকার লোকেরা শীঘ্রই ছাপা কাগজগুলি পাবে। পত্রে যাঁদের নাম আছে, তাঁরা আমাদের দেশের সেরা লোক। সভাপতি ছিলেন কলকাতার এক অভিজাতশ্রেষ্ঠ, অপর ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থানীয়।" ('বাণী ও রচনা,' ৬।৪৫৯-৬০)।

নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার

স্বামীজী ঝড় কাটাইয়া উঠিলেন। কিন্তু এত প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই, স্বেচ্ছায় স্বীকৃত কর্তব্যে এতটুকু শৈথিল্য বা অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। তবে প্রতিপদে সংগ্রাম চলিতে থাকায় সব সময়ে এইটুকুমাত্র অনিশ্চয়তা তাঁহাকে পীড়া দিত—হয়তো বা প্রয়োজনসাধনে সাধ্যাতীত বিঘ্ন ঘটিবে। মোটের উপর দুর্জনের সমালোচনা গ্রাহ্য না করিয়া, সাহায্যের অভাবে পশ্চাৎপদ না হইয়া, কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের মধ্যেও আশা পরিত্যাগ না করিয়া তিনি দৃঢ়পদেই অগ্রসর হইতেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এমন দুঃখময় দিনেও তাঁহার শিশুর মতো মুখখানি সরল হাসিতে উদ্ভাসিত থাকিত—ইহারও পরিচয় তাঁহার ঐ সময়ের পত্রে, বিশেষতঃ সোয়ামস্কট হইতে হেল ভগিনীদিগকে লিখিত ২৬শে জুলাই-এর পত্রে পরিষ্কার পাওয়া যায়। আবার ভারতবর্ষের উদাসীনতায় বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি এই সময় হইতে ভারতীয় কার্যের জন্য বিভিন্ন বাস্তব পরিকল্পনা-রচনায় নিযুক্ত হন এবং ভারতীয় ভক্ত ও বন্ধুদিগকে এই সকল বিষয়ে বিশেষ প্রেরণাপ্রদ উপদেশ দিতে থাকেন। পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত দুই-চারিটি স্থানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে ঃ

"একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরীবের বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাক। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।" (২৪শে জানুআরি, ১৮৯৪)।

"আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হ'তে চাই। সম্প্রদায়ের যে-সকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম ধর্মের উদারভাবও থাকবে।" (৩রা মার্চ, ১৮৯৪)।

"সামাজিক বিধানগুলো সমাজের নানাপ্রকার অবস্থাসংঘাত হ'তে উৎপন্ন—ধর্মের অনুমোদনে।...আমরা সেজন্যই একথাও বলি, ধর্ম যেন সমাজের বিধান-দাতা না হন।...শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান,

তারই প্রকাশ। ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। সুতরাং উভয় স্থলেই শিক্ষকের কার্য কেবল পথ থেকে সব অন্তরায় সরিয়ে দেওয়া।...বাকি সব ভগবান্ করেন।" (ঐ)।[১]

"অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও।...একটি কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মুখ্য। যেকোনরূপেই হউক সাধারণ দরিদ্রলোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে। কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া ভয় পাইও না।" (২৮শে মে, ১৮৯৪)।

"ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজের পক্ষে এত সহজ হইয়াছিল কেন? যেহেতু তাহারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তাহা ছিলাম না।...এদেশের শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।...জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়।...সমস্ত ক্রটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।...তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। মূর্তিপূজা থাকিবে কি থাকিবে না, কতজন বিধবার পুনর্বার বিবাহ হইবে, জাতিভেদ-প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার প্রয়োজন নাই।...এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সন্ন্যাসিগণ কিসের জন্য এ-জাতীয় ত্যাগব্রত গ্রহণ করিবে এবং কেনই বা এ প্রকারের কাজ করিতে অগ্রসর হইবে? উত্তরে আমি বলিব—ধর্মের প্রেরণায়।...গোঁড়া মতবাদ সব গোল্লায় যাউক—উহাদের দ্বারা কোন কাজই হয় না। একটি খাঁটি চরিত্র, একটি সত্যিকার জীবন, একটি শক্তির কেন্দ্র—একজন দেবমানবই পথ দেখাইবেন। ...এ কার্যের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন এবং অন্ততঃ প্রথম দিকটায় সামান্য কিছু অর্থেরও প্রয়োজন।" (২০শে জুন, ১৮৯৪)।

"ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্ত্যদেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, তুলনায় আমাদের দরিদ্রগণ দেবপ্রকৃতি।...আমাদের

১। ১৯শে মার্চ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্রে ছুঁৎমার্গ বর্জন এবং নারীজাতি ও দরিদ্রদিগের উন্নতিসাধনের একান্ত প্রয়োজন অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় সবিস্তার লিপিবদ্ধ আছে। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" "আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎ-মার্গ'।" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।…পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ।…আমাদের দেশে সহস্র সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন।…তাঁহারা এখন যেমন একস্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্মশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিকবিদ্যাও শিখাইবেন।" (২৩শে জুন, ১৮৯৪)।

"তবে একটি কথা—মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে।…আমার মহাভয় শশীর ঐ ঠাকুর-ঘর।…সমাজকে, জগৎকে বৈদ্যুতিক-শক্তিসম্পন্ন করতে হবে। বসে বসে গপ্পবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম…। তোমাদের কাজ ভাবপ্রবাহ বিস্তার।…যোগীন-মা গোলাপ-মা কতকগুলি বিধবা চেলা বানাতে পারে না কি? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে-সাধ্যি দিতে পার না কি?…কতকগুলো চেলা চাই। …মেয়ে-মদ্দ দুইই।" (১৮৯৪, গ্রীষ্মকাল)।

ভাবিয়া অবাক হইতে হয় একত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক একজন যুবক—যিনি বিদেশে শত্রু-পরিবেষ্টিত এবং স্বদেশে মিশনরী ও ব্রাহ্মসমাজের কাহারও কাহারও হস্তে লাঞ্ছিত, যিনি অবিরাম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ভারতের ও বিদেশের কল্যাণার্থ ভারতের রীতিনীতি ও অধ্যাত্মবিষয়ে ঘরোয়া-বৈঠকে ও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দানে ব্যস্ত এবং সেই সুযোগে দেশের জন্য ও নিজের ব্যয়সঙ্কুলনার্থ অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত, যিনি অবসরকালে নির্জনতায় মগ্ন হইয়া সমাধিসুখ উপলব্ধি করেন, তিনি কি প্রকারে আত্মীয়রূপে গৃহীত বিদেশীদের সহিত একই কালে নির্দোষ আনন্দে মগ্ন হন ও আবার ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে গভীর মৌলিক চিন্তা ও নবীন বাস্তব পরিকল্পনা রচনায় নিরত হন! মনে হয় দৈবপ্রেরণায় পরিচালিত স্বামীজীর পক্ষেই ইহা সম্ভব ছিল। আর ইহা আমাদের অনুমান নহে; তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই অব্যবহিত পূর্বে উদ্ধৃত পত্রখানিতে তিনিই লিখিতেছেন: "তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পার্‌ছি না—এগিয়ে চল, এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার শক্তি আসবে—বিশ্বাস কর। এগিয়ে চল—হরে, হরে। চিঠি

বাজার ক'রো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। এগিয়ে চল, হরে হরে।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৪৫৭)।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, স্বামীজী ২৭শে জুন চিকাগো ত্যাগ করিয়া ২৮শে জুন নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন। অতঃপর বন্ধুদের আমন্ত্রণে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে গিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিউ ইয়র্ক প্রদেশের ফিস্‌কিল ল্যাণ্ডিং হইতে লিখিত ১৮৯৪-এর জুলাই-এর পত্র ও ম্যাসাচুসেটস-এর অন্তর্গত সোয়ামস্কট হইতে লিখিত ২৬শে জুলাই-এর পত্রে জানিতে পারা যায়। ফিস্‌কিল ল্যাণ্ডিং-এ তিনি নিউ ইয়র্কের পূর্বপরিচিত বন্ধু ডাঃ গার্নসী ও তাঁহার স্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোয়ামস্কটে কাহার বাড়িতে ছিলেন, তাহা জানা নাই; তবে ঐ সময়টা যে খুব আনন্দে কাটিয়াছিল, তাহা তাঁহার পত্রের প্রতিপঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ। হেল ভগিনীগণকে তিনি উপহাসচ্ছলে লিখিয়াছিলেন: "যখন ভাবি তোমরা চার জনে গরমে ভাজা পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা!"

দুঃখের মধ্যেও আনন্দবিহ্বল হওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহার পূর্ব পর্যন্ত কর্মব্যস্ততা, টাকাকড়ি, জিনিসপত্রের হিসাব ও তদ্বির এবং দুশ্চিন্তা বা বক্তৃতার চিন্তায় তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলেন। সুন্দর পরিবেশ-মধ্যে, নগরের কোলাহল হইতে দূরে, বন্ধুপরিবারের আদরযত্নের মধ্যে নিশ্চিন্তমনে আরামে দিন কাটাইবার এমন সুযোগ তো তিনি খুব বেশী পান নাই। ধ্যানসিদ্ধ ও ধ্যানপরায়ণ তাঁহার নিকট আমেরিকার জীবন ইহার পূর্বে অতিশয় অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইত। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোতে যাঁহারা স্বামীজীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন, পাশ্চাত্ত্যে আসার অব্যবহিত পরে কত কষ্টে তাঁহাকে সর্বদা ধ্যানে ডুবিয়া যাওয়ার অভ্যাস দূর করিতে হইয়াছিল। ট্রামে উঠিয়া হয়তো চিন্তামগ্ন হইয়া ভুলিয়া যাইতেন ঠিক কোথায় নামিতে হইবে, যাহার ফলে ঐ একই যায়গায় যাইবার জন্য ট্রাম লাইনের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্যন্ত বারবার টিকেট কাটিতে হইত।" ('মাস্টার অ্যাজ আই স হিম')। ১৮৯৪-এর জুলাই মাসে ঐ ভাব কিছুটা কাটিয়া গিয়াছিল, যদিও শত্রুদের উৎপীড়ন পূর্ববৎই চলিয়াছিল। কিন্তু তখন

এই সম্পূর্ণ অবসর হইতে লব্ধ আনন্দের নিকট দুর্জনের নিন্দাবাদও হার মানিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ঐ পত্রেই আছে: নিউ ইয়র্ক প্রদেশের কোন স্থানে মিস ফিলিপ্সের পাহাড় হ্রদ নদী জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর একটি স্থান আছে। আর কি চাই! আমি যাচ্ছি স্থানটিকে হিমালয়ে পরিণত ক'রে সেখানে একটি মঠ খুলতে—নিশ্চয়ই। তর্জন গর্জন, লাথি ঝগড়ায় তোলপাড় এই আমেরিকায় ধর্মের মতভেদের আবর্তে আর একটি নূতন বিরোধের সৃষ্টি না ক'রে এ দেশ থেকে যাচ্ছি না। হইচই ছাড়িয়া জনকয়েকমাত্র আগ্রহশীল ব্যক্তিকে আপন ভাব সম্পূর্ণরূপে শিখাইবার ইচ্ছা তিনি পূর্বেও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই চিঠিতে জানা যায়—ঐ ইচ্ছাই আরও গভীরতা লাভ করিতেছে। দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকিয়া বেদান্তকে দৃঢ়ভিত্তিক করিবার অভিপ্রায়ও ইহাতে সুব্যক্ত। এই চিঠিতেই তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, "আমি গ্রীনএকারে যাচ্ছি।…গ্রীনএকার থেকে ফেরবার পথে কয়েক দিনের জন্য অ্যানিস্কোয়াম যাব মিসেস ব্যাগলির সঙ্গে দেখা করবার জন্য।" যতদূর জানিতে পারা যায়, গ্রীনএকারেই ব্যক্তিগতরূপে ও প্রণালীবদ্ধ-ভাবে তাঁহার শিক্ষাদানকার্যের সূত্রপাত হয়।

এই গ্রীষ্মকালেই তাঁহার কার্যধারায় আর একটি আমূল পরিবর্তন আসিতে-ছিল—তিনি অর্থের বিনিময়ে ধর্মপ্রচার করা এবং অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো অনুচিত বোধ করিতেছিলেন। ২০শে অগস্টের এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "অর্থসংগ্রহের সবরকম মতলব ছেড়ে দিয়েছি এবং একগ্রাস অন্ন ও একখানি কুটীর পেলেই আমি খুশী হয়ে কাজ করতে থাকব" (ইংরেজী গ্রন্থাবলী, ৫।৩৯)। এ ভাব অসাফল্যের দরুন আসে নাই, আসিয়াছিল সম্ভবতঃ গ্রীনএকারেরই কার্যের সাফল্যদর্শনে আর অর্থের প্রতি স্বীয় বিতৃষ্ণা হইতে। গ্রীনএকার হইতে ৩১শে জুলাই তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই সেদিন রাত্রিতে ছাউনির সকলে একটা পাইন গাছের তলায় শুতে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় হিন্দু ধরনে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছলাম—তারকাখচিত আকাশের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমি তো এই আনন্দের সবটুকু উপভোগ করেছি। এক বৎসর হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শোওয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা

তোমাদের কি ব'লব ! সরাইয়ে যারা রয়েছে তারা অল্পবিস্তর অবস্থাপন্ন, আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী।...এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই তাঁবুবাসীদের দরিদ্র করেছেন।" আর ৩১শে অগস্ট তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিলেন, "তুমি তো জান—টাকা রাখা, এমন কি টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুশকিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু ক'রে দেয়।...এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।" এই নিঃস্পৃহতা বা অর্থবিতৃষ্ণা যে কথার কথা ছিল না, তাহা হেল ভগিনীদিগকে লিখিত ১১ই অগস্টের পত্রেই প্রমাণিত হয়। উহাতে আছেঃ "কেনিলওয়ার্থের মিসেস প্র্যাট নাম্নী এক চিকাগোবাসিনী মহিলা আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পাঁচশত ডলার দিতে চান। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমায় কিন্তু কথা দিতে হয়েছে যে, অর্থের প্রয়োজন হলেই তাঁকে জানাব। আশা করি, ভগবান্ আমাকে সেরূপ অবস্থায় ফেলবেন না। একমাত্র তাঁর সহায়তাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত।"

বৈদ্যুতিক আলোকের প্রথম প্রচলনকারী বৈজ্ঞানিক মোজেস গেরিস ফার্মারের কন্যা কুমারী সারা ফার্মার 'গ্রীনএকার রিলিজিয়াস কনফারেন্স'-এর (ধর্মসম্মেলনের) প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। সম্মেলনে সর্বসম্প্রদায়ের নরনারী আসিতে পারিতেন এবং উহা গ্রীষ্মকালে মেইন প্রদেশের ইলিয়ট নগরের নিকটবর্তী গ্রীনএকারে সমবেত হইত। সম্মেলনের সভ্যগণ বাঁধাধরা নিয়মে ধর্মানুসরণ না করিয়া প্রগতিশীল স্বাধীন দৃষ্টি লইয়া উহাতে নিরত হইতেন। অতএব বেদান্ত হইতে প্রেতবিদ্যা পর্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও উদ্ভট সর্বপ্রকার মতবাদেরই স্থান ছিল এবং ধর্ম-সাধনার সহিত ধর্ম ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতাদিও হইত। স্বামীজী কুমারী ফার্মারের আমন্ত্রণে যে বৎসর প্রথম সেখানে যান এবং যে বারের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আমরা তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, সে বারের বক্তাদের মধ্যে ডাঃ লুই জি. জেনসও ছিলেন। ইনি ছিলেন ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসো-সিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট। গ্রীনএকারে আসার পূর্বেই নিউ ইয়র্কে স্বামীজী ইঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। গ্রীনএকারে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং স্বামীজী পরে ঐ ব্রুকলিনের সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঐ সম্মেলনে শ্রীযুক্তা ওলি বুলও অগস্ট মাসের তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তখনই স্বামীজীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেখানে সমবেত সাধকগণ বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের সরলতা, নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখিয়া স্বামীজী ঐ সম্মেলনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই দলটি কোন মতবাদকে কেবল মতবাদ হিসাবে না লইয়া উহাকে কার্যে পরিণত করার যে উৎসাহ দেখাইতেন, তাহাতে স্বামীজী অভিভূত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীযুক্তা ওলি বুল এক সময়ে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে উদ্যতা হইলে তিনি ঐ অর্থ গ্রীনএকারের জন্য ব্যয় করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন: "আমার সরল বিশ্বাস এই যে, আপনার এ বৎসরের দান কুমারী ফার্মারের গ্রীনএকার-এর কাজে দেওয়া উচিত। ভারত অপেক্ষা করতে পারবে—যেমন বহু শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে আসছে। তাছাড়া হাতের কাছে যে কাজটা পড়ে সেটাই আগে করতে হয়।" গ্রীনএকারের মঙ্গলচিন্তা কুমারী ফার্মারকে লিখিত তাঁহার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের পত্রেও প্রকাশ পায়। পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দও এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

গ্রীনএকারের নদীর ধারে সমতলভূমিতে ছোট-ছোট তাঁবু ফেলিয়া অল্পবিত্ত সাধকরা বাস করিতেন; আর পাহাড়ের উপরে সরাইয়ে থাকিতেন ধনী আগন্তুকরা। মধ্যস্থলে ঢালু জমির উপর ফেলা হইত একটা বড় তাঁবু, যাহার নাম ছিল 'হল অব পীস' বা 'শান্তির আগার'। এখানেই বক্তৃতা ও বহু মতের উপাসনা হইত। স্বামীজী বেদান্তশিক্ষা দিতেন কিঞ্চিৎ দূরে একটি পাইন বা সরল গাছের তলায় হিন্দুমতে বসিয়া। এই গাছটিকে বলা হইত 'স্বামীজীর পাইন'। ঐ বৎসর ৩০শে জুলাই প্রচণ্ড ঝড়ে তাঁবুগুলি ভূপাতিত হওয়ার রহস্যপূর্ণ বর্ণনা পাই স্বামীজীর ৩১শে জুলাই-এর পত্রে, "কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিল—তাতে তাঁবুগুলোর উত্তম-মধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এইসব বক্তৃতা চলছিল, ঐ 'চিকিৎসার' চোটে সেটির এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে, সেটি মর্ত্যলোকের দৃষ্টি হ'তে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে, আর প্রায় দুশ' চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবে গদগদ হয়ে জমির চারিদিকে নৃত্য আরম্ভ করেছিল!" গ্রীনএকারে স্বামীজী সম্ভবতঃ দুই সপ্তাহেরও অধিক ছিলেন। অতঃপর তিনি আবার বক্তৃতা দিতে অন্যত্র চলিয়া যান।

১১ই অগস্ট (১৮৯৪) তিনি হেল ভগিনীদের লিখিয়াছিলেন, "রবিবার

বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি গ্রীনাথে কর্নেল হিগিনসনের 'সিম্প্যাথি অব রিলিজিয়ন্স'-এর (ধর্মসমূহের সহানুভূতির) অধিবেশনে।" হিগিনসন ছিলেন উদার প্রগতিপন্থী ; আমেরিকার সিভিল ওয়ারের সময় তিনি দাসপ্রথা নিবারণের পক্ষে একদল নিগ্রো সৈন্য প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার আনুকূল্যে স্বামীজী ১২ই অগস্ট[১] গ্রীনাথে 'ফ্রী রিলিজিয়স অ্যাসোসিয়েশন'-এ (মুক্ত ধর্মসমিতিতে) বক্তৃতা দেন। স্বামীজীর ২০শে অগস্টের চিঠি হইতে মনে হয় গ্রীনাথ ছাড়িয়া তিনি পুনর্বার নিউ ইয়র্কের বন্ধু ডাঃ গার্নসীর ফিস্‌কিল ল্যাণ্ডিং-এর বাড়িতে যান দিন দুয়েকের জন্য। হাডসন নদীর তীরবর্তী এই ক্ষুদ্র শহর হইতে তিনি ১৬ই অগস্ট নাগাদ শ্রীযুক্তা ব্যাগলির আমন্ত্রণে অ্যানিস্কোয়ামে তাঁহার গ্রীষ্মনিবাসে যান। এক বৎসর পূর্বে তিনি এখানেই ডাঃ রাইট-এর অতিথি হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি অজ্ঞাত-পরিচয়, আর এখন সর্বজনবিদিত ও সর্বত্র সম্মানিত। এই গ্রামে তিনি অন্ততঃ ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলেন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ডাঃ রাইট সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে শ্রোতাদের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। অ্যানিস্কোয়াম হইতে স্বামীজী দুই-তিন দিনের জন্য ম্যাগনোলিয়ায় গিয়াছিলেন শ্রীমতী স্মিথ ও শ্রীমতী স'ইয়ারের আমন্ত্রণে। ম্যাগনোলিয়া একটি মনোরম সৈকতাবাস। তারপর অ্যানিস্কোয়ামে ফিরিয়া তিনি বস্টনে চলিয়া যান ও একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজের শ্রীযুক্তা ওলি বুলের সহিত তাঁহার পূর্বেই পরিচয় হইয়া থাকিলেও উক্ত মহিলা তখন সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্কে ছিলেন ; ইহাই হয়তো হোটেলে উঠিবার কারণ।

এইবার বস্টনে স্বামীজীর কর্মময় জীবন, বিশেষতঃ বক্তৃতাপ্রদান আরম্ভ হইল। ইহারই মধ্যে তিনি গ্রন্থপ্রণয়নের চেষ্টাও করিয়াছিলেন ; যদিও কার্যতঃ কিছুই হয় নাই। ১১ই জুলাই আলাসিঙ্গাকে লিখিত এক পত্রে ঐ বিষয়ে তাঁহার ঔৎসুক্যের প্রথম আভাস পাই। বস্টন হইতে মেরী হেলকে লিখিত একখানি পত্রেও লেখার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের সংবাদ পাই ; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই অসাফল্যের প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ঐ সময়ে তিনি বক্তৃতাদিতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় শান্তভাবে বসিবারই সময় পান নাই। তথাপি ঐ সময়েই তিনি

১। শ্রীমতী হেলকে লেখা স্বামীজীর ৮ই অগস্টের পত্রে ১৩ই অগাষ্ট বক্তৃতা হইবার কথা বলা আছে।

মাদ্রাজ-অভিনন্দনের সুদীর্ঘ উত্তর লিখিয়া পাঠান। তিনি পুস্তক রচনার কথা ভাবিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্তা ওলি বুল তাঁহাকে স্বগৃহে থাকিয়া ঐ কার্যে লিপ্ত হইতে অনুরোধ জানাইলে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি একবার বক্তৃতার জন্য মেলরোজে ঘুরিয়া আসিলেন। মেলরোজ বস্টন নগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। সেখানে তিনি অন্ততঃ দুইটি বক্তৃতা দেন, শেষেরটি ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবারে। অতঃপর ২রা অক্টোবর তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলের কেম্ব্রিজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ওলি বুল তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, স্বামীজীও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ও 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীযুক্তা ওলি বুল ছিলেন প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক নরওয়ে নিবাসী ওলি বুলের বিধবা পত্নী। তিনি বিদুষী, ধনাধিকারিণী এবং সমাজে প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন। তিনি পরে স্বামীজীকে বহুভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা ওলি বুলের গৃহে অনেক বিদ্বৎ-সম্মেলন হইত; এবং সম্ভবতঃ স্বামীজীকে দুই-একবার তাঁহার বৈঠকখানায় একটু-আধটু ভাষণ দিতে হইয়াছিল। আমরা দেখিব, পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই গৃহেই জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত উইলিয়াম জেমসের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয় এবং এখানেই উক্ত পণ্ডিতের আগ্রহে তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহাকে এই রহস্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় দেন। কিন্তু এই গৃহে আসিয়াও পুস্তকপ্রণয়ন সম্ভব হইল না।

শান্তিময় জীবনের জন্য স্বামীজী ক্রমেই অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "...সাধারণের সহিত জড়িত এই বাজে জীবনে এবং খবরের কাগজের হুজুকে আমি একেবারে দিক হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভেতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।" কিন্তু জীবনের স্রোত একদিকে প্রবাহিত হইতে থাকিলে অকস্মাৎ অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া অত সহজ হয় না; কাজেই বক্তৃতাপ্রদান তিনি ইচ্ছা করিলেও তখনই থামাইতে পারেন নাই। এই কারণেই তিনি ওলি বুলের গৃহে নয়-দশ দিনের অধিক থাকিতে পারেন নাই। সেখান হইতে তিনি মেরিল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বল্টিমোর শহরে উপনীত হইলেন ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায়।

স্বামীজী বল্টিমোরে গিয়াছিলেন ক্রম্যান ভ্রাতৃত্রয়—ওয়াল্টার, হিরাম ও কার্ল-এর আহ্বানে। তিন ভ্রাতাই তখন যুবক—বয়স কাহারও বাইশ-তেইশ-

এর উপরে নহে ; কিন্তু তিন জনেই ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবাদী, উদ্যমশীল ও বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। জীবন তাঁহাদের ছিল নানারূপ পরিবর্তন ও অনিশ্চয়বরণের সমষ্টিস্বরূপ। স্বামীজী যখন বল্টিমোরে যান, তখন বড় দুই ভাই নামে ধর্মযাজক হইলেও নানা সমাজসংস্কার ও রাজনীতিক আন্দোলনাদিতে জড়িত ছিলেন। তৃতীয়ের স্বভাবও ঐরূপ হইলেও তিনি তখনও ধর্মযাজক হইবার জন্য অধ্যয়নে রত। ইঁহারা কিরূপে স্বামীজীকে ধরিলেন এবং কেনই বা তিনি তথায় যাইতে সম্মত হইলেন জানা নাই। হয়তো সুবক্তা ভ্রাতৃত্রয় বল্টিমোর সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের পরিকল্পিত 'আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়' সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া স্বামীজীর বিশ্বাসোৎপাদন ও চিত্তজয় করিয়াছিলেন। স্বামীজী প্রচারের জন্য উদ্‌গ্রীব তো ছিলেনই, আবার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু নিজ জীবনে দুঃসাহসিক ক্রম্যান ভ্রাতৃত্রয় খুব বেশী অতিথিপরায়ণ বা অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে সাবধান ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। স্বামীজীকে স্বগৃহে না রাখিয়া ওয়াল্টার ক্রম্যান তাঁহাকে লইয়া নিম্নশ্রেণীর হোটেলে হোটেলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—যদি কোথাও স্থান মিলে। কিন্তু বল্টিমোরে বর্ণবিদ্বেষ যথেষ্ট ছিল—ময়লা রঙের স্বামীজীর কোথাও স্থান মিলিল না। অগত্যা ওয়াল্টার একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলে, 'হোটেল রেমার্ট'-এ গিয়া স্থান পাইলেন এবং তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। অবশ্য স্বামীজী এই বিপরীত পরিবেশের মধ্যেও বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত হন নাই। ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় বল্টিমোরে পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'বল্টিমোর আমেরিকান' পত্রিকার সংবাদদাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি বৈঠকখানায় শান্তভাবে রাজোচিত ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন। পরদিন 'সাণ্ডে হেরাল্ডের' সংবাদদাতাও তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায়ই দর্শন করিলেন। উভয় পত্রিকায় সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হইয়া স্বামীজীকে অচিরে বল্টিমোরে পরিচিত করিয়া দিল। দ্বিতীয় সাংবাদিককে হিরাম ক্রম্যান এই কথাও বলেন যে, স্বামীজী 'আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনে আগ্রহশীল।

১৪ই অক্টোবর, রবিবার ক্রম্যানভ্রাতৃগণ তাঁহাদের আদরের বিষয় 'প্রগতিশীল ধর্ম' (Dynamic Religion) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং সংবাদদাতার মতে সর্বশেষ বক্তা স্বামীজী ঐ বিষয়ে কিছু বলিয়া "তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন"

(অর্থাৎ তাঁহাদের বক্তব্য সহজবোধ্য ও পরিপুষ্ট করেন)। বক্তৃতায় তিনি বলেন, মুখে বেশী বাগাড়ম্বর না করিয়া ধর্মজীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ, আর ভারতে অধিকসংখ্যক মিশনরী না পাঠাইয়া অর্থসাহায্য প্রেরণই বাঞ্ছনীয়।

সম্ভবতঃ ইহার স্বল্প পরেই স্বামীজীকে আর হোটেলে থাকিতে হয় নাই; তিনি অপরের গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন, কেননা তিনি ২৭শে অক্টোবরের এক পত্রে শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে জানাইয়াছিলেন, "বল্টিমোরে এক হোটেলওয়ালার নিকট আমি যে দুর্ব্যবহার পেয়েছি, সেজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। যেমন সর্বত্রই হয়েছে, এখানেও তেমনি—আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ হ'তে উদ্ধার করেছিলেন, তারপর আমি বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম।" হয়তো কলিকাতার আমেরিকান কন্সাল জেনারেলের স্ত্রী শ্রীযুক্তা প্যাটার্সনও এই সাহায্যকারিণীদের মধ্যে ছিলেন।

বল্টিমোরের দ্বিতীয় সভা হয় ২১শে অক্টোবর, রবিবারে। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামীজী স্বয়ং এবং বিষয় ছিল, 'বুদ্ধ'। শ্রোতার সংখ্যা ছিল তিন সহস্র।

বল্টিমোর হইতে তিনি ২২শে অথবা ২৩শে অক্টোবর ওয়াশিংটনে পৌছিয়া শ্রীযুক্তা এনোক টটেনের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্বে ১৬ই অক্টোবর একবার ওয়াশিংটন ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন হইতে ২৬শে অক্টোবর তিনি ইসাবেলকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে প্রকাশ, তিনি ওয়াশিংটনে আরও এক সপ্তাহ থাকিয়া ফিলাডেলফিয়া যাইবেন। উহাতে আরও জানা যায়, তাঁহার পরিচিত অক্ষয় ঘোষ ইংলণ্ডে যে কুমারী মূলারের পোষ্যপুত্ররূপে বাস করিতেন, সেই মহিলা তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন এবং তিনিও শীতে যাইবার কথা ভাবিতেছেন। অবশ্য যাওয়া তখনই হয় নাই।

ওয়াশিংটনে তিনি পিপল্‌স চার্চের ধর্মযাজকের অনুরোধে ২৮শে অক্টোবর দুইবার বক্তৃতা দেন এবং ঐদিনই এক সাংবাদিকের সহিত বার্তালাপ করেন। সেখান হইতে তিনি পুনর্বার বল্টিমোরে যান এবং ২রা নভেম্বর সেখানে বক্তৃতা করেন। ৫ই নভেম্বর আর একটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কোনও কারণে ২রা তারিখের বক্তৃতার পরে, পূর্বোক্ত ২৬শে অক্টোবরের

পত্রানুযায়ী, স্বামীজী ওয়াশিংটন হইয়া ফিলাডেলফিয়ায় গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক রাইট তখন ফিলাডেলফিয়াতে ছিলেন।

মেরী হেলকে লিখিত একখানি পত্র হইতে তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণসূচীর আভাস পাওয়া যায়: "অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ফিলাডেলফিয়ায় মাত্র দিনকয়েক থাকব। ওখান থেকে নিউ ইয়র্ক। বার কয়েক নিউ ইয়র্ক— বস্টন দৌড়াদৌড়ি ক'রে ডেট্রয়েট হয়ে চিকাগোয় যাব।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৫০১)। নিউ ইয়র্ক হইতে ১৮ই নভেম্বর শ্রীমতী হেলকে লেখা একখানি পত্রে আছে: "এই মাসটা নিউ ইয়র্কে কাটিয়ে বস্টনে যাব এবং সম্ভবতঃ পুরো ডিসেম্বর মাস ওখানেই থাকব। গতবারে বস্টনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডেট্রয়েটে শ্রীমতী ব্যাগলির আমন্ত্রণ রক্ষা না করে সোজা চিকাগোয় চলে যাই। সুতরাং এবারে আগে ডেট্রয়েটে যাচ্ছি। সম্ভব হলে পরে চিকাগোয় যাব।" তিনি এই সময়ে ক্লান্তিবোধ করিতেছিলেন এবং এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া ধ্যান-ধারণা ও ঘনিষ্ঠভাবে লোকশিক্ষায় কাল কাটাইবার আগ্রহ তাঁহার মনে প্রবলতর হইতেছিল। ২৭শে অক্টোবর আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "এখন একটু বিশ্রাম করিতে চাই।...ধ্যান-ধারণা ও অধ্যয়নের উপরই আমার ঝোঁক।...আমি এক্ষণে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লোককে একটু শিক্ষা দিব।" তবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্রাম পাওয়া তখন তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না; মেরীকে লিখিত পূর্বোক্ত চিঠিতেই আছে: "আলাসিঙ্গা লিখেছে, দেশজুড়ে গ্রামে গ্রামে আমার নাম রটেছে। ফলে পূর্বেকার সে শান্তি আর রইল না; এরপর আর কোথাও বিশ্রাম বা অবসর পাওয়া কঠিন।...প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেছিলাম নিঃশব্দে কিছু অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে; কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেছি, আর এখন চুপচাপ থাকতে পারব না।" আমেরিকার কাজের ধারা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও এই সময়ে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইতেছিল, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। বিদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধেও তাঁহার মত স্পষ্টতর হইয়াছিল। আলাসিঙ্গাকে লিখিত উপরোক্ত পত্রে আছে: "ভট্টাচার্য আমাকে ভারতে যাইতে লিখিতেছেন। এস্থান প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বিভিন্ন মতবাদ লইয়া কি করিব? আমি ভগবানের দাস। উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এদেশ অপেক্ষা কোথায় পাইব?...কোন ব্যক্তি—কোন জাতিই অপরকে

ঘৃণা করিলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ'-শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল।" রাজা প্যারীমোহন মুখার্জিকেও তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে।...পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা এইরূপ শতশত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এ-জাতি বা ও-জাতির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।" ('বাণী ও রচনা', ৭।৩৮-৩৯)।

এই সময়ে স্বামীজী নিউ ইয়র্কে বেদান্তপ্রচারের কেন্দ্ররূপে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। আলাসিঙ্গাকে লেখা ৩০শে নভেম্বরের পত্রে আছে: "আমি ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কে একটা সমিতি খুলেছি।"

৫ই ডিসেম্বর তিনি কেম্ব্রিজে শ্রীযুক্তা ওলি বুলের গৃহে উপস্থিত হইলেন ও ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া ঐ বাড়িরই বৈঠকখানায় শাস্ত্রব্যাখ্যানাদি চালাইতে লাগিলেন। এই প্রবচনগুলি সম্বন্ধে শ্রীমতী বুল ডাঃ জেনসকে লিখিয়াছিলেন, "যে সব ছাত্র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত দর্শনবিদ্যার মধ্যে ঘোরপাক খাইতেছিল, স্বামীজী তাহাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিয়াছিলেন।"

স্বামীজী কেম্ব্রিজে যে কয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা বুলের অনুরোধে প্রদত্ত 'ভারতীয় নারী'-শীর্ষক ভাষণটিই সর্বাধিক মনোজ্ঞ হইয়াছিল। বক্তৃতা-শেষে তিনি স্বীয় জননীর প্রতি মুক্তকণ্ঠে প্রাণঢালা শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। হিন্দু-নারী-জীবনের আদর্শবিষয়ে এই প্রেরণাপূর্ণ নবালোক পাইয়া বস্টন ও কেম্ব্রিজের নারীসমাজ এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বামীজীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার মাতৃদেবীকে মেরী-ক্রোড়ে যীশুর একখানি চিত্রসহ একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি হার্দিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পত্রখানি এই:

"স্বামী বিবেকানন্দের পূজনীয়া জননীর প্রতি,

"ঠাকুরানী, এই যীশু-জন্মসপ্তাহে যখন সকলে আমাদের সহিত সমবেতভাবে জগতে মেরীপুত্রের অবদানস্মরণে উৎসব ও আনন্দে নিমগ্ন, তখন অন্য সব শুভ

ঘটনাও স্মরণীয়। আপনার পুত্র আমাদের মধ্যে আছেন বলিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। কয়েক দিন পূর্বে তিনি এখানে ভারতের মাতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলেন যে, এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার কল্যাণার্থ তিনি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে। সেদিন যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহার জননীকে অর্চনা করিলে দিব্যশক্তি ও আত্মোন্নতি লাভ হয়।

"হে পুণ্যচরিতে, আপনার সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত আপনার চরিত্র ও কার্যাবলী উপলব্ধি করিয়া আমরা আপনার প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি; অনুগ্রহপূর্বক উহা গ্রহণ করুন। আশা করি, এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা উপহার সকলকে স্পষ্টতঃ স্মরণ করাইয়া দিবে যে, ভগবান্ হইতে জগৎ উত্তরাধিকারসূত্রে যে ভ্রাতৃভাব ও একপ্রাণতা লাভ করিয়াছে, তাহার বাস্তব প্রতিষ্ঠা অচিরে অবশ্যম্ভাবী।"

কেম্ব্রিজের ভাষণগুলির আর একটি ফল এই হইয়াছিল যে, তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'গ্র্যাজুয়েট ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি অব হার্ভার্ড ইউ-নিভার্সিটিতে' বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহূত হইয়াছিলেন। এই কথা আমরা যথাস্থানে বলিব।

স্বামীজীর সংবর্ধনার্থ ব্রুকলিনের শ্রীযুক্ত চার্ল্‌স এম. হিগিন্স ২৮শে ডিসেম্বর, শুক্রবারে (১৮৯৪) তথায় যে সান্ধ্যসম্মেলনের আয়োজন করেন, উহাতে যোগ দিবার জন্য স্বামীজী কেম্ব্রিজ হইতে ব্রুকলিনে আসিলেন। 'ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের' অনেক সভ্যও ঐ সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন; তাছাড়া আরও আসিয়াছিলেন স্বামীজীর শিষ্য ল্যাণ্ডসবার্গ, পূর্বপরিচিতা কুমারী ফিলিপ্স ও উক্ত এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (নৈতিক সমিতির) সভাপতি ডাঃ জেনস। নৈতিক সমিতি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারই সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি স্বামীজীর একনিষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হিগিন্সও স্বামীজীর বিশেষ বন্ধু ও নৈতিক সমিতির পদাধিকারী ছিলেন। স্বামীজীর ব্রুকলিনে পদার্পণের পূর্বে ইনি তাঁহার সম্বন্ধে একখানি দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই আমন্ত্রণে স্বামীজী ব্রুকলিনে ও 'ব্রুকলিন নৈতিক সমিতি'তে বক্তৃতা দেন। ব্রুকলিন শহরে প্রথম বক্তৃতা হয় পাউচ

ম্যানশনে ৩০শে ডিসেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় ; বিষয় ছিল 'ভারতীয় ধর্মসমূহ' আর সভাপতি ছিলেন ডাঃ জেনস। বক্তৃতার পরে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল। 'ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়নে' এই বক্তৃতার যে বিবরণ বাহির হয়, তাহা স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে 'হিন্দু রিলিজিয়ান' নামে ছাপা হইয়াছে। বক্তৃতায় কোন প্রবেশ-ফি গৃহীত হয় নাই। প্রশ্নোত্তরকালে স্বামীজীর মুখে আমেরিকায় সর্বপ্রথম এই বার্তাটি বিঘোষিত হয় : "বুদ্ধ যেমন প্রাচ্যদেশের জন্য একটি বিশেষ বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন, আমিও তেমনি পাশ্চাত্ত্যের জন্য একটি বিশেষ বাণী লইয়া আসিয়াছি।"

প্রথমে কথা ছিল, স্বামীজী ব্রুকলিনে একটি মাত্র বক্তৃতা দিবেন। কিন্তু প্রথম বক্তৃতার সাফল্য দেখিয়া পরে আরও বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই কালের কার্যাবলী সম্বন্ধে স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুআরি শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন : "তাঁহাদের অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, এই জাতীয় প্রাচ্য-দেশীয় ধর্মবিষয়ক বক্তৃতায় ব্রুকলিনের জনসাধারণ আকৃষ্ট হইবে না। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে বক্তৃতাটি বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হইল। ব্রুকলিনের বিদগ্ধ-সমাজের প্রায় ৮০০শত জন উপস্থিত ছিলেন এবং যেসব ভদ্রলোক সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহবান ছিলেন, তাঁহারাই গোটা কয়েক বক্তৃতার আয়োজন করিতেছেন। আমার নিউ ইয়র্কের বক্তৃতাবলীর আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু কুমারী থার্সবি নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমি তারিখ ঠিক করিতে চাই না। অতএব কুমারী থার্সবির বন্ধু কুমারী ফিলিপ্স—যিনি আমার নিউ ইয়র্কের বক্তৃতাবলীর উদ্যোক্ত্রী—যদি নিউ ইয়র্কে কিছু করিতেই চান, তবে তাহা থার্সবির সহযোগেই করিবেন।" পত্রখানি চিকাগো হইতে লিখিত এবং হঠাৎ সেখানে যাওয়ার ব্যাখ্যাকল্পে তিনি লিখিয়াছেন : "আমি হেল-পরিবারের নিকট অনেক ঋণী ; তাই ভাবিলাম, নববর্ষের দিনে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবাক করিব" (ইংরেজী গ্রন্থাবলী, ৫।৬৩)। সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, তেমনি ছিলেন সর্বতোভাবে বন্ধুবৎসল।

ব্রুকলিনের নৈতিক সমিতির আনুকূল্যে যে বক্তৃতা কয়টি আয়োজিত হইয়াছিল উহার বিষয় ও তারিখ এইরূপ নির্দিষ্ট হয় :

নারীর আদর্শ—হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান—২০শে জানুআরি।

ভারতের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম—৩রা ফেব্রুআরি।

বেদ ও হিন্দুধর্ম ; পৌত্তলিকতার অর্থ কি ?—১৭ই ফেব্রুআরি।

প্রত্যেকটি বক্তৃতাই হয় রবিবারে এবং ঘোষণায় বলা হয় : "সব বক্তৃতার জন্য টিকেট—১ ডলার ; একটির জন্য—৫০ সেণ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-কার্য ও নৈতিক সমিতির পুস্তকপ্রকাশ তহবিলের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হইবে।" ২৫শে ফেব্রুআরি স্বামীজী "জগতে ভারতের দান" সম্বন্ধে আর-একটি বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত ঘরোয়া বৈঠকে তিনি দুইটি বক্তৃতা দেন এবং ৭ই এপ্রিল পাউচ ম্যানশনে সর্বশেষ বক্তৃতা দেন—'হিন্দুদের কয়েকটি রীতি-নীতি ; তাহাদের অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা', এই বিষয়ে।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, চিকাগো ধর্মমহাসভার সময় হইতেই একদল মিশনরী স্বামীজীর শত্রুতা করিয়া আসিতেছিলেন ; এবং বিরোধ চরম সীমায় উঠে ডেট্রয়েটে স্বামীজীর জনপ্রিয়তার পরে। ইহার পরে উহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিপ্রায় অতি ক্ষীণভাবে আপনার কার্য চালাইয়া যাইতে থাকিলেও, সে বিরোধ অচিরে চিরতরে নির্বাপিত হইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু ব্রুকলিনে স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা 'নারীর আদর্শ' আবার সে অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা পূর্ণরূপ প্রজ্বলিত হইল, যদিও উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারেও স্বামীজীর কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই ; উহা শুধু আমেরিকান সমাজে একটা ক্ষণিক চাঞ্চল্য ঘটাইয়া চিরতরে নির্বাপিত হইয়া যায়। ব্যাপারটি আরম্ভ হইয়াছিল রমাবাঈ সার্কল (মণ্ডলী)-গুলিকে কেন্দ্র করিয়া।

পণ্ডিতা রমাবাঈ ছিলেন মহারাষ্ট্রদেশীয় এক ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় এক বাঙ্গালী অব্রাহ্মণকে বিবাহ করেন। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডে যান। সেখানে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ এবং ইংরেজীবিদ্যা অর্জন করিবার পর ভারতে ফিরিয়া হিন্দু-বালবিধবাদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি আমেরিকায় যান ও তাঁহার সাহায্যকল্পে অমেরিকান নারীসমাজের অনেকে 'রমাবাঈ সার্কল' নাম দিয়া পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ব্রুকলিনের মণ্ডলটি এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। সহজে অর্থলাভের উদ্দেশ্যে মিশনরীরা যেমন মুখরোচক কাহিনী ও কুৎসা রটনা করিতেন, রমাবাঈ এবং তাঁহার অনুগামিনীরাও ঐরূপে আমেরিকার নিকট ভারতীয় বৈধব্যজীবনের

এমন এক কাল্পনিক ও বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে, স্বামীজী যখন স্বীয় বক্তৃতায় সত্য ঘটনা খুলিয়া বলিলেন, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অজ্ঞাতসারেই রমাবাঈ-মণ্ডলীর সহিত তাঁহার বিরোধের সূত্রপাত হইল।

স্বামীজী প্রত্যক্ষতঃ এই বিরোধে যোগদান না করিলেও তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক ডাঃ জেনস তাঁহার পক্ষ সমর্থনপূর্বক শত্রুপক্ষকে সমুচিত প্রত্যুত্তর দেন। বিরোধ ইহাতেও শান্ত হয় নাই; কয়েক মাস ধরিয়াই ইহা চলিয়াছিল। আবার ২৫শে ফেব্রুআরি (১৮৯৫) তারিখে 'জগতে ভারতের দান' বিষয়ক স্বামীজীর বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রোতাদের মধ্যে একজন তৎকালীন বিতর্কমূলক বিষয় 'হিন্দু-বিধবা' সম্বন্ধে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। তখন স্বামীজীকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল যে, ভারতে বিধবাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়, ইহা অতিরঞ্জিত মিথ্যা কথা; আইন অনুযায়ী বিধবাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার আছে এবং অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে স্বামীর সম্পত্তিতেও তাহার জীবন-স্বত্ব আছে। আর উচ্চশ্রেণীতে বিধবাবিবাহ হয় না প্রাকৃতিক নিয়মে। কারণ, তাহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মেয়েদের অনুপাতে কম। নিম্নবর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত নহে; আর সতীদাহপ্রথা পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহ হয়, এমনও কোন কথা নয়। এই সকল এবং আরও যেসব এই জাতীয় তথ্য স্বামীজী বলিয়াছিলেন তাহাতে রমাবাঈ-চক্রের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িয়াছিল মাত্র।

রমাবাঈ-চক্রের উষ্মা ও সংবাদপত্রে লেখনী-সঞ্চালন কিছুদিন ধরিয়া চলিলেও স্বামীজীর প্রচারকার্য উহাতে ব্যাহত হয় নাই। প্রকাশ্য বক্তৃতা তো পূর্বনির্দিষ্ট দিনগুলিতে চলিতেই ছিল, ঘরোয়া আলোচনাদিও বেশ জমিতেছিল। ল্যাণ্ডসবার্গ ২৬শে জানুআরিতে মেরীকে লিখিয়াছিলেন, "গতকাল (শুক্রবার) ব্রুকলিনের শ্রীযুক্তা চার্লস ওয়েলের গৃহে স্বামীজীর ঘরোয়া বক্তৃতাবলী আরম্ভ হইয়াছে। সভায় প্রায় পঁয়ষট্টি জন উপস্থিত ছিলেন—ইহাদের অধিকাংশই ভদ্রমহিলা। স্বামীজী 'উপনিষদ্ ও আত্মতত্ত্বের' মূল কথাগুলি বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া সকলে খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী আলোচনা বৈঠক হইবে মঙ্গলবারে।"

ব্রুকলিনে স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতা হয় 'ভারতের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম' সম্বন্ধে পাউচ ম্যানশনে ৩রা ফেব্রুআরি। ২৫শে ফেব্রুআরি, সোমবারে তিনি 'ভারতের

দান' সম্বন্ধে লঙ আয়ল্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটির হলে বক্তৃতা দেন। এই সব সময়টাই ব্রুকলিনের সংবাদপত্রগুলি রমাবাঈ-মণ্ডলীর সহিত স্বামীজীর মতবৈধ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল এবং উভয়পক্ষের অনেক বাদপ্রতিবাদ ছাপাইয়া বিরোধটা জাগাইয়া রাখিবারই প্রবৃত্তি দেখাইয়াছিল। সভাসমিতিতেও শ্রোতারা ঐ বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়া স্বামীজীকে বিব্রত করিতেছিলেন। এই বাদপ্রতিবাদের মধ্যে একটা কথা ফাঁপাইয়া তোলা হইল যে, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-কন্যাদের শিক্ষার বিরোধী। হয়তো ইহারই প্রত্যুত্তরকল্পে ডাঃ জেনস সংবাদপত্রের মাধ্যমে ১২ই মার্চ ঘোষণা করেন, "আমরা আশা করি, আমরা এই অনুমানটি সর্বতোভাবে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিব, যখন এই উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বাবু শশিপদ ব্যানার্জির শিক্ষাকার্যের সাহায্যকল্পে আগামী বারে ব্রুকলিনে বক্তৃতা দিবেন।" আমরা ধরিয়া লইতে পারি, স্বামীজী শুধু প্রয়োজনের খাতিরে ঐ বক্তৃতা দেন নাই; ইহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের সম্বন্ধও ছিল; কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য ভারতীয়দিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এই বক্তৃতালব্ধ অর্থ ডাঃ জেনস 'বরাহনগর বোর্ডিং স্কুল ফর হিন্দু উইডোজ'-এর সাহায্যকল্পে পাঠাইয়া উহার প্রতিষ্ঠাতা শশিপদবাবুকে লিখিয়াছিলেন, "স্বামীজীর প্রতি অবিচার না হয়, এইজন্য আমাকে বলিতে হইবে যে, আপনার বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বক্তৃতা দিবার প্রস্তাবটি ছিল স্বামীজীর নিজস্ব, যদিও আমরা সানন্দে তাঁহার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্যে সহযোগিতা করিয়াছি।" ('নিউ ডিসকভারিজ', ৫১৭)।

রমাবাঈ-মণ্ডলীর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত স্বামীজীর ২১শে মার্চের (১৮৯৫) পত্রে। উহাতে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, এই মণ্ডলীটি তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতেছে। আমরা এই বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ব্রুকলিনের রমাবাঈ-মণ্ডলীর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা জেমস ম্যাককীন ৬ই এপ্রিলের সংবাদপত্রে পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটারই মতো স্বামীজীর বিরুদ্ধে 'নববিধান-সমাজের' প্রচারিত আর একটি অপবাদের কথাও পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেন: "ব্রাহ্ম সমাজের অফিসিয়্যাল মুখপত্র 'ইউনিটি ও মিনিস্টার'-এ এতদূর পর্যন্ত বলা হইয়াছে যে বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্তকে দার্শনিকরূপে না জানিয়া তাঁহারা বরং তাঁহাকে নববিধানের থিয়েটার অভিনেতারূপেই জানিয়াছিলেন।"

('নিউ ডিসকভারিজ', ৫৩৩)। লেখিকা ক্রোধোন্মত্তা হইয়া আরও বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীর বিরুদ্ধে পুরাতন নানা কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং ডাঃ জেনস উহার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু পক্ষপাতী সংবাদপত্র 'ঈগল' তাহা প্রকাশ করে নাই। এইভাবে ব্রুকলিনের জনসাধারণ সত্য হইতে বঞ্চিত রহিল; তথাপি শশিপদবাবুর নারী-বিদ্যালয়ের জন্য ৭ই এপ্রিলে প্রদত্ত বক্তৃতাকালে স্বামীজী প্রতিপক্ষের প্রতিকথা ধরিয়া উত্তর না দিলেও সাধারণভাবে এমন কতকগুলি কথা বলিয়া গেলেন যে, এই বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ সেখানেই নিরস্ত হইল। ঐ দিন তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল পাউচ গ্যালারীতে; বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'হিন্দুদের কয়েকটি রীতি-নীতি—তাহাদের অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা!'

এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, না জানিয়া-শুনিয়া পরধর্মাবলম্বীর নিন্দা করা অন্যায়; কেননা অপরের আচরণ পছন্দ না হইলেও সে আচরণের পশ্চাতে যুক্তি থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, লোম দিয়া দাঁত না মাজিয়া গাছের ডাল দিয়া মাজা আরও উত্তম। জগন্নাথের রথের তলায় ফেলিয়া লোক-হত্যার আজগুবী গল্প ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। তারপর তিনি জাতিবিভাগের মূল তথ্য বুঝাইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অস্পৃশ্যতার অত্যন্ত নিন্দা করেন এবং জাতিভেদের কিছু কিছু দোষও দেখাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন যে, সব দিকটা ভালভাবে পরীক্ষা না করিয়া শুধু খারাপ দিকটা দেখিয়া বই লিখিতে যাওয়া অন্যায়। ইংরেজী শিক্ষার ফলে অনেক হিন্দু যে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হন, তিনি ইহার নিন্দা করেন। ইংরেজরা হিন্দুদিগকে সভ্য করিতে যাইয়া অসভ্য করিয়া তোলে। তবে ডেভিড হেয়ারের মতো মহানুভব ব্যক্তিও ইংরেজদের মধ্যে আছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, "ধামা-ধামা গালাগালি, গাড়ি-গাড়ি কুৎসার ব্যবস্থা এবং জাহাজ-জাহাজ নিন্দাবাদ না পাঠাইয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রেমধারা প্রবাহিত হউক। আমরা যেন সকলে মানুষ হই।" সভাশেষে শ্রোতৃবৃন্দ একবাক্যে বক্তাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সভার জন্য কোন প্রবেশ-ফি ছিল না; কিন্তু বক্তৃতান্তে শশিপদবাবুর বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। এইভাবে রমাবাঈ-মণ্ডলীর নামোল্লেখ মাত্র না করিয়া ভারতের প্রকৃত দোষগুণ ও অভাবের কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া এবং পরিশেষে প্রেমের আবেদন জানাইয়া ও অর্থ-

দানপূর্বক সে প্রেমকে রূপপ্রদানের অবকাশ দিয়া স্বামীজী ব্রুকলিন-সমাজের হৃদয় জয় করিলেন। ইহার পর স্বামীজী যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, এই জাতীয় বিরুদ্ধাচরণ আর কোন কালে মাথা তুলিতে পারে নাই। ঐ দিনের বক্তৃতার রিপোর্ট ছাপাইতে গিয়া 'ডেলি ঈগল' সুন্দর শিরোনামা দিয়াছিল, "ভারতকে নিজের মতো চলিতে দাও; তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে—এই কথা বলেন স্বামী বিবেকানন্দ।" মনে হয়, তখন হইতেই আমেরিকা ভারতকে এই স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমরা কিন্তু ভাবিয়া অবাক হই, শত্রুতা যেখানে চরিত্রকে পর্যন্ত জনমতের সম্মুখে বলি দিতে প্রস্তুত হয় এবং এই নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারদুষ্ট উদ্ভট কল্পনা যেখানে প্রত্যক্ষতঃ কোনও বাধা পায় না, সেখানেও ঐ মিথ্যার সহিত অপরোক্ষ সম্পর্কহীন এবং অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত বক্তৃতার দ্বারা কিরূপে উহা হঠাৎ নিরস্ত হয়? ইহা কি দৈববিধান অথবা স্বামীজীরই দৈবশক্তির প্রভাব? উত্তর আমরা পাঠকেরই হস্তে অর্পণ করিয়া অন্য বিষয়ে অগ্রসর হই। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, স্বামীজী ৩০শে ডিসেম্বর (১৮৯৪) হইতে ৮ই এপ্রিল (১৮৯৫) পর্যন্ত ব্রুকলিনে সর্বসাধারণের জন্য মোট ছয়টি ও ঘরোয়াভাবে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মার্চ মাসে তিনি হার্টফোর্ড (কনেকটিকাট)-এর 'মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি'তে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া 'আত্মা ও ঈশ্বর' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। বাকি সময় তিনি নিউ ইয়র্কের কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এখন আমাদিগকে ঐ ঘটনাবলীতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

সৎকার্যের জন্য হইলেও এবং অনন্যোপায় হইয়া ঐরূপ করিতে বাধ্য হইলেও ধর্মশিক্ষার বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ করা স্বামীজী আর কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না; তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, একস্থানে বসিয়া আশ্রমের মতো একটা কিছু গড়িয়া তুলিবেন এবং আগ্রহশীল জনকয়েক নরনারীকে ঘনিষ্ঠভাবে বেদান্ত ও যোগ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। নিউ ইয়র্কে তাঁহার এই দ্বিতীয় কার্যপ্রণালী রূপপরিগ্রহ করিল। কেম্ব্রিজ হইতে তিনি ২৮শে ডিসেম্বর (১৮৯৪) নিউ ইয়র্কে পৌছেন এবং সেখান হইতে মাঝে মাঝে ব্রুকলিনে যাইয়া বক্তৃতাদি দেন। ইহারই মধ্যে একবার নববর্ষে চিকাগোতেও যান। বাকি সময় নিউ ইয়র্কে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে থাকে। অবশ্য নভেম্বর মাসেই (১৮৯৪) সেখানে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, যদিও উহা নামে মাত্র।

এখন প্রকৃত কার্যের আরম্ভের পূর্বে আয়োজনও তদনুরূপ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বক্তৃতা ও আশ্রম-কেন্দ্রিক কার্যের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বন্ধুগৃহে দুই-চারিদিন থাকিয়া বক্তৃতা দেওয়া চলে, কিন্তু আশ্রমে বসিয়া ধর্মশিক্ষা দিতে হইলে চাই স্থায়ী গৃহ, আহারাদির ব্যবস্থা, চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদানের উপযুক্ত সহকারী এবং সমাগত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-আলোচনার সুব্যবস্থা। স্বামীজীর বন্ধুরা —বিশেষতঃ ল্যাণ্ডসবার্গ (পরবর্তী কালের স্বামী কৃপানন্দ), কুমারী থার্সবি ও কুমারী ফার্মার—এই সব বিষয়ে খুবই তৎপর হইলেন এবং স্বামীজী চিকাগো হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিবার পূর্বেই ল্যাণ্ডসবার্গ আশ্রমের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য প্রাথমিক আয়োজন অতি সাধারণ গোছেরই হইল। এই বিষয়ে ল্যাণ্ডসবার্গ ২৩শে জানুআরি (১৮৯৫) ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখিয়াছিলেন :

"কুমারী থার্সবি ও কুমারী ফার্মার নিউ ইয়র্কে ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করিতেছেন। আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, আমি দুইখানি ঘর ভাড়া করিয়াছি—একখানি নিজের জন্য এবং অপরখানি হইবে স্বামীজীর প্রধান অফিস। আগামী রবিবারে আমরা সেখানে যাইব। স্বামীজী গার্নসীদের গৃহে থাকিবেন ও আহার করিবেন এবং নূতন ভাড়াঘরটি শুধু অফিস হিসাবে ও যোগ বিষয়ে দলগতরূপে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহার করিবেন। অতএব আপনার পত্রাদি নূতন ঠিকানায় পাঠানোই উচিত হইবে—৫৪ পশ্চিম, ৩৩ নম্বর স্ট্রীট। ঐ সব পাইবার জন্য ও স্বামীজীর সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আমি সেখানে সর্বদাই থাকিব। আপনি কি মনে করেন না যে, এই মতলবটি অতি সুন্দর ?"

এখানে আমরা ল্যাণ্ডসবার্গের একটু পরিচয় লইয়া রাখি। ভগিনী কৃস্টিন তাঁহার স্মৃতি-কথায় ল্যাণ্ডসবার্গের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন: "তিনি রাশিয়ার এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার মধ্যে স্বজাতিসুলভ সবগুণই ছিল—আবেগ, কল্পনা, বিদ্যোৎসাহ ও প্রতিভাপূজা···। ইওরোপের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় —উহার দর্শন, ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতি—তাঁহার চিন্তারাজ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য ও পরিপূর্ণতা আনিয়া দিয়াছিল, যাহা অনন্যসাধারণ। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন তেজঃপূর্ণ ও সৌন্দর্যময়। বসনভূষণ ও নিজ শরীর সম্বন্ধে তাঁহার ঔদাসীন্য

দেখিয়া এবং স্বার্থচিন্তাহীন ভাবাবেগেরই মতো প্রতীয়মান তাঁহার দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পয়সাটি পর্যন্ত তিনি ভিক্ষুকের হস্তে তুলিয়া দিতেন, আর তিনি যে ভাণ্ডার হইতে উহা দান করিতেন তাহাও ছিল যাচকেরই ভাণ্ডারসদৃশ শূন্য। তিনি নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।" সেই সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করিয়া এখন তিনি স্বামীজীর খুঁটিনাটি কাজেই আত্মনিয়োগ করিলেন; তিনি বাড়ি ভাড়া করিলেন, গৃহস্থালীর কার্য স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন, স্বামীজীর সেক্রেটারি সাজিলেন—এক কথায় তিনি হইলেন স্বামীজীর দক্ষিণ হস্ত। ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেলে স্বামীজী ২৭শে জানুআরি, রবিবারে ঐ গৃহে পদার্পণ করিলেন এবং জুন মাস পর্যন্ত ইহাই হইল তাঁহার স্থায়ী কর্মকেন্দ্র। ঐ সময়ে স্বামীজীর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না, দারুণ শীতে ব্রুকলিন পুলের উপর দিয়া বারংবার যাতায়াতের ফলে তিনি সর্দিতে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কার্যোত্তম ব্যাহত হয় নাই।

যে পাড়ায় বাড়ি লওয়া হইল, উহাকে তখন ঠিক সম্রান্তপল্লী বলা চলে না, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই ঐ দিকে অগ্রসর হওয়ায় সমাজের উচ্চস্তরের সম্রান্ত ব্যক্তিরা তখন অন্যত্র সরিয়া যাইতেছিলেন। বেশীরভাগ পুরাতন বাড়ি ভাঙিয়া তখন নূতন ব্যবসাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল। নগরের দরিদ্র পল্লীও সেখান হইতে খুব দূরে ছিল না। তবে তখনও উহা ভদ্রপল্লী বলিয়াই পরিচিত হইত এবং অনেকগুলি বাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার ভাড়াটিয়ারূপে থাকিতেন। স্বামীজীর বাড়ির অপর দিকে প্রশস্ত ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউতে সদ্যোনির্মিত ওয়ালডর্ফ হোটেল স্বীয় ঐশ্বর্যদ্যোতক অত্যুচ্চ মস্তক উত্তোলন করিয়া ঐ নষ্ট-গৌরব পল্লীকেও সম্মানের আসন দিতেছিল। প্রশ্ন উঠে, হালরুচির দ্বারা পরিত্যক্ত এই পল্লীতে স্বামীজী ও ল্যাণ্ডসবার্গ বাড়ি লইলেন কেন? প্রথমেই মনে হয় অর্থাভাবই ইহার কারণ ছিল। তবে এই কারণের সহিত অন্য কারণও মিশ্রিত ছিল। ভগিনী দেবমাতা (শ্রীমতী লরা গ্লেন) লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে আসিয়া এক প্রচণ্ড বর্ণবিদ্বেষের সম্মুখীন হইলেন, যাহার ফলে তাঁহাকে সাধারণ ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও বহু অসুবিধায় পড়িতে হইল। অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে বাসস্থান সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইল। গৃহস্বামিনীরা তাঁহাকে প্রায়ই বলিতেন যে, ব্যক্তিগতভাবে

তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোনই বিদ্বেষ নাই, কিন্তু তাঁহাদের ভয় ছিল এই যে, কোন এশিয়াবাসীকে স্বগৃহে থাকিতে দিলে অবশিষ্ট বাসিন্দা বা ভোজনকারীরা সে গৃহ ত্যাগ করিবেন। এই কারণে বাধ্য হইয়া স্বামীজীকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের গৃহ লইতে হইয়াছিল।" এই বিষয়ে স্বামীজীর বন্ধুমহলেও জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল—ইহার নিদর্শন স্বামীজীরই পত্রে রহিয়াছে। ১১ই এপ্রিল (১৮৯৫) তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, "আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্র পল্লীতে এভাবে থাকলে এবং প্রচার করলে কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আসবেন না। বিশেষতঃ মিস হ্যামলিন মনে করেছিলেন, তিনি কিংবা তাঁর মতে যারা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে দরিদ্রোচিত কুটিরে নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুনবে তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ 'ঠিক ঠিক লোক' ঐ স্থানে দিনরাত আসতে লাগল, তিনিও আসতে লাগলেন।"

স্বামীজী আপন পরিকল্পনানুযায়ী চলিয়া সত্যসত্যই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন—অনুরাগী ভক্তদের আসার দিক হইতে। কিন্তু ইহাতে খরচ সঙ্কুলান হইতেছিল না। তাই স্বামীজী মিসেস বুলকে ২১শে মার্চ লিখিয়াছিলেন, "আমাদের বাড়িটার নীচ তলায় অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার সঙ্কল্প করছি। ঐ ঘরে প্রায় ১০০ লোকের জায়গা হবে, এতেই খরচা উঠে যাবে। ভারতবর্ষে টাকা পাঠাবার জন্য ব্যস্ত নই, সেজন্য অপেক্ষা ক'রব।" প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা যেমন কোন প্রকারে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া বিনা পয়সায় ছাত্রদের পড়াইতেন, স্বামীজী এই সময়ে ঐ প্রথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এই জীবনও ছিল বড় কষ্টের, কারণ প্রথমে যদিও তিনি গার্নসীদের গৃহে থাকিতে ও খাইতে যাইতেন, পরে তাহা না করিয়া ঐ ভাড়াবাড়িতেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন—অতি দরিদ্রভাবে। ১৪ই ফেব্রুআরি তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, "এখন বেশ সুখে আছি। আমি আর মিঃ ল্যাণ্ডসবার্গ মিলে কিছু চাল ডাল বা যব রাঁধি—চুপচাপ খাই, তারপর হয়তো কিছু লিখলাম বা পড়লাম, উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকেদের কেউ দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আর এইভাবে থেকে বোধ হচ্ছে আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করছি—আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন এরকম অনুভব করিনি।"

কুমারী এলেন ওয়াল্ডো-র স্মৃতিলিপি হইতে জানা যায়: "ব্রুকলিনে যাহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহার নিউ ইয়র্কের বাসস্থানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সাধারণের যোগ্য বাসভবনের তিন তলায় উহা ছিল একখানি সাধারণ ঘর। ক্লাসের লোকসংখ্যা আশ্চর্যরকম বাড়িয়া চলিল এবং ছোট ঘরখানিতে লোক যখন ঠাসাঠাসি করিয়া বসিত তখন বড়ই সুন্দর দেখাইত। স্বামীজী মেঝেতে বসিতেন, অধিকাংশ শ্রোতারাও ঐরূপ করিতেন। ক্রমবর্ধমান শ্রোতারা ড্রেসারের মার্বেল পাথরের উপরিভাগে, সোফার হাতলের উপরে, এমন কি কোণের হাতমুখ ধুইবার স্থানটির উপরে যে যেখানে পারিত বসিত। দরজা খোলা থাকিত এবং বাড়তি লোক হলে কিংবা সিঁড়িতে বসিত। আর কি চমৎকার ছিল সেই প্রথম দিকের ক্লাসগুলি! সেগুলি মনকে কি গভীরভাবেই না আকর্ষণ করিত! ঐগুলিতে উপস্থিত থাকার যাহাদের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহাদের কেহ কি কখন তাহা ভুলিতে পারে? স্বামীজী ছিলেন অতি শ্রদ্ধেয় ও সরল, তাঁহাতে ছিল একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ আগ্রহ, অপূর্ব বাগ্মিতা, আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংবদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্ত অসুবিধা ভুলিয়া রুদ্ধশ্বাসে তাঁহার প্রতিটি কথা শুনিতে থাকিত। যে আন্দোলনটি অতঃপর এত বিস্তারলাভ করিয়াছে, তাহার আরম্ভ এইরূপে হওয়া খুবই সমুচিত ছিল। সম্পূর্ণ বাহ্যাড়ম্বরশূন্যরূপেই স্বামীজী নিউ ইয়র্কে তাঁহার বেদান্তপ্রচার আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী মুক্ত পবনেরই ন্যায় বিনা অর্থে সেবা করিয়া চলিলেন। স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দানে বাড়িভাড়ার খরচ চলিত। যখন উহাতে কুলাইত না, তখন স্বামীজী কোন হল ভাড়া লইতেন ও ভারতের কোন সামাজিক বিষয়াদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং উহা ক্লাস চালাইবার জন্য খরচ করিতেন। তিনি বলিতেন, হিন্দু শিক্ষকদের মতে পাঠ চালাইবার ব্যয়ের ব্যবস্থা করা শিক্ষকদের কর্তব্য, এমনকি ছাত্রদের অভাব থাকিলে উহা পূরণ করাও তাঁহাদেরই কর্তব্য, গরীব ছাত্রকে সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে (?) ক্লাসগুলি আরম্ভ হয় এবং জুন পর্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু বহু পূর্বেই তাহাদের আয়তন এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অতঃপর একতলার বৈঠকখানা ও সংলগ্ন স্থানগুলি উহাদের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। প্রায় প্রতিদিন সকালে তো ক্লাস বসিতই, প্রতি সপ্তাহের অনেক সন্ধ্যায়ও বসিত। তাছাড়া কয়েকটি রবিবাসরীয় বক্তৃতাও হইয়াছিল। এবং যাহাদের নিকট

শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি অত্যন্ত অভিনব ও অদ্ভুত ঠেকিত বলিয়া তাহারা উহা আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চাহিত, তাহাদের জন্য প্রশ্নোত্তর ক্লাসেরও ব্যবস্থা হইত।”

এই সময়েই কুমারী জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর ভক্তবৃন্দ ইঁহাকে আদর করিয়া ট্যান্টিন (পিসি-মা) বলিয়া ডাকিতেন। তিনি নিজেকে স্বামীজীর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেও অপর সকলে তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়াই জানিতেন। পরে তিনি স্বামীজীর সহিত ইওরোপ ও ভারত ভ্রমণ করেন ও বহু বিষয়ে স্বামীজীকে সাহায্য করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও আনুকূল্য বহুরূপে প্রকটিত হইত। এককালে তিনি প্রায় প্রতিবৎসর ভারতভ্রমণে আসিয়া দীর্ঘকাল বেলুড় মঠে বাস করিতেন ও নানাপ্রকারে মঠ-মিশনের কার্যে সাহায্য করিতেন। শ্রীযুক্তা পল ভার্ডিয়ার-এর লিপি হইতে স্বামীজীর নিকট তাঁহার প্রথম আগমনের সংবাদ এইরূপ পাওয়া যায়: “ট্যান্টিন তখন নিউ ইয়র্ক হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে হাড্‌সন নদীর তীরে তাঁহার ভগিনীর (শ্রীযুক্তা স্টার্জিস, বা পরবর্তী কালে শ্রীযুক্তা লেগেটের) সহিত ডবসন ফেরীতে বাস করিতেন। ভগিনীর দুইটি সন্তান ছিল, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—হলিস্টার ও এলবার্টা)। শ্রীযুক্তা ডোরা রোয়েথলিস বার্জার-এর আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক শক্তি সম্বন্ধে সুনাম ছিল ও তাঁহার সহিত ট্যান্টিন-এর বন্ধুত্ব ছিল। ডবসন ফেরীতে থাকাকালে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুআরির কাছাকাছি একদিন তিনি শ্রীযুক্তা রোয়েথলিস বার্জারের নিকট হইতে পত্র পাইলেন, তিনি এবং তাঁহার ভগিনী যেন ভারত হইতে আগত অপূর্ব এক ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে নিউ ইয়র্কে আসেন। দুই ভগিনীই চলিয়া আসিলেন এবং ২৯শে জানুআরি তিন জন একত্রে ৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩নং স্ট্রীটের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। ইহাই স্বামীজীর সহিত ট্যান্টিনের প্রথম সাক্ষাৎকার।”

অতঃপর কুমারী ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায়: “১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুআরি আমি আমার ভগিনীর সহিত নিউ ইয়র্কের ৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩নং স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের স্বগৃহে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পনর হইতে কুড়িজন ভদ্রমহিলা এবং দুই-তিনজন ভদ্রলোক। ঘরটি ছিল পরিপূর্ণ। সব চেয়ার পূর্ব হইতে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায়

আমি সম্মুখের সারিতে মেঝের উপর বসিলাম। স্বামীজী দাঁড়াইয়া ছিলেন এক কোণে। তিনি প্রথম যে কথাটি বলিলেন, তাহা এখন আমার মনে নাই; কিন্তু তখন উহা আমার নিকট অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল। তিনি যে দ্বিতীয় কথাটি বলিলেন, তাহাও ছিল সত্য, আর তেমনি সত্য ছিল তৃতীয় কথাটি। তারপর সাত বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন, সবই আমার নিকট ছিল অভ্রান্ত। সেদিন হইতে আমার নিকট জীবনের অর্থ অন্যরূপ হইয়া গেল। মনে হইত, তিনি অপরের মধ্যে এমন এক অনুভূতি জাগাইয়া দিতেন যেন সে অসীমের মধ্যে বাস করিতেছে। সে অসীমতার কোন পরিবর্তন হইত না, কোন বৃদ্ধিও তাহাতে ছিল না। সূর্যকে একবার দেখিলে যেমন আর কখনও ভোলা যায় না, এ যেন ঠিক তাহারই মতো। সেই সারা শীতকালটাই আমি তাঁহার ভাষণ শুনিয়াছিলাম—সপ্তাহে তিন দিন সকাল এগারটায় যাইতাম। আমি কোন দিন তাঁহার সহিত কথা বলি নাই; কিন্তু আমরা নিয়মিত যাইতাম বলিয়া স্বামীজীর এই বসিবার ঘরের সামনের লাইনে আমাদের জন্য দুইখানি আসন নির্দিষ্ট থাকিত। একদিন তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'তোমরা কি দুই বোন?' 'হাঁ' বলিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি অনেক দূর থেকে আস?' আমরা বলিলাম, 'খুব দূর নয়, হাডসন নদীর এই ত্রিশ মাইল উজানে।' 'এত দূর থেকে! এ তো খুব আশ্চর্য!' তাঁহার শক্তির বোধ হয় ইহাই প্রমাণ যে তিনি অপরের মনে সাহস আনিয়া দিতেন। কখনও এমন মনে হইত না যে, তিনি নিজের কথা ভাবিতেছেন, তাঁহার মনের আকর্ষণ ছিল অপরের দিকে। তিনি বলিলেন, 'জীবনের পুঁথিটা যখন খুলতে আরম্ভ করে তখনই তো মজা।' তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, জীবনে এমন কিছুই থাকিতে পারে না যাহা ধর্মবিচ্যুত—সবটাই পবিত্র। 'সর্বদা মনে রাখবে, তুমি যে আমেরিকাবাসিনী বা নারী হয়ে জন্মেছ, এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র; আসলে তুমি সদাসর্বদা ভগবানেরই সন্তান। দিন রাত নিজেকে মনে করিয়ে দেবে, তুমি কে। কখনও ভুলে যেও না।' এইরূপ কথাই তিনি আমাদিগকে বলিতেন। বুঝিতেই পারিতেছ, তাঁহার সান্নিধ্য ছিল বিদ্যুদ্বৎ উদ্দীপনাময়। নিজের হাতে অর্থ না থাকিলে যেমন অপরকে দেওয়া চলে না, তেমনি নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকিলে তাহা অপরের মধ্যে সঞ্চার করা চলে না;

সঞ্চার করা হইতেছে বলিয়া কল্পনা করিতে পার, কিন্তু বস্তুতঃ করিতে পারা যায় না।"

এই সব কাজের সঙ্গে স্বামীজীর অন্যরূপ কাজও চলিতেছিল। মেরী হেলকে লিখিত ১০ই ফেব্রুআরির পত্রে পুস্তিকাপ্রকাশের সংবাদ রহিয়াছে: "তোমার পত্র পাবার ঠিক পরেই আমি তোমাকে লিখি এবং নিউ ইয়র্কে দেওয়া আমার তিনটি বক্তৃতাসংক্রান্ত কয়েকখানি পুস্তিকা পাঠাই। রবিবাসরীয় ও সাধারণে প্রদত্ত এই ভাষণগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিত হয়ে পরে মুদ্রিত হয়েছে। এইরূপ তিনটি বক্তৃতা দুইখানি পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়, তারই কয়েকখানি তোমাকে পাঠাই।" ঐ পত্রেই তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের উল্লেখও আছে: "এ বৎসর অবিরাম কাজের ফলে আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। স্নায়ুই বিশেষভাবে আক্রান্ত। সারা শীতে একরাত্রিও সুনিদ্রা হয়নি। দেখছি—অতিরিক্ত খাটুনি হয়ে যাচ্ছে। আবার সামনে ইংলণ্ডে মস্ত কাজ।"

এপ্রিল মাসে কয়েকদিনের জন্য স্বামীজী একটি গ্রামে (রিজলি?) গিয়াছিলেন। শ্রীমতী বুলকে লেখা ১১ই এপ্রিলের পত্রে আছে: "আগামীকাল মিঃ লেগেটের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ীতে যাচ্ছি। সেখানে কয়েকদিন থাকব।" ঐ গ্রামে দিন দশেক থাকিয়া তিনি নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার এই অনুপস্থিতিকালে ল্যাণ্ডসবার্গ অন্যত্র চলিয়া যান। ভাবপ্রবণ এবং খামখেয়ালী ল্যাণ্ডসবার্গের পক্ষে এরূপ করা আশ্চর্য ছিল না। হইতে পারে যে, স্বাধীনচেতা স্বামীজীর কার্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলেন, স্বামীজী তাহা পছন্দ করেন নাই; আবার স্বাধীনমতি ল্যাণ্ডসবার্গও স্বীয় ভাবাবেগ সংযত করিয়া গুরুর নিকট পড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। মিসেস বুলকে স্বামীজী ৭ই মে লিখিয়াছিলেন: "ল্যাণ্ডসবার্গ আসে না; আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার উপর বিরক্ত হয়েছে।" আবার জুন (এপ্রিল?) মাসে লিখিয়াছিলেন: "সে (ল্যাণ্ডসবার্গ) যেখানেই যাক, ভগবান তার মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে দু-চারজন অকপট লোক দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সে তাদেরই মধ্যে একজন।" পরে ল্যাণ্ডসবার্গ ফিরিয়া আসিয়া আবার সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

এই সময়ে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া তাঁহার বন্ধু ডাঃ গার্নসী

তাঁহার চিকিৎসা করিতেন। সম্ভবতঃ গার্নসীর উপদেশে কিংবা অন্য কাহারও পরামর্শানুসারে তিনি এই সময়ে শরীরের ওজন কমাইবার জন্য স্বল্পাহারের আশ্রয় লন—ইহা মেরীকে লিখিত তাঁহার ২২শে জুন (এপ্রিল?) তারিখের পত্র হইতে জানা যায়: "আজকাল দুধ, ফল, বাদাম—এইসব আমার আহার। ভাল লাগে, আছিও বেশ। এই গ্রীষ্মের মধ্যেই মনে হয়, শরীরের ওজন ৩০।৪০ পাউণ্ড কমবে।" ('বাণী ও রচনা', ৭।১২৭)।

২৫শে এপ্রিলের পত্রে তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে জানাইলেন: "বর্তমানে গ্রীনএকারে যেতে পারছি না, থাউজেণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্কে (সহস্রদ্বীপোদ্যানে) যাবার বন্দোবস্ত করেছি—উহা যেখানেই হউক। তথায় আমার জনৈকা ছাত্রী মিস ডাচারের এক কুটির আছে।...আমার ক্লাসে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে 'যোগী' করতে চাই। গ্রীনএকারের মতো কর্মচঞ্চল হাট এ কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।" এই পত্রে নিউ ইয়র্কের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে: "জ্ঞানযোগের ক্লাসে যাঁরা আসতেন, তাঁদের ১৩০ জনের নাম মিস হ্যামলিন টুকে রেখেছিলেন।...আরও ৫০ জন বুধবারে যোগ-ক্লাসে আসতেন আর সোমবারের ক্লাসে আরও ৫০ জন।"

স্বামীজী নিজ বাসগৃহে বিনা দক্ষিণায় ক্লাস চালাইতেন এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য নীচের তলার বৈঠকখানায় বক্তৃতা দিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন। এই দুই স্থান ছাড়াও তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলের আনুকূল্যে নিউ ইয়র্কের শ্রীযুক্তা কে. এল. বার্বার-এর গৃহে এপ্রিল মাসে 'বার্বার-বক্তৃতাবলী' নামে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ডিকসন সোসাইটিতেও তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং মে মাসে ও হয়তো এপ্রিল মাসেও মর্টস মেমোরিয়াল বিল্ডিং-এর উপরের হলে সর্বসাধারণের জন্য অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে কেবল দুইটির বিষয়-বস্তু জানিতে পারা গিয়াছে—১৩ই মের বক্তব্য বিষয় ছিল, 'ধর্ম-বিজ্ঞান' এবং আর একটি বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'যোগের যৌক্তিকতা'। এই দ্বিতীয় বক্তৃতার তারিখ জানা নাই। বসন্তকালে স্বামীজী আরও বক্তৃতা দিয়া থাকিবেন এবং সম্ভবতঃ এইরূপ একটি বক্তৃতাতেই ভগিনী দেবমাতা স্বামীজীকে প্রথম দেখিতে পান। তাঁহার অতি মূল্যবান স্মৃতিকথার কিয়দংশ এইরূপ:

"একদিন ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি এমন সময় 'হল অব দি ইউনিভার্স্যাল ব্রাদারহুড' (বিশ্বভ্রাতৃত্ব-হল)-এর জানালায় একটি সাধারণ

বিজ্ঞাপন দেখিলাম—"আগামী রবিবার অপরাহ্ণ তিনটায় স্বামী বিবেকানন্দ এখানে 'বেদান্তের অর্থ কি?' এই বিষয়ে এবং পরবর্তী রবিবারে 'যোগের অর্থ কি?' এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। আমি নির্দিষ্ট সময়ের বিশ মিনিট পূর্বে হলে উপস্থিত হইলাম; উহা তখনই অর্ধেক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হলটি অবশ্য বড় ছিল না—একখানি অপ্রশস্ত দীর্ঘ কক্ষের মধ্যবর্তী একটিমাত্র চলার পথের দুই দিকে প্রাচীর পর্যন্ত বেঞ্চিগুলি সাজানো ছিল। হলের এক প্রান্তে একটি অনুচ্চ মঞ্চের উপর পড়িবার ডেস্ক এবং চেয়ার ছিল, আর হলের পশ্চাতে ছিল সোপানাবলী। হলটি ছিল দোতলায় এবং ঐ একটিমাত্র সোপানশ্রেণী ধরিয়া বক্তা ও শ্রোতা সকলকেই হলে আসিতে হইত। তিনটা বাজিতে না বাজিতে হল, সিঁড়ি, জানালা, রেলিং সবই লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমনকি অনেকে নীচে এই আশায় দাঁড়াইয়া রহিল, যদি বা সৌভাগ্যক্রমে উপরের হলের বক্তৃতার কিছুটা শুনিতে পায়। অকস্মাৎ সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল, সিঁড়িতে শান্ত পদক্ষেপ শোনা গেল এবং স্বামী বিবেকানন্দ অতি সমুন্নত দেহে মধ্যবর্তী বারাণ্ডা ধরিয়া মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তাঁহার ভাষণ আরম্ভ হইল; অমনি আমার পূর্বস্মৃতি, দেশ, কাল, পাত্র সমস্ত লীন হইয়া গেল—কিছুই অবশিষ্ট রহিল না—শুধু শূন্য মধ্যে একটিমাত্র স্বর নিনাদিত হইতে থাকিল। মনে হইল, একটা সিংহদ্বার যেন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহার মধ্য দিয়া এমন এক পথে আসিয়া পড়িয়াছি, যাহা অসীম প্রাপ্তির দিকে চলিয়া গিয়াছে। শেষ তখনও দেখা যাইতেছে না; কিন্তু যিনি সে আশা আনিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার চিন্তারাশি সে আশার আলোকে ভাস্বর ছিল এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে লক্ষ্যের জ্যোতিঃ চমকিত হইতেছিল। ঐ তো তিনি ওখানে দণ্ডায়মান—অসীমের যিনি বার্তাবহ! শূন্যকক্ষের নীরবতা আমার আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিল—তখন স্বামীজী এবং মঞ্চসকাশে দণ্ডায়মান দুই ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই চলিয়া গিয়াছে। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম—তাঁহারা শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা গুডইয়ার। সভায় গুডইয়ারই ঘোষণার কার্য করিতেন।"

দেবমাতার স্মৃতিলিপি হইতে স্বামীজীর ঐ কালের জীবনযাত্রা বিষয়ে আরও কিছু জানিতে পারা যায়: "ঐ দরিদ্রোচিত গৃহে যে ক্লাসগুলি হইত, তাহাতে বিচিত্র রকমের লোকের সমাবেশ হইত—বৃদ্ধ ও যুবা, ধনী ও দরিদ্র, বিজ্ঞ ও মূঢ়, কৃপণ যিনি হয়তো চাঁদার বাক্সে একটি বোতাম ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন ও

দাতা যিনি হয়তো একটি বা দুইটি ডলারও দিয়া যাইতেন। দিনের পর দিন সেখানে সমবেত হওয়ায় আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল—যদিও আমরা কথা বলিতাম না বা অন্যভাবেও মিশিতাম না। আমাদের অনেকে একটি অধিবেশনও বাদ দিতেন না। আমরা ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের অধ্যাপনধারার অনুসরণ করিলাম। আমরা একই সঙ্গে রাজযোগ ও কর্মযোগের পথে চলিলাম। বলিতে গেলে আমার দুঃখই হইত যে, যোগগুলি ঐ চারিটিতেই শেষ হইয়া গিয়াছে। উহাদের সংখ্যা ছয় বা আট হইলে আরও উত্তম হইত; কারণ তাহা হইলে পাঠনস্রোতটি আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইত। আমাদের জ্ঞানস্পৃহা ছিল অতৃপ্ত। আমরা নিজদিগকে বিশেষ কোন গ্রন্থ বা মতবাদে আবদ্ধ রাখিতে চাহিতাম না। আমরা সকালে বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম, অপরাহ্ণে আর একটা বক্তৃতায় যাইতাম, কখনও বা তৃতীয় আর একটিতে। দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, জ্যোতিষ—প্রত্যেক বিষয়ই আসিয়া পড়িত। এইভাবে যদিও মনে হইত যে আমরা আমাদের জ্ঞানস্পৃহাকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছি, তবু আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাকেন্দ্র ছিলেন স্বামীজী। আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহা আর কোন ধর্মাচার্যের নাই। একমাত্র তিনিই আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে বিশ্বস্ত দলটি স্বামীজীর পশ্চাতে পশ্চাতে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারা যেমন ছিল আগ্রহশীল, তেমনি ছিল নাছোড়বান্দা। স্বামীজী যদি কখনও বলিতেন, ছুটির দিন আসিয়া পড়ায় বা অন্য কোন কারণে কোন ক্লাস বন্ধ থাকিবে, তো অমনি সর্বদাই তীব্র আপত্তি উঠিত—'ইনি নিউ ইয়র্কে আসিয়াছেন শুধু স্বামীজীর কথা শুনিয়া উপকৃত হইবার জন্য, ইহাকে যথাসম্ভব বেশী করিয়াই পাইতে হইবে', 'উনি শীঘ্রই অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, তাঁহার পক্ষে একটি দিনও বৃথা নষ্ট করা চলে না', ইত্যাদি। শ্রোতারা তাঁহাকে অবসর দিত না। তিনিও সকালে বিকালে শিক্ষা দিতে থাকিতেন। সর্বাধিক আগ্রহশীলদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন শিক্ষক—ইঁহাদের প্রত্যেকের হাতে একখানি করিয়া বই থাকিত, আর স্বামীজীর বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে ঐ কথাগুলি খাতায় টুকিয়া লইবার জন্য পেন্সিলের শব্দও শুনিতে পাওয়া যাইত—একটি বাক্যও অলিখিত থাকিত না; আর আমার বিশ্বাস, কেহ পরে নিউ ইয়র্কে 'নব-চিন্তার', দর্শনের ও ঈশ্বরতত্ত্বের কেন্দ্রগুলি



'Thousand Island Park' — এর স্বামীজীর ব্যবহৃত বাটী।
(এখানে স্বামীজী প্রদত্ত উপদেশাবলী 'Inspired Talks' নামে সুপরিচিত)

ঘুরিয়া দেখিলে সর্বত্র বেদান্ত, যোগ এবং উহাদের বিভিন্ন বিকৃত আকারের কথাই শুনিতে পাইত।"

ক্রমে ক্লাস বন্ধ করার দিন আসিলে সকলে দুঃখিত মনে বিদায় লইলেন। "কিন্তু তখনও রবিবাসরীয় একটি শেষ বক্তৃতা বাকি ছিল। উহার স্থান ছিল ম্যাডিসন স্কোয়ারের কনসার্ট হলে। হলটি মোটের উপর বেশ বড় এবং ম্যাডিসন গার্ডেনের পশ্চাতে বাড়ির দোতলায় অবস্থিত।…হলে কত লোক উপস্থিত ছিল বলিতে পারি না; তবে শেষ বক্তৃতার দিনে এমন হইয়াছিল যে, আর লোক ধরে না—প্রত্যেকটি আসন, প্রত্যেকটি দাঁড়াইবার মতো জায়গা ভরিয়া গিয়াছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, ঐ দিনই স্বামীজী 'মদীয় আচার্যদেব' নামক বক্তৃতাটি দেন। মঞ্চের একপার্শ্ব হইতে তিনি যখন প্রবেশ করিলেন, মনে হইল যেন তাঁহার ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মনে হইল যেন নিজের উপর তাঁহার তেমন বিশ্বাস নাই, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই কার্যে অগ্রসর হইতেছেন। বহু বৎসর পরে মাদ্রাজে থাকা-কালে আমি ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম—তিনি স্বীয় গুরুদেব সম্বন্ধে কিছু বলিতে সর্বদাই দ্বিধা বোধ করিতেন।…তিনি এক দীর্ঘ ভূমিকার পরে বক্তব্যবিষয়ে আসিয়া পড়িলেন, আর আসামাত্র উহা তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ইহার বেগে তিনি মঞ্চের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাড়িত হইতে থাকিলেন। খরস্রোতা নদীর ন্যায় দ্রুত প্রবহমাণ বক্তৃতাস্রোত তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিল। বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রদ্ধাপূর্ণ নীরবতা সহকারে উহা শুনিল এবং বক্তৃতাশেষে অনেকে নিঃশব্দে হল হইতে চলিয়া গেল। আমি নিজে তো নিশ্চল হইয়া গেলাম—যে অতীন্দ্রিয় চিত্র অঙ্কিত হইল তাহা আমাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিল। সেদিনই আমি যেন আহ্বান পাইলাম এবং আমিও সাড়া দিলাম।

"এই রবিবারেই স্বামীজীর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী রবিবাসরীয় বক্তৃতা পরের রবিবারে পুস্তিকাকারে বই-এর টেবিলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইতেছিল। এখন কর্মযোগ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ বক্তৃতাবলী পাতলা কাগজে ঘনভাবে ছাপিয়া একখানি বড় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। পরে উহার যে সংস্করণ মুদ্রিত হয়, প্রথম সংস্করণ তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। দেখিতে ইহা খুব সুন্দর ছিল না, কিন্তু যাঁহারা এইজন্য খাটিয়াছিলেন, তাঁহারা খুবই গর্ব অনুভব করিতেছিলেন। এই সভায়ই পরিপূরক হিসাবে আর

একটি ঘরোয়া বক্তৃতার পরে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের কাজ শেষ হইল।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ১৩২-৩৬)।

অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, স্বামীজী যদিও প্রথমে আশা করিয়াছিলেন, কুমারী ফার্মার ও কুমারী থার্সবি তাঁহার নিউ ইয়র্কের ক্লাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু কার্যতঃ তাঁহারা তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত স্বামীজীর এক পত্রে প্রকাশ, কুমারী কর্বিন-এর গৃহে উক্ত বন্ধু-দ্বয়ের ও স্বামীজীর উপস্থিতিকালে স্থির হয় যে, ১৭ই ফেব্রুআরি হইতে ঐ গৃহে প্রতি রবিবারে ক্লাস হইবে। উহা একমাস চলিয়াছিল। অতঃপর ১৬ই মার্চ স্বামীজী জানাইয়া দেন যে, তিনি আর ঐ ক্লাস করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত লেগেটকে লিখিত স্বামীজীর ১০ই এপ্রিলের পত্রে প্রকাশ, তিনি শ্রীমতী এণ্ড্রুজ-এর বাড়িতেও ক্লাস করিতেন। এইসব বিক্ষিপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করা চলে যে, তিনি অনেক স্থানেই এমন অনেক ক্লাস চালাইতেন যাহার সংবাদ এখনও আমাদের অজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন স্বামীজীর নিউ ইয়র্ক-নিবাসী অনুরাগীদের অন্যতম। পরে ইঁহার বাড়িতে স্বামীজী কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন; এবং একসময়ে ইনি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। পূর্বে আমরা শ্রীযুক্তা স্টার্জিস ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী ম্যাকলাউডের কথা বলিয়া আসিয়াছি। শ্রীযুক্ত লেগেট ও শ্রীযুক্তা স্টার্জিস ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামীজীর আমেরিকান ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহায্যকারীদের মধ্যে ইঁহাদের স্থান খুব উচ্চে।

'ব্রহ্মবাদিন্'-এ প্রকাশিত ল্যাণ্ডসবার্গের ১৫ই ফেব্রুআরির (১৮৯৬) এক প্রবন্ধে এবং অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, স্বামীজীকে নিউ ইয়র্কে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করিতে হইত। তাঁহার বক্তৃতাদিতে আকৃষ্ট শ্রোতারা সকলেই যে শুদ্ধ ধার্মিক ছিলেন, এরূপ নহে; অনেকে আসিতেন একটা কৌতূহল মিটাইবার জন্য, কিংবা অলৌকিক কিছু পাইবার আশায়। তখন আমেরিকার সমাজে প্রেতবিদ্যার বেশ আলোচনা হইত, মনঃশক্তি সাহায্যে রোগের প্রতিকারের চেষ্টা হইত, অলৌকিক সিদ্ধাই এবং অনুভূতির জন্যও অনেকে লালায়িত ছিলেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য ও উপায় ছিল ইঁহাদের পরিপন্থী। আবার একদল লোক মাতব্বরি করিয়া স্বামীজীকে নিজেদের পরিকল্পনানুযায়ী

চালাইতে চাহিতেন। স্বাধীনচেতা স্বামীজী এইসব কোন দলেই না ভিড়িয়া কিংবা আশু সাফল্যের মোহে মুগ্ধ না হইয়া আপন সিদ্ধান্তানুযায়ী চলিতেন। ৬ই মে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি যদি কপট বিষয়ী হতাম, তবে এখানকার কাজ সংগঠিত ক'রে খুব সাফল্য অর্জন করতে পারতাম। হায়, এখানে ধর্ম বলতে তার বেশী কিছু বুঝায় না। টাকার সঙ্গে নাম-যশ—এই হ'ল পুরোহিতের দল; আর টাকার সঙ্গে কাম যোগ দিলে হ'ল সাধারণ গৃহস্থ। আমাকে এখানে একদল নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবে না। অবশ্য এটি হবে অতি ধীরে—অতি ধীরে।" আবার ১১ই এপ্রিল শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিয়াছিলেন, "হে আমার ঈশ্বর, আমি কখন কখন একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্যের কথা ভাবি। চিরদিনের জন্য ওসব দুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা কর, যেন আমি তোমা ছাড়া আর কারও কাছে কখন সাহায্য প্রার্থনা না করি।" শ্রীযুক্তা বুলকেই তিনি ২১শে মার্চ লিখিয়াছিলেন, "এখানেই ভয়—আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ হবে। সেই বিষয়টি এই যে, কেউ সমাজকেও সন্তুষ্ট করবে, অথচ বড় বড় কাজ করবে—তা হতে পারে না।"

নিউ ইয়র্কে অবস্থানকালে 'নিউ ইয়র্ক ফ্রেনোলজিক্যাল জার্নাল'-এ (করোটি-বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকায়) স্বামীজীর আকৃতি-পরীক্ষাদ্বারা তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে পরিচয়লাভ হয় তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা এ পর্যন্ত স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পাইয়াছি, এই প্রবন্ধটি তাহারই সমর্থক বলিয়া মনে হয়ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বজাতীয়গণের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি এবং তাঁহার ওজন ১৭০ পাউণ্ড (অর্থাৎ দুই মণের উপর)। তাঁহার মস্তকের উপরিভাগের পরিধি এক কান হইতে অপর কান পর্যন্ত পৌনে বাইশ ইঞ্চি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার মস্তিষ্কের পরিমাণ দৈহিক আয়তনের অনুপাতে ঠিক আছে। তিনি যেখানে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগী ও অনুকূল কার্য পাইবেন সেইখানেই স্বচ্ছন্দচিত্তে থাকিতে পারিবেন এবং তাঁহার বন্ধুত্বের অর্থ তৎপ্রচারিত কার্যের প্রতি যাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহ এতদূর কোমল যে, তাহাতে দাম্পত্যভাবের

পোষণ অসম্ভব। আর তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে, আজ পর্যন্ত তিনি কোন স্ত্রীলোককে প্রণয়িনীর চক্ষে দেখেন নাই। তিনি যুদ্ধের বিরোধী এবং বিশুদ্ধ অহিংসা ধর্ম শিক্ষা দেন; সুতরাং আশা করিয়াছিলাম, কর্ণমূলের নিকটে মস্তকের যে অংশ সংঘর্ষ ও হিংসাবৃত্তির পরিচায়ক, তাঁহার মস্তকের সেই অংশ সঙ্কীর্ণ হইবে এবং দেখিলামও তাহাই। কিঞ্চিদূর্ধ্বে অর্থোপার্জন ও সঞ্চয় এই দুই স্থানের পরিধিতেও ঐ সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিলাম। তিনি নিজেও বলিয়াছেন যে, তিনি বিষয়সম্পত্তির কোন ধার ধারেন না এবং তাঁহার কোন সঞ্চিত ধন নাই। আমেরিকানদিগের কর্ণে এই কথা বিসদৃশ শুনায় সন্দেহ নাই; কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার মুখমণ্ডলে যেরূপ শান্তি ও সন্তোষের চিহ্ন বিদ্যমান তাহা রাসেল সেজ, হেটী, গ্রীন এবং আমাদের অনেক ক্রোরপতি-দিগের মুখেও দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও ধর্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত এবং পরোপকারপ্রবৃত্তি সুপরিস্ফুট, ললাটপ্রান্তদ্বয়ের বিস্তৃতি হইতে সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বিশাল চক্ষুর্দ্বয়ে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় সুব্যক্ত এবং অদ্ভুত বাগ্মিতার নিদর্শন সূচিত। ললাটের ঊর্ধ্বভাগে কারণানুসন্ধানপ্রবৃত্তি, মনুষ্যচরিত্রের জ্ঞান ও অমায়িকতার ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তাঁহার মস্তিষ্কযন্ত্রের লক্ষণসমূহ মোটের উপর এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, দয়া ও সহানুভূতি, দার্শনিক বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধীয় কৃতকার্যতালাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং এরূপ বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন যে, মনে হয় যেন ইংলণ্ডেই তাঁহার জন্ম। তিনি বিশ্বশিল্পমেলায় যে উদার ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি আর কিছু না করিয়া কেবল তাহারই বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হন, তাহা হইলে তাঁহার এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সার্থক ও সুসিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

স্বামীজী একদিকে যেমন ছিলেন স্বাবলম্বী, স্বাধীন, সাহসী বীর, অপরদিকে তেমনি ছিলেন অতি অমায়িক, কোমলহৃদয় ও বন্ধুবৎসল। জনসাধারণের কল্যাণসাধনে তাঁহার জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল এবং একবার যাহাদিগকে শিষ্য বা আপনজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে চিরজীবন ভালবাসিয়াছিলেন, কখনও ভুলেন নাই—ইহাতে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি কোন কিছুই অন্যথা ঘটাইতে পারিত না। আমরা ল্যাণ্ডসবার্গের প্রতি তাঁহার স্নেহের নিদর্শন

একটু আগেই পাইয়াছি, পরেও পাইব। হেল ভগিনীদের প্রতি তাঁহার স্নেহমমতা তুলনাবিহীন। লেগেট-দম্পতী, কুমারী ম্যাকলাউড, ওলি বুল, ইত্যাদির প্রতিও শ্রদ্ধা ভালবাসা অপরিসীম। তিনি যে শুধু ইহাদের আতিথ্য প্রভৃতি গ্রহণমাত্রই করিতেন, তাহা নহে; সাধ্যানুসারে তিনি তাঁহাদিগকে প্রীতিচিহ্ন-স্বরূপ নানা জিনিসপত্র দানও করিতেন। কাহাকেও কাশ্মীরী শাল, কাহাকেও মহার্ঘ গালিচা, মসলিন বা রেশমী বস্ত্র, কাহাকেও বা পিত্তল-নির্মিত সুচারু মূর্তি ও অন্যান্য কারুকার্য দিয়া হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিতেন, কিংবা উপকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। এই সকল জিনিস তিনি জুনাগড়ের দেওয়ান, মহীশূরের মহারাজ, খেতড়ির রাজা প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ভারত হইতে আনাইতেন। স্থলবিশেষে আমেরিকায় প্রস্তুত দ্রব্যও উপহারস্বরূপে ব্যবহার করিতেন। শিষ্যদের জন্য ভারত হইতে কুশাসন এবং রুদ্রাক্ষের মালাও আনাইতেন।

সহস্রদ্বীপোদ্যান

নিউ ইয়র্কের ভাড়াবাড়িতে দীর্ঘকাল কাজ চালাইবার পর স্বামীজী জুন এর গোড়ায় শ্রীযুক্ত লেগেটের ২১ পশ্চিম, ৩৪নং স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া চিকিৎসার সুবিধার্থে ডাঃ গার্নসীর বাড়িতে চলিয়া যান। ইহার পর কিছুদিন বিশ্রামের জন্য নিউ হ্যাম্পসায়ারের অন্তর্গত পার্শীতে অবস্থিত শ্রীযুক্ত লেগেটের 'মেইন ক্যাম্প' নামক ভবনে উপস্থিত হইলেন ৬ই জুন। ঐ সময়ে শ্রীযুক্তা উইলিয়াম স্টার্জিস ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী ম্যাকলাউডও লেগেটের অতিথিরূপে ঐ গৃহে ছিলেন। স্বামীজী সেখানে দশ দিন ছিলেন এবং অনেক সময় একাকী ভূর্জবনে বা হ্রদতীরে ভ্রমণ করিতেন, গীতা পাঠ করিতেন অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যানে কাটাইতেন। একদিন বাগানের মালী স্বামীজীকে হ্রদতীরে অচৈতন্য দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া বাড়িতে খবর দিল যে স্বামীজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। অমনি লেগেট, স্টার্জিস ও ম্যাকলাউড সেখানে আসিয়া নানাভাবে স্বামীজীর দেহে চৈতন্যসম্পাদনে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; অগত্যা তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালীর কথাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেন, এমন সময় স্বামীজীর দেহে চৈতন্যসঞ্চার হইল—স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন। পরবর্তী কালে কুমারী ম্যাকলাউড এই ঘটনাটি বিবৃত করেন। 'মেইন ক্যাম্প' স্বামীজীর নিকট কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা তিনি নিজেই ৭ই জুনের পত্রে শ্রীযুক্তা বুলকে জানাইয়াছিলেন:

"অবশেষে আমি এখানে মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌঁছেছি। আমি জীবনে যে-সকল সুন্দরতম স্থান দেখেছি, এটি তাদের অন্যতম। কল্পনা করুন, চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী ও তার মধ্যে একটি হ্রদ—আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! শহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। এখানে এসে আমি যেন নবজীবন লাভ করেছি। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। দিন দশেকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ ক'রে সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাব। এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর

দিন ধ্যান ক'রব এবং একলা নির্জনে থাকব। এই কল্পনাটাই মনকে উঁচু ক'রে দেয়।"

কাজের ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধ্যানে ডুবিয়া যাওয়ার আকুল বাসনা স্বামীজী সর্বদা হৃদয়ে অনুভব করিতেন। তাঁহার নিকট ধ্যানই ছিল সর্বাধিক প্রিয়। বাহিরের কর্মচাঞ্চল্য তাঁহার অন্তরের ধ্যানকে বাধা দিতে পারিত না। সহস্রদ্বীপোত্থানে যাইয়া বিভিন্ন শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার মধ্যেও তিনি যে নিজে অন্তরে অন্তরে ধ্যানস্থ থাকিতেন তাহা এই সময়কার লিপিবদ্ধ পুস্তক 'দেববাণী' পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। স্বামীজীর নিজস্ব দার্শনিক মতানুসারে কার্যও যেহেতু ভগবদারাধনায় পরিণত হইতে পারে, এবং বলা বাহুল্য স্বামীজীর ন্যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ও অনুভূতি-সমৃদ্ধচিত্ত মহাপুরুষ সর্বদাই ভগবদনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

যাহা হউক, ১৭ই জুন তিনি মেরী হেলকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আগামী কাল যাচ্ছি সহস্রদ্বীপোত্থানে।" ১৮ই জুন হইতে ৬ই অগস্ট পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটাইয়াছিলেন, তাঁহারই ছাত্রী শ্রীমতী ডাচারের কুটিরে। ঐ কুটিরখানি সেণ্ট লরেন্স নদীর বক্ষঃস্থ অজস্র দ্বীপগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ 'ওয়েলেসলি' দ্বীপের দক্ষিণাংশে 'সহস্রদ্বীপোত্থানে'র পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে নয় মাইল এবং প্রস্থে চার মাইল। তখনকার দিনে উহাতে লোকবসতি নামমাত্র ছিল। বনাকীর্ণ ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডাচ্ছাদিত পাহাড়ের একখণ্ড ঢালু জমির উপর কুটিরখানি দাঁড়াইয়া ছিল, উহারই একপার্শ্বে সুপ্রশস্ত সেণ্ট লরেন্স নদী। ঐ বাড়িটি নির্মিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন উহার নীচে দুইখানি ও উপরে দুইখানি ঘর ছিল। পরে স্বামীজীর জন্য নূতন একটা অংশ নির্মিত হয়। স্বামীজী আসিবার পূর্বেই সেখানে জন কয়েক ছাত্রছাত্রী জুটিয়াছিলেন; ক্রমে দ্বাদশ জন যাতায়াত আরম্ভ করেন, যদিও কোন সময়েই একসঙ্গে দশ জনের অধিক থাকেন নাই। এই গৃহে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীরা স্বামীজীর পদতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার যে উপদেশামৃত পান করিতেন, উহার কিয়দংশ শ্রীমতী ওয়াল্ডোর লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ হইয়া 'দেববাণী' (ইনস্পায়ার্ড টকস) নামে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের কথাগুলি এমন সুস্পষ্ট, উদ্দীপনাময় ও অধ্যাত্মভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িলেই মনে হয়, স্বামীজী তখন সত্যসত্যই দৈব-প্রেরণায় কথা বলিতেন; তাঁহার মন তখন এক অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে

বিচরণ করিত। প্রতিদিন প্রাতে তিনি বাইবেল, গীতা, উপনিষদ্, ভক্তিসূত্র অথবা বেদান্তসূত্রের অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করিতেন। আবার বনমধ্যে দীর্ঘ ভ্রমণ-কালে নানা উচ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতেন। এমনকি আহারকালে এবং সময়বিশেষে যখন শিষ্য-শিষ্যাদের জন্য রন্ধনে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনও খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে উচ্চ ধর্মচর্চার অবলম্বন করিয়া তুলিতেন—দিনের প্রতিটি মুহূর্ত এক ধার্মিক পরিবেশমধ্যে ব্যয়িত হইত, সকলের মন এক অতি উচ্চ সুরে বাঁধা থাকিত। দিবাবসানে সন্ধ্যায় যখন সকলে দ্বিতল কুটিরের উপরের বারাণ্ডায় সমবেত হইতেন, তখনও তিনি নিস্তব্ধ ও রুদ্ধশ্বাস সেই ভক্তবৃন্দকে ভগবৎকথাই আবেগভরে শুনাইতেন।

জুনের প্রথম সপ্তাহে ডাঃ গার্নসীর বাড়িতে এক আকস্মিক সাক্ষাতের পর ল্যাণ্ডসবার্গ ১৩ই জুলাই সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী ঐ কালমধ্যে ল্যাণ্ডসবার্গ ও শ্রীমতী মেরী লুইকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়া যথাক্রমে কৃপানন্দ ও অভয়ানন্দ নামে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের দিনে আরও পাঁচ জনকে ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমতী ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন, "দীক্ষাদান কার্যটি অতীব অনাড়ম্বর ছিল বলিয়া খুব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র বেদীতে প্রজ্বলিত অগ্নি, সুন্দর কিছু ফুল এবং আচার্য-দেবের সাগ্রহ বাণীই ঐ অনুষ্ঠানটিকে দৈনন্দিন কার্যাবলী হইতে ভিন্নরূপ প্রদান করিয়াছিল। গ্রীষ্মকালীন এক উষাকালে উহা অনুষ্ঠিত হয়; আর সেদিনের স্মৃতি আমাদের মনে আজও স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে।" বাকি সকলকে তিনি পরে নিউ ইয়র্কে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। ৬ই অগস্ট অন্তিম ক্লাস শেষ করিয়া তিনি পরদিন নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৭ই অগস্ট ইওরোপ যাত্রা করেন।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের সাধারণ পরিবেশ, গৃহ ও অন্যান্য ঘটনাদি সম্বন্ধে যেসব কথা শ্রীমতী ওয়াল্ডো, শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি ও ভগিনী ক্রিষ্টিনের গ্রন্থ ও স্মৃতিলিপিতে সংরক্ষিত হইয়াছে, সেসব খুবই তথ্যপূর্ণ। আমরা উহারই কিয়দংশ যথাক্রমে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। শ্রীমতী ওয়াল্ডোর লিখিত 'দেববাণী'র পটভূমিকা হইতে জানা যায় ('বাণী ও রচনা', ৪।১৭২-৭৪):

"যে ছাত্রীটি বাড়িখানির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মিস

ডাচার[1]। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষে একটি পৃথক্ কক্ষ নির্মাণ করা আবশ্যক—যেখানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ করিবে এবং তাঁহার গুরুর প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্যহিসাবে আসল বাড়িখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নূতন (তেতলা) পার্শ্ব সংযোজন করিয়া দিলেন। বাড়িটি এক উচ্চভূমির উপর অতি সুন্দরস্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটির অনেকখানি এবং উহার বহু-দূরবিস্তৃত সহস্রদ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন (শহর) অল্প অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত কানাডার উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়িখানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যন্ত গিয়াছে; শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুদ্র হ্রদের ন্যায় বাড়িখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়িখানি সত্যসত্যই (বাইবেলের ভাষায়) 'একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত', আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনির্মিত সংযোজনটি পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় যেন একটি বিরাট আলোকস্তম্ভের মতো দেখাইত। বাড়িটির তিন দিকে জানালা ছিল এবং উহার (নূতন) পিছনের দিক ত্রিতল ও সামনের (পুরাতন) দিক দ্বিতল ছিল। নীচের ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন; তাহার উপরকার ঘরটিতে বাড়িখানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দ্বার দিয়া যাওয়া যাইত এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত এবং সেখানেই স্বামীজী অনেক ঘণ্টা ধরিয়া আমাদিগের সুপরিচিত বন্ধুর মতো উপদেশ দিতেন। এই ঘরের উপরের ঘরটি শুধু স্বামীজীরই ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, সেজন্য মিস ডাচার বাহিরের দিকে একটি পৃথক্ সিঁড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে দোতলার বারাণ্ডায় আসিবার একটি প্রকাণ্ড দরজাও ছিল।[2]

১। মিস মেরী এলিজাবেথ ডাচারের (১৮৩২-১৯২২) জন্ম হয় নিউ ইয়র্ক স্টেটের অন্তর্গত ওসওয়েগোর কাছে। তিনি চিত্রবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন। ধর্মে তিনি ছিলেন প্রথমে মেথোডিস্ট ও পরে খ্রীষ্টান সায়েন্টিস্ট।

২। নূতন অংশের তেতলায় স্বামীজীর শয়নকক্ষ, দোতলায় পাঠকক্ষ ছিল। শয়নকক্ষের একটি দরজা দিয়া বারাণ্ডায় যাওয়া চলিত; এখানে সান্ধ্য বৈঠক বসিত। পাঠকক্ষে বসিত সকালের ক্লাস। উহার নীচে একতলায় একজন শিষ্য থাকিতেন ('বেদান্তকেশরী', আগস্ট, ১৯৬৩, ২৫৩)।

"এই (পুরাতন অংশের) উপরতলার বারাণ্ডাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল ; কারণ স্বামীজীর সকল সান্ধ্য কথোপকথন এই স্থানেই হইত। বারাণ্ডাটি প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা জায়গা ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল এবং উহা বাড়িখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস ডাচার উহার পশ্চিমাংশটি একটি পর্দা দিয়া সযত্নে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে-সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারাণ্ডা হইতে তত্রত্য অপূর্ব দৃশ্যটি দেখিবার জন্য সেখানে প্রায়ই আগমন করিতেন, তাঁহারা আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না।

"এইখানেই আমাদের অবস্থান-কালের প্রতিসন্ধ্যায় আচার্যদেব তাঁহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্যসত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল। পাদনিম্নে হরিৎ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎসমুদ্রের মতো আন্দোলিত হইত, কারণ সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। সুবৃহৎ (দ্বীপস্থ) গ্রামটির একখানি বাড়িও সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষ-শ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেণ্ট লরেন্স নদী ; উহার বক্ষে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এগুলি এত দূরে ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই মনে হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জনকোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীট-পতঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথবা পাতার মধ্য দিয়া সঞ্চরমাণ বায়ুর মৃদু মর্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত এবং নিম্নের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। এই অপূর্ব মায়া-রাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা সমন্বিত অপূর্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরা জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধ্যভোজন সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারাণ্ডায় গিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না, কারণ

আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্র অস্ত গেল ; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি নাই, স্বামীজীও মনে হয় ঠিক তেমনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।...

"এই দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মানুভূতি লাভ করিতাম, তাহা আমাদের কেহই ভুলিতে পারিবে না। স্বামীজী ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া দিতেন। ধর্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যেসকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত।...আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময় স্বামীজী যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন—তখন আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি এই ভয়ে যেন শ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারাণ্ডাটির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন।...স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। স্বামীজী মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে এবং কথার ক্ষিপ্র ও সরস প্রত্যুত্তর দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও কখন মুহূর্তের জন্য জীবনের মূলসুর হইতে বেশীদূর যাইতেন না। প্রতি জিনিসটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন এবং এক মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামীজী পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্যগণের মতো আর কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই।...

"'সহস্রদ্বীপোত্থানে' গমনকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একযোগে বাস করিব ; প্রত্যেকেই গৃহকর্মের নিজ নিজ অংশ

সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তি-ভঙ্গ হইতে পারিবে না। স্বামীজী স্বয়ং একজন পাকা রাঁধুনী ছিলেন এবং আমাদের জন্য প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেন।…প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্যগুলি শেষ হইবামাত্র (অনেক সময় তাহার পূর্বেই) স্বামীজী আমাদিগকে—যে বৃহৎ বৈঠকখানাটিতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, সেখানে সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন।[১] প্রতিদিন তিনি কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্ বা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র প্রভৃতি কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন।…বেদান্তসূত্রগুলিতে ভাষ্যকার-গণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব এই তিনজন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন। প্রাতঃ-কালের কথোপকথনগুলিতে স্বামীজী প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোন একটি লইয়া, তারপরে আর একটি ভাষ্য, এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং দেখাইতেন কিরূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাঁহার নিজের মতানুযায়ী সূত্রগুলির কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী।…কখনও কখনও স্বামীজী 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' লইয়া ব্যাখ্যা করিতেন।…এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামীজী সর্বপ্রথম আমাদের নিকট তাঁহার মহান্ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।"

সহস্রদ্বীপোদ্যানের আনন্দময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি লিখিয়াছেন: "(স্বামীজী যখন ডেট্রয়েটে[২] ছিলেন) তখন আমি ও ক্রিস্টিন গ্রীন-স্টিডেল ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার কোন সুযোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহাকে (সেখানে) যাহা কিছু বলিতে শুনিয়াছি, তাহা সমস্তই আমরা মনে মনে চিন্তা করিতাম এবং সঙ্কল্প করিতাম, কোন দিন কোথাও—এমন কি প্রয়োজন হইলে পৃথিবী পর্যটন করিয়াও তাঁহার সহিত মিলিত হইব। দেড় বৎসর যাবৎ আমরা তাঁহার কোন সংবাদই না পাইয়া ভাবিলাম, হয়তো তিনি ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একদিন অপরাহ্ণে এক বন্ধুর নিকট খবর পাইলাম, তিনি তখনও আমেরিকায় আছেন এবং গ্রীষ্মকালটি সহস্রদ্বীপোদ্যানে কাটাইবেন। পরদিন সকালেই আমরা যাত্রা করিলাম এবং সঙ্কল্প করিলাম,

১। সকালে যেসব ক্লাস হইত তাহারই কিয়দংশ 'দেববাণী'তে সংরক্ষিত হইয়াছে।

২। এই নামটি ঐ অঞ্চলে ডিট্রয়েট রূপেও উচ্চারিত হয়।

তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব ও তাঁহাকে আচার্যপদে বরণ করিব। অবশেষে অনেক কায়ক্লেশের পর তাঁহার সন্ধান পাইলাম। তিনি যেখানে জনসংস্পর্শ হইতে দূরে বাস করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শান্তিভঙ্গের দুঃসাহস করিতেছি ভাবিয়া আমরা খুবই ভয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয়ে এমন এক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, যাহা অনির্বাণ; এই আশ্চর্য ব্যক্তিটিকে আরও ভাল করিয়া জানিতে হইবে, তাঁহার বাণী আরও ভাল করিয়া শিখিতে হইবে। সে রাত্রিটি ছিল অন্ধকার ও বর্ষণমুখর এবং দীর্ঘ ভ্রমণের পর আমরাও ছিলাম ক্লান্ত; কিন্তু ঠিক তাঁহার সামনে না আসা পর্যন্ত যে আমাদের পক্ষে থামাই ছিল অসম্ভব। তিনি কি আমাদের গ্রহণ করিবেন? যদি না গ্রহণ করেন, তবে আমাদের উপায়? অকস্মাৎ আমাদের মনে হইল, এই যে শত শত মাইল দূরে চলিয়া আসিলাম এমন একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানেন না—ইহা কি আহাম্মকি হইল না? কিন্তু অন্ধকার ও বৃষ্টি ঠেলিয়া আমরা মন্থরগতিতে পাহাড়ের উপর দিকে আগাইয়া চলিলাম; পথ দেখাইবার জন্য আমরা যে লোকটিকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে লণ্ঠন লইয়া পথ দেখাইয়া চলিল। আমাদের গুরুদেব পরে আমাদের কথা বলিতে গিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'আমার যে শিষ্যারা আমার অন্বেষণে বহু শত মাইল দূর থেকে এসেছিল, আর তারা এসেছিল অন্ধকারে বৃষ্টি মাথায় করে।' তাঁহাকে কি কি বলিব, সব ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, সত্যই তাঁহাকে পাইয়াছি, তখন সব গুছানো সুন্দর কথাগুলি হারাইয়া গেল এবং আমাদের একজন কটু করিয়া বলিয়া বসিলেন, 'আমরা এসেছি ডেট্রয়েট থেকে আর শ্রীযুক্তা পি—আমাদের পাঠিয়েছেন।' অপরে বলিলেন, 'যীশুখ্রীষ্ট যদি মর্ত্যধামে এখনও থাকতেন, তাহলে তাঁর কাছে যেমন করে আসা উচিত এবং উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তেমনি ভাবে আপনার কাছে এসেছি।' তিনি অতি কৃপাদৃষ্টিতে আমাদের দেখিলেন, এবং বলিলেন, 'শুধু যদি আমার যীশুখ্রীষ্টেরই মতো শক্তি থাকত এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত করে দেবার!' তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতমনে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা গৃহস্বামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এই ভদ্র-মহিলারা ডেট্রয়েট থেকে এসেছেন, দয়া করে এঁদের উপরে নিয়ে যান। এই সন্ধ্যাটি আমাদের সঙ্গে থাকতে দিন।' অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া আমরা

গুরুদেবের উপদেশ শুনিলাম, যদিও তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ কোন নজরও দিলেন না। কিন্তু যখন সকলের নিকট বিদায় লইতে উঠিলাম, তখন আমাদের বলিয়া দেওয়া হইল, আমরা যেন পরদিন সকালে নয়টার সময় আসি। আমরা আসিলাম এবং গুরুদেব আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া ঐ গৃহেই বাসের জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানাইলে আমরা খুবই আনন্দিত হইলাম।"

ইহার পর ক্রস্টিন গ্রীনস্টিডেল (ভগিনী ক্রস্টিন)-এর স্মৃতিলিপির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম : "যেদিন আমরা দুঃসাহসভরে তাঁহাকে অন্বেষণপূর্বক বাহির করিলাম, সে তারিখটা নিশ্চয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই ছিল।···শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি তাঁহার লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের 'ইনস্পায়ার্ড টকস'-এর মুখবন্ধে আমাদের অন্বেষণের কথা বলিয়াছেন। ইহার পরবর্তী অত্যাশ্চর্য সপ্তাহগুলির কথা লিপিবদ্ধ করা কঠিন। আমরা তখন যে অত্যুচ্চ অনুভূতি-ভূমিতে বাস করিতাম আবার যদি মনকে সেই উচ্চক্ষেত্রে উন্নীত করিতে পারা যায়, তবেই সে পূর্বানুভূতিকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব। আমরা ছিলাম আনন্দে পরিপূর্ণ। তখন আমাদের এ বোধই ছিল না যে আমরা তাঁহারই আলোকে উদ্ভাসিত। প্রেরণার পক্ষোপরি স্থাপন করিয়া তিনি আমাদিগকে এমন এক উচ্চভূমিতে লইয়া গিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার নিজের স্বাভাবিক আবাসস্থল। এই সময়ের কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিজেও পরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সহস্রদ্বীপোদ্যানে তাঁহার সর্বোচ্চ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তিনি অনুভব করিতেন তাঁহার বাণী প্রচারের প্রকৃষ্ট প্রণালী, তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন; কারণ গুরু তখন তাঁহার আপন শিষ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম ও ঐকান্তিক অভিলাষ ছিল আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়া, আমাদিগকে মুক্তি দেওয়া। মর্মস্পর্শী করুণ স্বরে তিনি বলিতেন, 'আহা, আমি যদি স্পর্শমাত্র তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারতাম!' তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছা, যাহা তেমন আপাতপ্রতীয়মান না হইলেও ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হইত, তাহা ছিল আমেরিকার কার্য পরিচালনার জন্য ঐ দলটিকে গড়িয়া তোলা। তিনি বলিতেন, 'এই বাণী ভারতে ভারতীয়েরা ও আমেরিকায় আমেরিকানরা প্রচার করবে।' তাঁহার ঘরের যে ছোট বারাণ্ডাটি হইতে গাছগুলির মাথা ও মনোরম সেণ্ট লরেন্স নদী দেখা যাইত, সেখানে তিনি প্রায়ই আমাদের ডাকিয়া বক্তৃতা দিতে বলিতেন;···ইহা ছিল এক সুকঠিন পরীক্ষা। পর পর প্রত্যেককেই চেষ্টা

করিতে ডাকিতেন, পালাইবার জো ছিল না। হয়তো এই ভয়েই আমাদের কেহ কেহ এই ঘনিষ্ঠ সান্ধ্য সম্মেলনে আসিতেন না, যদিও তাঁহারা জানিতেন যে, রাত্রি গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁহার অধ্যাত্মভূমির সর্বোচ্চ স্তরে উঠিতে থাকিতেন। তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেলেও খেয়াল থাকিত না। চাঁদ উঠিয়া ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়াও আমাদের টনক নড়িত না—দেশ ও কাল আমাদের কাছে বিলীন হইয়া যাইত।

"উপরের বারাণ্ডায় এই সব নৈশ সম্মেলনের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। তিনি এক প্রান্তে তাঁহার দরজার কাছে বড় চেয়ারখানিতে বসিতেন। কখনও কখনও তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন; তখন আমরাও ধ্যান করিতাম কিংবা নীরবে বসিয়া থাকিতাম। এই ভাব অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া চলিত ও ক্রমে আমাদের সকলে একে একে উঠিয়া যাইতেন; কারণ আমরা জানিতাম, এইরূপ অবস্থার পরে তিনি কথা বলিতে চাহিতেন না। অথবা হয়তো অল্প পরেই ধ্যানভঙ্গ হইত ও তিনি আমাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে উৎসাহ দিতেন এবং প্রায়ই আমাদেরই কাহাকেও উত্তর দিতে বলিতেন। উত্তরটি যতই ভুল হউক না কেন, তিনি আমাদিগকে উহারই মধ্যে হাতড়াইয়া চলিতে দিতেন, যতক্ষণ না আমরা সত্যের নিকটবর্তী হই। তারপর কয়েকটি কথায় তিনি সমস্যাটির সমাধান করিয়া দিতেন। এই ছিল তাঁহার শিক্ষাদানের চিরন্তন প্রথা। কি করিয়া শিষ্যের মনে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তাহাকে স্বপ্রচেষ্টায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। আমরা হয়তো নিজের কোন ভাবের বা নূতন চিন্তার অনুমোদন লাভের জন্য তাঁহার নিকট গিয়া বলিতাম, 'আমার মনে হচ্ছে এটা এই রকম এবং এইরূপ।' তখন তিনি এমন করিয়া 'হাঁ' বলিতেন যে, উহা আমাদিগকে আরও ভাবিতে উৎসাহ দিত। পুনর্বার আর একটু পরিষ্কার ধারণা লইয়া আসিতাম; আবার সেই 'হাঁ'-টি আমাদিগকে আরও ভাবিয়া দেখিতে বলিত। হয়তো তৃতীয় বারে যখন আমাদের চিন্তাশক্তি ঐ পথাবলম্বনে আর অগ্রসর হইতে অক্ষম হইত, তখন তিনি ভ্রমটি দেখাইয়া দিতেন—আর ঐ প্রকার ভুল হইত আমাদের পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার ফলে।...

"সেই গ্রীষ্মকালে সহস্রদ্বীপে তিনি নিজেকে যে দলটির দ্বারা পরিবৃত করিয়াছিলেন, সে দলটি ছিল বড়ই অদ্ভুত। তাই ইহা মোটেই আশ্চর্য ছিল না

একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'ও বড় সরল'। ইহাতে ফাক্ষি আমোদ পাইতেন, কারণ তিনি স্বামীজীর ভাব অনুযায়ী চলিতে কখনও কাতর ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি আমাদের সকলের অপেক্ষা স্বামীজীর বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন অধিক অনুভব করিতেন। দেহমনকে সব সময়ই এতটা চাপ ও উত্তেজনার মধ্যে রাখা উচিত নয়। অপর সকলে যখন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত যাহাতে স্বামীজীর একটি কথাও অশ্রুত না থাকে, ফাক্ষি তখন ভাবিতেন কি করিয়া তাঁহাকে আনন্দ দেওয়া যায়। ফাক্ষি তাঁহাকে সব মজার গল্প শুনাইতেন; এমনকি নিজের সম্বন্ধেও ঐরূপ বলিতে ছাড়িতেন না এবং হালকা ও আমোদজনক প্রসঙ্গ তুলিতেন। স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ও আমাকে বিশ্রাম দিচ্ছে।' আবার ঐ ব্যক্তিকেই ফাক্ষি বলিয়াছিলেন, 'আমি জানি, তিনি আমাকে বোকা মনে করেন, কিন্তু তাতে করে যদি ওঁর আনন্দ হয়, তো আমি ওসব গ্রাহ্যই করি না।' স্বামীজীর নিকট (ফাক্ষির) পাইবার মতো প্রচুর থাকিলেও উহার জন্য লালায়িত না থাকার ফলেই কি ফাক্ষির মনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ আজও সম্পূর্ণ অনাবিল রহিয়াছে? ফাক্ষির আনন্দোৎফুল্ল ভাব, আশাপূর্ণ চিত্ত, উৎসাহময় মন অপরকে সতেজ করিয়া দিত। এমন কি, আজও শরীর অপটু হইলেও তাঁহার পূর্বকার আকর্ষণ ঠিকই আছে। স্বামীজীর কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার হৃদয়দীপ পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উৎসাহদ্যুতি যেমনভাবে ছড়াইয়া দেয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বামীজী তখন জীবন্ত হইয়া উঠেন, অপরে তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করে।...

"স্বামীজীর অপর যে দুইজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহারা বোধ হয় তাঁহার এই মতবাদ অনুসারেই স্বীকৃত হইয়া থাকিবেন যে, যে শক্তি বিপথগামী হইয়া ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়, সেই শক্তিকে পরিবর্তিত করিয়া যদি কোনও উৎকৃষ্টতর ধারায় প্রবাহিত করিতে পারা যায়, তবে উহা এক মঙ্গলসম্পাদক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। শক্তি থাকা চাই—এই হইল প্রথম প্রয়োজন। তিনি দেখিয়াছিলেন, মেরী লুই ও ল্যাণ্ডসবার্গের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা খুব বেশী রকমই আছে এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই উপাদানটি অমূল্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। আমাদের ক্ষুদ্র দলটির মধ্যে মেরী লুই-এর ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বাধিক। তিনি ছিলেন এক দীর্ঘাকৃতি, উগ্রপ্রকৃতির নারী; বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসর; আর চেহারায় এমন একটা পুরুষোচিত ভাব ছিল যে, বার কয়েক ভাল করিয়া

না দেখিলে পুরুষ কি নারী স্থির করা কঠিন হইত। ববড হেয়ার (মেয়েদের ছোট করিয়া চুল ছাঁটা) আরম্ভ হওয়ারও আগেই তাঁহার ছোট, তারের মতো চুল, পুরুষোচিত চেহারা, মোটা হাড়, গম্ভীর আওয়াজ, এবং প্রায় ভারতীয় পুরুষদেরই মতো পোশাক পরিধান সন্দেহের কারণ ঘটাইত। তিনি বলিতেন, তাঁহার সাধনপথ সর্বোচ্চ—উহা দর্শন বা জ্ঞানের পথ। তিনি ছিলেন অতি-প্রগতিশীল দলগুলির মুখপাত্রী, বিদুষী ও অনেকটা বাগ্মিতাশক্তি সম্পন্না। তিনি বলিতেন, 'আমার কাছে বক্তৃতামঞ্চের আকর্ষণী শক্তি আছে।' তাঁহার অহঙ্কার ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে শিষ্যত্বের পক্ষে অনুপযোগী এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনে অনাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের সকলের আগেই তিনি সহস্রদ্বীপোদ্যান ত্যাগ করিয়া প্রথমে ক্যালিফর্নিয়ায় এবং পরে ওয়াশিংটনে স্বতন্ত্র বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

"আমাদের দলের অন্যতম বিশেষ চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি এবং পণ্ডিতাগ্রণী ছিলেন লিয়ঁ ল্যাণ্ডসবার্গ।[১]...তিনটি বৎসর তিনি ছিলেন স্বামীজীর অবিচ্ছেদ্য সাথী, বন্ধু, সেক্রেটারি ও সেবক। নিউ ইয়র্কের এক সংবাদপত্রের আফিসে তিনি কাজ করিতেন; ঐ কার্যে সময় বেশী লাগিত না, অথচ সামান্য আয় হইত। তিনি ও স্বামীজী যখন নিউ ইয়র্কের ৩৩নং রাস্তায় বাস করিতেন তখন একজোটে অর্থব্যবহার হইত—কখনও দুইজনের পক্ষে যথেষ্ট থাকিত, কখনও থাকিত না। রাত্রে ক্লাস শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং ভ্রমণশেষে সামান্য অর্থব্যয়ে রাত্রের আহার শেষ করিতেন। ইহাতে দুই জনের কাহারও কোন উদ্বেগ হইত না—তাঁহারা জানিতেন, প্রয়োজন মতো টাকা আসিয়া যাইবে। ল্যাণ্ডসবার্গ ছিলেন যেন ইওরোপের ও ইওরোপীয় দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পরাজির একটি সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ। আর বই পড়া অপেক্ষা মানুষকে জানিতেই স্বামীজী অধিক আনন্দ পাইতেন। আবার ল্যাণ্ডসবার্গের মধ্যে যেন ইহুদী জাতি—উহার উন্নতি, উহার অবনতি—আত্মপ্রকাশ করিত। এই সাহচর্যের মধ্যে যেন দুইটি প্রাচীন জাতির মিলন ঘটিয়াছিল এবং উভয়েই একটা সাধারণ ভূমির সন্ধান পাইয়াছিল। সর্বপ্রথম যাঁহারা আসিয়াছিলেন এবং দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ল্যাণ্ডসবার্গ অন্যতম। ঐ সময়ের প্রথানুসারে তাঁহার নূতন নামকরণ হইয়াছিল; তাঁহার অসাধারণ কৃপার জন্য

১। ইঁহার কথা পূর্ব অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তাঁহার নাম হইয়াছিল কৃপানন্দ। তিনি ছিলেন ভক্তি, পূজা ও উপাসনা মার্গের সাধক। তাঁহার জ্বালাময় আবেগশীল চরিত্র এই পথেই সহজ আত্ম-বিকাশের অবকাশ পাইত। তাঁহাকেই সর্বপ্রথম প্রচারকার্যে নিয়োগ করা হয়।...

"এ পর্যন্ত যাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন[১] তাঁহাদের অনেককে স্বামী বিবেকানন্দ সোমবারে (৮ই জুলাই) মন্ত্রদীক্ষা দিবেন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। রবিবারে তিনি আমাদের বলিলেন, 'আমি তোমাদের এখনও এত ভাল করে জানি না যে, তোমাদিগকে মন্ত্রগ্রহণের উপযুক্ত ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারি।' তারপর তিনি যেন একটু সলজ্জভাবেই বলিলেন, 'আমার একটা শক্তি আছে, যা আমি কদাচ কাজে লাগাই—আমি অপরের মনের কথা জানতে পারি। তোমরা রাজী থাক তো তোমাদের মনগুলি পরীক্ষা করে দেখি, কারণ অপরদের সঙ্গে আমি তোমাদিগকেও কাল দীক্ষা দিতে চাই।' আমরা সানন্দে সম্মত হইলাম। পরীক্ষার ফল তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই সন্তোষ-জনক হইয়াছিল; কারণ পরদিন তিনি অপর অনেকের সহিত আমাদিগকেও একটি মন্ত্র দিলেন এবং শিষ্য করিয়া লইলেন। পরে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, মন পরীক্ষার সময় তিনি কি দেখিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে কিছু কিছু বলিলেন।...তিনি বলিয়াছিলেন, একজনকে প্রাচ্য দেশে অনেক ভ্রমণ করিতে হইবে।...তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদের একজনের জীবন ভারতের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হইয়া যাইবে। তিনি আমাদের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ অনেক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহার প্রায় সবই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।...

"...অনেক সময় স্বামীজী শুধু ল্যাণ্ডসবার্গকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন; কখনও কখনও দুই-একজনকে সঙ্গে লইতেন, মাঝে মাঝে সকলেই দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি কথা কহিতেন, কিন্তু বিতর্কমূলক বিষয় তুলিতেন না। নির্জনতা ও অরণ্যানী যেন ভারতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করাইয়া দিত এবং তিনি স্বীয় পরিব্রাজক-জীবনের অনুভূতির কথা আমাদের শুনাইতেন।...

১। কৃষ্টিনের স্মৃতিলিপিতে এই কয়জনের নাম পাওয়া গেল—ওয়াল্ডো, ওয়াইট, এলিস, ষ্টেলা, মেরী লুই, ল্যাণ্ডসবার্গ, কাফি, কৃষ্টিন, ডাচার।

"গোড়াতে স্থির ছিল যে, সকলে একপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় বাস করিবেন; কোন চাকর থাকিবে না, প্রত্যেকে গৃহস্থালীর কিছু কিছু কাজ করিবেন। অনেকেই গৃহকর্মে অনভ্যস্ত ছিলেন, আর ও কাজটাও পছন্দ করিতেন না। ফল হইল ভারী মজার! এমন কি, কিছুদিন পরে একটা মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। আমাদের কেহ কেহ 'ব্রুক ফার্ম'-এর কাহিনী পড়িয়াছিলেন; তাই এই কয়জন মনে করিতেন যেন ঐরূপ ঘটনাবলীই সম্মুখে চাক্ষুষ ভাসিয়া উঠিতেছে। ইহা আশ্চর্যজনক নহে যে, এমার্সন ঐ অতিলৌকিকবাদীদের দলে ভিড়িতে অস্বীকৃত হন; তাঁহার মানসিক শান্তি সংরক্ষণের জন্য বেশ একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমাদের একজনের কাজ ছিল রুটি কাটা; তিনি ইহাতে আর্তনাদ করিতেন এবং প্রায় কাঁদিয়া ফেলিতেন। এই সব ছোটখাট ব্যাপারে চরিত্রের পরীক্ষা কিরূপে হয় ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সাধারণ মেলামেশার ক্ষেত্রে যেসব দুর্বলতা হয়তো সারা জীবনই চাপা পড়িয়া থাকিত, তাহাও এইরূপ দলবদ্ধ জীবনে আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এ এক মজার ব্যাপার! কিন্তু স্বামীজীর মনে ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল অন্যরূপ। যদিও ঐ দলের মাত্র একজন বয়সে তাঁর ছোট ছিলেন, তথাপি ধৈর্য ও স্থৈর্যে তিনি যেন ছিলেন সকলের পিতৃসদৃশ বা মাতৃ-স্থানীয়। মন-কষাকষি যখন খুব বাড়িত তখন তিনি বলিতেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য রাঁধব।' ইহাতে ল্যাণ্ডসবার্গ জনান্তিকে বলিয়া উঠিতেন, 'ভগবান রক্ষা করুন!' ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বুঝাইতেন, নিউ ইয়র্কে যেদিন স্বামীজী রাঁধিতেন সেদিন ল্যাণ্ডসবার্গ দুশ্চিন্তায় নিজের চুল ছিঁড়িতেন, কারণ সেদিন বাড়িতে যত বাসন থাকিত, সবই পরে মাজিতে হইত। একজোটে গৃহস্থালীর কাজ চালাইতে গিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হওয়ার পরে ঐজন্য একজন সাহায্যকারী লোক রাখা হইল এবং আমাদের অধিকতর কার্যক্ষম দুই-একজন কোন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

"কিন্তু দৈনন্দিন কর্ম শেষ হইয়া গেলে আমরা যখন ক্লাসে সমবেত হইতাম, তখন সমস্ত আবহাওয়া বদলাইয়া যাইত। সেখানে কখন কোন বেসুরো কথা শুনি নাই; মনে হইত যেন দেহ ও দেহবোধ বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছি।... তিনি যখন বুঝিতে পারিতেন যে, আমাদের মনে তাঁহার প্রভাব খুবই গভীর হইয়াছে, তখন বলিতেন, 'গোখুরা সাপে তোমাদের কামড়েছে, পালাবার

জো নেই।' অথবা বলিতেন, 'আমি তোমাদের জালে ফেলেছি; যাবে কোথায়?'

"আমাদের গৃহকর্ত্রী কুমারী ডাচার ছিলেন এক অতি বিবেকপরায়ণা খর্বাকৃতি নারী; তিনি ছিলেন মেথোডিস্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তা ও সম্প্রদায়ানুরাগিণী। অকপট ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করা এবং তাঁহাদিগকে একত্র ধরিয়া রাখার যে ক্ষমতা স্বামীজীর ছিল, তাহার সহিত যাহাদের পরিচয় ছিল না, তাহারা ভাবিয়া পাইত না, সেই গ্রীষ্মকালে ডাচারের গৃহে যে দলটি সমবেত হইয়াছিল, উহার মধ্যে ডাচার আসিয়া পড়িলেন কি করিয়া! কিন্তু একবার যে স্বামীজীকে দেখিয়াছে বা তাঁহার কথা শুনিয়াছে, তাহার পক্ষে তো গত্যন্তর ছিল না।··· তথাপি যিনি তখনও আপনাকে প্রচলিত রীতিনীতি ও গোঁড়ামিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পথটি ছিল বড় কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে ভয়াবহ। ডাচারের নিকট মনে হইত যেন, তাঁহার সমস্ত আদর্শ, জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যায়ন, ধর্ম-সম্বন্ধীয় ধারণা ধ্বসিয়া পড়িতেছে—যদিও প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির আংশিক পরিবর্তন হইত মাত্র। মাঝে মাঝে তিনি দুই-তিন দিন ক্লাসে আসিতেন না। স্বামীজী বলিতেন, 'বুঝতে পারছ না—এ যেমন-তেমন অসুখ নয়! তার মনে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এ হচ্ছে তারই দৈহিক প্রতিক্রিয়া। সে সহ্য করতে পারছে না।' একদিন ক্লাসে স্বামীজীর একটা কথার উপর ডাচার যে মৃদু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলস্বরূপে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া আসিয়াছিল। 'কর্তব্যবুদ্ধিটা কি রকম জান? এ যেন দুঃখের মধ্যাহ্ন সূর্য—আত্মাকে পর্যন্ত জর্জরিত করে দেয়!' —এই কথা বলিয়াছিলেন স্বামীজী। 'এ কি আমাদের কর্তব্য নয় যে—' এইটুকু বলিয়াই ডাচার থামিয়া গেলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; কারণ স্বাধীন আত্মাকে কেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার সাহস রাখে একথা ভাবিতেও মুক্তাত্মা স্বামীজীর মন সম্পূর্ণ বিরোধে মাতিয়া উঠিল। কয়েকদিন কুমারী ডাচারকে আর দেখা গেল না। অথচ একইভাবে শিক্ষাপ্রণালী চলিতে থাকিল। উপযুক্ত গুরুভক্তি থাকিলে সে পথ কিছু কঠিন ছিল না, কারণ শিষ্য তখন সহজেই সাপের খোলসের মতো পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতনকে ধরিতে পারিত। কিন্তু প্রাচীন কুসংস্কার ও রীতি-নীতি যেখানে বিশ্বাস অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া পড়িত, সেখানে উহা হইত ভয়ঙ্কর, এমন কি অতি ধ্বংসশীল।···

"কিন্তু সব সময়ই বেদান্তচর্চা হইত না বা গভীর গুরুতর চিন্তা চলিত না। ক্লাস শেষ হইয়া গেলে অনেক সময় এমন বিমল হাস্য-পরিহাস ও আনন্দহিল্লোল চলিত যে, আর কোথাও সেরূপ দেখি নাই। আমরা ভাবিতাম, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা গম্ভীর হইবেন, কিন্তু ক্রমে আমরা বুঝিতে পারিলাম ইচ্ছামাত্র জগতের বোঝা সরাইয়া দিয়া শৈশবোচিত আনন্দে মগ্ন হইতে পারাও বৈরাগ্যেরই একটা সুনিশ্চিত চিহ্ন এবং যাঁহারা চরম সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কেবল তাঁহাদের ভাগ্যে এইরূপ ঘটে। ঐ সময়টুকুর মতো আমাদের সকলেরই মন খুব হালকা হইয়া যাইত।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ')।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে দৈনন্দিন পাঠাদিবিষয়ক বিবরণ 'দেববাণী'তে আছে; আমরা এখানে শুধু অন্যান্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছি। এক বন্ধুকে লিখিত শ্রীযুক্তা ফাঙ্কির পত্র হইতে জানা যায়: "সত্যই আমরা এখানে আসিয়া পড়িয়াছি—বিবেকানন্দের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকিয়া সকাল আটটা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার উপদেশ শুনিতেছি। অতি অসম্ভব কল্পনাবলম্বনেও আমি বিবেকানন্দের সঙ্গে থাকা এবং তাঁহার শিষ্যারূপে গৃহীত হওয়া রূপ এমন একটা অত্যাশ্চর্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবেশের কথা ভাবিতে পারিতাম না। আহা! বিবেকানন্দের শিক্ষা কি ভক্তি-উদ্রেককারীই না ছিল! কোন আজগুবী কথা নয়—শুধু ভগবান, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধের কথা! আমার বোধ হয় আমার পক্ষে আর কখনও ঠিক আগের অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব; কারণ আমি সত্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি।[১]

"একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, প্রতিবার আহারের সময় বিবেকানন্দের কথা শুনিতেছি, প্রতি সকালে ও রাত্রে উপরের বারাণ্ডার ক্লাসে বসিতেছি, আর ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল সুবর্ণবিন্দুর ন্যায় চিরন্তন তারাগুলি ঝকমক করিতেছে—ইহার ঠিক মর্ম কি? অপরাহ্ণে আমরা ভ্রমণে বাহির হই এবং স্বামীজী আক্ষরিক অর্থে এবং অতি সরল স্বাভাবিক ভাবে 'প্রবহমান ঝরনার মধ্যে শাস্ত্রবাণী ও প্রস্তরমধ্যে ধর্মকথা শুনিতে পান এবং প্রত্যেক বস্তুতে ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্ত হন।' আবার এই স্বামীজীই কত আনন্দোচ্ছল ও কৌতুকপ্রিয়! আমরা তো মাঝে মাঝে পাগলপ্রায় হইয়া যাই।"

১। ফাঙ্কি স্বামীজীর কার্যে আত্মোৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বিবাহিতা বলিয়া স্বামীজী রাজী হন নাই।

পরবর্তী পত্রে আছে : "তোমাকে আগে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার পর আমরা সব অতি উচ্চভূমিতে বিচরণ করিতেছি। স্বামীজী আমাদের বলেন, 'এখনকার মতো ভুলে যাও যে, ডেট্রয়েট বলে কোন জায়গা আছে।' অর্থাৎ এই উপদেশ গ্রহণের সময় আমরা যেন কোন স্বার্থ-চিন্তা আসিতে না দিই। তৃণপত্র হইতে মানুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে, এমন কি দুষ্টলোকের মধ্যে, আমাদিগকে ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হয়। সত্যি কথা বলিতে কি, পত্র লেখার মতো সময় পাওয়া এখানে প্রায় অসম্ভব। জায়গাটায় অত্যধিক লোক থাকায় যেসব অসুবিধা হয়, আমরা তাহা সহ্য করিয়া যাই। স্বামীজী শীঘ্রই ইংলণ্ডে চলিয়া যাইবেন ; কাজেই আমাদের বোধ হয়, বিশ্রামের জন্য, ক্লান্তি দূর করার মতো সময়ও মোটেই নাই—সময়টা এতই স্বল্প বলিয়া মনে হয়! নিজেদের কাপড়-চোপড় ভাল করিয়া গুছাইয়া লইবারও সময় আমাদের নাই ; কারণ আমাদের ভয় হয়, পাছে অমূল্য রত্নগুলি হারাইয়া ফেলি—তাঁহার কথাগুলিই সেই রত্ন। আর তিনি যাহা কিছু বলেন, সব কিছুই যেন এক অতি মনোরম বিচিত্র চিত্রের ন্যায় পরস্পরসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কথাপ্রসঙ্গে মনে হইতে পারে, তিনি যেন বিষয়বস্তু ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি সর্বদাই মূল বস্তু—একমাত্র প্রাণপ্রদ বস্তুর কথাতেই ফিরিয়া আসেন : 'ভগবানলাভ কর। আর সবই তো অসার!'

"আমি বিশেষ পছন্দ করি কুমারী ওয়াল্ডো ও কুমারী এলিসকে। অবশ্য এ বাড়ির সকলেই চিত্তাকর্ষক এবং কাহারও কাহারও চরিত্র অসাধারণ। ডাঃ ওয়াইট নামক কেম্ব্রিজের একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাঝে মাঝে খুব আমোদের কারণ হইয়া উঠেন। তিনি স্বামীজীর উপদেশমধ্যে এমন ডুবিয়া যান যে, প্রত্যেক ভাষণের পরে শেষ কথা হিসাবে স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, 'স্বামীজী, তাহলে শেষ পর্যন্ত তো কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে—তাই না—যে, আমি ব্রহ্ম, আমি নির্গুণ ও সর্বাতীত?' স্বামীজী তখন যে কেমন স্নেহভরে মৃদুহাস্য করেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দেন, 'হাঁ ডকি, তুমি ব্রহ্ম, তোমার সত্যস্বরূপে তুমি নির্গুণ, সর্বাতীত—তাহা যদি তুমি একবার দেখিতে পাইতে!' ইহারও পরে যখন ঐ বিদ্বান ডাক্তার একটু দেরী করিয়া খাবার টেবিলে আসেন, তখন স্বামীজী অতিমাত্র গাম্ভীর্য-সহকারে, কিন্তু চক্ষুদ্বয় মিটমিট করিয়া একটু হাসির ভঙ্গীতে বলেন, 'এই যে ব্রহ্ম আসছেন', অথবা 'এই যে সর্বাতীতের আগমন হল।' স্বামীজীর হাস্যকৌতুক

সবই আনন্দজনক। কখনও তিনি বলেন, 'এখন আমি তোমাদের জন্য রাঁধব!' তিনি রাঁধেন অতি চমৎকার এবং আমাদের সঙ্ঘের ভাই-বোনদের খাওয়াতে খুব ভালবাসেন। তিনি যে খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাহা অতি সুস্বাদ, কিন্তু নানা রকম মশলার বড় বাড়াবাড়ি। তবু আমি স্থির করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার দম আটকাইয়া আসিলেও আমি খাইবই—আর দম প্রায় বন্ধ হইয়াই আসিত। বিবেকানন্দ যদি আমার জন্য রাঁধিতে পারেন, তবে আমার মতে, আর কিছু না হউক, আমাকে অন্ততঃ খাইতেই হইবে। ভগবান তাঁহার কল্যাণ করুন! এই-সব সময়ে আমাদের যেন হাসিঠাট্টার ফোয়ারা খুলিয়া যায়। স্বামীজী নিজের হাতে একখানি সাদা তোয়ালে জড়াইয়া রেলগাড়ির খাবার-কামরার পরিবেশকের মতো মেঝেতে দাঁড়াইয়া ঠিক তাহাদেরই ন্যায় সুর করিয়া ডাকেন, 'খাবার কামরার জন্য এই শেষ ডাক। খাবার পরিবেশিত হয়েছে। ...' না হাসিয়া পারা যায়? অতঃপর খাবার টেবিলে বসিয়া ছোটখাট টিপ্পনী বা ঠাট্টা লইয়া যেন হাসির ঝড় বহিতে থাকে; কারণ তিনি প্রত্যেকের নিজস্ব অদ্ভুত চলন-বলনগুলি ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেন; কিন্তু কখনও ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ না করিয়া শুধু তামাসা করিতেন।

"আগে যে চিঠিতে আমি তোমাকে স্বামীজীর লোক হাসাইবার ক্ষমতার কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার পর এমন অনেক কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে বুঝা যায়, স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের কত বিচিত্র দিক রহিয়াছে। আমরা চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে তিনি যাহা কিছু বলেন সব টুকিয়া রাখিতে পারি। কিন্তু দেখিতেছি, আমি তাঁহার কথাতেই ডুবিয়া গিয়া লিখিবার সংকল্প ভুলিয়া যাই। তাঁহার স্বর আশ্চর্যরকম সুমিষ্ট। মানুষ তো এই কণ্ঠনিঃসৃত দেবসঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেই! যাহা হউক, আমাদের প্রিয় শ্রীমতী ওয়াল্ডো পাঠগুলির বেশ লম্বা নোট লইতেছেন। ঐভাবেই এগুলি রক্ষিত হইবে।

"আমাদের—আমার ও ক্রিস্টিনের—জন্মক্ষণের উপর কোন শুভগ্রহের সুদৃষ্টি নিশ্চয়ই নিবদ্ধ ছিল! এখনও আমরা কর্ম ও জন্মান্তরবাদের কথা বিশেষ বুঝি না; কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারিতেছি যে, স্বামীজীর সহিত আমাদের সান্নিধ্য ঘটাইবার জন্য উভয়েই সক্রিয় ছিল। আমি তাঁহাকে অনেক সময় অতিসাহসিক প্রশ্ন করিয়া বসি, কারণ আমি দেখিতে চাই, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁহাতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। আমার ভাবাবেগ লইয়া যখন আমি 'দেবদূতরাও

যেখানে বিচরণ করিতে ভয় পান, সেখানেও ঢুকিয়া পড়ি', তখন তিনি উহা অতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতেই দেখেন। একবার তিনি একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ক্যান্থি আমার মানসিক বিরামের ব্যবস্থা করছে ; ও বড় সরল।' ইহা কি তাঁহার খুব স্নেহের পরিচায়ক নয় ?

"এক সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়িতেছিল, আর আমরা শয়নঘরেই বসিয়াছিলাম। পবিত্র রমণীচরিত্রের কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী আমাদিগকে সীতার কাহিনী শুনাইলেন। কি চমৎকার গল্প বলেন তিনি ! তোমার সামনে যেন সব ভাসিয়া উঠে এবং সব চরিত্রগুলি জল জল করিতে থাকে। হঠাৎ দেখি, আমি মনে মনে ভাবিতেছি, পাশ্চাত্ত্যদেশের রানীতুল্যা সুন্দরী সমাজনেত্রীদের কেহ কেহ—বিশেষতঃ যেসব নারী পুরুষের মন ভুলাইতে পারদর্শিনী, তাঁহারা—স্বামীজীর চক্ষে কিরূপ ঠেকিবেন ? কথাটা ভাবিয়া দেখার পূর্বেই আমার মুখ হইতে প্রশ্নটা ফস করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, আর আমিও ভারী বিব্রত হইয়া পড়িলাম। স্বামীজী কিন্তু আমার দিকে তাঁহার বড় অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ চক্ষুদুটি ফিরাইয়া স্থির-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'জগতের শ্রেষ্ঠ কোন সুন্দরী যদি অসৎ বা নারীর পক্ষে অনুচিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় তবে সে তৎক্ষণাৎ একটা বিশ্রী সবুজ ব্যাঙ-এ পরিণত হয়ে যাবে—আর ব্যাঙ এমন একটা কিছু দেখবার মতো জিনিস নয়।...'

"কখন তিনি ক্লাস বন্ধ করিয়া আমাকে বলিতেন, 'ক্যান্থি, একটা কিছু মজার গল্প বল না ! আমরা শীঘ্রই যার যার জায়গায় চলে যাব। এখন মজার গল্প করাই ভাল। কি বল ?'...

"আমরা রোজ বিকালে দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হই। আর আমাদের বেড়াইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা পছন্দসই রাস্তা হইতেছে বাড়ির পশ্চাৎদিকে পাহাড় হইতে নামিয়া যাওয়া এবং পরে গ্রাম্য পথ ধরিয়া নদী পর্যন্ত যাওয়া।...চলিতে চলিতে আমরা মাঝে মাঝে থামি এবং স্বামীজীকে ঘিরিয়া ঘাসের উপর বসিয়া তাঁহার অপূর্ব কথা শুনি। হয়তো কোন পাখী, ফুল বা প্রজাপতি দেখিয়াই তাঁহার কথা আরম্ভ হইল, আর তিনি আমাদিগকে বেদের গল্প বা স্তোত্রাদি শুনাইতে লাগিলেন।..."

"বুধবার, ৭ই অগস্ট। হায়, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী আজ সকাল নয়টার ক্রেটনের স্টীমারে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি নিউ ইয়র্কের



লণ্ডনে বক্তৃতায় স্বামীজী, ১৮৯৬

ট্রেন ধরিবেন এবং নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে যাইবেন। শেষ দিনটা ছিল বড় চমৎকার, বড় মূল্যবান। সেদিন সকালে ক্লাস ছিল না। তিনি জি— (গ্রীনস্টিডেল) ও আমাকে তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে বলিলেন—আর কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা ছিল। অপরেরা তো সারা গ্রীষ্মকালটাই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ; এখন তিনি শুধু আমাদের দুইজনের সহিত একটু শেষ কথা বলিতে চান। আমরা একটা পাহাড়ে চড়াই করিতে করিতে প্রায় আধ মাইল অগ্রসর হইলাম। চারিদিকেই ছিল বন আর নির্জনতা। অবশেষে তিনি একটা নীচুডাল-ওয়ালা গাছ বাহির করিলেন এবং আমরা ঐ নীচু ডালগুলির তলায় বসিলাম। আশা করিতেছিলাম তিনি কথা বলিবেন ; কিন্তু তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এখন আমরা ধ্যান করব। আমরা বোধিদ্রুমতলে উপবিষ্ট বুদ্ধের মতো হয়ে যাব।' তিনি এত নিশ্চল হইয়া গেলেন, যেন একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি! তারপর বজ্রনির্ঘোষসহ ঝঞ্ঝাবাত আরম্ভ হইল এবং বৃষ্টি নামিয়া আসিল। তিনি লক্ষ্যই করিলেন না। আমি নিজের ছাতা ধরিয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব রক্ষা করিতে লাগিলাম। ধ্যানে সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া তিনি পারিপার্শ্বিক সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।[১] অচিরে আমরা দূরে চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অপর সকলে আমাদের খোঁজে ছাতা ও বর্ষাতি (রেন-কোট) লইয়া বাহির হইয়াছিল। স্বামীজী ভাসা-ভাসা চোখে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন—কারণ তখন আমাদিগকে যাইতেই হইবে—আর তিনি বলিলেন, 'আমি কি আবার কলকাতার বর্ষার মধ্যে এসে পড়লুম নাকি ?'

"এই শেষ দিনটায় তাঁহাকে বড়ই কোমল ও স্নেহময় মনে হইতেছিল। স্টীমার যখন নদীর মোড় ফিরিয়া চলিতে লাগিল, তিনি বিদায় লইবার জন্য আমাদের দিকে বালকের ন্যায় সানন্দে তাঁহার টুপিটি নাড়িতে লাগিলেন—আর তিনি সত্যই চলিয়া গেলেন।"

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী সর্বদা এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে অবস্থান করিতেন। ইহার সাক্ষ্য আমরা 'দেববাণী'র প্রতি ছত্রে পাই, শিষ্যাদের স্মৃতি-লিপিতেও ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলাম। এই উচ্চ স্তরে অবস্থানকালে তিনি

১। একটু আগে পাহাড়ের উপরে গাছতলায় যে গভীর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ উহাই এই নির্বিকল্প সমাধি। সম্প্রতি অনুসন্ধানক্রমে ঐ স্থানটি আবিষ্কৃত হইয়াছে—একটি প্রকাণ্ড ওক গাছের তলায় এক সমতল প্রস্তরখণ্ড—কুটির হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে।

একদিন সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে ধ্যানে বসিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হন। দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে তিনি যে অধ্যাত্মানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, সহস্র-দ্বীপোদ্যানেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল এবং গঙ্গাতীরবর্তী কাশীপুরে যে নির্বিকল্প সমাধিসুখ অনুভব করিয়াছিলেন, সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে সেদিন সেরূপ অনুভূতিই উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে তিনি এই বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিলেও, তিনি ঐ দিনটিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন। এই সহস্রদ্বীপোদ্যানেই তিনি 'সঙ্গ অব দি সন্ন্যাসীন' (সন্ন্যাসীর গীতি) নামক কবিতাটি রচনা করেন। অনেকের মতে উহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তি সর্বাধিক প্রকটিত হইয়াছে। ভাব-গাম্ভীর্যে উহা অনুপম—বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা ইহার প্রতিছত্রে জাজ্বল্যমান। পড়িলেই বোধ হয়, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরূঢ় ও অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষেরই পক্ষে এইরূপ পঙক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। স্বামীজী তখন সর্বসাধারণের সাহায্যে অনাড়ম্বরভাবে সন্ন্যাসীর চিরন্তন প্রণালীতে ধর্মশিক্ষা দিতে ব্যাকুল; কিন্তু আমেরিকার ঐশ্বর্যশালী কেহ কেহ তাঁহাদের স্বীয় পরিকল্পনানুযায়ী চলিবার উপদেশ দিতেন। কবিতাটিতে ইহার প্রতিবাদ ও স্বামীজীর স্বাধীন মনোভাব পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বামীজীর পত্রেও তাঁহার ঐ কালের মনোভাবটি লক্ষ্য করা যায়। সহস্র-দ্বীপোদ্যান হইতে তিনি মেরী হেলকে লিখিয়াছিলেন, "প্রতিদিনই মনে হচ্ছে—আমার করণীয় কিছু নেই। আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ তিনিই করছেন। আমরা যন্ত্রমাত্র। তাঁর নাম ধন্য! কাম, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ বন্ধন যেন আমা থেকে সাময়িকভাবে খসে পড়েছে। ভারতে মধ্যে মধ্যে আমার যেমন উপলব্ধি হ'ত, এখানেও আবার তেমনি হচ্ছে—'আমার ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দ বোধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন্ বিধিবিশেষ মানবো? কোন্‌টাই বা লঙ্ঘন ক'রব?' সে উচ্চ ভাবভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন একটা ডোবা। হরি ওঁ তৎ সৎ। একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছু নেই। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। হে প্রভো! তুমি আমার চির আশ্রয় হও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" (বাণী ও রচনা, ৭।১৩১-৩২)। মেরীকে লিখিত ২৬শে জুনের পত্রে আছে: "কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে ইচ্ছামত প্রসঙ্গ হয়। ফল দুধ প্রভৃতি আহার করি, আর বেদান্তবিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ি,

এগুলি ওরা ভারত থেকে অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়েছে।" স্বামীজী ঐ সময়ে 'বেদান্ত-সূত্রের' প্রধান প্রধান দার্শনিক ভাষ্যের তুলনামূলক অধ্যয়নে রত ছিলেন।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাইবার পূর্ব হইতেই গ্রীনএকারে যাইবার আহ্বান আসিতে থাকিলেও এবং গ্রীনএকারের প্রতি একটা প্রীতির আকর্ষণ থাকিলেও স্বামীজী গ্রীনএকার অপেক্ষা ইংলণ্ডে যাওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। ভারত হইতেও অনুরূপ আহ্বান আসিতেছিল। কিন্তু আমেরিকার কাজ যে সময়ে সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে এবং ইংলণ্ডেও ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে, সে সময়ে অকস্মাৎ ভারতে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। খেতড়ির রাজাকে তিনি ৯ই জুলাই (১৮৯৫) জানাইয়া দিলেন, "আমার ভারতে ফেরা সম্বন্ধে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই: মহারাজ তো বেশ ভালই জানেন, আমি হচ্ছি দৃঢ় অধ্যবসায়ের মানুষ। আমি এ দেশে একটি বীজ পুঁতেছি, সেটি ইতোমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি খুব শীঘ্রই এটা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; কতকগুলিকে সন্ন্যাসী ক'রব, তারপর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। ...ইতোমধ্যে লণ্ডনে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি অগস্টের শেষে সেখানে যাব মনে করেছি।" (ঐ, ১৩৮)।

পূর্বের ন্যায় এই সময়েও স্বামীজী ভাবী ভারতীয় কাজের কথা যথেষ্ট ভাবিতেন এবং নানা ভাবে কাজ গড়িয়া তোলার উপদেশাদি দিতেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় মাদ্রাজের জন কয়েক ভক্ত মিলিয়া একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করার পরিকল্পনা করেন। উহার যথাকালে নাম হয় 'ব্রহ্মবাদিন্'। এই সম্বন্ধে ২৮শে মে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "এই সঙ্গে একশ' ডলার... পাঠালাম। আশা করি, এতে তোমাদের কাগজটা বার করবার কিঞ্চিৎ সাহায্য হবে।" আবার ১লা জুলাই আলাসিঙ্গাকেই লিখিলেন, "তোমাদের কাগজখানি বার ক'রে ফেলো।...খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে থাকব। তোমরা কাজ ক'রে চল। দেশবাসীর জন্য কিছু কর— তাহলে তারাও তোমাদের সাহায্য করবে, সমগ্র জাতি তোমাদের পিছনে থাকবে।" ৩০শে জুলাই লিখিলেন, "প্রিয় আলাসিঙ্গা, তুমি ঠিক করেছ। নাম ('ব্রহ্মবাদিন্') আর মটো ('একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি') ঠিকই হয়েছে।... 'সন্ন্যাসীর গীতি' এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ।" 'ব্রহ্মবাদিনে'র

প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর। উহার ২৮শে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সন্ন্যাসীর গীতি' প্রকাশিত হয়।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই, স্বামীজী তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ভূখণ্ডের কল্যাণচিন্তায় ও মঙ্গলসাধনে ব্রতী—সব দেশই তাঁহার আপনার দেশ, সব মানুষই তাঁহার আপনার জন। ইংলণ্ডে যাইবার প্রাক্‌কালে নিউ ইয়র্ক হইতে ৯ই অগস্ট তিনি শ্রীযুক্ত স্টার্ডিকে লিখিয়াছিলেন, "ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অবহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না?" অগস্ট মাসেরই আর একখানি পত্রে তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, "আমি আমার স্বদেশবাসীর প্রতি কর্তব্য কতকটা করেছি। এখন জগতের জন্য—যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি; দেশের জন্য —যে দেশ আমাকে ভাব দিয়েছে; মনুষ্যজাতির জন্য—যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলতে পারি, কিছু ক'রব।" 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'—ইহা সত্য কথা; কিন্তু গভীরতম স্বদেশপ্রেমের সহিত উদারতম বিশ্বপ্রেমের মিলন বড়ই দুর্লভ।

স্বামীজীর পত্রাবলী পড়িয়া মনে হয়, ইওরোপ যাত্রার পূর্বে অন্ততঃ দুই-এক দিনের জন্য চিকাগো যাইয়া হেল-পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু তিনি গিয়াছিলেন কিনা সঠিক জানা নাই। তারপর কৃপানন্দ ও শ্রীমতী ওয়াল্ডোর (হরিদাসীর) হস্তে আমেরিকার কার্যভার অর্পণ করিয়া ইংলণ্ডের কার্যে অগ্রসর হইলেন।

লণ্ডন

ইংলণ্ডে প্রচারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার কথা স্বামীজীর মনে প্রায় প্রথম হইতেই ছিল। ধর্মমহাসভায় যোগদান এবং আমেরিকায় সাফল্যলাভ যখন অসম্ভব বোধ হইয়াছিল, তখনও এই চিন্তা মনে উদিত হইত। এখন এই শুভেচ্ছা বাস্তব রূপ ধারণ করিল। শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলারের সহিত স্বামীজীর আমেরিকায় সাক্ষাৎ হয়। আবার স্বামীজীর পরিচিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ শ্রীমতী মূলারের বাড়িতে থাকিতেন। স্বামীজীর পত্রাবলীর পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, পশ্চিম ভারতে ভ্রমণকালে স্বামীজী এই অক্ষয়বাবুকে পরিচয়পত্রসহ জুনাগড়ের দেওয়ানজীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমতী বুলকে লেখা স্বামীজীর ১৭ই সেপ্টেম্বরের (১৮৯৫) পত্র হইতে জানা যায় যে তিনি স্বামীজীর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। আলোচ্য সময়ে অক্ষয়বাবু মূলারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে লণ্ডনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এদিকে শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডি যখন আলমোড়ায় তপস্যা-নিরত ছিলেন, তখন স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেই সূত্রে তিনি স্বামীজীর কথা শুনিতে পান এবং লণ্ডনে ফিরিয়া স্বামীজীর সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন। মূলার স্বামীজীকে সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া স্টার্ডিও তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। ঠিক এই সময়েই শ্রীযুক্ত লেগেট ও শ্রীযুক্তা বেটি স্টার্জিস (ম্যাকলাউড-এর ভগিনী) তাঁহাদের পরিণয়-সম্পাদনের জন্য প্যারিসে যাইতে উদ্যত স্বামীজীকে সঙ্গে লইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এতগুলি যোগাযোগ দৈবনির্বন্ধেই ঘটিয়াছে মনে করিয়া স্বামীজী ইওরোপ হইয়া লণ্ডনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং ১৭ই অগস্ট (১৮৯৫) নিউ ইয়র্কে এক ফরাসী কোম্পানীর (Touraine নামক) জাহাজে উঠিয়া ২৪শে অগস্ট প্যারিসে উপস্থিত হইলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত লেগেটের বিবাহ হইয়া গেলে স্বামীজী প্যারিস হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। লণ্ডন যাত্রার পূর্বে ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি আলাসিঙ্গাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্বে আলোচিত কয়েকটি কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠে: বিদ্বেষপরায়ণ স্বদেশবাসীরা ও মিশনরীরা তখনও ভারতে তাঁহার নিন্দাপ্রচার হইতে বিরত হয় নাই; স্বামীজী তখন আপনাকে শুধু ভারতসেবক না ভাবিয়া বিশ্বসেবক মনে করিতেন, তিনি বিশ্বের

করিতেন, জগৎকে একটা বিশেষ কিছু দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত; তিনি রাজনীতিক নহেন; ইত্যাদি। পত্রে আছে:

"তোমরা যে মিশনরীদের বাজে কথাগুলোর উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ কর, তাতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কলকাতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দুখাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের ব'লো, তারা যেন আমায় একজন রাঁধুনী ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়।...অপরদিকে যদি মিশনরীরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগরূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বলো যে, তারা মস্ত মিথ্যাবাদী।...ডাঃ জেনস ঐ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারও কথায় আমি চ'লব না। আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের ওপর আমার তীব্র বিদ্বেষ নাই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না, আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—এখন তোমরা নিজেদের সামলাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস না কি?...আমার পেছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড়। কারও সাহায্য চাই না।...তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু ব'লে থাকো, সেই জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশ-শূন্য, কপট, নাস্তিক কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্য আমি জন্মেছি?...আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই না। আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।"

স্বামীজী যখন যেখানে যাইতেন, সেখানকার সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি ও ধর্মাদির সহিত সুপরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেন। প্যারিসে অবস্থানকালেও তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। প্যারিস ইওরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। প্যারিসে অল্পকয়দিন মাত্র থাকিলেও তিনি এই সুযোগে যাদুঘর, ছোট ও বড় গির্জা, চিত্রশালা ইত্যাদি দেখিয়া লইলেন এবং ফরাসীদের সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। লেগেটের অনেক বন্ধু-বান্ধবের সহিতও পরিচয় হইল, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাদিও

হইল। আগন্তুকগণও তাঁর গুণে মুগ্ধ হইলেন—কারণ একাধারে তিনি ছিলেন ধার্মিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রসিক, সুবক্তা ও বন্ধুবৎসল। এইরূপে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এবং মৌখিক আলাপ ও জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা তিনি ইওরোপ সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখিয়া লইলেন।

প্যারিসের এক অভিজ্ঞতার কথা স্বামীজী তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন: "প্যারিস, সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগ-বিলাসের ভূস্বর্গ প্যারিস, বিদ্যাশিল্পের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন—রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া; কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে—শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হ'ল—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' হয়েছে। এই দারুণ গরমি কাল, তাতে স্নান করবার জো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল জায়গা খুঁজে নিইগে। বারোটা প্রধান প্রধান হোটেল খোঁজা হ'ল, স্নানের স্থান কোথাও নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে—সেখানে গিয়ে চার-পাঁচ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল, হরি!"

স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে তাঁহার দুইটি হোটেলে অবস্থানের কথা জানা যায়—'হোটেল কন্টিনেণ্ট্যাল, ৩ রু ক্যাস্তিগ্লিয়েঁা, প্যারিস' ও 'হোটেল হল্যাণ্ড রু দ্য লা প্যায়, প্যারিস'।

ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া স্বামীজী প্রথমে শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলারের অতিথি হইলেন। ঐ বাড়ির ঠিকানা, "জুয়ান ডাফ হাউস, রিজেন্ট স্ট্রীট, কেম্ব্রিজ, ইংলণ্ড।" ঐ বাটীতে দিন কয়েক থাকার পর তিনি স্টার্ডির গৃহে চলিয়া যান। উহার ঠিকানা—"হাই ভিউ, ক্যাভার্শ্যাম, রেডিং, ইংলণ্ড।"

একদিকে ইংলণ্ডে আসার অভিপ্রায় স্বামীজী যেমন দীর্ঘকাল যাবৎ পোষণ করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, ইংরেজ-সমাজ তাঁহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবে—রাজার জাতি প্রজাজাতির ধর্মের একজন প্রচারককে সাদরে গ্রহণ করিবে তো? অবশ্য শ্রীমতী মূলার ও শ্রীযুক্ত স্টার্ডির আহ্বান তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি বিশাল ইংরেজ-সমাজের সম্মুখীন হন নাই। লণ্ডনের কার্যক্ষেত্রে নামিয়া তিনি যাহা দেখিলেন,

তাহা শুধু আশ্চর্য নহে, কল্পনারও অতীত। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন উদার বিশ্বভ্রাতৃত্ব লইয়া, গৃহীতও হইলেন তেমনি সর্বস্তরে সাগ্রহে। শীঘ্রই তাঁহার অনেক বন্ধু জুটিয়া গেলেন এবং তাঁহারাই বাসস্থান, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, ক্লাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই 'হিন্দুযোগী'র আগমনে লণ্ডনে সাড়া পড়িয়া গেল। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় যে ক্লাস খুলিলেন, তাহাতে বেশ লোকসমাগম হইতে লাগিল; তাঁহার সহিত অন্ততঃ দুই-চারি মিনিট আলাপের সুযোগ পাইবার জন্য আগন্তুকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কিছুদিন যাইতে না যাইতে স্বামীজী দেখিতে পাইলেন, নিউ ইয়র্কে তিনি যেমন কর্মব্যাপৃত ছিলেন, এখানেও ঠিক তাহাই ঘটিল। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রেও তাঁহার কার্যাবলীর সংবাদ সাগ্রহে ও সসম্মানে মুদ্রিত হইল। অনেক সংবাদপত্র-প্রতিনিধি সাক্ষাৎকারের জন্য আসিলেন; ইহাদের মধ্যে 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট', 'দি স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকাদ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজী প্রথমে ভাবিয়াছিলেন ব্যক্তিগত মেলা-মেশা ও সৎপ্রসঙ্গাদিতেই লণ্ডনের দিনগুলি কাটিবে; কিন্তু খবরের কাগজে প্রকাশিত তৎকালীন সংবাদাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অচিরে জনসাধারণের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কার্যধারারও বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। যে সকল বন্ধু এইসব কার্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সাহায্যে তিনি ইংরেজ-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন এবং একসময়ে হিমালয়ের আলমোড়া অঞ্চলে নিরামিষাশী থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্তমত ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার ধনবল ও যশোবল ছিল। অতএব ইঁহার বন্ধুত্ব স্বামীজীর পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইনি পরে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারী মূলার তো ছিলেনই। তাছাড়া প্রথমাবস্থায় যেসব সম্মানিত ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে লেডি ইসাবেল মার্গেসন প্রভৃতি কুলীন সম্প্রদায়ের অনেকেও ছিলেন। স্বামীজী ইহাদের আগ্রহ মিটাইবার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেন।

জনসমাজ স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার বন্ধুগণ ২২শে

অক্টোবর লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত পল্লী পিকাডিলীতে অবস্থিত প্রিন্সেস হলে তাঁহার একটি বক্তৃতার আয়োজন করিলেন। এই হলে স্বামীজী সেই সন্ধ্যায় 'আত্মবিজ্ঞান' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভায় লণ্ডনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভাষণটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং পরদিবস সংবাদপত্রগুলি উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল।

'স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখিয়াছিল :

"সেদিন এক ভারতীয় যুবক প্রিন্সেস হলে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারতবাসীদের মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখন ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দৃষ্ট হন নাই।...বক্তৃতাপ্রদান-কালে তিনি মহাত্মা বুদ্ধ ও যীশুর দুই-চারিটি কথার তুলনায় রাশি রাশি কলকারখানা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তিকাদি দ্বারা মানুষের যে কত সামান্য উপকার সাধিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি যে তিনি পূর্বে প্রস্তুত করিয়া আসেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর এবং বক্তৃতা দিবার সময়ে মুখে একটি কথাও বাধে না।"

'লণ্ডন ডেলি ক্রনিকল'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল :

"জনপ্রিয় হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যাঁহার আকৃতির সহিত বুদ্ধের ইতিহাস-বিদিত মুখের স্পষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে, তিনি আমাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রিক ঐশ্বর্যকে, আমাদের নিষ্ঠুর যুদ্ধকে এবং আমাদের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতাকে এই বলিয়া নিন্দা করেন যে, এইরূপ মূল্যের বিনিময়ে যদি আমাদের স্পর্ধার বস্তু এই সভ্যতা অর্জন করিতে হয়, তবে হিন্দুরা ইহার কিছুই চায় না।"

'ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট'-এর জনৈক সাংবাদিক স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ২৩শে অক্টোবর ঐ পত্রিকায় 'লণ্ডনে একজন ভারতীয় যোগী' এই শিরোনামা-যুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল : "খ্রীষ্টান ধর্মাধ্যক্ষদের 'মাইটার'-সদৃশ পাগড়ি-পরিহিত এবং শান্ত অথচ সৌজন্যপূর্ণ মুখাবয়ববিশিষ্ট স্বামীজীর চেহারা বড়ই আকর্ষণীয়। স্বামীজী যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ!" উক্ত সাংবাদিক দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বামীজীর সহিত আলাপ করেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তিনি কেন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। স্বামীজী স্বীয় গুরুর

কথাও বলেন এবং জানান যে, তিনি কোন সম্প্রদায় গঠন করিতে আসেন নাই, কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার করিতেও আগ্রহশীল নহেন, তিনি শুধু বেদান্তের মৌলিক ও বিশ্বজনীন তথ্যগুলিই প্রচার করিতে চান এবং আশা করেন যে, শ্রোতারা প্রত্যেকে ঐগুলি গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ ভাবে জীবনে রূপায়িত করিবে। তিনি বলিয়াছিলেন: "আমি কোন গোপন-সম্প্রদায়ের প্রবক্তা নহি, অথবা আমি বিশ্বাসও করি না যে, এই জাতীয় দলের দ্বারা কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।" 'গেজেট'-এর সংবাদদাতা স্বামীজীর সমস্ত কথা, আদর্শ ও আমেরিকায় সাফল্যের বিবরণ টুকিয়া লইয়াছিলেন এবং যথাকালে প্রবন্ধাকারে ছাপাইয়াছিলেন। প্রবন্ধশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন: "আমি অতঃপর তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ইনি যে একজন প্রধান মৌলিকতাপূর্ণ ব্যক্তি, একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

এইরূপে লণ্ডনের শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন ও ধার্মিক সমাজ এই হিন্দু-সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব, মতামত ও গুণাবলী সম্বন্ধে বহু বিবরণ অবগত হইলেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা ও ঔৎসুক্য বর্ধিত হওয়ায় স্বামীজী নিত্য নূতন অনুরাগী লাভ করিতে থাকিলেন। ইংরেজগণকে এইভাবে হিন্দু-মতের সমর্থক ও তাঁহার নিজের প্রতি শ্রদ্ধালু দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সর্বপ্রযত্নে এই স্বল্পকালের অবস্থানের সুযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যের হৃদয়কেন্দ্রে একটা স্থায়ী দাগ রাখিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন শ্রীমতী মার্গারেট ই. নোবল, যিনি পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে ভারতে ও ভরতেতর দেশে সুপরিচিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট চমৎকার লাগিয়াছিল স্বামীজীর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অভিনব উদার বাণী এবং দার্শনিক ক্ষেত্রে বিচারপূত নবীন চিন্তাধারা; আর তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, "স্বামীজীর আহ্বান বিঘোষিত হইয়াছিল, মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও শক্তিপ্রদ তাহারই নামে, পরন্তু মানুষের মধ্যে যাহা কিছু নীচ ও অশিব তাহার উপর উহা নির্ভর করে নাই।" স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে এবং কিছুকাল পরেও মার্গারেট ইংলণ্ডে শিক্ষাকার্যে ব্রতী ছিলেন এবং তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাকার্যের পরিপুষ্টি-সাধনকল্পে সংস্থাপিত 'সিসেম ক্লাবে'রও তিনি একজন

প্রধান সদস্যা ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে সকলেই ছিলেন শান্তপ্রকৃতি ও সুশিক্ষিত। আধুনিক সমস্ত চিন্তাধারা ও উহার প্রভাবের প্রতি তাঁহার একটা প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। স্বামীজীর বাক্যগুলি তিনি প্রথমেই আপন নিকষে কষিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পক্ষে উহার অনেকটা নির্বিচারে গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু স্বামীজী জানিতেন, নিবেদিতার এই দ্বিধা নূতন ভাবাদর্শে প্রবেশ করারই প্রথম প্রয়াস, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, শ্রদ্ধামিশ্রিত-বিচারপরায়ণা নিবেদিতা যদি একবার তাঁহার মতবাদ পরীক্ষাপূর্বক স্বীকার করেন, তবে তিনিই কালে হইবেন এই নববাণী-প্রচারের সর্বাগ্রণী মুখপাত্রী। নিবেদিতা নিজেও বলিয়া গিয়াছেন, স্বামীজীর মতসমূহ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে তাঁহার বহু মাস লাগিয়াছিল। আবার স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের যে হৃদয়গ্রাহী বিবরণটি তিনি দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, তিনি প্রথম দিন হইতেই স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। ফলতঃ সেদিন হইতেই মার্গারেট স্বামীজীর কথাগুলির গভীর অনুধ্যানে রত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীর লণ্ডন ত্যাগের পূর্বেই নিবেদিতা তাঁহাকে আচার্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের চমৎকার বর্ণনাটি এই : "সত্য কথা বলিতে কি, সেই সুদূর লণ্ডনেও আমি যখন তাঁহার প্রথম দর্শন পাই, সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া আজ যেমন তাহার সূর্যকিরণোজ্জ্বল জন্মভূমির সহিত জড়ানো অসংখ্য কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, তাঁহারও মনে সেদিন নিশ্চয়ই ঐরূপ হইয়া থাকিবে। সে সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের এক রবিবারের শীতের অপরাহ্ণ, যদিও স্থানটি ছিল লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ড-এর একটি বৈঠকখানা। অর্ধচন্দ্রাকারে উপবিষ্ট এক শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, আর তাঁহার পশ্চাতে ছিল অগ্নিকুণ্ড। প্রশ্নের পর প্রশ্নের যখন তিনি উত্তর দিতেছিলেন এবং উত্তরগুলি বুঝাইবার জন্য সুর করিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোক নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে, আর সমস্ত দৃশ্যটি তাঁহার নিকট ভারতীয় উদ্যানেরই একটা অভিনব সংস্করণ অথবা সূর্যাস্তকালে যখন সাধু আসিয়া কূপের ধারে কিংবা গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষতলে আসন পাতেন আর গ্রামের শ্রোতারা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসে, উহারই আর একটা অদ্ভুত প্রকারভেদ বলিয়া মনে হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডে স্বামীজীকে আর কখনও এইরূপ অনাড়ম্বর আচার্যরূপে দেখিতে পাই নাই। অতঃপর তিনি বক্তৃতাপ্রদানেই ব্যস্ত

থাকিতেন, অথবা যে-সকল প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতেন তাহা আসিত বিধিবদ্ধ রীতিতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে। এই প্রথম বারেই মাত্র আমরা পনর-ষোল জন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম এবং আমরা অনেকেই ছিলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর তিনি আমাদের মধ্যে তাঁহার লাল রঙ-এর আলখাল্লা ও কোমরবন্ধ পরিয়া বসিয়া যেন কোন সুদূর দেশের কাহিনী শুনাইতেছিলেন ও মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত অভ্যাসবশে বলিতেছিলেন, 'শিব, শিব'। তাঁহার আননে ছিল কোমলতা ও উচ্চভাবের এমন এক মধুর সমাবেশ যাহা ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিদের বদনে ফুটিয়া উঠে—এ যেন সেই মুখচ্ছবি যাহা মেরী-ক্রোড়ে উপবিষ্ট যীশুখ্রীষ্টের মুখে র‍্যাফেলের তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে। সে অপরাহ্ণের পর আজ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিন তিনি যে সংস্কৃত শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহা কোনদিন বিস্মৃত হইবার নহে; সে আবৃত্তি হইয়াছিল প্রাচ্যদেশীয় সেই অপূর্ব সুরে যাহা আমাদের গির্জাগুলিতে শ্রুত গ্রেগোরিয়ান সুরেরই সদৃশ, অথচ উহা হইতে কতই পৃথক্!"

লণ্ডনের অভিজাতগৃহে বা ক্লাবগুলিতে স্বামীজী যেসব ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইতেন, তাহাতে তিনি ভারতীয় ধর্মমতের, বিশেষতঃ বেদান্তের মৌলিক তথ্যগুলির আলোচনা করিতেন। আমেরিকার ন্যায় ইংলণ্ডেও তাঁহাকে বহু প্রকার অজস্র প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হইতে হইত; এখানেও তিনি ঝটিতি উত্তরপ্রদান, শ্লেষযুক্ত প্রত্যুত্তর, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতির দ্বারা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেন, অথচ মূল অধ্যাত্মচর্চার ধারা কখনও ব্যাহত হইত না। পাশ্চাত্ত্য-সুলভ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মলাভ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রায়ই তিনি তীব্র সমালোচনা করিতেন এবং ঐশ্বর্যকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাইতেন। এই ভাবদ্বয়ের প্রতিপক্ষরূপে তিনি ধর্মজগতে হিন্দুদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা তুলিতেন এবং ত্যাগের মহিমাকীর্তনে শতমুখ হইয়া উঠিতেন।

স্বামীজীর বক্তৃতা ও আলাপ শ্রোতার হৃদয়ে অনেকক্ষেত্রে ভাবোচ্ছ্বাস জাগাইত ও সর্বদাই নবালোক আনিয়া দিত। এই বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছিল একদিন ওয়েস্ট এণ্ড-এর এক বৈঠকখানায় ঘরোয়া আলাপপ্রসঙ্গে। সেদিন তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্টা ছিলেন লণ্ডনের সম্ভ্রান্তকুলের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা জননী এবং স্বামীজীর বাগ্মিতা স্বীয় প্রভাবপ্রসারের শক্তিতে যেন সেদিন চরমে উঠিয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল প্রেমের মহত্ত্ব;

আর স্বামীজী দেখাইয়া দিতেছিলেন, প্রেম মানবচিত্তকে স্বার্থত্যাগের কত উচ্চ-স্তরে উন্নীত করে এবং মনের সর্বপ্রকার ঊর্ধ্বতম ভাবরাশিকে কিরূপে স্বকার্যে নিয়োগ করে। কথাটি দৃষ্টান্তসহায়ে বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "ধরুন রাস্তায় অকস্মাৎ আপনাদের সামনে একটা বাঘ এসে হাজির হল। এতে আপনারা কতই না ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন এবং আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যেতে কতই না ব্যাকুল হবেন! কিন্তু—" বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠধ্বনি অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং আধ্যাত্মিক তেজঃপুষ্ট ব্যক্তির বদন যেমন দিব্যবল ও সাহসে উদ্ভাসিত থাকে, তাঁহারও মুখ অকস্মাৎ তেমনি প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "মনে করুন ঐ বাঘের পথে একটি ক্ষুদ্র নিরুপায় শিশু পড়ে আছে, তখন আপনারা কোথায় যাবেন? বাঘের মুখের সামনে—আপনাদের যে-কেহ সেখানে গিয়েই দাঁড়াবেন—আমার এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" শ্রোত্রীবৃন্দ তাঁহার এই মনোরম মন্তব্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কারণ ইহার মধ্যে এমন একটা সত্যদৃষ্টি ছিল যাহা মাতৃহৃদয়ের স্নেহের সহিত সুনিবিড় পরিচয় দিতেছিল, অথচ সব হৃদয়গুলিকেই অধিকতর স্বার্থত্যাগের আদর্শাভিমুখে সবলে আকর্ষণ করিতেছিল। তাঁহার এই অপূর্ব গুণাবলীর—তাঁহার ব্যক্তিত্বের অসীম আকর্ষণ, তাঁহার সহজ সরল উক্তি, তাঁহার প্রাঞ্জলতা, তাঁহার অভ্রান্ত দৃষ্টি—এই সকল মিলিয়া তাঁহার বাক্যাবলীকে অপূর্ব শক্তিসমন্বিত ও দুর্নিবার করিয়া তুলিত; শ্রোতার মনে উহা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত এবং বক্তা ও শ্রোতাকে এক চিরস্থায়ী বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত করিত। দেশ, কাল বা পাত্রের বিভেদ-স্থলেও এই প্রভাবের ব্যতিক্রম হইত না। এই জন্যই তিনি দেশ-বিদেশে অতি একনিষ্ঠ ও অকপট ধর্মপ্রাণ বহু শিষ্য ও বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। আর এই সর্বজনীন প্রভাবের কারণও ছিল যথেষ্ট। কেননা তুলনামূলক দৃষ্টি অবলম্বনে তিনি যেভাবে জগতের ধর্মগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের উৎকর্ষাদি সুস্পষ্ট-রূপে দেখাইয়া দিতেন, তাঁহার বাণীতে যে সার্বভৌম প্রেম, উদার মনোভাব এবং বিদ্যাবত্তা ও সুসংস্কৃতির পরিচয় ফুটিয়া উঠিত, তাঁহার প্রচারিত ভাবরাশিতে যে অভিনবত্ব প্রকটিত হইত, তাঁহার মৌলিক চিন্তা যেভাবে নৈতিকতার ভিত্তি নবীনভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিত, আর যেরূপ প্রাণঢালা ভালবাসা লইয়া তিনি সকলের সহিত ভাবের আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন—তাহাতে এইরূপ হওয়াই ছিল খুব স্বাভাবিক। অনেক দিক হইতেই স্বামীজীর বার্তা ছিল একাধারে

অভিনব ও প্রাণপ্রদ। আর এই সমস্তের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিল তাঁহার আত্মিক বল, বীর্য ও অভীঃ।

স্বামীজীর মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, তাঁহার এই প্রথম ইংলণ্ডে আগমনের ফলে সেখানে বেদান্তের ভিত্তি এমন দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে যে কোন দিন তিনি উহার উপর বিশাল স্থায়ী সৌধ নির্মাণ করিতে পারিবেন। প্রথম যখন তিনি ইংলণ্ডে আসার কথা ভাবিতেন, তখন শুধু পরীক্ষা হিসাবে সেখানকার লোকের মনোভাব নিরীক্ষণের অধিক আশা পোষণ করিতেন না। কিন্তু সেখানে আসিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ আগমন শুধু পর্যবেক্ষণ নহে, প্রত্যুত তিনি প্রকৃত মূল্যবান কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন এবং উহা আশাতীতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সংবাদপত্রসমূহ তাঁহার চিন্তাগুলিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া জনসাধারণের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিল; মহানগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বহু গৃহে ও ক্লাবে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং ধর্মযাজকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় অনেকেও তাঁহাকে বন্ধুভাবে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংরেজ নরনারী সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববর্তী ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আমেরিকাতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন জনসমাজ তাঁহার চিন্তারাশিকে ঝটিতি সোৎসাহে গ্রহণ করে; কিন্তু ইংলণ্ডে তিনি দেখিলেন তাহারা যদিও নূতন বার্তাটি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে ও ঐ চিন্তাধারার প্রশংসা করিতে ততটা তৎপর নহে এবং স্বভাবতঃই যদিও তাহারা অধিকতর রক্ষণশীল, তথাপি সত্যসত্যই কোন আচার্যের গুণে মুগ্ধ হইলে এবং তাঁহার উপদেশের মূল্য বুঝিতে পারিলে তাহারা একবার যাহা ধরে, তাহা সহজে ছাড়ে না। স্বামীজীর সর্বদাই বিশ্বাস ছিল যে, ভারত রাজনীতি-ক্ষেত্রে বহুবার পরাধীন হইলেও যুগেযুগে তাহার অধ্যাত্মবাণী বিজেতাকে বিমোহিত করিয়াছে এবং বিজেতারই শক্তি অবলম্বনে উহা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত হইয়াছে। তাৎকালিক জগতে সর্বাধিক শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ইংরেজ-জাতির মনে ভারতীয় ভাবরাশির প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক স্বামীজীর দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আকররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। স্বামীজীর ঐ সময়ের পত্রাবলীতে এই সকল কথার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্তা লেগেটকে তিনি অক্টোবর মাসে লিখিয়াছিলেন, "এখানে ইংরেজরা

খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। কতিপয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যতিরেকে কেউ কালা আদমীদের ঘৃণা করে না। এমন কি রাস্তায় আমাকে লক্ষ্য ক'রে কেউ কোন ব্যঙ্গরব করে না।...আবার যে-সকল ইংরেজ পুরুষ এবং নারী ভারতবর্ষকে ভালবাসে, তারা হিন্দুদের চেয়েও বেশী 'হিন্দু'। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে, এখানে আমি নিখুঁত ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রচুর তরিতরকারি পাচ্ছি। যখন একজন ইংরেজ একটি জিনিস ধরে, সে তখন তার গভীরতম দেশে প্রবেশ করে।" ('বাণী ও রচনা', ৭।১৬৫)। ২০শে অক্টোবর তিনি শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, "এক হিসাবে এদেশ আমার মাতৃভূমি, সুতরাং পূর্বেই তোমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।" ২৪শে অক্টোবরের পত্রে (আলাসিঙ্গাকে) আছে, "এ পর্যন্ত দেখছ, ইংলণ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে।" ১৮ই নভেম্বরের পত্রে আছে, "ইংলণ্ডে আমার কাজ বাস্তবিক খুব চমৎকার হয়েছে; আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। ইংরেজরা খবরের কাগজে বেশী বকে না, কিন্তু নীরবে কাজ করে। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। দলে দলে লোক আসছে, কিন্তু এত লোকের জন্য তো আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও অন্যান্য সকলেই মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা করতে বলি যে, তারা যেন ভারতীয় আকাশের তলে শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত একটি বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে—তারা অবশ্য এ ভাবটা পছন্দই করে।" ১৩ই নভেম্বরের পত্রে (স্বামী অখণ্ডানন্দকে) আছে, "এদেশে সকল কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজবাচ্ছা কোনও কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চটপটে, কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুনের মতো।"

আলাসিঙ্গাকে লিখিত তাঁহার ২৪শে অক্টোবরের পত্রে জানা যায়: "আগামী মঙ্গলবার লণ্ডনে গিয়ে ৮০ ওকলি স্ট্রীট, চেলসী, লণ্ডন, এস. ডব্লিউ—ঠিকানায় একমাস থাকব।" রিডিং ছাড়িয়া অতঃপর তিনি ঐ বাড়িতেই সৎপ্রসঙ্গাদি চালাইতেন; ঐ ঠিকানা হইতে লিখিত কয়েকখানি চিঠি 'বাণী ও রচনা'তে স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ কাজের সুবিধার জন্য এই স্থানপরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছিল।

পত্রাবলী হইতে স্বামীজীর লণ্ডনের কার্যের যে কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ: সেপ্টেম্বর মাসে স্টার্ডির বাটীতে অবস্থানকালে স্বামীজী

জনসাধারণের জন্য বিশেষ কোন কার্য না করিয়া স্টার্ডিকে সংস্কৃত-চর্চায় ও নারদীয় ভক্তিসূত্রের ইংরেজী অনুবাদে সাহায্য করেন। তাছাড়া স্বয়ং শাস্ত্র-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। তিনি শ্রীযুক্তা বুলকে ২৪শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন, "মিঃ স্টার্ডিকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্যন্ত আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করিনি।" আর শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, "বন্ধুটি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। সুতরাং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যদের ভাষ্যপাঠে আমরা সর্বদা নিযুক্ত আছি। এখানে এখন কেবল ধর্ম ও দর্শন চলেছে।" শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত ৬ই অক্টোবরের পত্রেও আছে, "আমি মিঃ স্টার্ডির সহিত 'ভক্তি' সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ করিতেছি, প্রচুর টীকা সমেত উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।" তাঁহার পরবর্তীকালের বক্তৃতাদি সম্বন্ধে জানা যায়, "লণ্ডনে ও লণ্ডনের কাছেপিঠে কয়েকটি বক্তৃতা দেবো; ২২ তারিখে (অক্টোবর) সাড়ে আটটার সময় প্রিন্সেস হলে দেবো সাধারণের জন্য একটি" (ম্যাকলাউডকে লিখিত অক্টোবরের চিঠি)। "এই মাসে আমাকে লণ্ডনে দুইটি এবং মেডেন-হেডে একটি বক্তৃতা দিতে হইবে। ইহাতে কতকগুলি ক্লাস খুলিবার ও পারিবারিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইবার সুবিধা হইবে" (৬ই অক্টোবরের পত্র)। "মিঃ চেমিয়ারের ওখানে যে ক্লাস হ'ত তা শেষ হ'ল। আগামী শনিবার রাত্রি থেকে আমার বাসাতেই হবে। আমার ক্লাসের জন্য দু-একখানা চলনসই বড় ঘর পাব, আশা করি। মনকিওর কনওয়ের নৈতিক সমিতির নিমন্ত্রণে ১০ই তারিখে তাদের ওখানে বক্তৃতা দেবো। আগামী মঙ্গলবার ব্যাল্‌বোয়া সমিতিতে বক্তৃতা" (৩১শে অক্টোবরের পত্র—ম্যাকলাউডকে)। "ব্যালেরেন সোসাইটির টিকিটের সংখ্যা ৩৫। বিষয় হ'ল—'ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ', সভাপতির স্থান শূন্য" (১লা নভেম্বরের চিঠি—স্টার্ডিকে)।

অবশ্য ইহা তাঁহার কার্যের অতি অসম্পূর্ণ তালিকা; সম্পূর্ণ তালিকা নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘতর ছিল। মোটের উপর এই সময় তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন ও তাহার ফলে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। স্টার্ডির বাড়ি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি নিজেই পত্রযোগে জানাইয়াছিলেন, "আমার এই ঘুরে ঘুরে লেকচার ক'রে শরীর অত্যন্ত nervous (স্নায়ুপ্রধান) হয়ে পড়ছে—প্রায় ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একলা। দেশের লোকের কথা কি বলো? কেউ না একটা পয়সা দিয়ে এ-পর্যন্ত সহায়তা করেছে,

না একজন সাহায্য করতে এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহায্য চায়—এবং যত কর ততই চায়। তারপর যদি আর না পারো তো তুমি চোর!" ('বাণী ও রচনা', ৭।১৭৪)। নিষ্কামভাবে কলিকাতার বন্ধুবান্ধবকে ও মাদ্রাজের কাজে তিনি অর্থসাহায্য পাঠাইতেন, 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন ও অন্য প্রকারে সাহায্য বরাবরই করিতেন। কিন্তু ইংলণ্ডে আমেরিকার মতো অর্থসাচ্ছল্য ছিল না। তাঁহার পত্রেই প্রকাশ, সঞ্চিত অর্থে ও স্টার্ডির আনুকূল্যে লণ্ডনের কার্য চালাইয়া অবশেষে আমেরিকায় ফিরিয়া যাইবার মতো অর্থ মাত্র অবশিষ্ট ছিল; কারণ ইংলণ্ডের শ্রোতারা আগ্রহবান হইলেও তেমন দাতা ছিলেন না। স্বীয় পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হ'লে সে এতদিনে রক্ত বমি ক'রে মরে যেত।" ('বাণী ও রচনা', ৭।১৭৯)।

স্বাস্থ্যভঙ্গের বা সংকার্যার্থ উপযুক্ত অর্থাভাবের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রায় তিন মাস শ্রমের পর স্বামীজীর সন্তোষলাভের যথেষ্ট কারণ ছিল, ইহা স্বামীজীর নিজের কথা ভিন্ন অন্য সূত্রেও জানা যায়। স্বামীজীর ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন এইরূপ এক ব্যক্তি এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, "লণ্ডনের বিশিষ্ট পরিবারের কোন কোন ভদ্রমহিলা চেয়ারের অভাবে আসন-পিঁড়ি হইয়া মেঝেতে বসিয়া গুরুর প্রতি ভারতীয় চেলাদের সদৃশ পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া উপদেশ শুনিতেছেন, এরূপ দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। ইংরেজী-ভাষা-ভাষী জাতির হৃদয়ে স্বামীজী ভারতের জন্য যে ভালবাসা ও সহানুভূতি উদ্দীপিত করিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই ভারতের উন্নতির পক্ষে একটি সুদৃঢ় সমুন্নত স্তম্ভের সদৃশ হইয়া উঠিবে।"

শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডি 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রে লিখিয়াছিলেন: "স্বামী বিবেকানন্দের ইংলণ্ডে আগমনের ফলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঠিক ঠিক খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে এবং তাঁহাদের নিকট শুধু উপস্থিত হইলেই দেখা যাইবে যে, এই দেশেও চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত এমন একদল লোক আছেন যাঁহারা ভারতের প্রাণপ্রদ চিন্তাধারার সাহায্যে সবিশেষ উপকৃত হইতে প্রস্তুত।...আবার এদেশে স্বামীজী যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছেন, গির্জার বেদী হইতে উচ্চারিত কোন কোন ভাষণে যখন তাহার উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহা হইতেও ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, যেসকল উদারচিত্ত পাশ্চাত্ত্য ধর্মযাজক খোলা মনে তাঁহার সহিত মিশিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহারই

সাহায্যে বিশুদ্ধ বৈদান্তিক তত্ত্বসমূহকে কিরূপে স্বধর্ম ব্যাখ্যাকল্পে প্রয়োগ করা চলে তাহার উপায় শিখিতে পারিয়াছিলেন।...স্বামী বিবেকানন্দ যে-সব ক্লাস করিতেন তাহাতে ইংরেজ-সমাজের বিবিধ স্তরের বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হইতেন। ইহাদের অধিকাংশই এই দৃঢ় ধারণা লইয়া ফিরিতেন যে, আচার্য হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।...তিনি আমাদের এই দ্বীপে আসিয়াছিলেন এমন একজন যোগিরূপে, যাঁহার হৃদয় ছিল প্রেমে পূর্ণ এবং স্মৃতি ছিল বহু যুগের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ।"

ইংলণ্ডের কার্যের সাফল্য স্বামীজী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনার গভীর আশাও পোষণ করিতেন। লোকচিত্তে তাঁহার বার্তা স্থায়ী আসন পাতিয়াছিল, স্টার্ডির ন্যায় কর্মী তিনি লাভ করিয়াছিলেন, নিবেদিতার মতো কর্মীর আগমনের পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন এবং ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজ সেনানায়কদের মধ্যে বেদান্তের প্রতি অনুরাগ দর্শনে ভারতীয় কার্যে অধিকতর সাহায্য লাভের আশার আলোক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তবু তিনি জানিতেন যে, আমেরিকায় আরব্ধ কার্যে অবহেলা করিয়া তখনই দীর্ঘ কালের জন্য অন্যত্র অবস্থানের কথা ভাবা যায় না। ইংলণ্ডে থাকাকালেও আমেরিকায় প্রত্যাবর্তনের জন্য তাগিদ আসিতেছিল। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া স্বামীজী স্থির করিয়াছিলেন, ভারত হইতে আর একজন সন্ন্যাসীকে আনাইয়া ইংলণ্ডের কার্য তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্বক তিনি স্বয়ং আমেরিকায় ফিরিয়া যাইবেন। শ্রীযুক্ত স্টার্ডিও এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন ; ইংলণ্ডে এমন সুন্দরভাবে যে কার্যের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে, এমন কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখাপেক্ষী ছিলেন ; আর তিনি জানিতেন যে, স্বামীজীর পক্ষে দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে থাকা সম্ভব হইবে না। অতএব নিজের বিবেচনানুসারে এবং স্টার্ডির অনুরোধে স্বামীজী ভারতে গুরুভ্রাতাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা যেন অবিলম্বে একজন উপযুক্ত সন্ন্যাসীকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে কৃতবিদ্য ত্যাগী ও শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরাগী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অগত্যা রামকৃষ্ণানন্দজীর আগমন অসম্ভব হইলে স্বামী সারদানন্দ বা স্বামী অভেদানন্দকে পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আগমন তখন অসম্ভব ছিল,

কারণ তিনি তখন দারুণ চর্মরোগে ভুগিতেছিলেন। অপর দুইজনেরও বোধ হয় কোনও কারণে তখনই যাত্রা করা সম্ভব হয় নাই। অতএব আলমবাজার মঠ হইতে অপর দুই-একজনের নাম প্রস্তাবিত হইল; কিন্তু স্বামীজীর তাহা মনঃপূত হইল না—তিনি পুনর্বার পূর্বের ব্যক্তিদিগের কাহাকেও পাইবার আকাঙ্ক্ষাই জানাইলেন, এমন কি আসার ব্যয় বাবদ কিছু টাকাও পাঠাইলেন ও কিভাবে আসিতে হইবে, কিরূপ পোষাক পরিতে হইবে ইত্যাদি লিখিয়া পাঠাইলেন। তথাপি স্বামীজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্বে কেহই আসিলেন না। এই অবস্থায় হতাশ হইয়া তিনি এক সময়ে মাদ্রাজ হইতে স্বশিষ্য কাহাকেও আনাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে জানিতে পারা যায়, ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ণ দুই মাস এইভাবে চেষ্টা করিয়া এই বিষয়ে প্রায় বিফলকাম হইয়াই তিনি ২৭শে নভেম্বর বুধবার 'ব্রিটানিক' জাহাজে আমেরিকা রওনা হইলেন।

অবশ্য নূতন সন্ন্যাসী না আসিলেও স্বামীজীর অবর্তমানে ইংলণ্ডের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হইল না; কারণ শ্রীযুক্ত স্টার্ডির পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধেই আছে: "তিনি যখন আমেরিকায় ফিরিয়া গেলেন, তখন এইভাবে যে প্রারম্ভিক কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ভগবদ্গীতা এবং ঐ জাতীয় বিষয় অধ্যয়নের জন্য ক্লাস আরম্ভ হইল।...এই ক্লাসগুলি এখনও চলিতেছে।...এই জন্য কোন পরিচয়পত্রাদির প্রয়োজন নাই।...কোন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই, হইবেও না। আর ইহার সহিত অর্থপ্রদানেরও কোন সম্পর্ক নাই।" বলা বাহুল্য, এই কার্যপরিচালনার প্রধান দায়িত্ব স্টার্ডির স্কন্ধেই ন্যস্ত ছিল।

মোটের উপর ইংলণ্ডের কাজে পূর্ণ সন্তোষ ও ভবিষ্যতে ফিরিয়া অধিকতর কার্য করার আকাঙ্ক্ষা লইয়া স্বামীজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাজের যে তুলামূলক লিপি তিনি জাহাজে বসিয়া ৫ই ডিসেম্বর কুমারী এলবার্টাকে লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই কথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পত্রে আছে, "এলবার্টা, তোমাদের দেশে (আমেরিকায়) বৈদান্তিক চিন্তাধারা প্রথমে অজ্ঞ 'বাতিকগ্রস্ত' ব্যক্তিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাজের পথ তৈরী ক'রে নিতে হয়। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, আমেরিকায় আমার ক্লাসগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর নরনারী কখন কখন যোগ দিয়েছেন, তাও মুষ্টিমেয়। আবার আমেরিকায়

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ধনী হবার ফলে তাদের সমস্ত সময় ঐশ্বর্য সম্ভোগ করতে ও ইওরোপীয়দের অনুকরণ (বোকার মতো ?) করতে করতে কাটে। অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে বৈদান্তিক মতবাদ দেশের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বহু লোক আছেন, যাঁরা বিশেষ চিন্তাশীল। তুমি শুনে অবাক হবে, এখানে আমি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত পেয়েছিলাম এবং বিশ্বাস করি যে, আমার কাজ আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী সফল হবে।… ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমার মত অনেকখানি পালটে গিয়েছে এবং আমি সানন্দে তা স্বীকার করি।" আর শ্রীযুক্তা বুলকে তিনি ৮ই ডিসেম্বর জানাইলেন, "ইংলণ্ডে আমি জন কয়েক বন্ধু রেখে এসেছি। আগামী গ্রীষ্মে ফিরে যাব, এই আশায় তাঁরা আমার অনুপস্থিতিকালে কাজ করবেন।"

স্থায়ী কার্যপ্রতিষ্ঠা

স্বামীজী ৬ই ডিসেম্বর (১৮৯৫) শুক্রবারে নিউ ইয়র্কে পৌছিলেন। কিন্তু এই যাত্রাটি তাঁহার নিকট মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না; সমুদ্রবক্ষ ছিল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ এবং ইহাতে তাঁহার কয়েকদিবসব্যাপী সমুদ্রপীড়াও হইয়াছিল। আবার নিউ ইয়র্কে পৌছিবার পূর্বে ঘন কুয়াসার জন্য বহুক্ষণ জাহাজকে সমুদ্রমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল; কারণ কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তাই ৮ই ডিসেম্বরের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "দশদিন অতি বিরক্তিকর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এখানে পৌছেছি। সমুদ্র ভয়ানক বিক্ষুব্ধ ছিল এবং জীবনে এই সর্বপ্রথম আমি 'সমুদ্রপীড়ায়' (সী সিকনেস) অতিশয় কষ্ট পেয়েছি।"

নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া তিনি ২২৮ ওয়েস্ট ৩৯ নং স্ট্রীট-এর বাড়িতে উঠিলেন। বন্ধুগণ এ বাড়িতেই তাঁহার বাসের জন্য দুইখানি বড় ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামী কৃপানন্দও তাঁহার সহিত সেই বাড়িতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘর দুইখানি ছিল দোতলায় অবস্থিত—সম্মুখের খানি রাস্তার উপরে এবং অপরখানি তাহার পশ্চাতে। প্রথমে স্বামীজী ও কৃপানন্দ দুই বিভিন্ন কামরাতে থাকিতেন; কিন্তু পরে কার্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাগম আরম্ভ হইলে কৃপানন্দ ঐ বাড়ির উচ্চতম তলায় একখানি ঘরে চলিয়া গেলেন, আর স্বামীজী পশ্চাতের ঘরখানিকে শয়নকক্ষ ও সম্মুখের খানিকে ক্লাস ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অবশ্য লোকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে উভয় ঘরেই তাহারা বসিত।

আমরা জানি, স্বামীজী নিরিবিলি কাজ করার দিকেই ঝুঁকিতেছিলেন এবং অর্থের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এইদিকে আরও বেশি ঝুঁকিলেন। ইহার প্রস্তুতিস্বরূপ ৮ই ডিসেম্বর তিনি শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিলেন, "সাধারণের কাছে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দেওয়াটা আমি একেবারে ছেড়ে দেব স্থির করেছি; কারণ আমি দেখছি, আমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে—প্রকাশ্য বক্তৃতায় কিংবা ঘরোয়া ক্লাসে টাকাকড়ির একদম সংস্রব না রাখা। পরিণামে ওতে কাজের ক্ষতি হবে এবং খারাপ দৃষ্টান্ত

ইংলণ্ডে আমি ঐ ধারায় কার্য করেছি এবং লোকজন স্বেচ্ছায় দিতে এসেছিল, তাও ফেরত দিয়েছি।" ঐ পত্রেই তিনি জানিতে চাহিলেন, চিকাগো গিয়া "ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হবে কিনা" তাহা যেন শ্রীযুক্তা বুল তাঁহাকে জানান, "অবশ্য টাকাকড়ির ব্যাপার একদম বাদ দিতে হবে।"

স্বামীজী চিকাগো যাইবার কথা ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু যাওয়া হয় নাই; কারণ ৯ই ডিসেম্বর, সোমবার হইতেই তাঁহার নিউ ইয়র্কের ক্লাস আরম্ভ হইয়া গেল। বিরক্তিকর সমুদ্রযাত্রা ও সমুদ্র-রোগের পর মাত্র তিনটি দিন তিনি অবকাশ লইলেন। অবশ্য এই তিন দিনও বিশ্রাম অল্পই মিলিল; কারণ পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ইত্যাদিতেই ঐ অল্প সময় কাটিয়া গেল। ক্লাস-গুলির খবর ওলি বুলকে লিখিত স্বামী কৃপানন্দের (১০ই ডিসেম্বরের) এক পত্র হইতে জানা যায়: "স্বামীজী কাল সন্ধ্যায় একটি বক্তৃতা করিয়া তাঁহার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি যোগের বিবিধ প্রণালীর কথা বলিয়াছেন। তিনি যেন ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। ঘর দুইখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছিল; এবং মনে হয় আন্দোলনটি এই বৎসর বিশাল আকার ধারণ করিবে। এই সঙ্গে বিভিন্ন যোগের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলির তালিকা পাঠাইলাম।" ঐ তালিকাটি পাওয়া যায় নাই। তবু ইহা নিশ্চিত যে, ঐ সময়ে স্বামীজী কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই যোগত্রয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদ্ সম্বন্ধেও ক্লাস করিতেন। কৃপানন্দের আর একখানি পত্র হইতে বক্তৃতার কয়েকটি বিষয়ের নাম পাওয়া যায়—'প্রাণ ও উহার পরবর্তী বিকার', 'মন: উহার ক্রিয়া ও সংযম', 'প্রধান যোগ-সাধনগুলি', 'উপনিষদ্'। এই অসম্পূর্ণ তালিকা দেখিলেও মনে হয়, স্বামীজী অল্প সময়ে অধিক পরিশ্রম করিয়া যেন তাঁহার বাণীর একটা নিষ্কর্ষ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই উদ্দেশ্য অনুসারে ১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২৩শে ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত তিনি দিনে দুইবার ক্লাস করিতেন, রবিবারও বাদ পড়িত না, এমন কি বড়দিনের প্রাক্‌সন্ধ্যায়ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ক্লাস করিয়া তবে রিজলী ম্যানর-এ লেগেটদের গৃহে অল্পদিনের জন্য বেড়াইতে ও বিশ্রাম লইতে গিয়াছিলেন। পর বৎসর (১৮৯৬) জানুআরির প্রথম সপ্তাহেই তাঁহার বক্তৃতাবলী আরম্ভ হয়, ক্লাসও চলিতে থাকে। সকালে এগারটায় ক্লাসে এমন সব পুরাতন ছাত্রছাত্রীরা

আসিতেন যাঁহারা পূর্বেই অনেকটা শিখিয়াছিলেন ; আর স[illegible]
আসিতেন নবাগন্তুকরা।

স্বামীজী যে বাড়িতে থাকিতেন, উহার একতলায় ছিল রা[illegible]
ভাড়াটিয়া সকলেই সেখানে রান্না করিত। ফলে ঘরের জিনিসপত্র বড় অ[illegible]
ছিল, রান্নাও তেমন রুচিকর হইত না। অতএব স্বামীজীর অনুরোধে তাঁহার ছাত্রী শ্রীমতী সারা এলেন ওয়াল্ডোকে রন্ধনের দায়িত্ব লইতে হইল। ভগিনী দেবমাতার স্মৃতিকথা হইতে ঐ কালের কিছু কিছু ঘটনা জানিতে পারা যায়। দেবমাতার পূর্ব নাম ছিল কুমারী লরা গ্লেন। তিনি স্বামীজীর ক্লাসেরই মাধ্যমে ওয়াল্ডোর (হরিদাসীর) সহিত পরিচিত হন এবং ওয়াল্ডোর মুখে ঐ সব প্রাচীন দিনের কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করেন। মনে রাখিতে হইবে, পূর্ববারে স্বামীজী ৩৩নং রাস্তার বাড়িতে ছিলেন, এবারে ৩৯ নম্বরে (দেবমাতা যদিও ৩৮ বলিয়াছেন)। দ্বিতীয় বাড়ি অপেক্ষাকৃত ভদ্রপাড়ায় হইলেও উহাকে খুব সম্ভ্রান্ত বলা চলে না। দেবমাতা এই দ্বিতীয় পল্লীকেও তাই দরিদ্রপল্লী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। দেবমাতা স্বামীজীর অনুরক্ত এবং তাঁহার ক্লাসের নিয়মিত ছাত্রী হইলেও কোন কারণে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ করিতে পারেন নাই। হয়তো তাঁহার ভগিনীর বিরোধই ইহার কারণ ছিল। ওয়াল্ডো ও স্বামীজীর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

"স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের বক্তৃতা ও ক্লাসগুলিতে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা অচিরে এমন এক দীর্ঘকায়া, মর্যাদাশালিনী নারীমূর্তির সহিত পরিচিত হইয়া পড়িতেন, যিনি সর্বকার্যে ব্যস্ত থাকিয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, ইনি দর্শন ও অন্যান্য সাধারণ সাংস্কৃতিক বিষয়ে সুশিক্ষিতা কুমারী এলেন ওয়াল্ডো এবং ইনি রাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সনের দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া। স্বামীজী তাঁহার নাম দিয়াছিলেন 'হরিদাসী'। আর নামটি ছিল খুব মানানসই—কারণ ইহা জানাই ছিল যে, তিনি ভগবৎকার্যে উৎসর্গিতপ্রাণা ; তাঁহার সেবা ছিল অবিরাম ও অক্লান্ত। তিনি (স্বামীজীর জন্য) রাঁধিতেন, গ্রন্থ-সম্পাদনের কার্য করিতেন, গৃহাদি পরিষ্কার রাখিতেন, শ্রুতিলেখিকার কাজ করিতেন, অপরকে শিখাইতেন ও চালাইতেন, বই-এর প্রুফ দেখিতেন ও অভ্যাগতদের সহিত আলাপ করিতেন।"

স্বামীজী নিউ ইয়র্কে আসিয়া বর্ণবিদ্বেষের ফলে উপযুক্ত পল্লীতে উপযুক্ত

পাইয়া অবহেলিত পল্লীতে বাড়ি ভাড়া লইতে বাধ্য হন। বা যেরূপ লোকের সান্নিধ্যলাভ বাঞ্ছিত ছিল, তাহার কোনটিই ইলেন না। ঐ দরিদ্র পল্লীর অপরিচ্ছন্ন বাসগৃহগুলির একটিতে একরাত্রি যাপনের পর তিনি কুমারী ওয়াল্ডোকে বলিলেন, 'এখানকার খাদ্য বড় অপরিষ্কার দেখায়; তুমি আমায় রেঁধে দিতে পার?' ওয়াল্ডো তখনই গৃহস্বামিনীর নিকট যাইয়া রান্নাঘর ব্যবহারের অনুমতি লইয়া আসিলেন; তারপর নিজেরই ভাণ্ডার হইতে রান্নার বাসনপত্র ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিলেন এবং পরদিন সকালে ঐসব সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তাঁহার বাসস্থান ছিল ব্রুকলিনের অপর প্রান্তে। পথ চলার একমাত্র বাহন ছিল মন্থরগামী ঘোড়ার গাড়ি এবং নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর বাসস্থান ৩৮নং (৩৯নং) স্ট্রীটে আসিতে দুই ঘণ্টা লাগিত। ইহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ওয়াল্ডো সকালে আটটায় কিংবা তারও আগে পথে নামিতেন এবং রাত্রি নয়টা-দশটায় বাড়ির পথ ধরিতেন। ছুটির দিনে বিপরীত ব্যবস্থা হইত—এবারে স্বামীজীই ছ্যাকরা গাড়ি ধরিতেন, দুই ঘণ্টা পথ চলিতেন এবং রাঁধিতেন। কুমারী ওয়াল্ডোর সাদাসিধা বাড়ির নীরবতা ও স্বাধীনতার মধ্যে তিনি আরাম ও বিশ্রাম পাইতেন। (ওয়াল্ডোর) রান্নাঘরটি ছিল বাড়ির সর্বোচ্চ তলায়; তাহার সম্মুখে ছিল খাবার ঘর—সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল ও গামলায় বসানো চারাগাছে পূর্ণ। নূতন নূতন খাদ্য প্রস্তুতে ব্যস্ত, কিংবা পাশ্চাত্ত্য খাদ্য লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত স্বামীজী ক্রীড়ারত বালকের ন্যায় ব্যস্তসমস্তভাবে এঘর-ওঘর করিতে থাকিতেন। কুমারী ওয়াল্ডো আমাকে পরে বলিয়াছিলেন, 'এমন নিবিড় মেলামেশার মধ্যেও আমার মনে যে একবারও সংসারত্যাগের কথা উঠে নাই, ইহা খুবই আশ্চর্য। তাঁহার সঙ্গে ভারতে যাইবার কথাও আমি কখনও আন্তরিকভাবে ভাবি নাই। আমার মনে হইত, আমার স্থান আমেরিকায়; অথচ আমি তাঁহার জন্য করিতে পারিতাম না, এমন কিছুই ছিল না। তিনি যখন প্রথম নিউ ইয়র্কে আসিলেন, তখন তিনি সর্বত্রই তাঁহার কমলা রং-এর আলখাল্লা পরিয়া থাকিতে চাহিতেন। ব্রডওয়ের উপর এমন আগুনের মতো উজ্জ্বল কোটের পাশে পাশে চলিতে বেশ একটু সাহসের প্রয়োজন হইত। স্বামীজী যখন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজোচিত ভঙ্গীতে দীর্ঘপদবিক্ষেপে আমার পুরোভাগে চলিতে থাকিতেন, আর আমি হাঁফাইতে হাঁফাইতে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করিতাম, তখন

সকলেই আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করিত, "এরা আবার কারা ?" পরে আমি তাঁহাকে বলিয়া-কহিয়া আরও ফিকে রঙ-এর কোট ব্যবহার করিতে রাজী করাইয়াছিলাম।'

"একদিন সকালে স্বামীজী দেখিলেন কুমারী ওয়াল্ডোর চক্ষে জল। তিনি উদ্বেগ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হলো, এলেন ? কোন কিছু ঘটেছে কি ?' ওয়াল্ডো বলিলেন, 'মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে কিছুতেই তুষ্ট করতে পারছি না। অপরে আপনার বিরক্তি ঘটালেও আপনি বকবেন আমাকেই।' স্বামীজী অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ওসব লোককে তেমন ভাল রকম জানিই না যে, তাদের বকব ; তাদের বকতে না পেরে আমি তোমার কাছেই আসি। নিজের লোককেই যদি না বকতে পারি, তাহলে বকব কাকে ?' সঙ্গে সঙ্গে ওয়াল্ডোর অশ্রু শুকাইয়া গেল এবং অতঃপর তিনি গালাগালিই খুঁজিয়া বেড়াইতেন, কারণ উহা ছিল নৈকট্যের নিদর্শন। কুমারী ওয়াল্ডো নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ইহা তাঁহারই জীবনের ঘটনা, রোমাঁ রোলাঁর মতে যদিও উহা অপর এক শিষ্যের জীবনের ঘটনা। অবশ্য এরূপ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হওয়া খুবই সম্ভব।

"শিক্ষকদের সম্বন্ধে কুমারী ওয়াল্ডোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। স্বীয় সুদীর্ঘ জ্ঞানান্বেষণ ব্যপদেশে তিনি অনেকেরই পদতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন ; কিন্তু দুই-চারিদিন আগে বা পরেই হউক, তিনি দেখিতেন, সকলেরই প্রকৃতিতে ত্রুটি আছে। তাঁহার মনে সতত ভয় হইত, পাছে এই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রকৃতিতেও ঐরূপ ত্রুটি ধরা পড়িয়া যায়। এইরূপ দুর্বলতার চিহ্ন ধরা পড়ে কিনা এই বিষয়ে তিনি খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। সে চিহ্ন ধরাও পড়িল। সেদিন স্বামীজী ও তিনি নিউ ইয়র্কের এক বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর সময়ের নিউ ইয়র্কের সহিত বর্তমান নিউ ইয়র্কের কোন মিল নাই। তখনকার দিনে রাস্তার দুইধারে ছিল সারি সারি বাদামী পাথরের তৈরী একই রকমের সব বাড়ি। বাড়িগুলির চেহারা এতই একঘেয়ে ছিল যে, এক প্রসিদ্ধ চিত্রকর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনারা কি করে টের পান যে, নিজের বাড়িতে এসেছেন ? ভুলে তো প্রতিবেশীর বাড়িতেও ঢুকে পড়তে পারেন ?' এই অপ্রশস্ত, অথচ রাস্তার দিক হইতে দৈর্ঘ্যে অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা প্রত্যেকটি বাড়ির দ্বিতলে একটি করিয়া সরু ও দীর্ঘ বৈঠকখানা থাকিত ; উহার এক প্রান্তে ভাঁজ করা চার পাল্লার

দরজা, অপর প্রান্তে দুইটি বড় জানালা এবং তাহাদের মধ্যস্থলে মেঝে হইতে সিলিং পর্যন্ত উঁচু একখানি প্রকাণ্ড আয়না থাকিত। এই আয়নার দিকে যেন স্বামীজীর একটু ঝোঁক দেখা গেল। তিনি বার বার উহার সামনে দাঁড়াইয়া মন দিয়া নিজের চেহারা দেখিতে লাগিলেন, আর মাঝে মাঝে চিন্তামগ্নভাবে ঘরখানির এ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বেড়াইতে থাকিলেন। কুমারী ওয়াল্ডো উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে থাকিলেন—'এইবারে বুঝি বা চিচিং-ফাঁক!' তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি তো আপন অহঙ্কারে মত্ত!' অকস্মাৎ স্বামীজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এলেন, এ যে দেখছি সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমি আমার নিজের চেহারা মনে করে রাখতে পারি না! আমি আর্শীতে এত করে নিজেকে দেখে নিচ্ছি, কিন্তু যে মুহূর্তে মুখ ফিরাই অমনি ভুলে যাই যে, আমাকে কেমন দেখায়!'

"স্বামীজীর এই প্রথমবার আমেরিকা-পরিভ্রমণকালে রাজযোগ গ্রন্থখানি গড়িয়া উঠে। ইহার অধিকাংশ তিনি মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছিলেন, আর কুমারী ওয়াল্ডো লিখিয়া লইয়াছিলেন। ওয়াল্ডো সাংকেতিক-লেখিকা ছিলেন না, সাধারণ ভাবেই লিখিয়াছিলেন। ঐ কার্যে ব্যয়িত মনোরম সময়টির স্মৃতি তাঁহার নিকট বড়ই মধুময় ছিল; তিনি প্রায়ই ঐসব দিনের কথা বলিতেন। স্বামীজীর খাদ্য প্রস্তুত হইয়া গেলে রান্নাঘরের কাজ শেষ করিয়া প্রতিদিন তিনি বাড়ির পশ্চাদ্ভাগে স্বামীজীর বাসকক্ষে আসিতেন এবং টেবিলের কাছে বসিয়া উহার উপরের দোয়াতে কলম ডুবাইতেন। তখন হইতে সেইদিনের মতো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কলম ভিজাইয়াই রাখিতেন, যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে স্বামীজীর যে বাক্যস্রোত চলিতে থাকিত, তাহার প্রারম্ভেই তিনি কলম ধরিতে পারেন। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের কোন শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ ঠিক করিবার জন্য স্বামীজী পনর-কুড়ি মিনিট সমাহিতমনে বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু তবু কলম শুকাইতে দেওয়া হইত না—বলিয়া যাওয়ার তোড় তো যে-কোন মুহূর্তেই আরম্ভ হইতে পারিত! পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া গেলে উহার মুদ্রণের দায়িত্ব কুমারী ওয়াল্ডোর হস্তে অর্পিত হইল। কিন্তু পুস্তক প্রকাশের পূর্বে তাঁহাকে বহু ক্লেশ ও মর্মপীড়ার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। স্বামীজীর আর একজন বিশিষ্ট অনুরাগী পাণ্ডুলিপিটি ধার করিয়া লণ্ডনে লইয়া যান এবং সেখানে উহা প্রকাশ করেন; কারণ ঐ ব্যক্তির ধারণা ছিল, লণ্ডনে উহা প্রকাশিত

হইলে স্বামীজীরই সুবিধা হইবে। ইহার ফলে তখনকার মতো আমেরিকান সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হইল না। অপ্রচলিত শব্দের শব্দপঞ্জিকা ও অন্যান্য কিছু কিছু অংশ যোগ করার পরে উহা সম্ভব হইয়াছিল।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ')। এই বিষয়টি পরেও আলোচিত হইবে।

গৃহস্থালির ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যের দায়িত্ব ওয়াল্ডোর উপর ছাড়িয়া দিয়া স্বামীজী তাঁহার প্রকৃত কার্য বেদান্তপ্রচারে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার পুরাতন বন্ধুরা সমবেত হইলেন, নূতনও অনেকে আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান ও সাধারণ-বুদ্ধির মানুষ ; লেখক-লেখিকা, গায়ক-গায়িকা, উকিল, ডাক্তার, সমাজনেত্রী ইত্যাদি অনেকে। আমরা ইঁহাদের অনেকেরই সহিত পূর্বেই পরিচিত হইয়াছি—ওয়াল্ডো, লেগেট-দম্পতি, গুডইয়ার-দম্পতি, গার্নসী-দম্পতি, কৃপানন্দ, মেরী ফিলিপ্স, ডাঃ ওয়াইট, এমা থার্সবি ইত্যাদি। ক্রমে নূতনদের মধ্যে আসিলেন সাংকেতিক-লেখক গুডউইন, সাহিত্য-সেবিকা মেরী মেপ্‌স ডজ, কেট-ডগলাস উইগিন, ও এল্লা হুইলার উইলকক্স, আর গায়িকা অ্যান্টিয়নেট স্টার্লিং। সময়ে সময়ে বৈজ্ঞানিক নিকোলাস টেসলাকেও দেখা যাইত। ম্যাকলাউড তখন ইওরোপে, আর ওলি বুল কেম্ব্রিজে। প্রকোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যস্থলে বসিতেন স্বামীজী, আর উভয় পার্শ্বে শ্রোতৃবর্গ উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন প্রতিটি কথা শুনিবার জন্য।

এইবারে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া স্বামীজী যেন তাঁহার আরব্ধ কার্যকে একটি স্থায়ী রূপ দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রণালীতে ধাবিত হইল—একদল কর্মী গড়িয়া তোলা, পুস্তক প্রণয়ন, কার্যের বৈষয়িক ভার গ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান সংগঠন ইত্যাদি। সর্ববিষয়েই তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইলেন ; বন্ধুরাও বুঝিলেন, এইরূপ নববার্তাবহ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই। পূর্বে তাঁহারা সমাজের সহিত আপস করিয়া চলার পরামর্শ দিয়াছিলেন ; স্বামীজী তাহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অতিনিকট বন্ধুদেরও বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তথাপি ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে তাঁহার নিউ ইয়র্কের কাজ স্বাধীন পথেই চলিয়াছিল। এবারেও উহা সেই পথই ধরিল। ইংরেজী জীবনীতে আছে, বস্টনের জনৈকা ভদ্রমহিলা সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কোনও

কারণে পারেন নাই। স্বামীজী তথাপি মানুষ ও মানুষের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া দৈব-নির্দেশে স্বরচিত মার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই স্বাধীন কার্যধারার পরিপোষকরূপে তিনি একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই বৈষয়িক ব্যাপার উহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। অবশ্য ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরেই একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। যদিও কার্যক্ষেত্রে উহা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই, তথাপি উহার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় আলাসিঙ্গাকে লিখিত স্বামীজীর ৩০শে নভেম্বরের পত্রে এবং পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত কৃপানন্দের ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পত্র এবং অভয়ানন্দের লিখিত ২২শে নভেম্বরের পত্র হইতে। স্বামীজীর পত্রে আছে: "আমি ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি।" কৃপানন্দ জানাইয়াছিলেন যে, সমিতিতে অনেক কর্মকর্তা থাকিলেও ঐ পর্যন্ত তাঁহারা কিছুই করেন নাই। অভয়ানন্দ নিউ ইয়র্কের অন্তর্বর্তী গ্রীনউইচ গ্রামে বেদান্ত-প্রচার করিতেন, কিন্তু তাঁহার ক্লাসে আট-নয় জনের অধিক লোক আসিত না। তিনিও ওলি বুলকে জানাইয়াছিলেন যে, সমিতি এই বিষয়ে উদাসীন ('প্রবুদ্ধ ভারত', এপ্রিল, ১৯৬৩)। কৃপানন্দের পত্রে আরও জানা যায়, তিনি ৩৯নং স্ট্রীটের ২২৮নং বাড়িতে নভেম্বর মাসে যে ক্লাস করিতেন তাহাতে সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গুডইয়ার চাঁদা তুলিতেন, যদিও উহা ছিল অতি সামান্য। এই সমিতিরই অঙ্গরূপে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন কার্যকরী কমিটি গড়িয়া উঠিল, তখন স্বামীজী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্টার্ডিকে ২৩শে ডিসেম্বর লিখিলেন, "আমি সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার একটি কমিটির হাতে দিয়া সমস্ত হাঙ্গামা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি। প্রতিষ্ঠান-গঠনাদি কার্যে আমি নিপুণ নহি, ইহাতে আমি যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ি।" পাশ্চাত্ত্য ধারা অবলম্বনে প্রতিষ্ঠান-গঠনের তিনি চিরকালই বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনা লইয়া উহা দশজনের উপর চাপাইয়া দিয়া একটা কৃত্রিম আন্দোলন গঠন করা ধর্মের ক্ষেত্রে চলে না। এখানে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই পরিচালনাধীনে এবং মানুষের সদ্‌বৃত্তির সহায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়—এখানে কাজটি স্বতঃপ্রবৃত্ত মানুষের সহযোগে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। এই ভাবে এই সমিতিই চালু থাকিয়া পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বামীজীর ভারতে থাকাকালে আইন

অনুসারে 'নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি' নাম ধারণপূর্বক বিধিবদ্ধ সমিতিতে পরিণত হয়। স্বামীজী নিজের কার্যপ্রণালী বিষয়ে ২৩শে ডিসেম্বর (১৮৯৫) স্বামী সারদানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "আমি খোকাদের ও ভীরুদের চাই না। প্রত্যুত আমি একাই কাজ ক'রব। আমায় একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। আমি একাই তা সম্পন্ন ক'রব। কে আসে বা কে যায়, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না।" বলা বাহুল্য, এইরূপ মনোভাব প্রচলিত অর্থে প্রতিষ্ঠান গঠনের বিরোধী।

একদিকে এই কঠোর ও নির্ভীক সিদ্ধান্ত, আর অপর দিকে ছিল তাঁহার অতি দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের দৃঢ় সঙ্কল্প, সুতরাং এই সময়ে কর্মব্যস্ততা অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমরা ওয়াল্ডো প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, স্বামীজী ইহারই মধ্যে আবার 'রাজযোগ'-রচনায়ও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ তারিখের এক পত্রে তিনি স্টার্ডিকে লিখিয়াছিলেন, "আমি এখন যোগসূত্র আরম্ভ করিয়াছি। এক একটি সূত্র ধরিয়া উহার উপর যত ভাষ্য আছে, সেইগুলি মিলাইয়া উহা পাঠ করি। এই সব লিখিয়া রাখা হয় এবং সম্পূর্ণ হইলে দেখা যাইবে যে, পতঞ্জলির সূত্রের ইহাই পূর্ণতম সটীক সংস্করণ। অবশ্য বইখানি একটু বড়ই হইবে।" পরে এক পত্রে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, কূর্মপুরাণে যোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু আছে, তাহাও তিনি ঐ গ্রন্থমধ্যে দিতে চাহেন। প্রথমে তিনি হয়তো পারিভাষিক বিষয়বহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকরচনার কথাই ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শেষে যে আকারে বাহির হইল তাহাতে দেখা গেল তিনি স্বীয় অনুভূতি হইতে লব্ধ সত্য অবলম্বনে সহজ ভাষায় সাধারণের উপযোগী গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছেন। তথ্য সমাবেশের ন্যূনতা ইহাতে নাই; অথচ গম্ভীর তত্ত্বগুলি তাঁহার প্রতিভাস্পর্শে প্রাণময় ও প্রেরণাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীজী স্টার্ডি মহোদয়কে ফেব্রুআরি মাসে (১৮৯৬) যে পত্র[১] লিখেন, তাহা হইতেও নিউ ইয়র্কের এই সময়ের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারা যায়। স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "এখানে আমার সপ্তাহে ছ'টি ক'রে ক্লাস হচ্ছে; তাছাড়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসও একটি আছে। শ্রোতার সংখ্যা ৭০ থেকে

১। পত্রখানির তারিখ 'বাণী ও রচনা'র মতে ১৬ই ডিসেম্বর হইলেও পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে মনে হয়, ফেব্রুআরি মাস হওয়াই সমীচীনতর।

১২০ পর্যন্ত হয়। এ ছাড়া প্রতি রবিবারে আমি সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিই। গতমাসে যে সভাগৃহে আমার বক্তৃতাগুলি হয়েছিল, তাতে ৬০০ জন বসতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ ৯০০ জন আসত—৩০০ জন দাঁড়িয়ে থাকত, আর ৩০০ জন জায়গা না পেয়ে ফিরে যেত। সুতরাং এ সপ্তাহে একটা বৃহত্তর হল নিয়েছি, যাতে ১২০০ জন বসতে পারবে। এই বক্তৃতাগুলিতে যোগ দেবার জন্য কোন অর্থাদি চাওয়া হয় না; কিন্তু সভায় যা চাঁদা ওঠে তাতে বাড়ি-ভাড়াটা পুষিয়ে যায়। এ সপ্তাহে খবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে এবং এ বৎসর আমি নিউ ইয়র্ককে অনেকটা মাতিয়ে তুলেছি। ...ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে।...আমি 'ভক্তি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি।...এখানে জন কয়েক বন্ধু আমার রবিবারের বক্তৃতাগুলি ছাপছেন। প্রথমটির কয়েক কপি তোমায় পাঠিয়েছি। আগামী ডাকে পরবর্তী দুটি বক্তৃতার কয়েক কপি পাঠাব।"

স্বামীজীর রবিবাসরীয় বক্তৃতা আরম্ভ হয় ৫ই জানুআরি (১৮৯৬)। উহা তখন হার্ডিম্যান হল-এ হইত এবং সাংকেতিক-লেখক গুডউইন ঐগুলি লিখিয়া লইতেন। এইরূপেই ঐগুলির সংরক্ষণ সম্ভব হইয়াছিল। স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুবৃন্দ জানুআরির পূর্বেই দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মূল্যবান উপদেশগুলি সংরক্ষিত না হইয়া বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইতেছে, অথচ নিজেদের স্বাধ্যায় ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সুশিক্ষা ও পথপ্রদর্শনের জন্য এইসব অমূল্য রত্ন রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, একজন সাংকেতিক-লেখক নিয়োগ করিবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যকরী কমিটির সভ্যরা চাঁদা তুলিয়া একজন সাংকেতিক-লেখক নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১২ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। অতঃপর ডিসেম্বরের (১৮৯৫) শেষের দিকে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু ইঁহার কার্য আশানুরূপ হইল না; স্বামীজীর দ্রুত ভাষণের সহিত তাল রাখিয়া চলা ইঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; আবার বিষয়বস্তুর সহিত পরিচয় না থাকায় পদে পদে ভুল হইতেছিল। তাই ইঁহার বদলে দ্বিতীয় আর একজনকে রাখিতে হইল; কিন্তু ইনিও তেমন সফল হইলেন না। সর্বশেষে জে. জে. গুডউইন ঐ কার্যে নিযুক্ত হইলেন। গুডউইনেরই প্রযত্নে স্বামীজীর বক্তৃতারূপ অমূল্য রত্নরাজি আমরা পাইয়াছি; নতুবা যে অল্প কয় বৎসর স্বামীজী ইহলোকে ছিলেন, ঐ কালে তিনি নানা কার্যে এতই

ব্যাপৃত ছিলেন যে, স্থির হইয়া বসিয়া দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবার মতো অবসর পাওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না।

গুডউইনের আগমন দৈবনির্দিষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কার্যের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে তখনকার দিনে নিউ ইয়র্কে সপ্তাহে অন্ততঃ পনর হইতে আঠার ডলার দিতে হইত। এত টাকা খরচ করিয়া লোক রাখা কমিটির সভ্যদের পক্ষে সহজ ছিল না; অথচ সর্বগুণসমন্বিত গুডউইন যেন পূর্বনির্দিষ্টরূপেই অতি সহজে স্বকার্যের জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ইংরেজ এবং তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশের নিম্নে। তিনি আসিয়া শুধু যে ক্লাসের বক্তৃতা ও সাধারণ ভাষণগুলিই লিখিতে লাগিলেন তাহাই নহে, অচিরে স্বামীজীর অন্যান্য কার্যেও সহায় হইলেন। ইহার পূর্বে তিনি আদালতের রিপোর্ট লিখিতেন এবং একাদশ বৎসর যাবৎ তিনখানি সংবাদপত্রের সম্পাদনাদি কার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এমন পথে চলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবন নিষ্ফল হইতে বসিয়াছিল। এই সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁহার উপর স্বামীজীর প্রভাব বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। স্বামীজী তাঁহার অতীত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক ঘটনাবলী বলিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে তাঁহার নৈতিক জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এইজন্য এবং স্বামীজীর বালকসুলভ সারল্য দেখিয়া ও অপরের সামান্য সৌজন্যও তাঁহাকে সহজে মুগ্ধ করে বুঝিয়া গুডউইন নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন, এমন যে ব্যক্তি অতীতের সব কথা জানিয়াও কিছুমাত্র ভৎ´সনা বা ঘৃণা করেন না, প্রত্যুত ভালবাসা দেখাইয়া থাকেন, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করা কি সৌভাগ্যের বিষয় নহে? গুডউইন সত্যই স্বামীজীর কার্যে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিলেন। বেতন লইয়া কার্য করা তাঁহার অভীপ্সিত ছিল না; কিন্তু তিনি ছিলেন দরিদ্র; অতএব নিজের দেহরক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, এতদতিরিক্ত কিছু তিনি লইতেন না। বহু পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে তিনি শ্রীযুক্তা বুলকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়া লিখিয়াছিলেন, "যদিও আমার সমগ্র মনই চায় যে, আমি বেদান্তকার্যেই লিপ্ত থাকি ও আমার বোধ হয়, আমি একথা বলিতেও পারি যে, আমার সমগ্র চিত্তটিই ইহাতে লিপ্ত আছে, তথাপি আমার ভয় হয়, আমাকে অন্ততঃ দেহধারণের জন্য কিছু অর্থ লইতেই হইবে। কিন্তু এতদতিরিক্ত কোন ব্যবস্থাতে আমার সম্মতি

নাই।" কার্যতঃও দেখা গিয়াছিল, গুডউইন সর্বতোভাবে আপনাকে বেদান্তকার্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। দিবারাত্র তিনি বক্তৃতাগুলি সংকেতলিপিতে টুকিতে ও পুনঃ সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বামীজী সকালে দীর্ঘকালব্যাপী যে কর্মযোগের ক্লাস করিতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া লওয়াই একটা কষ্টসাধ্য কার্য ছিল। স্বামীজীর প্রতিটি কথা লিখিয়া লইতে গিয়া গুডউইন আর কিছুই করিবার সময় পাইতেন না। হয়তো একই বাটীতে থাকিলে কাজের সুবিধা হইত; কিন্তু স্থানাভাবে তিনি রাস্তার অপরদিকে আর একটি বাটীতে থাকিতেন এবং সেখানে বসিয়া টাইপ করা প্রভৃতি কাজ সারিতেন। আবার সন্ধ্যার ক্লাসেও যোগ দিতে হইত। হয়তো ইতোমধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া সান্ধ্যভোজন শেষ করিয়া লইতেন।

স্বামীজীর পাঠ ও বক্তৃতার যেসব প্রামাণিক প্রতিলিপি সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের প্রস্তুতির জন্য গুডউইনেরই নিকট আমরা প্রধানতঃ ঋণী হইলেও ঐ সময়ের সব কিছুই তাঁহার হস্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি হইতে জুন পর্যন্ত 'ব্রহ্মবাদিন্'-পত্রিকায় আটটি সংখ্যায় 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধীয় যে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার অন্ততঃ কিয়দংশ স্বামীজী স্বয়ং স্বীয় বক্তৃতাবলম্বনে প্রবন্ধাকারে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং 'ভক্তির লক্ষণ' ও 'ঈশ্বরের স্বরূপ' এই প্রারম্ভিক প্রবন্ধদ্বয় তিনি ডিসেম্বর মাসে (১৮৯৫) মৌলিকা রচনা হিসাবে লিখিতে আরম্ভ করিয়া বড়দিনের পূর্বেই শেষ করিয়া ফেলেন। ইহা টাইপ করিয়াছিলেন কৃপানন্দ। ঐ জন্য শ্রীযুক্তা বুলের অর্থসাহায্যে কৃপানন্দ মাসিক ৫ ডলার ভাড়ায় একটি টাইপরাইটার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর স্বামীজী 'গুরুর প্রয়োজনীয়তা' ও 'গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন উহার নিষ্কর্ষও প্রবন্ধাকারে ঐ মাসেই প্রস্তুত হয় এবং কৃপানন্দের টাইপরাইটারের কৃপায় লিপিবদ্ধ হইয়া যথাকালে 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ প্রবন্ধদ্বয়ের আকারে প্রকাশিত হয়।

ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামীজী যে পাঠচক্রগুলি পরিচালনা করিতেছিলেন, উহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মন যেমন একদিকে নূতন ধারায় গড়িয়া উঠিতেছিল এবং তাঁহারা সত্যের নবালোকলাভে জীবন ধন্য মনে করিতেছিলেন, অপরদিকে তেমনি এই ক্লাসগুলি অবলম্বনে স্বামীজীর সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ বার্তাসহ এমন কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়া যাইতেছিল যাহা পরে তাঁহার

উপদেশ বিশ্বময় বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। তিনি নিজেও লিখিয়াছিলেন, "আমি এমন কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক লিখে ফেলতে চাই, যেগুলি আমি চলে গেলে আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ হবে" (১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫)। এইভাবে কর্মযোগের ব্যাখ্যাবলী গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ হইয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে প্রথম নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পুস্তক 'রাজযোগ' প্রকাশিত হয় ঐ বৎসর জুলাই মাসে ইংলণ্ড হইতে। এই বিষয়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ভক্তদের মধ্যে যে মতভেদ হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই দেবমাতার স্মৃতিলিপি হইতে জানিতে পারিয়াছি। 'ভক্তিযোগ' প্রথমে 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় ও ঐ বৎসর শরৎকালে মাদ্রাজে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে স্বামীজী ঐ সময়ে যেসকল ক্লাস করেন, তাহার সারাংশ শ্রীমতী ওয়াল্ডো লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ বক্তৃতাবলী তখন আমেরিকায় প্রকাশিত হয় নাই। ওয়াল্ডোর স্মৃতিলিপিতে আছে, "স্বামীজী যেসব অতি উত্তম বক্তৃতা দিয়াছিলেন, নিউ ইয়র্কের জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী তাহারই অন্তর্ভুক্ত হইলেও ঐগুলি কখনও ছাপা হয় নাই। যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে জ্ঞানযোগ নামে প্রকাশিত হইয়াছে, ঐগুলি ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে দেওয়া হইয়াছিল।" প্রকৃতপক্ষে ঐসব বক্তৃতা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় দেওয়া হইয়াছিল।

ওয়াল্ডো যে আমেরিকান ভাষণগুলিও লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—ইহার প্রমাণ শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত তাঁহার ১৭শে মে, ১৮৯৬-এর পত্রেই প্রকাশ: "আমি জ্ঞান সম্বন্ধীয় নোটগুলি পর পর সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং স্বামীজী উহার একটি কপি এই বলিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান যে, তিনি এই বৎসরের পাঠগুলির (অর্থাৎ ইংলণ্ডের বক্তৃতাবলীর) সহিত ইহা ভূমিকারূপে ছাপাইতে পারেন। তিনি সেরূপ করিবেন বলিয়া আমার মোটেই মনে হয় না। আপনি জানেন যে, এ বৎসরের জ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতাগুলিকে পূর্ব বৎসরের বক্তৃতার জের বলিলেই চলে এবং বর্তমানগুলি যেন প্রারম্ভশূন্য। স্টার্ডি হয়তো একটা মুখবন্ধ জুড়িয়া দিবেন।" যাহা হউক, স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি ওয়াল্ডোর পাণ্ডুলিপি হইতে স্বামীজীর প্রদত্ত 'জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে আলোচনা' (ডিসকোর্সেস অন জ্ঞানযোগ) নামীয় কয়েকটি ভাষণের প্রতিলিপি করিয়া আনেন। উহা স্বামীজীর ইংরেজী 'কমপ্লিট ওয়ার্কস'-এর অষ্টম খণ্ডে পাওয়া

যায়। সম্ভবতঃ ইহাই নিউ ইয়র্কের ঐ বক্তৃতাবলীর সারাংশ। যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হইবে, স্বামীজীর নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত যোগ-চতুষ্টয় সম্বন্ধীয় ভাষণগুলি কোন না কোন আকারে সংরক্ষিত হইয়াছে।

এইসকল বিশ্রামহীন ও কষ্টসাধ্য কার্যের মধ্যেও আবার বন্ধুবান্ধবদের সহিত মিশিতে হইত, সাংবাদিক ও জিজ্ঞাসুর সহিত জটিল বিষয়ে আলোচনা করিতে হইত, ভারতীয় ও ভারতেতর-দেশীয় বন্ধুদিগকে প্রচুর সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে হইত। অতএব তাঁহার মনে স্বভাবসিদ্ধ নির্জনস্পৃহা, হিমালয়ে বসিয়া সাধনায় ডুবিয়া যাওয়ার ইচ্ছা পুনঃপুনঃ উদিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভারতে ফিরিবার কথাও মনে উঠিত। তাই ২৬শে ডিসেম্বর (১৮৯৫) স্বামীজীর মুখে শুনিয়া কৃপানন্দ শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিলেন, মে মাসে তিনি ইংলণ্ডে যাইবেন এবং সেখান হইতে ভারতে ফিরিয়া বহু বৎসর আপনাকে কোন গুহামধ্যে লুকাইয়া রাখিতে চান। অতএব আমরা এই শেষ বারের মতোই তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিব।" কার্যতঃ স্বামীজীর ভাগ্যে সে দীর্ঘ বিশ্রামের সম্ভাবনা ছিল না। আপাততঃ ডিসেম্বরের (১৮৯৫) কাজ শেষ করিয়া তিনি লেগেট-দম্পতির আমন্ত্রণ স্বীকারপূর্বক তাঁহাদের আলস্টার কাউন্টিতে অবস্থিত 'রিজলী ম্যানর' বাসভবনে অবসরকাল কাটাইতে চলিয়া গেলেন।[১]

'রিজলী' হইতে ফিরিয়াই স্বামীজী আবার কার্য আরম্ভ করিলেন—ক্লাস, সাধারণের জন্য বক্তৃতা, প্রবন্ধরচনা, পত্র লেখা ও ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। ৫ই জানুআরি হইতে 'হার্ডম্যান হলে' নিয়মিত রবিবাসরীয় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। এতদ্ব্যতীত ব্রুকলিনের 'মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি'র সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতা ও নিউ ইয়র্কের 'পিপল্স চার্চে' প্রদত্ত বক্তৃতাতে লোকসমাগম হইল প্রচুর এবং প্রশংসাও মিলিল যথেষ্ট। প্রত্যহ দুইটি করিয়া ক্লাসও চলিতে লাগিল এবং উহাতে লোকসংখ্যা আশাতীতরূপে বাড়িয়া চলিল। সাধারণ বক্তৃতায় যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে ৩৯নং স্ট্রীটেও আসিতেন, আর 'হার্ডম্যান হলে' স্থান সঙ্কুলান হইত না। নিউ ইয়র্কে তাঁহার নাম রটিয়াছিল—

১। স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের কার্যাবলীর এই বিবরণ আমরা শ্রীযুক্তা বার্কের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে রচনা করিলাম। অধিকতর তথ্য ও প্রমাণের জন্য উহা দ্রষ্টব্য।

'বিদ্যুৎসদৃশ বক্তা'; আর বাগ্মিতার প্রশংসা এতই প্রসারিত হইয়াছিল যে, 'হার্ডম্যান হল' ছাড়িয়া অতঃপর ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে একটা প্রকাণ্ড হল ভাড়া লইতে হইয়াছিল। উহাতেই ফেব্রুআরি মাসে তাঁহার নিউ ইয়র্কের দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তৃতা হয়। বিষয় ছিল: 'ভক্তিযোগ', 'প্রকৃত ও আপাত-প্রতীয়মান মানুষ', 'মদীয় আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ'। ফেব্রুআরি মাসেই তিনি ডাঃ জেনসের আনুকূল্যে ব্রুকলিন নৈতিক সমিতিতেও বক্তৃতা করেন। ইহারই মধ্যে ৩১শে জানুআরি (১৮৯৬) হার্টফোর্ডে 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

তাঁহার বক্তৃতায় সর্বত্রই যে মহা উৎসাহ জাগরিত হইল, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া নিউ ইয়র্কের সর্বাধিক জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' ১৯শে জানুআরি (১৮৯৬) তারিখে লিখিয়াছিল: "স্বামী বিবেকানন্দ নামটি আজকাল নিউ ইয়র্কের সমাজের কোন কোন জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া থাকে; আর ইঁহাদের যে ধন বা বিদ্যার ন্যূনতা আছে, তাহাও নহে। নামটি হইতেছে ভারত হইতে আগত একজন ময়লা রঙের ভদ্রলোকের, যিনি বিগত এক বৎসর যাবৎ এই মহানগরীতে প্রাচ্যদেশীয় বিশেষ ধর্মমত, দর্শন ও অনুষ্ঠানাদির প্রচারের ফলে উত্তরোত্তর নামযশের অধিকারী হইতেছেন। গত শীতকালে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউর একটি প্রধান হোটেলের অভ্যর্থনাগৃহ ছিল তাঁহার অভিযানকেন্দ্র। নিজের ও নিজের বিষয়বস্তুর প্রতি উচ্চতর সমাজের অনেকটা স্বীকৃতিলাভের পর তিনি এখন সাধারণের মধ্যে প্রচারে সমুৎসুক এবং এই উদ্দেশ্যে 'হার্ডম্যান হলে' বিনা পয়সায় প্রতি রবিবারে এক বক্তৃতাপর্যায় চালাইতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।...তাঁহার অতীত জীবনের কথা তিনি কদাচিৎ বলেন, তবে তিনি যেসব মতবাদ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্প্রতি এই দেশে প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট, সেইসব তিনি যে আচার্যপ্রবরের নিকট শিখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা বলিবার মুখে কখন কখন আত্মজীবনও সাধারণ-ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।...তাঁহার আচারব্যবহার সত্যসত্যই রুচিসম্মত এবং তাঁহার ব্যক্তিগত আকর্ষণও যথেষ্ট। যেসকল নরনারী তাঁহার ক্লাসে সমবেত হন, তাঁহাদের গম্ভীর ও মনোযোগপূর্ণ মুখভঙ্গী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ঐ ভদ্রলোকের শুধু বক্তব্য বিষয়ই যে তাঁহার শিষ্যদিগকে আকৃষ্ট করে, এরূপ নহে।"

স্বামীজী ও তাঁহার আমেরিকার কার্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের পর 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের' সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন: "সম্প্রতি আমি যখন স্বামীজীর একটি ক্লাসে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ মূল্যবান পোশাক পরিহিত এবং তাঁহারা বুদ্ধিমান! গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, উকিল ও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তিবর্গ। মধ্যস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ কমলা রঙের একটি আলখাল্লা পরিয়া। হিন্দু ভদ্রলোকের শ্রোতারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সংখ্যায় তাঁহারা ছিলেন পঞ্চাশ হইতে একশত। তখন কর্মযোগের পাঠ চলিতেছিল।...এই বক্তৃতা বা সৎপ্রসঙ্গের পরে স্বামীজী অনাড়ম্বর আদর-আপ্যায়ন ও আলাপ-পরিচয়ে রত হইলেন এবং এ পর্যন্ত যাঁহারা বক্তৃতা শুনিতেছিলেন তাঁহারা তখন যেরূপ আগ্রহসহকারে তাঁহার সহিত করমর্দনে অগ্রসর হইলেন কিংবা তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য অপরকে অনুরোধ করিতে থাকিলেন, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব কত প্রবল। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে একান্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি কথাও স্বামীজী বলেন না। তাঁহার শিষ্যবৃন্দ অন্যরূপ প্রচার করিলেও তিনি পরিষ্কার বলেন যে, তিনি নিজ দায়িত্বেই এই দেশে আগমন করিয়াছেন, কোন হিন্দু সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের প্রতিনিধি রূপে আসেন নাই। তিনি বলেন, তিনি সন্ন্যাসীদেরই একজন; অতএব জাতিচ্যুত হইবার ভয়শূন্য হইয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারেন।"

ঐ পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই আর একটি প্রবন্ধে ২৪শে ডিসেম্বরের (১৮৯৫) ক্লাস সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল: "বিষয় ছিল, 'ভক্তিলাভের জন্য গুরু ও শিষ্য উভয়ের মধ্যে যে গুণাবলী থাকা আবশ্যক'—(অর্থাৎ) ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ। যাঁহারা সেদিন স্বামীজীর ক্লাসে এই প্রথমবার আসিয়াছিলেন এবং অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁহার উদার মতের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাঁহারা সেদিন আশ্চর্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা শুনিতে আসিয়াছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর, একজন অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিধর্মীর কথা; কিন্তু তাঁহার প্রাচ্য আকৃতি ও তাঁহার উপদেশের উদারতা এবং সর্বজনীনতা বাদ দিলে তো তাঁহাকে একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রচারক হিসাবেই গ্রহণ করা চলিত!"

স্বামীজীর এই সময়কার ব্যক্তিত্ববিষয়ে ব্রুকলিনের হেলেন হান্টিংটন 'ব্রহ্ম-বাদিন্'-এ লিখিয়াছিলেন: "ভগবান কৃপাবশে আমাদের নিকট ভারত হইতে

একজন অধ্যাত্মমার্গের পথপ্রদর্শক পাঠাইয়াছেন; এই আচার্যের ভাবগম্ভীর দার্শনিক মত ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে আমাদের দেশের নৈতিকবায়ুমণ্ডলে সঞ্চারিত হইতেছে। ইঁহার প্রভাব ও পবিত্রতা অত্যন্ত অসাধারণ। তিনি আমাদের নয়নসমক্ষে অধ্যাত্মজীবনের এক অত্যুচ্চ মান খুলিয়া ধরিয়াছেন; তিনি এমন এক ধর্ম দেখাইয়াছেন যাহা সার্বভৌম, যাহার পরমতসহনশীলতা ও সহানুভূতির মধ্যে কোন কৃপণতা নাই, যাহা বৈরাগ্যমণ্ডিত এবং মানবচিত্তে যতপ্রকার সদ্ভাবের উদয় হইতে পারে তাহা দ্বারা সুশোভিত। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের নিকট এমন এক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহা মতবাদ বা বিচারশূন্য বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, যাহা মানবমনকে উন্নীত করে, পবিত্র করে, অশেষ সান্ত্বনাদান করে এবং সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার দোষের ঊর্ধ্বে বিরাজ করে —উহা ভগবদ্ভক্তি, মানবপ্রীতি এবং অনাবিল ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বীয় অনুরাগিমণ্ডলীর বাহিরেও বিবেকানন্দ অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছেন; সমাজের প্রতিস্তরেরই সহিত তিনি সমভাবে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ক্লাস ও বক্তৃতাগুলিতে আমাদের নগরসমূহের সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন এবং তাঁহার প্রভাব ইহারই মধ্যে এক গভীর ও শক্তিশালী অন্তঃসলিল অধ্যাত্মপ্রবাহের আকার ধারণ করিয়াছে। কোন প্রকার নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হইয়া তিনি প্রতিবাদ বা অনুমোদনে রত হন নাই; অর্থ বা প্রতিপত্তি তাঁহাকে প্রভাবিত বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে নাই। অশোভন অনুগ্রহ-বর্ষণস্থলে তিনি ধর্মযাজকের উপযুক্ত বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; নির্বোধের প্রলোভনপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ আত্মসমাহিত থাকিয়াছেন যে, উহাতে বিপরীত পক্ষ হার মানিয়াছে; অথচ তিনি কোন অপরাধকারী বা অপবিত্রচিত্ত ব্যক্তিকে নিন্দা করেন না; তিনি শুধু পবিত্র হইতে ও মঙ্গলময় জীবনযাপন করিতেই উৎসাহিত করেন। মোটের উপর তিনি সত্যই এমন এক ব্যক্তি যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে রাজারাও আহ্লাদিত হন।"

কৃপানন্দের ১৯শে ফেব্রুআরি তারিখের যে পত্র 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ প্রকাশিত হয়, তাহাতে আছে, "আমার (৩১শে জানুআরি তারিখের) পূর্ব পত্রের পর আমাদের আচার্যবর আমাদের সুমহান উদ্দেশ্যের প্রসারকল্পে প্রচুর কার্য করিয়াছেন। ক্লাসে প্রদত্ত ব্যাখ্যাদি শ্রবণের জন্য ক্রমবর্ধমান আগন্তুকসংখ্যা এবং রবিবাসরীয় বক্তৃতায় উপস্থিত বিরাট জনসমাগম হইতেই বুঝিতে পারা যায়,

তাঁহার উপদেশাবলী লোকের মনে কিরূপ ব্যাপক আগ্রহ উৎপন্ন করিয়াছে।··· তাঁহার বক্তৃতা অবলম্বনে ও লেখনীমুখে যে প্রবল ধর্মস্রোত প্রবাহিত হয়, তাঁহার শিক্ষাগুণে আজন্মলব্ধ কুসংস্কার ও বিদ্বেষভাব পরিহারপূর্বক সত্যানুসন্ধিৎসার জন্য যে প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়, তাহা নীরবে ও অজ্ঞাতসারে আপন কার্য করিতে থাকিলেও জনগণের মনে উহা এক স্থায়ী ও মঙ্গলময় ফল উৎপাদন করিতেছে এবং এইরূপে সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণে পরিণত হইয়াছে। ইহার সর্বাধিক পরিস্ফুট প্রমাণ এই যে, বেদান্ত-সাহিত্যের জন্য চাহিদা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং এমন সব মুখেও সংস্কৃত শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, যেখানে ঐরূপ হওয়ার বিন্দুমাত্র আশা করা চলে না। আত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, মোক্ষ এবং ঐ জাতীয় শব্দ আমেরিকার ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং শঙ্করাচার্য ও রামানুজের নাম অনেকের নিকট হাক্সলি ও স্পেন্সারেরই ন্যায় সুপরিচিত হইতে চলিয়াছে। ভারতীয় যে কোন বিষয়ক পুস্তকের জন্য সাধারণ পুস্তকাগারগুলিতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ম্যাক্সমূলার, কোলব্রুক, ডয়সন, বার্নোফ কিংবা অপর যেসকল গ্রন্থকার হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পুস্তক অনায়াসে বিক্রয় হইতেছে এবং বৈদান্তিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়া শোপেনহাওয়ার রচিত শুষ্ক ও ক্লান্তি-জনক গ্রন্থও সাগ্রহে পঠিত হইতেছে। মানুষ এমন একটি মতবাদের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সহজেই অনুভব করিতে পারে, যাহা একাধারে দর্শন ও ধর্মের আকারে প্রতিভাত হয়, হৃদয়কে যেমন আকর্ষণ করে বুদ্ধিবৃত্তিকেও তেমনি পরিতৃপ্ত করে এবং মানবের চিত্তে যতপ্রকার ধর্মপ্রেরণা আছে তাহার সবগুলির সন্তোষবিধান করে। আর এবিষয়ে কিছু বলাই তো নিরর্থক, যখন ইহার ব্যাখ্যাতারূপে আবির্ভূত হন আমাদের আচার্যসদৃশ কোন পুরুষ, যিনি স্বীয় অপূর্ব বাগ্মিতাবলে মানুষের আত্মার অন্তর্নিহিত দিব্য মহিমাকে ইচ্ছানুসারে উদ্বোধিত করিতে পারেন এবং তীক্ষ্ণ ও অবশ্যস্বীকার্য যুক্তিবলে অতীব বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানানুগামী অনমনীয় মনেও অতি সহজে বিশ্বাস জাগাইতে পারেন।"

এই সময়েই স্বামীজী ভক্তিযোগের ক্লাস করিতেছিলেন এবং জ্ঞানযোগ ও সাংখ্য-বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে তাঁহার সর্বশেষ বক্তৃতার তারিখ ছিল ২৩শে ফেব্রুআরি। ঐদিন তিনি 'মদীয় আচার্যদেব' সম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দিয়া

স্বীয় গুরুদেবের প্রতি হৃদয়ের আবেগ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। ঘটনাচক্রে সেই দিনই শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে ভারতে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ইহারও পূর্বে ১৩ই ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবারে স্বামীজীর এক অনুরাগী শিষ্য ডাঃ স্ট্রীট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে অপর সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ ঘটনাবলী হইতে প্রতীত হয় স্বামীজী কিরূপ শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। নতুবা কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান বিদেশী বিধর্মীদের হৃদয়ে এবম্প্রকার ভাববন্যা প্রবাহিত করা ও তাঁহাদের তিন জনের জীবনে একই বৎসর মধ্যে বেদান্তের প্রতি এমন আকর্ষণ জাগানো যে, তাঁহারা সেই টানে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সংসারসম্পর্ক ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—ইহা বড় সহজসাধ্য কর্ম নহে। ডাঃ স্ট্রীটের সংসার-ত্যাগকে উপলক্ষ করিয়া খবরের কাগজ মন্তব্য করিল: "যাঁহারা স্বামীজীর ব্যক্তিগত প্রভাবমধ্যে আসিয়া পড়েন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের জীবনে মঙ্গল-সাধনের অসীম ক্ষমতা রাখেন, এই ঘটনাটি তাহারই এক অন্যতম অত্যাশ্চর্য প্রমাণ।" পূর্বে যাঁহারা দূর হইতে স্বামীজীকে শুধু প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছিলেন তাঁহাদেরও কেহ কেহ এইরূপে ক্রমে তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হইলেন এবং দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। ২০শে ফেব্রুআরি ইঁহাদের অনেকে স্বামীজীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। স্বামীজী তখন আমেরিকাবাসী জনসাধারণের নিকট বড়ই আপনার জন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কতকটা কৌতুকচ্ছলে পূর্বোদ্ধৃত পত্রে কৃপানন্দ লিখিয়াছিলেন, "ভাল কথা, ভারতের পক্ষে বরং এখনই স্বামীজীর উপর স্বীয় দাবীর কথাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলা ভাল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিশ্বকোষের জন্য নাকি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখিত হইতেছে। হয়তো ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে যখন অতীতে যেমন হোমরের জন্মভূমিরূপে খ্যাতিলাভের জন্য সপ্তনগরীর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তেমনি সপ্তদেশ আমাদের আচার্যকে স্বদেশীয় বলিয়া দাবী করিতে পারে এবং ভারতকে তাহার অন্যতম সর্বাগ্রণী সন্তানের জননী হওয়ার গর্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।"

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যসেবিকা এবং বিশ্ববরেণ্যা মহিলা শ্রীযুক্তা এল্লা হুইলার উইলকক্স ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে 'নিউ ইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রকাশ করেন : "বার বৎসর আগে হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, আমার বাড়ি হইতে এক ব্লক দূরে ভারত হইতে আগত জনৈক দর্শনাচার্য—বিবেকানন্দ নামক একব্যক্তি বক্তৃতা দিবেন। আমরা (আমি ও আমি যে পুরুষের উপাধি স্বীকার করিয়াছি, তিনি) কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য চলিলাম এবং শ্রোতৃমণ্ডলীমধ্যে দশ মিনিট বসিয়া থাকিতে না থাকিতে আমাদের মনে হইল, আমরা যেন এমন এক সূক্ষ্ম জগতে উন্নীত হইয়াছি যাহা এত জীবন্ত ও চমকপ্রদ যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ এবং প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাস হইয়া বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত বসিয়া রহিলাম। যখন উহা শেষ হইল, তখন আমরা দুইজন নবীন সাহস, নূতন আশা, অভূতপূর্ব বল, অভিনব বিশ্বাস লইয়া জীবনের দৈনন্দিন ভাগ্যপরিবর্তনের সহিত মোকাবিলা করিতে বাহিরে আসিলাম। পুরুষটি বলিয়া উঠিলেন, 'এই দর্শন, ভগবান সম্বন্ধে এই ধারণা, এই ধর্মই তো আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।' তারপর তিনি আমার সঙ্গে যাইতেন বিবেকানন্দের মুখে সেই পুরাতন ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিতে এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য মনোভাণ্ডার হইতে সত্যের মণিসমূহ এবং সাহায্যকারী ও শক্তিপ্রদ চিন্তারাশি আহরণ করিতে। ইহা সেই ভয়ঙ্কর শীত ঋতুর কথা যখন অর্থজগতে সর্বনাশ ঘটিতেছে, ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যাইতেছে ও বিধ্বস্ত বেলুনের ন্যায় কোম্পানির কাগজের দাম ভূমিস্পর্শ করিতে চলিয়াছে, ব্যবসায়ীরা হতাশার অন্ধকার উপত্যকামধ্যে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন এবং গোটা জগৎটাই যেন মনে হইতেছে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে —ঠিক তেমনি একযুগ যাহার দিকে ঠিক আজও আমরা অগ্রসর হইতেছি। অনেক সময় বহু বিনিদ্র রজনী যাপনের পর পুরুষটি আমার সহিত স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং তারপর তিনি বিষাদময় শীতের অন্ধকারে নামিয়া আসিয়া হাসিমুখে রাস্তা ধরিয়া হাঁটিয়া চলিতেন আর বলিতেন, 'সব ঠিক আছে; দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।' আর আমিও আমার কর্তব্য ও আমোদ-আহ্লাদে ডুবিয়া যাইতাম ঠিক তেমনি আত্মাসম্বন্ধে উন্নততর ধারণা ও সম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া। অত্যধিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার এই যুগেও যে ধর্ম বা যে দর্শন মানুষের জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটাইতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের প্রতি তাহাদের অধিক বিশ্বাস জন্মাইতে পারে, মানবসাধারণের প্রতি সহানুভূতি বাড়াইতে পারে এবং ভাবী জীবনগুলির কথা ভাবিতে একটা বিশ্বাস-পূর্ণ আনন্দে মন ভরিয়া তুলে, সে ধর্ম নিশ্চয়ই উত্তম ও মহান।"

এই যশস্বিনী মহিলা শুধু ভাষণ শুনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি "বিবেকানন্দ-প্রচারিত ভারতের এই প্রাচীন চমৎকার ধর্মকে" ভক্তিসহকারে অধ্যয়ন করিতেও আরম্ভ করেন। প্রবন্ধশেষে তিনি লিখিয়াছেন: "ভারতীয় দর্শনের মাহাত্ম্য আমাদিগকে জানিতে হইবে। আমাদিগকে ধার্মিক জ্ঞানসহায়ে আমাদের সঙ্কীর্ণ মতবাদসমূহকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। কিন্তু আমরা চাই ঐগুলিকে আমাদের নিজস্ব আধুনিক প্রগতিশীল মনোভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিতে এবং প্রীতিপূর্ণভাবে ও ধৈর্যসহকারে কার্যকররূপে মানবীয় প্রয়োজনসাধনে প্রয়োগ করিতে। বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন আমাদের নিকট একটি বার্তা লইয়া।... 'আমি তোমাদিগকে কোন নবধর্মে ধর্মান্তরিত করিতে চাহি না', তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি চাই, তোমরা স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক; আমি চাই মেথডিস্টকে আরও ভাল মেথডিস্টরূপে গড়িতে, প্রেসবিটেরিয়ানকে আরও উত্তম প্রেসবিটেরিয়ান বানাইতে, ইউনিটেরিয়ানকে প্রকৃষ্টতর ইউনিটেরিয়ানে পরিণত করিতে।' তিনি দিয়াছিলেন এমন এক বার্তা যাহা ব্যবসায়ীকে বলবত্তর করে, চপলস্বভাবা সমাজনেত্রীদিগকে একটু থামিয়া ভাবিতে বলে, শিল্পীকে নবীন প্রেরণা দান করে এবং স্ত্রী ও মাতার, স্বামী ও পিতার চিত্তে কর্তব্য বিষয়ে আরও বৃহত্তর ও পবিত্রতর কর্তব্যবুদ্ধি অনুসঞ্চারিত করে।"

স্টার্ডিকে লিখিত স্বামীজীর ১৩ই ফেব্রুআরির (১৮৯৬) পত্রে জানিতে পারা যায়, "আমেরিকায় কাজ সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে। শুরু থেকেই কোন ভোজ-বাজি না থাকায় আমেরিকার সমাজের সেরা লোকদের দৃষ্টি বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।" আর আলাসিঙ্গাকে লিখিত ১৭ই ফেব্রুআরির পত্রে আছে: "আমি এক্ষণে মার্কিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউ ইয়র্ককে জাগাতে সমর্থ হয়েছি; কিন্তু এর জন্য আমাকে ভয়ানক সংগ্রাম করতে হয়েছে। গত দু-বৎসর এক পয়সাও আসেনি। হাতে যা-কিছু ছিল, তা প্রায় সবই এই নিউ ইয়র্ক ও ইংলণ্ডের কাজে ব্যয় করেছি। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কাজ চলে যাবে।

"তারপর ভাবো দেখি: হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আবার শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করা, যা একদিকে সহজ সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীষিগণের উপযোগী হবে! এ যারা চেষ্টা করেছে, তারাই বলতে পারে কি কঠিন ব্যাপার! সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত

ও কবিত্বময় করতে হবে ; অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্ত্বসকলের মধ্য থেকে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্তসকল বের করতে হবে ; আর বিভ্রান্তিকর যোগ-শাস্ত্রের মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক ও কার্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বের করতে হবে, আবার এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে। এই আমার জীবনব্রত।"

কঠিন এ ব্রত এবং কঠিনতর ইহার উদ্‌যাপন। সমাধির প্রতি যাঁহার চির-প্রবণতা, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যিনি নির্বিকল্প সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং লাভও করিয়াছিলেন, অথচ শ্রীগুরুর অলঙ্ঘ্য আদেশে প্রাণপাতী কর্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি একদিকে আপন সুখসুবিধা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ভুলিয়া কঠিনতম কর্তব্যে লিপ্ত থাকিলেও একমুহূর্তের জন্য সেই সমাধির কথা বিস্মৃত হন নাই, প্রত্যুত কার্যপ্রবাহের সহিত তাঁহার জীবনে ব্রহ্মনিষ্ঠা অব্যাহত ছিল—ইহা লৌকিক দৃষ্টিতে আপাতবিরোধী হইলেও এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলাই স্বামীজীর জীবনের অন্যতম অবদান। স্বামীজী নিজেও ইহা জানিতেন, তাই তাঁহার ১৮৯৬ সালের ১০ই ফেব্রুআরির পত্রে এই আপাতবিরোধী অথচ মর্ম-স্পর্শী করুণ সুরই শুনিতে পাই: "নিরন্তর কার্য করার ফলে এ বৎসর আমার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে গেছে ; স্নায়ুগুলি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই শীতে আমি একরাত্রিও ভালভাবে ঘুমাইনি। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমার খাটুনি খুব বেশী হচ্ছে, এখনও ইংলণ্ডে এক বৃহৎ কার্য বাকি আছে। আমাকে তা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তারপর আশা করি ভারতে ফিরে বাকি জীবনটা বিশ্রাম ক'রে কাটাতে পারব। এখন আমি বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা করছি। আশা করি, তা কিছুটা পাব এবং ভারতের লোকেরা আমাকে রেহাই দেবে। খুব ইচ্ছা হয়, কয়েক বছরের জন্য বোবা হয়ে যাই এবং একেবারে কথা না বলি! এই সকল পার্থিব সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের জন্য আমি জন্মাইনি। স্বভাবতঃ আমি স্বপ্নচারী এবং শান্তিপ্রিয়। আমি আজন্ম আদর্শবাদী, স্বপ্নজগতেই আমার বাস, বাস্তবের সংস্পর্শ আমার স্বপ্নের বিঘ্ন ঘটায় এবং আমাকে অসুখী ক'রে তোলে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!···আমার সমগ্র জীবনটাই স্বপ্নের পর স্বপ্নের সমাবেশ। সচেতন স্বপ্নচারী হওয়া আমার উচ্চাভিলাষ, ব্যস্।"

তবু কাজ তিনি করিয়াই চলিয়াছিলেন এবং নিউ ইয়র্কের বুদ্ধিকেন্দ্রেও তাঁহার প্রভাব অনুসংক্রামিত হইতেছিল। ইহার প্রমাণ আমরা কবি উইলকক্সের

প্রবন্ধে পাইয়াছি। স্বামীজীর ১৮৯৬ সালের ১৩ই ফেব্রুআরির পত্রে দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের বিবরণ পাওয়া যায়: "ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল' (Iziel) অভিনয় করেছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁজে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রুম-মূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষরক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হ'ল! মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আমি এই বুদ্ধব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। মাদাম কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেসলা ছিলেন। মাদাম (বার্নহার্ড) খুব সুশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। মোরেল ঔৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু মিঃ টেসলা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টিমন বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেসলা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।"

স্বামীজীর ১০ই ফেব্রুআরির (১৮৯৬) পত্রে আছে: "নিউ ইয়র্কে আরও দুই সপ্তাহ থাকব, তারপর ডেট্রয়েট যাব, সেখান থেকে দু-এক সপ্তাহের জন্য আবার বস্টন ফিরে আসব।" এই অভিপ্রায় অনুসারে নিউ ইয়র্কের কর্মবহুল দিনগুলির শেষে তিনি বন্ধুদের আমন্ত্রণক্রমে ডেট্রয়েট যাত্রা করিলেন ও সেখানে দুই সপ্তাহ থাকিয়া বক্তৃতা দিলেন। ডেট্রয়েটের এইবারের ঘটনাবলী আমরা পূর্বেই 'ডেট্রয়েট' অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি। সেখানে শ্রীযুক্তা ফাঙ্কির স্মৃতি-লিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহারই শেষাংশে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বামীজীকে তখন দেখিয়া "মনে হইতেছিল যেন অন্তরাত্মা দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; আর তখনই আমি যাত্রাশেষের একটা পূর্বাভাস পাইলাম। বহু বৎসর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখনই

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, তিনি ইহলোকে অধিক দিন থাকিবেন না। এই নিদারুণ সত্যকে না দেখিবার জন্য চক্ষু বুজিয়া রহিলাম, কিন্তু হৃদয় সে সত্যকে ঢাকিতে দিল না। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহাকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।" ('দেববাণী', ৩১-৩৪)।

শরীর যে এত পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিতেছিল না, স্বামীজী নিজেও ইহা জানিতেন এবং এই সময়ের বহু পত্রে তাহা প্রকাশও করিয়াছিলেন। তিনি তবু কর্তব্য হইতে বিরত হন নাই, কেন না তখন তিনি ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া ভগবন্নির্দেশে লোককল্যাণসাধনে নিরত। তাঁহার ২৩শে মার্চের পত্রে আছে: "আমার ভয় হয়—আমার খাটুনি অত্যধিক হয়ে পড়েছে; এই দীর্ঘ একটানা পরিশ্রমে আমার স্নায়ুমণ্ডলী যেন ছিঁড়ে গেছে।...যা হোক, লোক-কল্যাণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই মনে করেই আমি সন্তুষ্ট; আর কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি যখন গিরিগুহায় ধ্যানে মগ্ন হবো, তখন এ বিষয়ে আমার বিবেক সাফ থাকবে।"

এই সময়ে তাঁহার পুস্তকমুদ্রণবিষয়ে স্টার্ডি ও নিউ ইয়র্কের ভক্তদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য হয়। মনে হয় স্টার্ডি অনেকটা স্বাধীনভাবেই নিউ ইয়র্কে লিপিবদ্ধ কিছু কিছু বক্তৃতা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া ফেলেন। অবশেষে মধ্যস্থ হইয়া স্বামীজী বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই সূত্রে ঐ কার্যে স্বামীজীর শ্রম এবং লণ্ডন ও আমেরিকান সংস্করণদ্বয়ের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্বে দেবমাতার স্মৃতিলিপিতে পাইয়া থাকিলেও স্টার্ডিকে লিখিত স্বামীজীর দুইখানি পত্রের উদ্ধৃতি হইতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে: (২৩৭-৩৮)

"পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এখানে এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। নিউ ইয়র্কে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। তারাই সাংকেতিক লেখার ও ছাপার যাবতীয় খরচা দিয়েছে এই শর্তে যে, এই বইগুলির স্বত্বাধিকার তাদের থাকবে। সুতরাং এই পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি তাদের। একখানা বই 'কর্মযোগ' ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে; তার চেয়ে অনেক বড় 'রাজযোগ' ছাপা চলছে; 'জ্ঞানযোগ' পরে প্রকাশিত হ'তে পারে" (২৯শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৬)। "তাঁরা (বন্ধুরা) ইতোমধ্যেই রবিবারের বক্তৃতাগুলি এবং 'রাজযোগ', 'কর্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ'-

বিষয়ে তিনটি বই ছাপিয়েছেন। বিশেষতঃ 'রাজযোগের' অনেকখানি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পতঞ্জলির যোগসূত্রের অনুবাদসহ ঢেলে সাজা হয়েছে। 'রাজযোগ' লংম্যানদের হাতে।...পুস্তকগুলির এত পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন করা হয়েছে যে, আমেরিকান সংস্করণ দেখে ইংরেজী সংস্করণ চেনাই যাবে না। এখন অনুরোধ করছি—এই বইগুলি প্রকাশ করো না।" (১৭ই মার্চ)।

২৩শে মার্চের পত্রে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "চারিখানি বই তৈরী হয়ে গেছে। একখানি বেরিয়ে গেছে, 'পাতঞ্জল সূত্রে'র অনুবাদসহ 'রাজযোগে'র বইখানি ছাপা হচ্ছে, 'ভক্তিযোগে'র বইটা তোমার কাছে আছে, আর 'জ্ঞানযোগে'রটা গুছিয়ে নিয়ে ছাপার জন্য তৈরী হচ্ছে। তা ছাড়া রবিবারের বক্তৃতাগুলিও ছাপা হয়ে গেছে।"

পূর্ব অভিপ্রায়ানুসারে স্বামীজী ডেট্রয়েট হইতে সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক হইয়া বস্টনে গিয়াছিলেন। ১৮ই অথবা ১৯শে মার্চ বস্টনে পৌছিয়া তিনি 'প্রকোপিয়া ক্লাবে' (Procopeia Club, 45 St. Botolph Street, Boston) উঠেন। ১৯শে মার্চ এই ক্লাবের মাসিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ব্যতীত ২১শে, ২৩শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় যথাক্রমে 'কর্মবিজ্ঞান', 'ভক্তি', 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ', 'অনুভূতি বা চরম ধর্ম' এবং 'উপনিষদ্' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২৮শে মার্চ অপরাহ্ণে 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী ক্লাবে' তিনি 'বেদান্তের ব্যবহারিক দিক ও অন্যান্য দর্শনের সহিত ইহার পার্থক্য' বিষয়ে ভাষণ দিয়াছিলেন। বৎসরের প্রারম্ভেই শ্রীযুক্ত কক্স তাঁহাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্র্যাজুয়েট ফিলোজফিক্যাল সোসাইটি ক্লাবে'র সম্মুখে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করেন। তদনুযায়ী ২২শে ও ২৪শে মার্চ দুইটি প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতার পরে ২৫শে মার্চ সেখানে 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেন। উপস্থিত প্রফেসারগণ তাঁহার সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ও বক্তৃতান্তে প্রশ্নোত্তরকালে যথাযথ উত্তর শুনিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শন-বিভাগের প্রধান আচার্যের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়; কিন্তু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উহা প্রত্যাখ্যান করেন। এই সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গের সম্মুখে বক্তৃতাপ্রদান স্বামীজীর জীবনে এক কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ ছিল; কিন্তু তিনি উহাতে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। এমন কি ঐ বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরগুলি যখন পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল তখন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতাগ্রণী রেভারেণ্ড সি. সি.

এভারেট ডি. ডি., এল. এল. ডি. মহাশয় ভূমিকাতে লিখিলেন, "বিবেকানন্দ স্বীয় কার্য ও নিজের প্রতি প্রভূত পরিমাণ আগ্রহ জন্মাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ভাবরাশি অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক অধীতব্য বিষয় অতি অল্পই আছে। বেদান্ত হইতেছে তেমনি একটি ধর্মবিশ্বাস যাহা অনেকের নিকট বাস্তবতার সহিত অতীব সম্পর্কহীন ও অবাস্তব বলিয়া মনে হয়; কোন জীবন্ত, প্রতিভাবান ও সাতিশয় আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই মতবাদটির প্রবক্তৃরূপে পাওয়ার আনন্দ সহজলভ্য নহে। এই মতবাদকে কেবল কৌতূহলজনক কিছু কিংবা বুদ্ধির খেয়াল মাত্র মনে করিলে চলিবে না; হেগেল বলিয়াছিলেন, সর্বপ্রকার দর্শন-চিন্তার আদিতে স্পিনোজার চর্চা আবশ্যক। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে এই কথাটি আরও জোর করিয়া বলা চলে। আমরা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা বহুত্বকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকি। কিন্তু যে একত্বের উপর বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে উহাকে বুঝিতে না পারিলে বহুত্বের কোন বোধই জাগিতে পারে না। অদ্বৈত যে একটা বাস্তব সত্য—একথা প্রাচ্যজগৎ আমাদিগকে ভাল করিয়াই শিখাইতে পারে; এবং বিবেকানন্দ এইরূপ সাফল্যের সহিত ইহা শিখাইয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে উইলকক্স, এভারেট, টেসলা ও তাঁহার নিজের যেসব কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই পূর্ণতর রূপ পাওয়া যায় এই বক্তৃতাগুলিতে ('বাণী ও রচনা', ৩য় খণ্ড): 'বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা,' 'আত্মার একত্ব', 'যুক্তি ও ধর্ম', 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ', 'সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদান্ত', 'বেদান্তদর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব', 'বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম?' তিনি বারংবার ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বেদান্ত যুক্তিবিরোধী, বিজ্ঞান-প্রতিস্পর্ধী বা মানবতা ও বাস্তবতার সহিত সম্পর্কশূন্য নহে। তবে সত্য শুধু প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের মধ্যে পর্যবসিত নহে, উহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি পর্যন্ত প্রসারিত। বর্তমান জগতের বহু সমস্যা সমাধানের কুঞ্জিকা লুক্কায়িত আছে বেদান্ত মধ্যে, আধুনিক জগতে এই তথ্যের আবিষ্কার ও প্রয়োগের কৃতিত্ব স্বামী বিবেকানন্দের। মানুষের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে উহা দেয় শান্তি, মনকে করে উদার, ধর্মক্ষেত্রে আনে সমন্বয়, নীতির ভিত্তিকে করে সুদৃঢ়, মানুষের প্রেমকে করে অনন্ত ও অসীম, দৃষ্টিকে করে অনাবিল, শতধা-বিচ্ছিন্ন জীবনকে করে সুসমঞ্জস, মানুষকে দেয় মর্যাদা, অখণ্ড সত্তার

স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া তোলে মহামানবতার বাস্তব রূপ। বিজ্ঞান যেমন চরম ও পূর্ণতম সত্যের দাবি করিতে পারে না, বেদান্তও তেমনি প্রত্যক্ষানুভূত বাস্তবকে অস্বীকার করিতে চাহে না; প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্বপ্রধান, অথচ একে অপরের পরিপূরক। অনুভূতির তুলনায় যুক্তি নিম্নস্তরের বস্তু হইলেও, ধর্ম যুক্তিকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না, সে চেষ্টায় ধর্মজীবন বিপর্যস্ত হওয়ারই সম্ভাবনা। অদ্বৈত বেদান্তই নৈতিকতার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনায় সক্ষম। আবার অদ্বৈত বেদান্ত দ্বৈতবাদেরও বিরোধী নহে, বরং অদ্বৈতমতেই ঈশ্বরো-পাসনাদির যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হওয়া সম্ভব। বিবেকানন্দের অদ্বৈত নেতির গহ্বরে আপনাকে না হারাইয়া একটা অখণ্ড ইতির মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যার উপায়রূপে মায়াবাদ স্বীকার করিলেও তিনি মায়াবাদী বা অনুভূত সব কিছুকে উড়াইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বা অখণ্ড সত্যের পূজারী।

অতঃপর আমরা স্বামীজীর তদানীন্তন প্রধান কেন্দ্র নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যাই। এখানে ক্লাস ও বক্তৃতা অবলম্বনে একদল অনুরাগী শিষ্য সৃষ্টি করিয়া, পুস্তক রচনা করিয়া এবং বেদান্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীজী ভাবিলেন, তাঁহার কাজ অনেকটা দৃঢ়মূল হইয়াছে। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমনের পূর্বে তিনি একবার চিকাগো ঘুরিয়া আসা অত্যাবশ্যক মনে করিলেন। চিকাগোর সহিত তাঁহার একটা প্রাণের টান ছিল। চিকাগো তাঁহাকে বিশ্বহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, চিকাগোর হেল পরিবার ছিলেন তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী, বন্ধু বা আত্মীয়, আর সেখানেই থাকিতেন তাঁহার আদরের ভগিনীরা—হেল-ভগিনী-চতুষ্টয়। কিন্তু শুধু পারিবারিক আনন্দোপভোগ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অতএব চিকাগোতেও প্রচুর কাজ জুটিয়া গেল। ৬ই এপ্রিল তিনি শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিলেন: "বন্ধুগণের সঙ্গে আমি ইতোমধ্যে অনেক সুন্দর স্থান দেখেছি এবং অনেকগুলি ক্লাস করেছি। আরও কয়েকটি ক্লাস করতে হবে, তারপর আগামী বৃহস্পতিবার রওনা হবো।"[১] ১৪ই এপ্রিল হেল ভগিনীদিগকে জানাইলেন, "রবিবার নিরাপদে এসে পৌছেছি এবং অসুস্থতার জন্য আগে চিঠি দিতে পারিনি। হোয়াইট স্টার লাইনের 'জার্মানিক' জাহাজে আগামী কাল বেলা বারোটায় যাত্রা করছি।" সেইবারের মতো আমেরিকার কার্য সমাপন করিয়া স্বামীজী ১৫ই এপ্রিল লণ্ডন যাত্রা করিলেন।

---

১ ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন বলিয়া গুডউইনের পত্রে উল্লেখ আছে।

"আমি ইয়াঙ্কিদের ভালবাসি"

স্বামীজীকে পাই আমরা ধর্মাচার্য, বক্তা, লেখক, দার্শনিক ইত্যাদিরূপে। একটা সাধারণ মানবসুলভ দিকও যে তাঁহার ছিল, তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল গুরু, স্নেহময় ভ্রাতা, প্রেমময় বন্ধু; আর হাস্যরসোজ্জ্বল সারল্যমণ্ডিত বালকসুলভ ছিল তাঁহার চরিত্র। ধর্মকার্যে যখন তিনি নিরত থাকিতেন, তখন সে কার্যের ভিতর দিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি-ধারা অপরের কল্যাণার্থ কার্পণ্যশূন্যরূপে নিঃস্যন্দিত হইত; হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিয়া তিনি স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। ফলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন; তখন শরীর মনকে একটু অবসর দিবার জন্য সাধারণ মানুষেরই ন্যায় অনাবিল চিত্তবিনোদন, হাস্যকৌতুক প্রভৃতিতে রত হইতেন; তখন যেন আজেবাজে কথায়, হিজিবিজি কাজেই তাঁহার স্ফূর্তি! হয়তো একখানি হাস্যরসময় 'পাঞ্চ' পত্রিকা বা ঐরূপ কোন প্রবন্ধাদি লইয়া পড়িতে বসিতেন এবং হাসিতে হাসিতে চোখে জল আনিয়া ফেলিতেন। তিনি নিজে জানিতেন যে, তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক হইতেছে, গম্ভীর দর্শন ও ধর্মচিন্তার দিকে; তথাপি দেহধর্ম মানিয়া মাঝে মাঝে স্বভাবতঃই অনাবিল আনন্দের সন্ধানে ফিরিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন ও ভালবাসিতেন তাঁহারাও তাঁহাকে বালকপ্রায় ক্রীড়ারত দেখিতে আনন্দ পাইতেন। আমেরিকার ভক্তদের লইয়া এই মানবলীলাই এখানে আমাদের অনুধ্যেয়।

ভাল মজার গল্প শুনিলে তিনি আহ্লাদে আটখানা হইতেন। আর এরূপ গল্প তিনি কখনও ভুলিতেন না; প্রয়োজনমত উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া অপরকেও হাসাইতেন। কেম্ব্রিজের শ্রীযুক্তা ব্রীড[১] ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে যখন অ্যানিস্কোয়ামে শ্রীযুক্তা ব্যাগলির গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, স্বামীজীও তখন সেখানে থাকায় উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে পরে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন:

১ ইঁহার স্বামী চর্ম-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামীজী লীন শহরে ইঁহাদের বাড়িতে অতিথিরূপে থাকিয়া সেখানে বক্তৃতা করেন। ইনি কেম্ব্রিজেও থাকিতেন। শ্রীযুক্তা ব্রীডই স্বামীজীকে সর্বপ্রথম বরফের উপর স্লেজ-যানে চড়াইয়াছিলেন।

"আমাদের মধ্যে অচিরে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।...তিনি অ্যানিস্কোয়ামে একবার মাত্র বক্তৃতা দেন।...তখন তিনি বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন।... তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিতেন, 'একটা গল্প শোনান না!' আমার মনে পড়ে তিনি এক চীনার গল্প শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। সে শূকরমাংস চুরি করিয়া ধরা পড়ে। বিচারক যখন বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা ছিল, চীনারা শূকরমাংস খায় না, তখন সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলিয়াছিল, 'ওঃ, আমি তো এখন মেলিকান (আমেরিকান) মহাশয়; আমি ব্ল্যাণ্ডি খাই, আমি শূকরমাংস খাই, আমি সব খাই'।[১] কতবার আমি বিবেকানন্দকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, 'আমি মেলিকান!' তোমার মতো যাহারা স্বামীজীর সহিত অত পরিচিত নহে, তাহাদের কাছে এই সব কথা তুচ্ছ মনে হইবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুই তোমার নিকট তুচ্ছ বা না-বলার মতো বাজে নয়।

"আমি কানাডা দেশে রেড ইণ্ডিয়ানদের অধ্যুষিত 'সংরক্ষিত স্থানে' তিন বৎসর বাস করিয়াছিলাম। এই রেড ইণ্ডিয়ানদের গল্প শুনিতে স্বামীজী কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। আমার মনে আছে, একটা গল্প তাঁহার নিকট খুব মজাদার ছিল। একজনের স্ত্রী মারা গেলে তাহার শবাধারের জন্য সে কয়েকটি পেরেক চাহিতে ধর্মযাজকের নিকট আসিল। ঐ জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন সময় সে আমার রাঁধুনীকে জিজ্ঞাসা করিল, রাঁধুনী তাহাকে বিবাহ করিবে কি না। স্বভাবতঃই রাঁধুনী রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। তাহার এই বিষাদময় প্রত্যাখ্যানের উত্তরে পুরুষটি বলিল, 'দুদিন পরে দেখা যাবে!' পরের রবিবারে সে যখন আসিয়া আমাদের গেটে একটা থামের উপর বসিল, তখন আমাদের মনে বড় কৌতূহল জাগিল। সে টুপিতে বাঁকা করিয়া একটা পালক গুঁজিয়াছে এবং চুলে এত তেল মাখিয়াছে যে, উহা গাল বাহিয়া গড়াইতেছে। দৈবক্রমে (ঐ গল্প যখন বলি) ঠিক ঐ সময়েই নিজের একখানি তৈলচিত্রের জন্য স্বামীজীকে চিত্রকরের গৃহে গিয়া মাঝে মাঝে বসিতে হইত। ছবিখানি কতদূর হইল দেখিবার জন্য আমরাও শিল্পীর কার্যালয়ে গেলাম। আমি ঘরে ঢুকিতে যাইয়া দেখি একটু তেল চিত্রখানির গাল গড়াইয়া পড়িতেছে; স্বামীজীও উহা দেখিতে

[১] **Me Melikan sir, me eat blandy, me eat polk, me eat everything.**

পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওটা রাঁধুনীকে বে করতে তৈরী হচ্ছে।'…স্বামীজীকে তো তুমি জানই—কী অপূর্ব হাস্যরসিকই না ছিলেন তিনি!"

দুইটি গল্প ছিল তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়—একটির বিষয় ছিল নরমাংসভোজীদের দেশে খ্রীষ্টান পাদ্রীর আগমন এবং অপরটি ছিল ময়লা-রঙের পাদ্রীর সৃষ্টিবিষয়ে ভাষণ। গল্প দুইটি তাঁহার মুখে বিবৃত হইয়া হাসির তরঙ্গ উঠাইত। প্রথম গল্পটি এই: এক সুদূর আদমখোরদের দ্বীপে এক নূতন পাদ্রী আসিয়াছেন। তিনি দলের সরদারের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কথা, আমার পূর্ববর্তীকে তোমাদের কেমন লেগেছিল?" উত্তর আসিল, "ওঃ, ভারী সু-স্বাদ!" আর ময়লা রঙের প্রচারকের গল্পটি এই: তারস্বরে প্রচারক বলিয়া চলিয়াছেন, 'জানো? ভগবান তখন আদমকে তৈরি করছিলেন—আর তিনি তৈরী করছিলেন কাদা দিয়ে। যখন ভগবান তাকে তৈরী করে ফেলেছেন, তখন তিনি তাকে একটা বেড়ার গায়ে লাগিয়ে রাখলেন শুকাবার জন্য—।" পাদ্রী বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "পাদ্রীমশায়, একটু থামুন তো! ঐ যে বেড়ার কথাটা বললেন, (সৃষ্টির আদিতে) ওটা আবার এল কোত্থেকে? ওটাকে তৈরী করল কে?" পাদ্রী তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিলেন, "ওহে স্যাম জোন্স, শোন, শোন! হাঁকপাক করে এসব আজেবাজে প্রশ্ন করা ছেড়ে দাও দেখি! তুমি যে দেখছি সব ধর্মতত্ত্ব ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে!"

সাধারণ মানুষের ধারণা যদিও অন্যরূপ, তথাপি ইহা সত্য যে, মহাপুরুষরা সব সময়ই গম্ভীর হইয়া থাকেন না। এইভাবে মনকে সম্পূর্ণ হালকা করিয়া ফেলাতেও স্বামীজীর তেমনি শক্তি প্রকাশ পাইত যেমন পাইত তাঁহার প্রতিভা ও অধ্যাত্মানুভূতির স্ফুরণে। ধর্মাচার্যের জীবনের অনুভূতিসমূহের সন্ধান পাইতে আমাদের মনে যেমন অনুসন্ধিৎসা জাগে, তেমনি জাগে তাঁহার ব্যক্তিগত হাবভাব, রুচি, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও মানবীয় দিক সম্বন্ধে সব কিছু জানিবার ঔৎসুক্য। মহাপুরুষদের নিকট-সংস্পর্শে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা তাঁহাদের এই মানবসুলভ অথচ অতিমানব গুণাবলীর জন্য তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও অনুরাগীদের সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তাঁহারা সর্বদা চেষ্টা করিতেন তাঁহার মনে আনন্দোৎপাদন করিতে এবং দেখিতেন যে, এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার ধর্মীয় বাণীর প্রকাশও স্পষ্টতর হইত।

তাঁহার পাশ্চাত্ত্যদেশীয় নিকটতম বন্ধুদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল, তাঁহারা তাঁহার বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন বোধ করিয়া অন্ততঃ স্বল্প কাল কর্মবিরতি উপভোগের জন্য তাঁহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। সে সব জায়গায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে ফিরিতে দেওয়া হইত। তিনি কথা বলিতে চাহিলে তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শুনিতেন। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা করিতে চাহিলে নির্বিবাদে তাহা করিতে পারিতেন। তিনি নীরবে ধ্যানমগ্ন হইলে তাঁহারা সে নির্জনতা ভঙ্গ করিতেন না। এমনও হইত যে, বহুদিন মৌন থাকিয়া তিনি অকস্মাৎ ভগবদালাপনে মুখর হইয়া উঠিতেন; অন্য সময় আবার এমন সব গল্পগুজব করিতেন, যাহাতে চিন্তা করিতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তিস্পন্দনসহ সর্বত্রপ্রসারী ও ভাবগাম্ভীর্যে অতলস্পর্শী প্রাণমাতানো ভাষণশেষে তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিতেন, "আঃ, ভগবান বাঁচালেন; এটা শেষ হয়ে গেছে।" এমনি করিয়া প্রজ্ঞাদৃষ্টির অত্যুচ্চ আকাশভেদী উর্ধ্বগমন রোধ করিয়া তিনি অকস্মাৎ শিশুজনোচিত সারল্যের ভূমিতে অবতরণ করিতেন।

পাশ্চাত্ত্যদেশীয় নিকট বন্ধুদের কাছে কোন কিছু তিনি গোপন রাখিতেন না, মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। অনেককে নিজের ইচ্ছানুরূপ নামে ডাকিতেন। শ্রীযুক্ত হেল ও তাঁহার পত্নী ছিলেন তাঁহার নিকট 'ফাদার পোপ' (পোপ-বাবা) ও 'মাদার চার্চ' (গির্জা-মা); শ্রীমতী ম্যাকলাউড ছিলেন 'ইউম্' বা 'জো জো'; শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন 'ফ্রাঙ্কিন্সেন্স' (গুগ্‌গুল) ইত্যাদি। বন্ধুরা কোন উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিলে তিনি আনন্দোচ্ছল-নয়নে সাগ্রহে উহা দেখিতে থাকিতেন এবং স্বদেশীয় রীতিতে হাতে করিয়া খাইতে খাইতে বলিতেন, "এমন করে না খেলে তৃপ্তি হয়?" প্রথম প্রথম এইরূপ ব্যবহারে অনভ্যস্ত পাশ্চাত্ত্যেরা আঁৎকাইয়া উঠিতেন; কিন্তু পরে ইহার তাৎপর্য বুঝিয়া তিনি ঐরূপ করিলেই বরং তাঁহারা অধিকতর আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন তাঁহাদের গৃহমধ্যে ঢুকিয়া স্বগৃহোচিত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব-পূর্বক তাড়াতাড়ি গলার কলার খুলিয়া ফেলিতেন, পায়ের বুট ঝাড়িয়া ফেলিতেন এবং গৃহমধ্যে ব্যবহার্য চটি-জুতায় পা গলাইয়া দিতেন, তখন গৃহবাসীদের খুব আমোদ হইত। আর জামার আস্তিনের কপ তো ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে অতি জঘন্য। তাঁহার স্বাভাবিক সন্ন্যাসীর মন মাঝে মাঝে সামাজিক কৃত্রিম রীতিনীতি ও আদবকায়দার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। অর্থের প্রতি তাঁহার এক স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ছিল। তাঁহার আমেরিকান শিষ্যরা কতবারই না দেখিয়াছেন, বন্ধুরা তাঁহার আপন ব্যবহারের জন্য অর্থ দিলেও তিনি আঁৎকাইয়া উঠিতেন এবং উহা ভিখারী বা অভাবগ্রস্ত লোককে অকাতরে দান করিতেন অথবা এমনও হইত যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ অর্থে শিষ্যবর্গকে বা বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার উপযুক্ত কিছু কিনিয়া ফেলিতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানের কার্যশেষে যখন তাঁহাকে বেশ একটা মোটা টাকা দেওয়া হয়, তখন ঐ টাকার গতি ঐরূপই হইয়াছিল। তাঁহার নিকট অর্থ বড় ছিল না, বড় ছিল মানুষ।

তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবি করিতেন; তাহা না পাইলেও স্বনির্ধারিত স্বাধীন মার্গেই চলিতেন। কেহ মুরুব্বিয়ানা করিবে ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। একসময়ে কার্যব্যবস্থা ও পরিকল্পনা বিষয়ে জনৈকা বিত্তশালিনী মহিলা স্বামীজীকে স্বমত গ্রহণ করাইতে উদ্যতা হইলে তিনি সব পণ্ড করিয়া দিলেন। তখনকার মতো ঐ মহিলা চটিয়া গেলেও পরে সহাস্যে স্নেহভরে বলিতেন, "আমি তাঁর জন্য যত মতলব আঁটি, তিনি শেষ মুহূর্তে সব ভণ্ডুল করে দেন, তিনি নিজের খেয়ালেই চলবেন। তাঁর স্বভাব যেন চীনা-মাটির আসবাবের দোকানে প্রবিষ্ট পাগলা ষাঁড়ের মতো।" সেবা বা আনুগত্যের প্রেরণায় তিনি সব কিছু করিতেই প্রস্তুত থাকিলেও বলপূর্বক তাঁহাকে দিয়া কেহ কিছু করাইবে, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল। আবার যখন তাঁহার প্রতীতি জন্মিত যে কোন ব্যক্তি ভগবন্নির্দেশে কোন ভগবৎকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি অশেষ ধৈর্য প্রদর্শন করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে ল্যাণ্ডসবার্গ (কৃপানন্দ)-এর নাম করা যাইতে পারে।

অনেক সময় তিনি বলিতেন, "শরীরটা একটা ভয়ানক বন্ধনবিশেষ", অথবা "আমার ইচ্ছা হয়, যাতে আমি নিজেকে চিরকালের মতো লুকিয়ে ফেলতে পারি"; আর সকলেই অনুভব করিত যেন তাঁহার মুক্ত আত্মা রক্তমাংসের বন্ধনে পড়িয়া আকুল আর্তনাদ করিতেছে। এইসব মুহূর্তের অনুপ্রেরণাবশেই তিনি 'খেলা হলো শেষ', 'সন্ন্যাসীর গীতি' ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং এই ভাবই বহু পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত একখানি পত্রে আছে: "আমার একখানি নোটবুক আছে যা আমার সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছে। তাতে সাত বছর আগেকার এই লেখাটি পাচ্ছি, 'এখন

এমন একটা নিরিবিলি কোণ চাই, যেখানে শুয়ে পড়ে মরতে পারি।' কিন্তু এইসব কর্ম বাকি ছিল। আশা করি, আমার প্রারব্ধ শেষ হয়েছে।" (২৪শে জানুআরি, ১৮৯৫)। "এখন এটা একটা মায়ার খেলা বলে মনে হচ্ছে যে, আমি শিশুবৎ এটা করা, ওটা করার স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি ওসব থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি।...সম্ভবতঃ আমাকে এদেশে নিয়ে আসার জন্য এসব উন্মাদসদৃশ স্বপ্নের প্রয়োজন ছিল, আর এ অভিজ্ঞতার জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ।" (১৪ই ফেব্রুআরি)। এই জাতীয় ভাব যখন আসিত তখন শিষ্যদের ভয় হইত, হয়তো বা তাঁহার লীলাবসানের দিন আগতপ্রায় এবং তিনি দেহমুক্ত হইবেন। অতএব তাঁহাকে নিম্নতর ভূমিতে বিচরণ করিতে দেখিলেই তাঁহারা স্বস্তিবোধ করিতেন।

স্বামীজীর মানুষভাবের একটি দৃষ্টান্ত ডেট্রয়েটের এক ঘটনায় পাওয়া যায়। একদিন তিনি তাঁহার এক অনুগত ভক্তের গৃহে যান এবং স্বাভাবিক সারল্য, আত্মীয়তাবোধ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুসারে বলেন যে, তিনি সেদিন কিছু ভারতীয় খাদ্য প্রস্তুত করিবেন। গৃহস্বামী সহজেই সম্মত হইলেন। তারপর সকলে দেখিয়া অবাক হইলেন যে, তিনি পকেট হইতে ছোট ছোট মোড়কে ভর্তি রকমারী মশলা প্রভৃতি বাহির করিতেছেন। এইসব তিনি সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের গৃহে গিয়া রন্ধন করিলে তাঁহারা খুব আনন্দিত হইতেন। এইসব বিষয়ে তাঁহারা সাহায্যও করিতেন এবং এইভাবে কিছুটা সময় নিকট আত্মীয়তাসুলভ অনাবিল আনন্দে কাটিত। তরকারিতে তিনি মাঝে মাঝে বেশী গরম মশলা প্রভৃতি দিতেন বলিয়া পাশ্চাত্ত্যদের পক্ষে খাওয়া কঠিন হইত, আবার কখন কখন রান্না করিতে এত দেরি হইয়া যাইত যে, ততক্ষণে অতিথিরা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। অবশ্য খাইতে বসিয়া আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইত, আর ভারতীয় মশলা মুখে দিয়া পাশ্চাত্ত্যদের কিরূপ মুখভঙ্গী হয় ইত্যাদি দেখিবার জন্য স্বামীজী উৎসুক হইয়া থাকিতেন। এইসব খাদ্য তাঁহার কর্মক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে তৃপ্তিপ্রদ হইলেও তাঁহার পরিপাকশক্তির পক্ষে খুব উপযুক্ত ছিল না, অথচ তিনি বলিতেন যে, এইগুলিতে তাঁহার উপকারই হয়। এই জাতীয় ছেলেমানুষি অপরের ভালবাসাই আকর্ষণ করিত।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের একটি ঘটনা শ্রীযুক্তা কাঙ্কি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "আমার

নাম লইয়া একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটিল। সেদিন আমরা সকলে গ্রামের দিকে বেড়াইতে গেলাম এবং পথে দেখিলাম একটি তাঁবুতে একজন লোক ফুঁ দিয়া কাঁচের সব জিনিস তৈয়ার করিতেছে। দেখিয়া স্বামীজীর ভারী আমোদ হইল এইং তিনি ঐ লোকটির কানে কানে কি বলিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, 'এসো, গ্রামের মাঝ রাস্তা ধরে একটু বেড়িয়ে আসি।' যখন বেলোয়ারীর তাঁবুতে ফিরিলাম, তখন ঐ ব্যক্তি কয়েকটি রহস্যজনক মোড়ক স্বামীজীর হাতে তুলিয়া দিল। পরে দেখা গিয়াছিল উহাতে আমাদের প্রত্যেকের জন্য উপহারস্বরূপ একটি করিয়া স্ফটিকের বল আছে আর উহার ভিতরে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে লিখিত আছে, 'বিবেকানন্দের প্রীতিসহ প্রদত্ত।' বাসগৃহে ফিরিয়া আমরা মোড়কগুলি খুলিলাম। আমার নামটা বানান করা হইয়াছিল (Funke স্থলে Phunkey) ফুঙ্কিরূপে। আমরা তো হাসিয়া লুটোপুটি, কিন্তু এমন স্থানে যেন তিনি না শুনিতে পান। তিনি তো কখনও লিখিতভাবে আমার নাম দেখেন নাই, কাজেই এইরূপ হইয়াছিল।"

শীতের দিনে আগুনের ঠিক কাছে শান্তভাবে বেশ আরামে বসিয়া তিনি অনেক সময় ছেলেবেলার গল্প শুরু করিয়া দিতেন, অথবা কোন হাস্যরসময় পুস্তক বা সাময়িক পত্র লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা পড়িয়া শেষ করিতেন। খবরের কাগজ হাতে লইয়া চিরাচরিত অভ্যাসানুরূপ কেবল শিরোনামগুলি পড়িয়া ছাড়িয়া দিতেন। এই ছিল তাঁহার চিত্তবিনোদনের উপায়। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে তাঁহার অন্তর্নিহিত ঋষি বা মহাপুরুষের স্বরূপ ইহারই মধ্যে ঝলকিয়া উঠিত। জনৈক শিষ্য স্বামীজীর মহত্ত্ব ঠিক ধরিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহাকে তিনি প্রায়শঃ এই জাতীয় আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই পাইতেন। হঠাৎ একদিন তিনি ঠিক মানুষটির পরিচয় পাইলেন। স্বামীজী আনন্দে বিহ্বল আছেন, এমন সময় শিষ্যটি ধর্মসম্বন্ধীয় একটি প্রশ্ন করিবামাত্র স্বামীজীর চেহারা বদলাইয়া গেল, হাসিঠাট্টার জায়গায় অকস্মাৎ অধ্যাত্মতত্ত্বের বন্যা প্রবাহিত হইল। শিষ্যটি বলেন, "স্বামীজী তখন চেতনার যে ভূমিতে অবস্থানপূর্বক আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন, তাহা হইতে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের পশ্চাদ্বর্তী উচ্চ হইতে উচ্চতর বহু চেতনার স্তর সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করিয়া দিলেন।" কিন্তু প্রজ্ঞাকে একভূমি হইতে অন্যভূমিতে—হাস্যকৌতুক হইতে হঠাৎ অধ্যাত্মবিষয়ে

সঞ্চালিত করাতেই যে তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে; তিনি একই সময়ে উভয়ভূমিতে অবস্থান করিতে পারিতেন। কার্যতঃ দেখা যাইত যে, যদিও তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকটতর সাধারণ স্তরে বিচরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হইত, তথাপি দ্রষ্টার মনে ঐ সঙ্গে এ বোধও জাগরিত থাকিত যে, এই ক্রীড়াচঞ্চল উপরিভাগের নিম্নে অতলস্পর্শী অগাধ সমুদ্র বিদ্যমান।

আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে সার্ধ দুই বৎসর কাজ করার পর তিনি একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের পরে কয়েকদিন ধরিয়া মনে হইত যেন মাথার ভিতরে বিকট শব্দে গাড়ির চাকাগুলি ঘুরিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে মনে হইত স্নায়ুগুলি একেবারে অবসন্ন—যেন তিনি স্নায়ুরোগগ্রস্ত। ভারতে অবস্থানকালীন কঠোর সাধনা এবং পাশ্চাত্যদেশে অকাতরে ধর্মপ্রচারের শ্রম এত মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে, শরীরের পক্ষে তাহা আর সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। বন্ধুরা ভয় করিতেছিলেন, শরীর হয়তো একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ফলতঃ ভাঙ্গিয়াও পড়িতেছিল, তথাপি তিনি নিজে ঐ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য কার্যে নিযুক্ত হইতেছিলেন। যাঁহারা তাঁহার বাণী গ্রহণে আগ্রহশীল, তাঁহাদের কল্যাণার্থ তিনি দেহমন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার থামিবার উপায় ছিল না।

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে স্বামীজীর আর যেসব চরিত্রগত ও উপদেশগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অনেকটাই আমাদের নিকট অজ্ঞাত এবং অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের একজন বলিয়াছিলেন, "দিবসের প্রতি দণ্ডে কত নবীন ভাব, নূতন মানবীয় আনন্দ, মানবের দেবত্ব ও আত্মার অসীমত্ব সম্বন্ধে কত নবালোকপ্রদ চিন্তা, কত অভিনব অফুরন্ত আশা, কত অজ্ঞাতপূর্ব চমকপ্রদ পরিকল্পনা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া বিচ্ছুরিত হইত!" অপর এক শিষ্য বলিয়াছিলেন, "শুধু বেড়াইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে রাস্তা ধরিয়া চলিতে গেলেও দেখা যাইত অকস্মাৎ নিছক রঙ্গরস হইতে অচিন্ত্যপূর্ব চমৎকার চিন্তারাজ্যে বা শক্তিকেন্দ্রে উপস্থাপিত হইয়া গিয়াছি।" আর একজন লিখিয়াছিলেন, "তিনি সর্বদা এই বোধ জাগাইয়া দিতেন যে, তাঁহার সবটুকুই যেন বিদেহ আত্মা, তাহার গরিমময় বরবপু দুর্নিবার বলে প্রত্যেকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে থাকিলেও এইরূপ বোধ অব্যাহত থাকিত।" আরও একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর উপস্থিতি অপরের উপর যে কিরূপ অপ্রতিহত

প্রভাব বিস্তার করিত তাহা আমার পক্ষে বলা অসাধ্য। তিনি আপনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং যখন তিনি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত গুরুগম্ভীরভাবে কথা বলিয়া যাইতেন, তখন আমার এই কথাটি প্রায় অসম্ভব মনে হইলেও শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ সত্য সত্যই বোধ করিতেন যে, তাঁহারা যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন ; তাঁহার চিন্তা ও যুক্তির অতি সূক্ষ্ম ধারা তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। আমি এমন এক ব্যক্তির কথা জানি যিনি স্বামীজীর সহিত একদিন আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়া এরূপ স্নায়বিক আঘাত পাইয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাকে কয়েকদিন শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল একাধারে গম্ভীর অথচ ভয়-ভক্তি-সঞ্চারক। তাঁহাতে এমন শক্তি ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে অপরের ব্যক্তিত্বকে সত্য সত্যই নস্যাৎ করিয়া দিতে পারিতেন।”

অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিত যে, বিরোধী পক্ষকে তিনি যখন নিজমত সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া বলিতে বাধ্য করিতেন, তখন সে যত বলিতে যাইত ততই আপন যুক্তিজালে জড়াইয়া বিভ্রান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িত ; অথচ এই জাতীয় যেসব ব্যক্তি তাঁহার তেজোদীপ্ত শক্তিপ্রভাবে বিবশ হইয়া পড়িত তাহারাই আবার তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের অকাট্য সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হইত। তাহারা বলিত, “ইঁহার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিপত্তি ও মাধুর্যের অত্যাশ্চর্য সন্নিবেশ ঘটিয়াছে ; ইনি একাধারে শিশু ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।” বস্তুতঃ এই বিষয়ে এত ঘটনা আছে যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বামীজী নিজেও বক্তৃতাকালে বোধ করিতেন এবং সময়বিশেষে অপরকেও বলিতেন তিনি শুধু বক্তৃতামাত্র দেন না, ঐকালে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটা অধ্যাত্মসূত্র স্থাপন করেন এবং সেই সূত্রাবলম্বনে বক্তার শক্তি শ্রোতৃমধ্যে সঞ্চারিত হয়। স্বামীজী আপনাকে আক্ষরিক অর্থে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন করিতেন।

তাঁহার বক্তৃতাগুলিকে বুদ্ধিপ্রসূত না বলিয়া দিব্যপ্রেরণা-লব্ধ বলা উচিত। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার ‘স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি’ গ্রন্থে স্বামীজী নিজে বক্তৃতাপ্রদান-বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন : “তিনি বলিয়াছিলেন, রাত্রে তাঁহার নিজের ঘরে এক অশরীরী স্বর পরদিবসের বক্তৃতার কথাগুলি তাঁহাকে শুনাইয়া জোরে জোরে বলিতে থাকিত

এবং পরদিন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিতেন ঐ কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। কখনো কখনো শুনিতেন দুইটি স্বর পরস্পর আলোচনা করিতেছে। কখনো মনে হইত কোন সুদূর হইতে যেন ঐ স্বর দীর্ঘ বীথিকা-বলম্বনে তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে ; হয়তো পরে ক্রমে নিকটে আসিতে আসিতে উহা উচ্চরবে পরিণত হইত। 'এটা ধরে নিতে পার', তিনি বলিতেন, 'অতীতে দৈবপ্রেরণা শব্দটি যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক না কেন, সেটা এ রকমেরই কোন কিছু হবে'।" ভগিনী নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন, "আবার জাহাজে বসিয়া তিনি বিবাহ সম্বন্ধে একটা স্বপ্নের কথা আমাদের বলিয়াছিলেন : 'ঐ স্বপ্নে আমি শুনিয়াছিলাম, দুইটি অশরীরী বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিবাহের আদর্শ লইয়া বিচার করিতেছে এবং ঐ বিচারের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, উভয় আদর্শের মধ্যে নিজস্ব এমন একটা কিছু সত্য আছে, যাহা হারাইলে জগতেরই ক্ষতি হইবে'।" ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্বামীজী সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মাঝে মাঝে পাশ্চাত্ত্য ব্যবস্থার সমালোচনা করিলেও উহার ভাল দিকটাও সাদা চোখেই দেখিতেন এবং স্বীকারও করিতেন।

স্বামীজী একসময়ে ইচ্ছামাত্র রোগ সারাইতে পারিতেন, কিন্তু এই শক্তি তাঁহার আছে জানিয়াও তিনি সচরাচর উহা ব্যবহার করিতেন না, অতএব উহা তেমন সুবিদিত নহে। এইটুকু তাঁহার জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, জনৈকা আমেরিকান স্ত্রীলোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি তাহার 'হে ফিভার' নামক জ্বর সারাইয়াছিলেন। অনেকদিন পরে ঐ স্ত্রীলোকটি স্বামীজীর একজন শিষ্যকে পত্র লিখিয়া ঘটনাটি এইরূপে প্রকাশ করেন : "বন্ধুটির বাটীতে বাসকালে আমি জ্বরে পড়িলাম। সে বড় বিষম জ্বর। আমায় যন্ত্রণায় ছটফট করিতে দেখিয়া স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার অসুখ সারিয়ে দিব ?' আমি বলিলাম, 'তা যদি পারেন তো বড় সুখের বিষয় হয়।' এই কথা শুনিয়া তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন এবং আমার হাত দুখানি তাঁহার হাতের তালুর উপর রাখিতে বলিলেন। আমি ঐরূপ করিলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার হাত দুইটি শীতল হইয়া আসিল এবং মনে হইল তিনি যেন কাঠের মতো শক্ত হইয়া গিয়াছেন। কতক্ষণ পরে (অল্প কি অধিক বলিতে পারি না) তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন এবং উঠিয়া দ্রুতগতি গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে আমার জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখের এক পত্রে এইরূপ ব্যাপারের সূক্ষ্মতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে লিখিয়াছিলেন : "এবার একটি আশ্চর্য বিষয় বলি, শোন। যখন তোমাদের কাহারও কোন পীড়া হইবে, তখন সে নিজে বা অপর কেহ তাহার মূর্তিটাকে বেশ করিয়া মনে মনে ধ্যান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে, 'সে নীরোগ, তার কোন অসুখ নাই।' দেখিবে সে নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে। যাহার পীড়া হইয়াছে, তাহাকে না জানাইয়াও, বা সে শত শতক্রোশ দূরে থাকিলেও এই উপায়ে তাহাকে আরোগ্য করা যায়। কথাটা মনে রেখো।" স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'লণ্ডনে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বামীজী একবার চিন্তাশক্তিবলে তাঁহারও জ্বর সারাইয়াছিলেন (১ম খণ্ড, ৬১-৬২)।

এইসব গুরুগম্ভীর কথা ছাড়িয়া স্বামীজী হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়া কিরূপে আমেরিকানদের হৃদয় জয় করিতেন তাহারই সম্বন্ধে আরও দুই-একটি ঘটনা বলি। স্বামীজী নিজে হাস্যরসিক ছিলেন, হাস্যকর পরিস্থিতিও বেশ উপভোগ করিতেন ও সানন্দে তাহাতে যোগ দিতেন, যদিও সেজন্য হয়তো একটু-আধটু অসুবিধায়ও পড়িতে হইত। আমেরিকায় এক চিত্রকর-দম্পতি ছিল, যাহারা বেশ আনন্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত এবং উভয়ের মধ্যে কে কত দ্রুত ও ভাল ছবি আঁকিতে পারে এই বিষয়ে পাল্লা চলিত। এক সময়ে তাহারা স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন মাঝে মাঝে বাইসাইকেলে চড়িয়া যন্ত্রপাতিসহ তাঁহার নিকট আসিত ও দুইজন দুইদিকে বসিয়া কে কত দ্রুত অথচ হুবহু আঁকিতে পারে এই লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিয়া দিত। এদিকে আড়ষ্টভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকা একটু কষ্টদায়ক হইলেও স্বামীজী তাহাদের আমোদে মন খুলিয়া যোগ দিতেন। ('লণ্ডনে বিবেকানন্দ', ১৪০)।

আমেরিকায় নাপিতের দোকানে চুলদাড়ি কামাইলেও নখ প্রায়শঃ নিজেরাই কাটে। হেলদের বাড়িতে থাকাকালে একবার পায়ের নখ বাড়িয়া যাওয়ায় স্বামীজী হেলকন্যাদের একজনের নিকট একখানি কলমকাটা ছুরি চাহিলেন। মেয়েটি প্রশ্ন করিল, "কি হবে ?" স্বামীজী নখ-কাটার কথা বলিলে সে যন্ত্রপাতি আনিয়া ও স্বামীজীর জুতা-মোজা খুলিয়া বেশ যত্নসহকারে পায়ের নখ কাটিয়া দিল এবং আবদার করিল, নাপিতের দোকানে এ পরিশ্রমের মূল্য তিন-চারি ডলার ; তাহাকে অন্ততঃ এক ডলার পারিশ্রমিক দিতে হইবে। স্বামীজীও

অমনি সহাস্যে জবাব দিলেন, মহাপুরুষের পাদস্পর্শ সৌভাগ্যবশে ঘটে, পোপের পা ছুঁইতে হইলে অর্থ দিতে হয়। পরিশ্রম করিয়া অর্থপ্রাপ্তির বদলে উলটা আবার অর্থদণ্ড দিতে হইবে শুনিয়া মেয়েটি হঠাৎ কোন পালটা জবাব দিতে পারিল না; সে হাসিতে হাসিতে নাচার ভঙ্গীতে ঘর হইতে চলিয়া গেল। (ঐ, ১২৭)।

গুডউইন বলিতেন, তিনি গরীবের ছেলে; তাই পূর্বে রোজগারের ধান্দায় অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে ঘুরিতে হইয়াছিল, কিন্তু এইভাবে জীবনধারণের উপায় পাইলেও এবং দ্রুতলিখন-ব্যপদেশে অনেক বড়-লোকের সান্নিধ্যলাভ ঘটিলেও তিনি প্রকৃত ভালবাসা কাহারও নিকট পান নাই। পরিশেষে স্বামীজীর অকৃত্রিম স্নেহমমতায় ধরা পড়িয়া তিনি অর্থোপার্জনের চেষ্টা বর্জন করেন। স্বামীজী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার সহিত হাসিঠাট্টাও করিতেন। গুডউইনের পূর্বে এক মস্ত দোষ ছিল জুয়া খেলা। আর উহাতে তিনি প্রায়ই হারিতেন। স্বামীজী ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "তোমার নাম গুড-উইন না হয়ে হওয়া উচিত ছিল ব্যাড-উইন।" আর তখন গুডউইন মাথা নীচু করিয়া বলিতেন, "না, আমার নাম গুড-উইন, ব্যাড-উইন নয় (দুর্ভাগা নয়, সুভাগা)।"

বিদেশবাসের শেষ বৎসরে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অধিকতর খোলাখুলি-ভাবে বলিতেন, তাঁহার কথাবার্তায় শ্রীগুরুর উপর একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব প্রকাশ পাইত। আবার এই গুরুভক্তিরই দৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বপ্রেমের সুরটিও সহজেই ধরা পড়িত। ৯ই সেপ্টেম্বর (১৮৯৫) তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়া-ছিলেন: "আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের ওপর আমার তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। ...কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি?...আমার পেছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড়।...আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।" ৪ঠা অক্টোবর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "তিনি যে রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে।...একি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন?" ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেরই একদিন তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "এদেশ হ'তে

শীঘ্র দেশে যাওয়ায় কোন লাভ নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজলে, দেশে মহাধ্বনি হয়, তারপর এদেশের লোকেরা মহাধনী ও ছাতিওয়ালা। দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং ছাতি একেবারেই নাই। ক্রমশঃ প্রকাশ্য! তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? ঐ সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে। তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব।... কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না।" স্বামীজীর মতে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করা মানেই উদারতা বরণ করা। এই উদারতার ভিত্তির উপরই তাঁহার আমেরিকার কাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

আমেরিকায় থাকা-কালে তিনি নানাবিধ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। বিবিধ কারণে ঐগুলি কার্যে পরিণত না হইলেও উহা হইতে তাঁহার চিন্তাধারা বুঝিতে পারা যায়। এককালে তিনি সার্বভৌম মন্দির এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, ইহার আভাস আমরা তাঁহার পত্রে ও বল্টিমোর ভ্রমণ উপলক্ষে পাইয়াছি। ১৮৯৫-এর প্রথমভাগে এক পত্রে (২৪শে জানুআরি) তিনি আর একটি পরিকল্পনার কথা শ্রীযুক্তা বুলকে জানাইয়াছিলেন। ক্যাটস্‌কিল পর্বতে প্রকাণ্ড জমি কিনিয়া তিনি তাহাতে সাধনক্ষেত্র রচনা করিবেন এবং পাশ্চাত্ত্য ভক্তগণ গ্রীষ্মকালে তথায় যাইয়া ইচ্ছানুরূপ কুটীর নির্মাণ করিয়া বা তাঁবু খাটাইয়া সাধনায় রত হইবেন। কিছুদিন এইভাবে চলিয়া পরে স্থায়ী আশ্রম স্থাপিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে অর্থ ব্যয় করিবেন। বলা বাহুল্য উভয় অভিপ্রায় অসিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

ফলতঃ যে কয়টি বৎসর স্বামীজী আমেরিকায় ছিলেন, সব সময়টাই তিনি আমেরিকার অধ্যাত্মজীবনের উন্নতিকল্পে ব্যক্তিগতভাবে নানা কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বৃহত্তর কার্যধারার কথাও ভাবিতেছিলেন। অবশ্য আমেরিকানরা সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিল না, পারিলে তাঁহার সর্বনাশ করিতে পারে এরূপ ব্যক্তিও সেদেশে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ইষ্ট বা অনিষ্টের কথা না ভাবিয়া স্বামীজী স্বকার্য সাধনে রত হইয়াছিলেন এবং সাফল্যও পাইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন চার্চ, রমাবাঈ-মণ্ডলী ও অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বহু বন্ধুলাভে সমর্থ হন। পাদ্রীরা ও রমাবাঈ-মণ্ডলী যখন তাঁহার শত্রুতাচরণে ব্যস্ত, প্রায় সেই সময়েই তিনি বহু বন্ধুলাভে সমর্থ হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে পণ্ডিতাগ্রণী দর্শনাধ্যাপক

উইলিয়ম জেমস-এর সহিত তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলের গৃহে পরিচিত হন। অধ্যাপক নৈশভোজনে আসিয়াছিলেন। আহারের পর তিনি ও স্বামীজী অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপি চুপি আলাপ করিতে থাকেন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এই আলোচনা চলিতে থাকে। এই দুই বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে এতক্ষণ কি কথাবার্তা হইয়াছিল, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া পরে ওলি বুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, অধ্যাপক জেমসকে আপনার কেমন মনে হল ?" স্বামীজী বলিলেন, "অতি চমৎকার লোক, অতি চমৎকার লোক।" 'চমৎকার' কথাটি বেশ জোর দিয়া উচ্চারণ করিলেন। পরদিন স্বামীজী ওলি বুলের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, "আপনার হয়তো এটা পড়বার আগ্রহ হবে।" ২৮শে মার্চ (১৮৯৬) তারিখ সম্বলিত এই পত্রখানি ওলি বুল পড়িলেন এবং দেখিয়া অবাক হইলেন যে, অধ্যাপক ঐ পত্রে স্বামীজীকে 'গুরুজী' (মাস্টার) বলিয়া সম্বোধনপূর্বক দিন কয়েক পরে স্বগৃহে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। অধ্যাপক জেমসের গ্রন্থেও স্বামীজীর উল্লেখ আছে, তিনি স্বামীজীকে বৈদান্তিক-শিরোমণি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম্' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তিনি অদ্বৈতমতানুসারে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা লিখিতে গিয়া স্বামীজীর নাম করিয়াছেন। 'ভ্যারাইটিজ্ অব রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স' গ্রন্থের বিভিন্ন পাদটীকায় তিনি স্বামীজীর কয়েকখানি পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'দি এনার্জিজ অব মেন'-এ তিনি এমন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কথা বলিয়াছেন যিনি স্নায়ুরোগ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য রাজযোগ অভ্যাস করিয়া তাহার ফলে শুধু আরোগ্যলাভই করেন নাই, বুদ্ধি এবং অধ্যাত্মানুভূতিতেও উৎকর্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন।

মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রেও স্বামীজীর সহিত বহু মনীষীর মিলন ঘটিয়াছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পরে প্রসিদ্ধ বৈদ্যুতিক আবিষ্কারক অধ্যাপক এলিসা গ্রে ও তাঁহার স্ত্রী স্বামীজীর সংবর্ধনার্থ চিকাগোর হাইল্যাণ্ড পার্কে অবস্থিত মনোরম বাসভবনে স্বামীজীকে নিরামিষাহারীদের এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন, স্যর উইলিয়াম থম্পসন (পরে লর্ড কেল্‌ভিন), অধ্যাপক হেল্‌মহোলৎজ এবং অ্যারিটোন হোপিট্যালিয়া। স্বামীজীর বিদ্যুৎ-

বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানবিষয়ক শ্লেষযুক্ত সরস টিপ্পনিগুলিতে আমোদিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের ডাঃ গার্নসীর গৃহে অবস্থানকালে ডাঃ লীম্যান এবট-এর সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং সমকালেই তিনি 'আউটলুক' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত নৈশভোজনে নিমন্ত্রিত হন। অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। মানুষের প্রতি একটা স্বাভাবিক টানই ছিল এইসব মেলামেশার কারণ, সর্বক্ষেত্রে মানুষই ছিল তাঁহার স্বজন। তিনি স্বয়ং সম্মানপ্রার্থী ছিলেন না, অপরের বন্ধুত্ব লাভের জন্য কোন হীনবৃত্তি অবলম্বনেও প্রস্তুত ছিলেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার স্পষ্ট নির্ভীক বাক্য বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ ঘটাইতেছে জানিয়াও তিনি সত্যভ্রষ্ট হইতেন না। লোকরঞ্জনের জন্য সাধারণ বক্তা বা প্রচারক যে দাসসুলভ মনোবৃত্তি অবলম্বন করেন, স্বামীজী তাহা না করিয়া বরং স্পষ্ট ভাষায় আমেরিকান সমাজের দোষোদ্ঘাটন করিতেন। ইহাতে প্রথমতঃ অনেকে বিরক্তিবোধ করিলেও পরে তাহারা তাঁহার সত্যবাদিতা ও সারল্যের প্রশংসাই করিত।

ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনা যে একটু মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত না, এরূপ নহে। আর ইহাতে স্বামীজী নিজেও দুঃখিত হইতেন। বিশেষতঃ এক দিনের ঘটনার জন্য তিনি খুবই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সেদিন বস্টনের এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি 'মদীয় আচার্যদেব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।[১] বৈরাগ্যমণ্ডিত সন্ন্যাসী যখন বলিতে দাঁড়াইলেন, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবলী, তখন সম্মুখে ইহলোকসর্বস্ব, ধর্মে আস্থাহীন ও ভোগবিলাসে নিরত শ্রোতাদের দেখিয়া ভাবিলেন, ইহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কি বুঝিবে, আর ইহাদের সম্মুখে এই অপূর্ব বৈরাগ্যাদর্শ স্থাপনেরই বা মূল্য কি? এইরূপ বিরুদ্ধ চিন্তার বশবর্তী হইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ ও উহার মূল্যায়নমাত্রে নিরত না থাকিয়া আমেরিকান সভ্যতার অপকৃষ্ট দিকটাকে এমন নির্মমভাবে কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ইহাতে বিরক্ত হইয়া শত শত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সভা হইতে চলিয়া গেলেন। স্বামীজী ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ঐভাবেই

১। ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বক্তৃতা শেষ করিলেন। পরদিন এই বক্তৃতার বিবরণপ্রসঙ্গে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রশংসা থাকিলেও সমালোচনাও যথেষ্ট প্রকাশিত হইল ; তবে সব কাগজই একবাক্যে তাঁহার নির্ভীকতা, অকপটতা ও সারল্যের প্রশংসা করিল। স্বামীজী সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিবরণ পাঠ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং অশ্রুমোচন করিতে করিতে বন্ধুদের বলিলেন, "আমার গুরুদেব মানুষের দোষ দেখিতেন না ; নিজের সর্বাধিক নিন্দুকের প্রতিও তিনি প্রেম ব্যতীত অন্য ভাব পোষণ করিতেন না। আমার গুরুদেবের কথা বলিতে গিয়া অপরের নিন্দা করিয়া এবং তাহাদের মনে আঘাত দিয়া আমি গুরুদ্রোহের অপরাধ করিয়াছি। সত্য বলিতে কি, আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে পারি নাই এবং আমি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলার অনুপযুক্ত।"

এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। স্থলবিশেষে যদিও তিনি আমেরিকার সমাজের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করিতেন তথাপি ইহা সম্পূর্ণ অলীক যে, তিনি আমেরিকার নারী-সমাজকে নিন্দা করিয়াছেন। মিশনরীরা স্বার্থোদ্ধারের জন্য অবশ্য এমন অসম্ভব কথারও অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতা, রচনা ও পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে তিনি তাহাদের প্রতি কত কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিলেন। জগতের মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না, বিশেষতঃ নানাভাবে নারীদিগের নিকট লব্ধ উপকাররাশির কথা প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার মুখ ও লেখনী যেন উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইত না। মাতৃভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীযুক্তা ওলি বুলের গৃহে বাসকালে তিনি যেসব বক্তৃতা দেন তাহার মধ্যে তাঁহার 'ভারতীয় নারীর আদর্শ' নামক ভাষণটি ভাষা, ভাবাবেগ, বাগ্মিতা ও চিন্তার অভিনবত্বে আমেরিকান নারী সমাজের নিকট বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ওলি বুলের ঐকান্তিক আগ্রহে বস্টনের উপকণ্ঠে কেম্ব্রিজের মহিলাদের সম্মুখে প্রদত্ত এই বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় নারীজীবনের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন প্রসঙ্গে যখন মাতৃভাবের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইলেন, তখন একদিকে যেমন ভারতীয় সমাজের একটি মূল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইল, অপর দিকে তেমনি বিবেকানন্দের অপূর্ব মাতৃভক্তিও যেন মূর্তি ধারণ করিল এবং বিশ্বের নারী-সমাজের প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা জনসাধারণের সমক্ষে প্রকটিত হইয়া পড়িল।

এই বক্তৃতা বিষয়ে শ্রীযুক্তা ওলি বুল লিখিয়াছিলেন: "…তিনি বেদ, সংস্কৃত সাহিত্য ও নাটকাদি হইতে এই সকল আদর্শের উদাহরণ উদ্ধৃত করিলেন এবং বর্তমানকালের যে সকল রীতি-পদ্ধতি ভারতীয় নারীর উন্নতির অনুকূল ও সহায়ক, তাহা প্রদর্শন করিয়া সর্বশেষে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় জননীর উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জননীর নিঃস্বার্থ স্নেহ পূতচরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি সন্ন্যাস-জীবনের অধিকারী হইয়াছেন। এবং তিনি জীবনে যা কিছু সংকার্য করিয়াছেন, সমস্তই সেই জননীর কৃপাপ্রভাবে।" স্বামীজীর জীবনের বিশেষত্বই এই ছিল যে, তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই অবকাশ ঘটিলে মুক্তকণ্ঠে স্বীয় জননীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। একবার যে বন্ধুগৃহে স্বামীজী থাকিতেন সেই গৃহেই একই কালে কয়েক সপ্তাহ বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এমন এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "তিনি তখন তাঁহার মায়ের কথা বলিতেন। আমার মনে আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মাতার সংযমশক্তি ছিল অপূর্ব এবং তিনি অপর কোন মহিলাকে একটানা তাঁহার মতো দীর্ঘকাল উপবাস করিতে দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মা এক সময় সুদীর্ঘ চৌদ্দ দিন উপবাসে কাটাইয়াছিলেন। স্বামীজীর শিষ্যগণ প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনিতেন, 'মা-ই তো আমাকে এই প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র আমার জীবন ও কার্যের চির-প্রেরণাস্থল'।" স্বামীজী তখন আমেরিকান সমাজে মাতৃভাবেরই প্রচার করিতেছিলেন।

আমেরিকার বর্ষীয়সী মহিলাদের প্রতিও স্বামীজীর আচরণ ছিল বালক-সদৃশ; তাঁহারা ছিলেন তাঁহার মা। এই সরল শিশুর সম্মুখে তাই তাঁহারাও একটা মাতৃজনোচিত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন। শ্রীযুক্তা লেগেট বলিয়াছিলেন, "সারা জীবনের অভিজ্ঞতামধ্যে আমি এমন দুইজন মাত্র জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির দর্শন পাইয়াছি, যাঁহাদের সম্মুখে মানুষ নিজের মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ মনে চলা-ফেরা করিতে পারে—একজন ছিলেন জার্মান সম্রাট কাইজার এবং অপর জন স্বামী বিবেকানন্দ।"

আর ছিল শত কার্য ও মেলামেশার মধ্যেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠা। আমেরিকান কোন কোন সংবাদপত্রে যে তাঁহাকে 'আভিজাত্যসম্পন্ন সন্ন্যাসী' বলা হইত, তাহা সত্যই বটে। পাশ্চাত্ত্য দেশে স্বামীজীর কার্যাবলীর অনুধ্যান

করিলে মনে হয়, তিনি যেন এক প্রবল, সমুজ্জ্বল ও পবিত্র অগ্নিশিখাসম ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। চিন্তায় দার্শনিকশ্রেষ্ঠের গাম্ভীর্য ও মৌলিকতা, দৃষ্টিতে সত্যসন্ধ ঋষির অভ্রান্তি, কার্যে সিংহসদৃশ সাহস ও বিক্রম এবং ভাবসঞ্চারণে অবতারকল্প ব্যক্তির অসীম শক্তি লইয়া অনুরাগী ও ভক্তিমান শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত স্বামীজী বর্তমান যুগে যেন এক নবীন জ্ঞান-ভক্তি-যোগালঙ্কৃত বোধিসত্ত্বরূপে জগৎকল্যাণে নিরত ছিলেন। চিকাগো মহাসভায় ও তৎপরবর্তী ভাষণাদির অনুধাবন করিলে স্বতঃই মনে হয়, ইঁহার বাণী বুদ্ধিপ্রসূত নহে, প্রত্যুত অনুভূতিসম্ভূত এবং তাহা অপরের প্রমাণস্থল। তাঁহার হস্ত সর্বদা সম্প্রসারিত হইত অপরের কল্যাণ-সাধনে, তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইত শ্রীভগবানের জয়গীতি, মুখে তাঁহার অঙ্কিত থাকিত ভগবৎ-প্রেমিকসুলভ স্নেহমমতা এবং হৃদয়টি অহরহঃ কাঁদিত অপরের ব্যথায়। তিনি বলিতেনও, "আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি।" আমেরিকাবাসীরা তাঁহার মধ্যে পাইয়াছিল এমন এক ব্যক্তিকে যিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর, ভগবান যাঁহার হাত ধরিয়া ছিলেন, অথচ জগৎকে দিবার মতো যাঁহার যথেষ্ট সম্বল ছিল এবং তিনি দিয়াও ছিলেন সব উজাড় করিয়া।

আমেরিকায় ভালভাবে কাজ করিতে হইলে তথাকার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক এবং সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি অন্ততঃ আংশিক মানিয়া লওয়া প্রয়োজন—ইহা স্বামীজী জানিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।" স্বামীজী তাই আমেরিকানদের সহিত একটা আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তাহাদের আদব-কায়দা, আচার-বিচার ইত্যাদি বেশ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেন ও শিখিয়া লইতেন। ভদ্রলোকদের সহিত তাঁহাদেরই দেশীয় কায়দায় ভদ্রভাবে ব্যবহার করিতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি সর্বদাই অনুরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। এই জন্যই আমেরিকায় অনেকে বলিত, "সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানোই তাঁহার ধর্ম হইলেও তিনি বড় ঘরের ছেলে—আদব-কায়দা সব আগেরই মতো আছে, কিছুই ভুলেন নাই।" কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কার্যব্যপদেশ ও প্রীতির আকর্ষণে তিনি আমেরিকান-জীবনের প্রতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আনুগত্য স্বীকার করিলেও মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে তিনি তাঁহার ভারতীয় শাশ্বত বৈশিষ্ট্য ও সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। এই দিকটাই তাঁহাকে আমেরিকানদের নিকট অধিকতর শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিভাজন করিয়া তুলিত। ফলতঃ তিনি প্রতি-ক্ষেত্রেই ছিলেন আচার্য—অপরকে সুপথে পরিচালনা করাই ছিল তাঁহার কর্তব্য, পরিচালিত হইতে তিনি মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন নাই।

লণ্ডনে দ্বিতীয়বার

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল স্বামীজী নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন—হোয়াইট স্টার লাইনের 'জার্মানিক' জাহাজে। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া রেডিং হইতে ২০শে এপ্রিলের পত্রে হেল ভগিনীদিগকে জানাইলেন : "এবার সমুদ্রযাত্রা আনন্দদায়ক হয়েছে এবং কোন পীড়া হয়নি। সমুদ্রপীড়া এড়াবার জন্য আমি নিজেই কিছু চিকিৎসা করেছিলাম। আয়ার্লণ্ডের মধ্য দিয়ে এবং ইংলণ্ডের কয়েকটি পুরানো শহর দেখে এক দৌড়ে ঘুরে এলাম, এখন আবার রেডিং-এ 'ব্রহ্ম, মায়া, জীব, জীবাত্মা ও পরমাত্মা' প্রভৃতি নিয়ে আছি। অপর সন্ন্যাসীটি এখানে রয়েছেন ; আমি যত লোক দেখেছি, তাদের মধ্যে তিনি একজন চমৎকার লোক, বেশ পণ্ডিতও। আমরা এখন গ্রন্থগুলি সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি—নিতান্ত নীরস, একটানা এবং গদ্যময়, আমার জীবনেরই মতো। আমি যখন আমেরিকার বাইরে যাই, তখনই আমেরিকাকে বেশী ভালবাসি। যাই হোক, এ পর্যন্ত যা দেখছি, তার মধ্যে ওখানকার কয়েকটি বছরই সর্বোৎকৃষ্ট।"

আমরা জানি, স্বামীজী দীর্ঘকাল যাবৎ ভারত হইতে একজন গুরুভ্রাতাকে আনাইয়া তাঁহার হস্তে লণ্ডনের কার্যভার অর্পণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু গুরুভাই ঠিক সময়ে না আসিয়া স্বামীজীর লণ্ডনে আগমনের দিন কয়েক পূর্বে ১লা এপ্রিল স্টার্ডির গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলমবাজার মঠের সাধুবৃন্দ অনেক ভাবিয়া স্বামী সারদানন্দকে এই কার্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। স্টার্ডির গৃহে তাঁহাকে পাইয়া স্বামীজী খুবই আনন্দিত হইলেন। প্রায় তিনটি বৎসর পরে এই প্রথম তিনি একজন গুরুভ্রাতার মুখ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার নিকট মঠের যেসব সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে, মঠের কার্যপ্রণালীর দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক এবং যে গতানুগতিকভাবে তদানীন্তন ভারতীয় কার্য পরিচালিত হইতেছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া যুগোপযোগী অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই প্রকার চিন্তাপরবশ হইয়া তিনি অবিলম্বে (২৭শে এপ্রিল) পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র

লিখিলেন। পত্রের ভূমিকায় আছে : "আমি নিজের কর্তৃত্বলাভের আশায় নয়, কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও প্রভুর অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্য লিখিতেছি। তিনি তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও; এজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে। তোমাদের মধ্যে দ্বেষভাব ও অহমিকা প্রবল হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। যারা দশজনে দশদিন প্রীতির সহিত বাস করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের দ্বারা জগতে প্রীতিস্থাপন কি সম্ভব? নিয়মবদ্ধ হওয়া ভাল নয় বটে, কিন্তু অপক্ক অবস্থায় নিয়মের বশে চলার আবশ্যক —অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি।...সেই জন্য নিম্নলিখিতনির্দেশগুলি লিখিতেছি।" অতঃপর "প্রথমতঃ মঠ চালাইবার সম্বন্ধে" নির্দেশ দিয়া পরে লিখিলেন, "মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা: (১) বিদ্যা-বিভাগ, (২) প্রচার-বিভাগ, (৩) সাধন-বিভাগ।" সর্বশেষে "কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ" দিয়া ও কর্মচারি-সভার কথা বলিয়া লিখিলেন, "যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এইসকল নিয়ম পালন কর, তাহ'লে আমি মঠভাড়ার এবং সমস্ত খরচপত্র পাঠিয়ে দেবো। নতুবা তোমাদের সঙ্গ-ত্যাগ—একদম। অপিচ গৌর-মা, যোগীন-মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐ প্রকার একটা (মঠ) মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে।" চিঠিখানি পড়িলেই অনুমিত হয়, স্বামীজীর মন তখন ভারতীয় কার্যের জন্য একটা বড় রকমের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত ছিল এবং উহারই ভিত্তিস্বরূপে তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের কল্যাণ বিধানার্থ এই কাল হইতে স্ত্রীমঠ স্থাপনের অভিপ্রায়ও পরিষ্কারভাবে জানাইতে থাকেন।

এবারেও তিনি স্টার্ডির বাটীতে অধিক দিন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ মে মাসের এক পত্রে প্রকাশ, তাঁহারা দুই গুরুভ্রাতা লণ্ডনের এক ভাড়া-বাড়িতে আছেন। ঐ পত্রে স্বামী সারদানন্দ সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য আছে। মনে রাখিতে হইবে, সারদানন্দজী তখন সবেমাত্র বিদেশে আসিয়াছেন। পত্রে আছে: "আমাদের ব্যবহারের জন্য এবার একটা গোটা বাড়ি পাওয়া গেছে। বাড়িটি ছোট হলেও বেশ সুবিধাজনক। লণ্ডনে বাড়ি-ভাড়া আমেরিকার মতো তত বেশী নয়, তা বোধ হয় তুমি জানো।...আমরা এই বাড়িতে বেশ ছোট-

খাটো একটি পরিবার হয়েছি; আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন সন্ন্যাসী। 'বেচারা হিন্দু' বলতে যা বোঝায়, তা এঁকে দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে। সর্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন; অতি নম্র ও মধুরস্বভাব। আমার যেমন একটা অদম্য সাহস ও ঘোর কর্মতৎপরতা আছে, তাঁতে তার কিছুই নেই। ওতে চলবে না। আমি তাঁর ভেতর একটু কর্ম-শীলতা প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রব। এখনই আমার ত্রুটি ক'রে ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাস ঐরূপ চলবে—তারপর ভারতে যাচ্ছি; কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে—আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি।"

লণ্ডনে ক্ষেত্র প্রস্তুত রহিয়াছে এবং পূর্বপরিচিত ও নবাগত তত্ত্বান্বেষীদের আগ্রহ মিটাইবার জন্য তাঁহাকে কঠোর শ্রম করিতে হইবে, ইহা জানিয়া তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। ইংরেজী জীবনীর মতে স্বামীজী লণ্ডনে ৬৩নং সেণ্ট জর্জেস রোডের ভাড়া-বাড়িতে[১] "শ্রীমতী মূলার ও শ্রীযুক্ত স্টার্ডির অতিথিরূপে বাস করিতেন।" ঐ বাড়িতে আসিয়া মে মাসের প্রথমেই তিনি জ্ঞানযোগ[২] সম্বন্ধে ক্লাস আরম্ভ করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে ধর্মালোচনা ও সাধারণের জন্য বক্তৃতাও চলিতে লাগিল। পরে রাজযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধেও প্রবচনাদি শুরু হইল। তাঁহার পাণ্ডিত্য, যুক্তি ও বাগ্মিতা যেমন একদিকে বুধমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিত, অসাধারণ অনুভূতির স্পর্শ, মধুর বাক্যালাপ, অমায়িক ব্যবহার, ত্যাগোজ্জ্বল অনিন্দনীয় দেবদুর্লভ চরিত্রও তেমনি বহু হৃদয়ে ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা জাগাইত।

মে মাসের শেষভাগ হইতে তিনি প্রতি রবিবারে পিকাডিলি অঞ্চলে 'রয়েল ইনষ্টিটিউট অব পেইনটার্স ইন ওয়াটার কালার্স' নামক প্রতিষ্ঠানের একটি গ্যালারীতে যেসকল ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, তাহার বিষয় ছিল, 'ধর্মের প্রয়োজন', 'সার্বজনীন ধর্ম' এবং 'মানুষের প্রকৃত ও আভাসিক স্বরূপ।' এই

১। মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতে বাড়িটি ছিল লেডি মার্গেসনের; তিনি সন্তানাদিসহ কয়েক মাসের জন্য অন্যত্র যাওয়ায় ষ্টার্ডি ঐ বাড়ি স্বামীজীর জন্য ভাড়া লন। বাড়িতে থাকিতেন স্বামীজী, স্বামী সারদানন্দ, বৃদ্ধা হেনরিয়েটা মুলার, জে. জে. গুডউইন ও স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। মহেন্দ্রবাবুর 'লণ্ডনে বিবেকানন্দ'-এর মতে—ঐ বাড়িতে 'রাজযোগে'র ক্লাস হইত; পিকাডিলিতে যেসব বক্তৃতা হইত, তাহাই পরে 'জ্ঞানযোগ' নামক গ্রন্থ এবং ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা ও বক্তৃতার আকারে ছাপা হয়। (১০৬)।

বক্তৃতা পর্যায়ের সাফল্য দেখিয়া জুন মাসের শেষ হইতে জুলাই-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রিন্সেস হলে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে আর এক পর্যায় বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যে এই কয়টি বিষয়ও ছিল—'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ', 'অপরোক্ষানুভূতি'। এতদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে পরিচালিত পাঁচটি ক্লাসে প্রচুর লোকসমাগম হইত; আর প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি প্রশ্নোত্তর ক্লাসে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ঘনিষ্ঠভাবে স্বীয় সন্দেহ মিটাইবার অবকাশ পাইতেন। স্বামীজীর প্রথম পর্যায়ের ভাষণগুলিতে আর্যজাতির ইতিহাস, আর্যসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বিস্তার ইত্যাদি বিষয় বহুশঃ আলোচিত হইত। গুডউইন তাঁহার বক্তৃতাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। লণ্ডনের সংবাদপত্র-প্রতিনিধিরাও স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রবন্ধাদি ছাপাইয়াছিলেন। এই কার্যতালিকা সুদীর্ঘ হইলেও স্বামীজীর তৎপরতা ইহারই দ্বারা সীমিত হয় নাই। তিনি অনেক ঘরোয়া বৈঠকে এবং ক্লাবেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। একবার শ্রীযুক্তা এনি বেসান্তের অনুরোধে তিনি সেণ্ট জন্স উডে অবস্থিত তাঁহার অ্যাভিনিউ রোডের বাড়িতে গিয়া ভক্তি সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। এই সভায় কর্নেল অলকটও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া শ্রীযুক্তা মার্টিনের ১৭নং হাইড পার্ক গেটের গৃহেও 'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা' বিষয়ে ১০ই জুন (১৮৯৬) তাঁহার একটি বক্তৃতা হয়। এই সভায় অনেক আমেরিকান ও প্রচ্ছন্নভাবে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি নটিংহিল গেটে শ্রীযুক্তা হান্ট-এর ভবনে ও উইম্বলডন-এ বক্তৃতা দেন। উভয় স্থানে বক্তৃতান্তে ঔৎসুক্যপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনা হয়। ইহার পর আরও অনেক বক্তৃতার আয়োজন হয়।

'সিসেম ক্লাব' নামক একটি মহিলা সমিতিতে তিনি শিক্ষা বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, ঐ সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ ৬ই জুন তারিখের 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ লিখিয়াছিলেন: "স্বামী বিবেকানন্দের কার্য এখানে সুন্দর আরম্ভ হইয়াছে। অনেক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাঁহার ক্লাসে যোগ দেন এবং বক্তৃতাগুলি খুবই হৃদয়গ্রাহী। ক্যানন হাউইস নামক অ্যাংলিক্যান চার্চ সম্প্রদায়ের জনৈক নেতা সেদিন আসিয়াছিলেন এবং খুব ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই চিকাগো মেলায় স্বামীজীর সহিত তাঁহার মিলন ঘটিয়াছিল এবং তখন হইতেই তিনি স্বামীজীকে ভালবাসিতেন। গত মঙ্গলবারে স্বামীজী 'সিসেম ক্লাবে' শিক্ষা

বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইহা নারীশিক্ষার প্রসারকল্পে নারীদেরই দ্বারা পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা।[১] বক্তৃতায় তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলেন; স্পষ্টভাবে এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি বুঝাইয়া দেন যে, ঐ পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষ গঠন করা, শুধু পাঠ মুখস্থ করা নহে; তিনি বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুলির সহিত উহার তুলনাও করিয়াছিলেন।" ক্যানন হাউইস লণ্ডনে স্বামীজীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হন যে, স্বীয় সেণ্ট জেমস চ্যাপেলে তাঁহার প্রচারিত ভক্তিতত্ত্ব অবলম্বনে দুইটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করেন, এই ভাবটি তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট পাইয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্মে ইহা অনুপ্রবিষ্ট হইলে বেশ ভালই হইবে। ('লণ্ডনে বিবেকানন্দ', ১০২-৩)। ক্যানন উইলবারফোর্স একবার স্বামীজীকে মহাসমাদরে নিজ আলয়ে লইয়া যান এবং তাঁহার সম্মানার্থ সেখানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির একটি সভা করেন।

স্বামীজীর লণ্ডনে অবস্থান, কার্যাবলী এবং একটি ক্লাবে বক্তৃতার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীযুক্ত এরিক হামণ্ড লিখিয়াছিলেন: "স্বামীজী যখন প্রথম লণ্ডনে আসিলেন, তখন লণ্ডনবাসীরা তাহাদের চিরন্তন সাধারণ অভ্যাস অনুসারে অনাড়ম্বর, দ্বিধাপূর্ণ এবং কতকটা হিসাব করিয়া চলার কায়দাতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ধর্মপ্রচারকেরা সব নূতন জায়গায়ই এমন এক আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া পড়েন যাহাকে ঠিক বিরুদ্ধ না বলিলেও সন্দেহাকুল বলা চলে। ইহা নিশ্চিত যে স্বামীজী এই সংশয়াচ্ছন্ন ও কুতূহলপূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এবং ইহাও নিশ্চিত যে তাঁহার চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব ইহারই মধ্যে আপনার পথ করিয়া লইয়াছিল ও বহু হৃদয়ের সাদর সংবর্ধনালাভে সমর্থ হইয়াছিল। ক্লাব, সমিতি, বৈঠকখানার দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন দলীয় শিক্ষার্থিবৃন্দ নানা অঞ্চলে সমবেত হইত এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। শ্রোতারা একবার শুনিয়া আবার শুনিতে চাহিত।

"এইরূপ এক সভায় বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে এক শুভ্রকেশ ও সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্বামীজীকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে এবং আমি এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি; কিন্তু আপনি তো আমাদের একটিও নূতন কথা বলেননি।' উত্তরে বক্তার সুস্পষ্ট বাণী কক্ষমধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া

১। ভগিনী নিবেদিতা ইহার সভ্য ছিলেন।

উঠিল, 'মহাশয়, আমি আপনাকে যা সত্য তাই শুনিয়েছি; আর সেটা হল সেই সত্য, যা স্মরণাতীত কাল থেকে অবস্থিত পর্বতেরই ন্যায় প্রাচীন, মানুষেরই মতো পুরাতন, সৃষ্টিরই সদৃশ অনাদি, ভগবানেরই অনুরূপ শাশ্বত। আমি যদি সে সত্যকে এমন ভাবে বলে থাকি যাতে আপনার চিন্তার খোরাক যোগায়, যাতে আপনাকে ঐ চিন্তানুরূপ জীবন যাপন করতে প্রণোদিত করে, তবে আমি তা বলে কি ভাল করিনি?' 'সাধু সাধু' বলিয়া মৃদু গুঞ্জন এবং তদপেক্ষাও স্পষ্টতর করধ্বনি বুঝাইয়া দিল, স্বামীজী শ্রোতাদিগকে কিরূপ একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আরও বহু সভায় উপস্থিত থাকিতেন এমন এক ভদ্রমহিলা বলিয়াছিলেন, 'আমি সারাজীবন গির্জার উপাসনায় নিয়মিতভাবে যোগ দিয়েছি। নিজস্ব একঘেয়েমি এবং প্রাণহীনতার জন্য ওগুলি নিষ্ফল ও অতৃপ্তিকর হয়ে পড়েছিল। আমি সেখানে যেতাম, কারণ সকলেই যায়, আর খাপ-ছাড়া কাজ কেউ করতে চায় না। স্বামীজীর ভাষণ শুনার পর ধর্ম আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ধর্ম এখন সত্য, ইহা জীবন্ত। এর একটা নূতন আনন্দপ্রদ তাৎপর্য আছে এবং আমার কাছে এর রূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে।'

"স্বামীজী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'আমি কি করে সত্যলাভ করলাম তা তোমাদের বলব।' যখন তিনি উহা বলিলেন, তখন শ্রোতারা শ্রীরামকৃষ্ণের মানবলীলার কিঞ্চিৎ আভাস পাইল, তাঁহার চরিত্রের ভক্তি-সঞ্চারক সারল্যের কথা জানিতে পারিল, ধর্মের বিভিন্ন মার্গাবলম্বনে অদম্য সত্যানুসন্ধিৎসার তথ্য অবগত হইল এবং অবশেষে তাঁহার সত্যাবিষ্কারের কথা ও সেই আবিষ্কারের ঘোষণাধ্বনি শুনিল, 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ, অহং ব্রহ্মাস্মি'।

" 'আমি সত্যকে পেয়েছি, কারণ তা আমার হৃদয়মধ্যে পূর্ব হতেই ছিল'—স্বামীজী বলিয়া চলিলেন—'তোমরা নিজেদের প্রতারণা করো না, একথা কল্পনা করো না যে, তোমরা সত্যকে এ ধর্মে বা ও ধর্মে পাবে, সত্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে। তোমাদের সাম্প্রদায়িক মতবাদ তোমাদের কাছে এ সত্য নিয়ে আসতে পারবে না, মতবাদের মধ্যে তোমাদিগকেই সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মানুষ ও পুরোহিতকুল একে বিভিন্ন নাম দিয়েছে। তারা বলে, "এটা বিশ্বাস করো, ওটা বিশ্বাস করো।" শোন! এটি—এই অমূল্য মুক্তাটি তোমাদের

মধ্যে আগে থেকেই আছে। যা সত্য, তা অদ্বিতীয়। শোন, তুমিই হচ্ছ তাই।'

"আদ্যোপান্ত বক্তৃতায় তিনি স্বীয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরই কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, শুনাইবার মতো তাঁহার নিজস্ব একটি শব্দও নাই, খুলিয়া প্রকাশ করিবার মতো তাঁহার নিজস্ব এতটুকু চিন্তাও নাই। প্রত্যেকটি জিনিস, সব কিছু, তিনি নিজে যাহা, আমাদের নিকট তিনি যেভাবে প্রকাশ পাইতে পারেন, জগৎ তাঁহাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে পারে—'সমস্তই সেই একমাত্র উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, সবই এসেছে সেই পূতাত্মা থেকে, সেই অসীম অনুপ্রেরণা হতে, যিনি আমার ভালবাসার ভূমি ভারতবর্ষে নিগূঢ় সমস্যার সমাধান করেছেন এবং সে মীমাংসা দ্বিধাশূন্যচিত্তে নির্বিচারে, ভগবৎসুলভ মুক্তহস্তে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন।'

"অতি কবিত্বপূর্ণ কয়েকটি বাক্যসমষ্টি অবলম্বনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী সবিস্তারে শুনাইলেন। নিজের কথা তিনি তখন সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, উহাকে একেবারে অবহেলা করিয়াছিলেন। 'আমি যা, আমি তাই; আর আমি যা তা সর্বদা তাঁরই কল্যাণে হয়েছে; আমাতে, আমার কথাতে যা কিছু মঙ্গলময়, সত্য বা শাশ্বত আছে, তা আমি তাঁরই শ্রীবদন, তাঁরই হৃদয়, তাঁরই আত্মা থেকে পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বের বর্তমান যুগের অধ্যাত্মজীবনের, উহার উদ্দীপনার ও কর্মোদ্যমের উৎসস্থল—যুগাবতার! আমি যদি জগৎকে গুরুদেবের জীবনের এক ঝলকও দেখাতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক'।"

বিদেশে সাম্রাজ্য-শাসকদিগের নিকট প্রচুর সম্মান পাইলেও স্বামীজী কিভাবে নিজের কৃতিত্বে দম্ভ না করিয়া স্বীয় শ্রীগুরুর কথাই সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেন, আপনাকে তাঁহার তুলনায় নগণ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং তাঁহার সমস্ত গুণাবলী তাঁহারই কৃপালব্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতেন, তাহা সত্যই অনুধাবনযোগ্য। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যের ইহাই সমুচিত ব্যবহার।

ইংলণ্ডে যেসব ভারতীয় ছাত্র বাস করিতেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই স্বামীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিতেন এবং উপদেশলাভের জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। স্বামীজীও তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ও নানাভাবে সাহায্য করিয়া সকলের ভক্তি ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতএব 'লণ্ডন হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন'-এর আনুকূল্যে যখন ১৮ই জুলাই তারিখে গ্রেটব্রিটেন ও

আয়ার্লণ্ড নিবাসী সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের এক সামাজিক অধিবেশন আহূত হইল, তখন স্বামীজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। স্বামীজী ইহাতে সম্মত হইয়া 'হিন্দুগণ ও তাহাদের প্রয়োজন' এই বিষয়ে একটি ভাষণ দেন। মণ্টেগু ম্যানসনে অনুষ্ঠিত এই সভায় ঐ সমিতির স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজী ও বহু ইংরেজ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিং এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীযুক্ত অতুল চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনার্থে ২১শে নভেম্বর (১৮৯৬) কেম্ব্রিজে ভারতীয় মজলিসের যে সভা হয় স্বামীজী সেখানেও বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

পূর্ববারের অপেক্ষাও এইবারে স্বামীজীর লণ্ডন-জীবন অধিকতর কর্মবহুল ছিল। অধিকন্তু পুরাতন একটি অসমাপ্ত কাজও শেষ করিতে হইয়াছিল। পূর্ববারে তিনি 'নারদ-ভক্তিসূত্রে'র অনুবাদকার্যে স্টার্ডিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এখন উহা স্বামীজীর লিখিত প্রচুর টীকাসহ প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত টি. জে. দেশাই স্বামীজীর ইংলণ্ড-জীবনের কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার অধিকাংশ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের; তবে তৎপূর্বে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেরও দুই-চারিটি কথা বলিয়াছেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুমারী মূলারের আমন্ত্রণে স্বামীজীর দুইটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন—প্রথম বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন সেণ্ট জেমস হলে ও দ্বিতীয় বক্তৃতা বেলুন সোসাইটিতে। প্রথম বক্তৃতার পরে সংবাদপত্রে স্বীকার করা হয় যে, কেশবচন্দ্র সেনের পরে ভারতবাসীদের মধ্যে কেবল স্বামীজীর বাগ্মিতাতেই শ্রোতারা সর্বাধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় বক্তৃতার পরে এক ধর্মযাজক বলিয়া উঠিলেন, স্বামীজী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেই অধিকতর শোভন হইত। শুনিয়া স্বামীজী এমন তেজঃপূর্ণ একটি ভাষণ দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি যেন কেঁচো হইয়া গেলেন। ধর্মযাজকের সমস্ত কথার তিনি উত্তর দিলেন এবং শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া এমন বাগ্মিতা প্রকাশ করিলেন যে, দেশাই চমৎকৃত হইলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী বিভিন্ন যোগ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দেন এবং থিওসফিস্টদের ব্ল্যাভাটস্কি লজে যে ভাষণ দেন, তাহার অনেকগুলিতেই দেশাই উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ সমাজের সেরা শ্রোতারা ঐসব বক্তৃতায় আসিতেন। 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি'র এক সভায় স্বামীজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি

অনেকে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী সেখানে বক্তৃতা করেন নাই। অধ্যাপক বেইন উপনিষদ্ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং দেশাই তাহার প্রতিবাদ করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে স্বামীজী দেশাইর মত অনুমোদন করেন। একবার স্বামীজী, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ ওয়েন-দম্পতির গৃহে আহার করেন; দেশাই তখন ঐ বাড়িতে থাকিতেন। দেশাই ও স্বামীজী প্রায়ই বেদান্ত, গীতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং দেশাই এইসব খুবই পছন্দ করিতেন। ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ৩০৫-১৬)।

স্বামীজীর জীবনে এইবারের অন্যতম প্রধান ঘটনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত সাক্ষাৎকার। স্বামীজী ২৮শে মে অধ্যাপকের গৃহে যান এবং সেদিনকার আনন্দময় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ৬ই জুন তারিখে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধে আছে: "শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী'-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণসংবলিত একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রস্তুত আছেন? অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি দিন-কয়েক পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত, আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম। কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন—তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে-কোন সম্প্রদায়—মত বা জাতিভুক্ত—হউন না কেন—তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি।...স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কি শক্তিতে সাধিত হইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন; তারপর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং ঐগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না তো কাহাকে পূজা করিবে?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার মূর্তিবিশেষ। তিনি স্টার্ডি সাহেব ও আমাকে তাঁহার সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান পুস্তকাগার দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌছাইয়া দিতে

আসিলেন, আর আমাদিগকে এত যত্ন কেন করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সহিত তো আর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় না।' বাস্তবিক আমি নূতন কথা শুনিলাম।" স্বামীজী ম্যাক্সমূলারের ব্যবহার, গৃহের পরিবেশ এবং তাঁহার চরিত্রে ভক্তি, পাণ্ডিত্য ও বিনয়ের সমাবেশ দেখিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম-ধ্যাননিরত প্রাচীন ঋষিতুল্যই মনে করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ভারতে আসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে "বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে একবিন্দু অশ্রু নির্গতপ্রায় হইল, মৃদুভাবে শির সঞ্চালিত হইল, ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি স্ফুরিত হইল, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে সেইখানেই সমাহিত করিতে হইবে।' আর অধিক প্রশ্ন মানবহৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল।" ('বাণী ও রচনা', ১০।১৭৭-৮১)।

'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী'র অগষ্ট, ১৮৯৬ সংখ্যায় ম্যাক্সমূলার যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, উহার নাম 'এক প্রকৃত মহাত্মা'। কথাপ্রসঙ্গে তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আপনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জগতের সমক্ষে প্রচার করার জন্য কি করছেন?" (ঐ, ৭।২৪৮)। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানা বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী স্বামী সারদানন্দের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়া ও ভারত হইতে আনাইয়া অধ্যাপকের হস্তে অর্পণ করেন এবং অধ্যাপক ঐ সকল অবলম্বনে 'রামকৃষ্ণ: তাঁহার জীবন ও উপদেশ' নামে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকখানি অধ্যাপকের ভক্তি ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে পাশ্চাত্ত্য জগতে স্বামীজীর প্রচারকার্য যে খুবই সুগম হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। স্বামীজী ও অধ্যাপকের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা পরস্পরের সহিত পত্রালাপও করিতেন—যদিও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন।

এই সময়ে স্বামীজী যেসব পত্র লিখেন, তাহার মধ্যে ৩০শে মে-র একখানিতে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে মেরী হেলকে জানাইয়াছিলেন: "এখন এখানে (৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোডে) ক্লাস খুলেছি। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি রবিবার বক্তৃতা আরম্ভ ক'রব। ক্লাসগুলি খুব বড় হয়; যে বাড়িটি সারা মরসুমের জন্য ভাড়া করেছি, সেই বাড়িতেই ক্লাস হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম।

জাফরান, লেভেণ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিসমিস, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল—এগুলি মিলিয়ে এমনই সুস্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, নতুবা তার খানিকটা মিশালে গিলবার পক্ষে সুবিধা হ'ত। কাল হালফ্যাশনের এক বিবাহে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু মিস মূলার নাম্নী জনৈকা ধনী মহিলা একটি হিন্দু ছেলেকে (অক্ষয় ঘোষকে) দত্তক গ্রহণ করেছেন এবং আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য আমি যে বাড়িতে আছি সেই বাড়িতেই ঘর ভাড়া করেছেন। তিনিই বিয়ে দেখবার জন্য আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান যেন আর শেষ হয় না—কি আপদ! তুমি যে বিয়েতে নারাজ, এতে আমি খুশী।" প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ভারতীয় সন্ন্যাসীদের রীতিবিরুদ্ধ হইলেও পাশ্চাত্ত্য ধর্মযাজকদের অনুসৃত দেশাচারের খাতিরে, বন্ধুদিগের অনুরোধে এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজের সহিত সুপরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় এই জাতীয় অনুষ্ঠানে স্বামীজী যদিও সময় বিশেষে উপস্থিত থাকিতেন, তথাপি তাঁহার বৈরাগ্যময় চিত্ত উহাতে সর্বদা অবিকৃতই থাকিত; তিনি যে সন্ন্যাসী, সারাজীবন বিরুদ্ধ অবস্থামধ্যেও সেই সন্ন্যাসীই ছিলেন—ইহা পূর্বোদ্ধৃত পত্রাংশের শেষ কয়েক পঙক্তিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

লণ্ডনের কার্যের সাফল্য স্পষ্টতর হইতে লাগিল; মনে হইল এখানে স্থায়িভাবে একজন সন্ন্যাসী থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমেরিকার কার্যে অবহেলা চলে না। সম্ভবতঃ এই কারণেই জুন মাসের শেষে স্বামীজী স্থির করিলেন, স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইবেন এবং স্বামী অভেদানন্দকে ভারত হইতে আনাইয়া লণ্ডনে বসাইবেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত তাঁহার ২৪শে জুনের পত্রে আছে: "শরৎ (সারদানন্দ) কাল আমেরিকায় চ'লল। এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। লণ্ডনে একটি কেন্দ্রের জন্য টাকা এর আগেই উঠে গেছে। আমি আগামী মাসে সুইজরলণ্ড গিয়ে এক-দুই মাস থাকব। তার পর আবার লণ্ডনে। আমার শুধু শুধু দেশে গিয়ে কি হবে? এই লণ্ডন হ'ল—দুনিয়ার কেন্দ্র; ভারতের হৃৎপিণ্ড এখানে। এখানে একটা গেড়ে না বসিয়ে কি যাওয়া হয়? তোরা পাগল নাকি? সম্প্রতি কালীকে (অভেদানন্দকে) আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলো। পত্রপাঠ যেন চলে আসে।...সত্যই

শক্তি, আর আজ্ঞাবহতাই হ'ল তার গূঢ় রহস্য।" অবশ্য লণ্ডনে স্থায়ী কেন্দ্র স্বামীজীর জীবনকালে স্থাপিত হয় নাই। সে-সব কারণের অনুসন্ধান বর্তমান জীবনী-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতে পারি যে, স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ায় তিনি লণ্ডনের কার্যে আশানুরূপ শক্তি-প্রয়োগ করিতে পারেন নাই এবং অপর কেহ তখনকার দিনে সে দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। তখনকার মতো পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসাবেই তিনি স্বামী সারদানন্দের হস্তে আমেরিকার ও স্বামী অভেদানন্দের হস্তে ইংলণ্ডের কার্যভার অর্পণের কথা ভাবিয়া স্বয়ং ঐ বৎসরের শেষে ভারতে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। লণ্ডনের কার্য সমাপ্তপ্রায় হইলে ৬ই জুলাই তিনি শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস লেগেটকে যে পত্র লিখেন উহাকে মোটামুটি তাঁহার লণ্ডনের কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও স্বীয় মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবিরূপে গ্রহণ করা চলে। পত্রে আছে :

"আমার রবিবারের বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, ক্লাসগুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাজের মরসুম শেষ হয়ে গেছে—আমিও সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন মিস মূলারের সঙ্গে সুইজরলণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছি। গল্‌স-ওয়ার্দিরা আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো (ম্যাকলাউড) বড় অদ্ভুতভাবে তাঁদের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জো'র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য-প্রণালীর প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি না।...গত পরশু সন্ধ্যায় আমি মিসেস মার্টিনের বাড়িতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম।...

"যাহোক, ইংলণ্ডে কাজ খুব আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিতভাবে বেড়ে চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, এটি যে চারদিকে ভাব ছড়াবার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমার সঙ্কল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবরাশি প্রচার ক'রব—তাহলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে।...তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল-প্রতাপশালী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান ব'লে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্যন্ত

ভালবাসতে পারব। বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলাম যে, কারও প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হ'লে কারোও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না, কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না পর্যন্ত। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবারও মনে উঠবে না। একি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি—না, আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আবার লোকে বলে শুনতে পাই, যে ব্যক্তি চারদিকে মন্দ ও অমঙ্গল দেখতে পায় না, সে ভাল কাজ করতে পারে না—এক-রকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়! আমি তো তা দেখছি না; বরং আমার কর্মশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে কাজের সফলতাও খুব হচ্ছে।"

হেল ভগিনীদিগকে লিখিত ৭ই জুলাই-এর পত্রে তাঁহার পরবর্তী কার্যক্রমের সংবাদ পাওয়া যায়: "ক্লাস ও রবিবারের বক্তৃতাগুলি আগামী ১৬ই থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। আর সুইজরলণ্ডের পাহাড়ে শান্তি ও বিশ্রামের জন্য ১৭শে আমি যাচ্ছি—মাস খানেকের জন্য। আবার শরৎকালে লণ্ডনে ফিরে কাজ আরম্ভ করা যাবে। এখানে কাজ খুবই আনন্দজনক হয়েছে। এখানে আগ্রহ জাগিয়ে—আমি প্রকৃতপক্ষে ভারতে থেকে যা করতে পারতাম, তার চেয়ে বেশী ভারতের জন্যই করেছি।...আমি তিনজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে সুইজরলণ্ডের পাহাড়ে যাচ্ছি, পরে শীতের শেষে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে ভারতে যাবার আশা করি। তাঁরাও আমার মঠে থাকতে যাচ্ছেন, মঠ হবার পরিকল্পনা চলছে মাত্র। হিমালয়ের কোথাও সেটা বাস্তবে রূপ নেবার চেষ্টা করছে।"

স্বামীজীর ইওরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত উপস্থিত করার পূর্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'লণ্ডনে বিবেকানন্দ' গ্রন্থ অবলম্বনে দুই-চারিটি তথ্য পরিবেশন করিলে মন্দ হইবে না। মহেন্দ্রবাবু পাঠোদ্দেশ্যে লণ্ডনে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৮৯৬-এর এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, অর্থাৎ স্বামীজীর লণ্ডনে আগমনের দিনকয়েক পূর্বে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থানুসারে স্বামীজী আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিয়া সেখানে

এক সপ্তাহ থাকার পর, কিছুদিন শ্রীমতী মূলারের পল্লীনিবাসে কাটাইয়াছিলেন। মেডেন হেড স্টেশন হইতে দুই-তিন মাইল দূরে পিংকিনিস গ্রীন নামক গ্রামে ঐ বাটীতে স্বামী সারদানন্দও ঐ সঙ্গে গিয়াছিলেন, মহেন্দ্রবাবু গ্রামের অন্য এক বাড়িতে থাকিতেন। শ্রীমতী মূলার স্বামীজীদের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিলেও তাঁহার স্বভাবটি ছিল বড় রুক্ষ এবং তিনি প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বামী সারদানন্দ এই মহিলার রকম-সকম দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ দেবীর মন্ত্র কি জানিস? 'ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট। তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে'।" গ্রামে কিছুদিন কাটাইয়া স্বামীজী লণ্ডনে ফিরিয়া কাজ আরম্ভ করেন।

লণ্ডনে ফিরিয়া স্বামীজী সেণ্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে অবস্থান করিতে থাকিলে মহেন্দ্রবাবুও সেখানে চলিয়া আসেন। ঐ সময় স্বামীজীর পূর্বপরিচিত কৃষ্ণ মেনন নামক এক ব্যক্তিও তথায় যাতায়াত করিতেন। স্বামীজীর পত্রে প্রকাশ, মেননের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, তাই তিনি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বামীজী চাহিতেন না যে, মহেন্দ্রবাবু আইন-ব্যবসায়ী হন, কেন না শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা পছন্দ করিতেন না। অতএব মহেন্দ্রবাবু অন্য বিষয় পড়িতেন। তিনি কলিকাতা হইতে স্বামীজীর জন্য 'বাচস্পত্যম্ অভিধানম্' লইয়া আসিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ এইসব বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নের উল্লেখ হইতে সহজেই প্রমাণিত হয়, সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি স্বামীজীর কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় শ্রীযুক্তা ওলি বুলের গৃহে ছিলেন, তখন কল্ম নামক এক যুবক তাঁহার সেক্রেটারির কাজ করিতেন। তিনিও লণ্ডনে আসিয়া সম্ভবতঃ মে মাস হইতে স্বামীজীর সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সেণ্ট জর্জেস রোডের বাড়িতেই থাকা-কালে শ্রীমতী মূলার ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ও ইওরোপের খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ডাঃ জন ভেন-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বামীজীকে লইয়া যান। নৈয়ায়িক মহোদয় স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতি অনুভব করেন।

স্বামীজীর ইংলণ্ড-জীবনের একটি ঘটনা ভগিনী নিবেদিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সঠিক সময় অজ্ঞাত, হয়তো পল্লীগ্রামে শ্রীমতী মূলারের গৃহে বাসকালে ঘটিয়া থাকিবে। সেদিন শ্রীমতী মূলার ও একজন ভদ্রলোকের সহিত স্বামীজী মাঠে বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ একটি ক্রুদ্ধ ষাঁড় তাঁহাদের

দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। "ইংরেজ ভদ্রলোকটি চোঁচা দৌড় দিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্বে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলেন। মহিলাটি যতদূর শক্তিতে কুলায় দৌড়িলেন, তারপর আর না পারিয়া পড়িয়া গেলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে আর কোন উপায় না দেখিয়া স্বামীজী ভাবিলেন, 'ওঃ, তাহলে এভাবেই তো সব ফুরিয়ে যায়!'—এবং দুই হস্ত বক্ষোপরি রাখিয়া মহিলাটিকে আগলাইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে গণিতের এই সমস্যাটি লইয়াই তোলপাড় চলিতেছিল যে, ষাঁড়টি তাঁহাকে কতটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু জানোয়ারটি অকস্মাৎ কয়েক পদ দূরে থামিয়া গেল, মাথা তুলিল এবং মন্থরগতিতে পশ্চাদপসরণ করিল।"

মহেন্দ্রবাবুর মতে লণ্ডনের ক্লাসগুলি প্রথম দিকে মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রতিদিন দুইবার করিয়া বসিত—বেলা এগারটা হইতে একটা পর্যন্ত একবার এবং সন্ধ্যা সাতটা হইতে আর একবার। মাসখানেক পরে রবিবাসরীয় বক্তৃতার সূত্রপাত হইলে ঐ বক্তৃতা শুরু হইত বিকাল চারিটায়।

স্বামীজী তখন নিদারুণ পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর যে তখন কত খারাপ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় মহেন্দ্রবাবুর বর্ণিত একটি ঘটনা হইতে। একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর স্বামীজী তাঁহার ঠেসান দেওয়া চেয়ার-খানিতে বসিয়া ভাবিতেছিলেন বা ধ্যান করিতেছিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার মুখে বড় কষ্টের ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ পরে তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফক্সকে বলিলেন, "দেখ ফক্স, আমার হৃৎপিণ্ড প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমার বাবা এই (সন্ন্যাস) রোগে মারা গেছেন। বুকটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল, এইটা আমাদের বংশের রোগ।" ('লণ্ডনে বিবেকানন্দ')।

ফক্সের সহিত আর একদিনের কথাবার্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হইয়াছে, স্বামীজী সেদিন চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া মুদ্রিতচক্ষে কি ভাবিতেছিলেন। পরে খাড়া হইয়া বসিয়া ফক্সকে বলিলেন, "সেণ্ট পল ছিলেন একজন শিক্ষিত ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি; আমিও শিক্ষিত ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি এবং একদল পণ্ডিত ধর্মোন্মাদ তৈরি করতে চাই। দেখ, যারা শুধু ধর্মোন্মাদ তারা কোন কাজের নয়, ও হচ্ছে মস্তিষ্কের রোগ, এতে বড় অনিষ্ট করে। পণ্ডিত ধর্মোন্মাদ হলে কাজ হয়।… পল ছিলেন পণ্ডিত উন্মাদ; তাই তিনি গ্রীক দর্শন ও রোমান সভ্যতাকে উলটাইয়া ফেলিলেন।" আর একদিন স্টার্ডিকে বলিয়াছিলেন, "বেদান্ত সকল

ধর্মের ফিলোসফিটা (দার্শনিক তত্ত্ব) বলে যায়, যা কোন ধর্মবিশেষের একচেটিয়া নয়। এজন্য বেদান্ত সর্বজনীন ধর্ম হবে। একে সর্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত কর।...কতকগুলো সঙ্কীর্ণমনা লোকের হাতে থাকবে না।" (ঐ, ১৫০)।

স্বামীজী একদিকে অতি উচ্চশ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন, ইংলণ্ডের অভিজাতগৃহে এমন কি ডিউকের গৃহেও আহারাদিতে নিমন্ত্রিত হইতেন, অপর দিকে তেমনি সাধারণ লোকও তাঁহার সহিত আত্মীয়ভাবে মিশিত, সংসারের সুখদুঃখের কাহিনী তাঁহাকে শুনাইত এবং স্থলবিশেষে পরামর্শও চাহিত, বিদেশী বলিয়া কোনও সঙ্কোচের ভাব তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত না। স্বামীজীও তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে ঠিক যেন তাহাদের একজন হইয়া যাইতেন।

লণ্ডনের বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল ; কিন্তু সব সমাজেই কিছু না কিছু দুষ্টলোকও থাকে, বিশেষতঃ ভারত-প্রত্যাগত কোন কোন ইংরেজ ভারতীয়দের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করিয়া তখনকার দিনে বাহাদুরি লইত। স্বামীজীর সভাগৃহে একদিন এইরূপ একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বামীজী তখন রাজযোগ সম্বন্ধে গভীর তথ্যপূর্ণ ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিতেছিলেন ; কিন্তু সভায় উপস্থিত এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী কাটিতে লাগিল। শ্রোতারা ইহাতে বিরক্ত হইলেও স্বামীজী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনমনে অবিরাম বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ক্রমে টিপ্পনী ছাড়িয়া সমালোচকের ভূমিকায় নামিল। স্বামীজী বুদ্ধের প্রশংসা করিলে সে বুদ্ধের নিন্দা আরম্ভ করিল। অমনি স্টার্ডি ও গুডউইন খেপিয়া গেলেন এবং প্রতিকার করিতে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু স্বামীজী তবু বক্তৃতা চালাইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। আবার স্বামীজী সাধুদের প্রশংসা করিলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উহাদিগকে চোর ছ্যাচড় বলিয়া গালাগালি দিল। অমনি স্টার্ডি ও গুডউইন আর একবার খেপিয়া উঠিলেন, কিন্তু স্বামীজীর ঐ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই দেখিয়া এবারও শান্ত হইলেন। অতঃপর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটি সিদ্ধান্ত করিল, স্বামীজী বাঙ্গালীবাবু, তাই বলিয়া উঠিল, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা বাঙ্গালীবাবুদের বাঁচাইয়া-ছিলেন। বার বার বাধা পাইয়া স্বামীজী এবারে ঐ অভদ্র লোকটির দিকে তাকাইয়া ওজস্বিনী ভাষায় ইতিহাসের নজির দিয়া ইংরেজের কুকীর্তি সম্বন্ধে

দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন কতকগুলি কথা বলিলেন যে, ঐ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর সামলাইতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বামীজী অমনি মুখ ফিরাইয়া পূর্বে রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন ঠিক সেইখান হইতে নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। বক্তৃতাশেষে শ্রোতাদের অনেকেই স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করি, আপনি সত্যই মহাপুরুষ।" (ঐ, ৯৬-১০২)।

এই ধারায় কিছুদিন কার্য চালাইয়া ইওরোপ-ভ্রমণে নির্গত হইবার পূর্বে এবং ইংলণ্ডের কার্যের জন্য ভারত হইতে স্বামী অভেদানন্দের আসার আগেই তিনি স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে গেলেন গুডউইন। স্বামী সারদানন্দ নূতন আমেরিকায় যাইতেছিলেন। অতএব নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও ঐ সঙ্গে গুডউইনকে পাঠানোর একটা প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়াও গুডউইনের নিজের দিক হইতে অন্যত্র যাওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। গুডউইন স্বামীজীকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত গরীব। এদিকে স্টার্ডি ও শ্রীমতী মূলার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া গুডউইনের সহিত এক টেবিলে বসিয়া আহারাদি করা পছন্দ করিতেন না—ইহা গুডউইন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন; তাই তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, স্বামীজী সেণ্ট জর্জেস রোডের বাড়ি ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে পয়সা খরচ করিয়া অন্যত্র থাকিতে ও খাইতে হইবে। অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন, তিনি অন্যত্র সস্তায় ঘর ভাড়া লইয়া থাকিবেন, দ্রুত-লেখকের কার্য করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন এবং এই প্রকারে স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালের দিনগুলি কাটাইবেন। স্বামীজী কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিলেন, ঐকালে আমেরিকায় ওলি বুলের বাড়িতে গিয়া থাকিলে গুডউইনের সকল সমস্যা দূর হইবে। তদনুসারে স্বামী সারদানন্দ ও গুডউইন লিভারপুল হইতে জাহাজ ধরিয়া আমেরিকায় যাইবার জন্য ২৫শে জুন (১৮৯৬) লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। আর ৩রা জুলাই স্বামীজী ভারতে পত্র দিলেন, "এই পত্রপাঠ কালীকে (অভেদানন্দকে) ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে।" স্বামীজী তারপর আরও কিছুদিন লণ্ডনের কাজ চালাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের উদ্দেশ্যে জুলাই মাসের মাঝামাঝি শ্রীমতী মূলার ও সেভিয়ার-দম্পতির সহিত ইওরোপ-ভ্রমণে নির্গত হইলেন।

ইংলণ্ডের ধর্মপ্রচারকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজীর জন কয়েক ঘনিষ্ঠ বন্ধুলাভ

ঘটিয়াছিল। আমরা শ্রীমতী মূলার ও শ্রীযুক্ত স্টার্ডির সহিত পরিচিত হইয়াছি। আর তিনজন অনুরাগী ভক্ত জুটিয়াছিল—সেভিয়ার-দম্পতি ও কুমারী মার্গারেট ই. নোবল অথবা পরবর্তী কালের স্বনামধন্যা ভগিনী নিবেদিতা। আমরা বলিয়া আসিয়াছি স্বামীজীর প্রথমবারে ইংলণ্ডে আসার পর তাঁহার সহিত নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎকার হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায়। লেডি ইসাবেল মার্গেসনের গৃহে আতশীখানার পার্শ্বে বসিয়া স্বামীজী সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্টা পনর-ষোল জন ভক্তিপরায়ণা শ্রোত্রীকে ভগবদ্বাণী শুনাইতেছিলেন। তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক বাণী ও চক্ষের সারল্যমণ্ডিত উচ্চভাব সেদিন মার্গারেটকে মেরী-ক্রোড়ে উপবিষ্ট শিশু যীশুর কথা স্মরণ করাইয়াছিল। স্বামীজীর কথাগুলি নিবেদিতার নিকট প্রাণস্পর্শী হইলেও তিনি তখনই ঐগুলিকে সজ্ঞানে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। ঐ মরসুমে তিনি স্বামীজীর আরও দুইটি বক্তৃতায় ১৬ই এবং ২৩শে নভেম্বর উপস্থিত থাকিলেও তাঁহার মন সন্দেহ-দোলায়িত রহিয়া গেল। স্বামীজীর প্রশ্নোত্তর ক্লাসগুলিতে বসিয়াও নিবেদিতার মন বারবার বলিয়া উঠিত, "কিন্তু", "যদি" ইত্যাদি। পরবর্তী কালে নিবেদিতার তৎকালীন এই বিচারপ্রবণ সন্দেহাকুল মনের কথা তুলিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "বিশ্বাস জন্মানো কারো জীবনে কঠিন হয়ে থাকলেও এজন্য আপসোস করার কিছু নেই, আমি ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘ ছয় বছর লড়েছিলাম, তার ফলে আমি রাস্তার প্রত্যেক ইঞ্চির—সাধনমার্গের প্রত্যেক ইঞ্চির পরিচয় লাভ করতে পেরেছি।" সেবারে ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বেই নিবেদিতা স্বামীজীকে গুরু (মাস্টার) বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন। নিবেদিতারূপিণী মার্গারেট পরে লিখিয়াছেন, "ঐ ব্যক্তির মধ্যে যে বীরোচিত ভাব ছিল, আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার স্বজাতির প্রতি তিনি যে প্রীতি পোষণ করিতেন আমি তদর্থে আপনাকে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলাম। আচার্যের দিক হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে গিয়া আমি বুঝিলাম, যদিও তিনি একটি বিশেষ মতবাদের প্রচারক ছিলেন, তথাপি তিনি যদি কখনও বুঝিতেন যে, ঐ মতবাদ-মধ্যে সত্য নিহিত না থাকিয়া বরং অন্যত্র অবস্থিত আছে, তবে সে বাদটি পরিত্যাগ করিতে তাঁহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইত না। এই কথাটার যাহা প্রকৃত তাৎপর্য, আমি সেই অর্থেই তাঁহার শিষ্যা হইলাম। ইহার অধিক যাহা কিছু, তাহার জন্য আমি তাঁহার উপদেশাবলীর

যথেষ্ট অনুধাবনের পরে বোধ করিলাম যে, উহার মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বীয় অনুভূতির ফলে আমি ঐগুলির যাথার্থ্য অনুভব করিয়াছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মনেপ্রাণে তাঁহার প্রচারিত সমস্ত কথার চরম প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লই নাই। অধিকন্তু ঐ সময়ে তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেও অন্য যেসকল প্রতিভাবান ব্যক্তির কথা আমি জানিতাম, তাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মাভিব্যক্তির যে আকাশপাতাল ভেদ আমি পরে লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা ঐ কালে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।"

সেই শীতকালে স্বামীজী আমেরিকায় ফিরিয়া গেলে মার্গারেট তাঁহার সম্বন্ধে তিনটি চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন: প্রথমতঃ তাঁহার ধর্মানুভূতির প্রসার, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার চিন্তার অভিনবত্ব ও আকর্ষণশক্তি এবং তৃতীয়তঃ মানবের যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র শুধু তাহারই নামে উচ্চারিত তাঁহার আহ্বান। মানুষ আজন্ম পাপী বা দুর্বল ইত্যাদি মতবাদের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না।

দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসিয়া স্বামীজী ক্লাস ও বক্তৃতা আরম্ভ করিলে মার্গারেট বান্ধবীদের সহিত পুনরায় ঐ সকলে যোগ দিতে থাকিলেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মার্গারেট সেপ্টেম্বর মাসের 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ লিখিয়াছিলেন: "কাহারও দৃষ্টিতে এমন একটা ধর্মের ধারণাই যথেষ্ট ছিল যাহাতে সর্বজনীন ধর্মমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়, যাহাতে বলা হয় যে, আমরা সত্য হইতে সত্যের দিকে অগ্রসর হই, ভ্রম হইতে সত্যে যাই না। আবার আমাদের সাহিত্য, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠতম অনুপ্রেরণার পুনঃপুনঃ প্রকাশে সমৃদ্ধ কাব্য, গভীরভাবে অধ্যয়নে রত অপর একজনের নিকট স্বামীজীর উচ্চারিত 'আমি ব্রহ্ম' এই তত্ত্বটি আসিত যেন চিরপরিচিত তথ্যের মতো, যদিও তাহা পূর্বে কখনও ঐভাবে উচ্চারিত হয় নাই। আরও অনেকে ছিলেন যাঁহাদের নিকট ভগবানের পিতৃত্বস্বরূপ মানবোচিত ভাব একটা সামান্য সমস্যাবিশেষ ছিল, তাঁহারা দেখিলেন, এইরূপ ধারণাকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অনাবশ্যক, পরন্তু ভগবৎসত্তার সহিত অভেদানুভূতির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে ক্রমসন্নিবদ্ধরূপে সজ্জিত সাধন-ধারায় উহা একটি স্তর-বিশেষমাত্র। আবার মানুষের একত্বরূপ ধারণার স্পর্শেই অতীতের সকল অভিজ্ঞতা তাৎপর্যময় হইয়া উঠে এবং সেবার আগ্রহে সর্বস্বত্যাগের যে আকাঙ্ক্ষা অতীতে কখনও সাহসপূর্বক স্বীকৃত হয় নাই, ইহাতেই

তাহার যৌক্তিকতা সিদ্ধ হয়। আমাদের সকলেই—কেহ এই দ্বারে, কেহ বা অপর দ্বারে—আমাদের বিরাট উত্তরাধিকারভাণ্ডারে উপস্থিত হইয়াছি এবং আমরা সে বিষয়ে সচেতন।”

একদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামীজী অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন, “জগৎ আজকার দিনে যা চায়, তা হচ্ছে এমন বিশজন নরনারী যারা ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহসভরে বলতে পারবে যে, ভগবান ছাড়া তাদের আপনার বলবার আর কেউ নেই। কে প্রস্তুত?” আবার তিনি বলিলেন, “ভয় পাবে কেন? এ যদি সত্য হয়, তবে আর কিছুতে কি যায় আসে? আর এ যদি সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা কি যায় আসে?” নিবেদিতার হৃদয় সাড়া দিল! কিন্তু কি করিতে হইবে তিনি জানিতেন না, অতএব স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীজীর পরিকল্পনাটি কিরূপ। স্বামীজীর ৭ই জুন (১৮৯৬)-এর পত্রে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে আমরা ইহা উদ্ধৃত করিলাম না। মোটামুটি স্বীয় আদর্শের কথা বলিয়া স্বামীজী পত্রশেষে লিখিলেন, “হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন…। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ, জাগো।” নিবেদিতা ধরিয়া লইলেন, স্বামীজী তাঁহার আত্মদান স্বীকার করিয়াছেন। একদিন কথাচ্ছলে স্বামীজী বলিলেন, “আমার দেশের নারীসমাজের জন্য আমার একটা পরিকল্পনা আছে, যাতে আমার বিশ্বাস, তুমি খুব কাজে লাগবে।” নিবেদিতার অন্তর সে আহ্বান মানিয়া লইল। তিনি স্বামীজীর কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

স্বামীজীর অপর দুই অনুরাগী ভক্ত সেভিয়ার-দম্পতি। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার পূর্বে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে কাজ করিতেন এবং স্বামীজীর লণ্ডন আগমনের বহু পূর্বেই সৈন্যবিভাগ হইতে অবসর লইয়া ইংলণ্ডের হ্যাম্পস্টেডে নিজগৃহে বাস করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত প্রথম পরিচয়কালে সেভিয়ারের বয়স ছিল ঊনপঞ্চাশ। সেভিয়ার-দম্পতি ধর্মলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষায় বহু অধ্যয়ন ও চেষ্টা করিয়াও প্রাণে শান্তি পান নাই। বিভিন্ন মতবাদ সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না করিয়া যেন অন্ধপরম্পরাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। রীতিনীতি, শাস্ত্রগ্রন্থ ও আচার-ব্যবহারই ধর্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

স্বামীজীর লণ্ডনে আগমনের অব্যবহিত পরে তাঁহারা এক বন্ধুর মুখে সংবাদ পাইলেন যে জনৈক ভারতীয় যোগী প্রাচ্য দর্শন ব্যাখ্যা করিবেন, অতএব সাগ্রহে যোগীর কথা শুনিবার জন্য যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন এবং বক্তৃতাবিষয়ে পরস্পর আলোচনা করিতে গিয়া উভয়ে দেখিলেন, তাঁহারা মনে মনে এই একই কথা ভাবিতেছিলেন, "এই ব্যক্তি এবং এই দর্শনেরই তো অন্বেষণে আমরা এ যাবৎ জীবনযাপন করিয়াছি অথচ সফলকাম হই নাই।" স্বামীজীর প্রচারিত অদ্বৈত দর্শনই ছিল তাঁহাদের নিকট অধিকতম চিত্তাকর্ষক ও সন্তোষপ্রদ। মার্গারেট যেমন সম্পূর্ণ ভক্তি-বিশ্বাস লইয়া স্বামীজীর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন, সেভিয়ারদের আত্ম-সমর্পণও ছিল তেমনি স্বাভাবিক, ঐকান্তিক ও শ্রদ্ধাভক্তি-পরিপূর্ণ। শ্রীমতী ম্যাকলাউড এক সময়ে রোঁমা রোঁলাকে বলিয়াছিলেন ('দি লাইফ অব বিবেকানন্দ', ৯৪-৯৫): "স্বামীজীর একটি ভাষণ শ্রবণান্তে বক্তৃতাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীযুক্ত সেভিয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এই যুবক ভদ্রলোককে জানেন? তাঁকে যেমন দেখায়, ইনি সত্যি কি তাই?' 'হাঁ।' 'তাহলে তো তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং এঁরই সাহায্যে ভগবান-লাভ করতে হবে।' তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিলেন, 'আমি যদি স্বামীজীর শিষ্য হই, তাতে তোমার মত আছে তো?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ।' তারপর স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমায় স্বামীজীর শিষ্যা হতে দেবে তো?' স্বামী প্রেমপূর্ণ রহস্যচ্ছলে বলিলেন, 'তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না।'

অতঃপর প্রথম যেদিন তাঁহারা স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিতে গেলেন, সেদিনই তিনি শ্রীযুক্তা সেভিয়ারকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, সেদিন হইতে তাঁহারা স্বামীজীকে পাইলেন শুধু গুরুরূপে নহে, অধিকন্তু পুত্ররূপে। স্বামীজী সেদিন তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনাদের কি ভারতে আসতে ইচ্ছা হয় না? এলে আমি আমার অনুভূতির শ্রেষ্ঠসম্পদ আপনাদের দেব।" সেভিয়ার-দম্পতি সোল্লাসে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন এবং এই প্রকারে যে অটুট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা একদিকে যেমন স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য কর্মের অশেষ সাফল্য আনিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি তাঁহার দীর্ঘ-কালবাঞ্ছিত হিমালয়ের আশ্রমটিকে রূপপ্রদান করিয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি স্বামীজীর হস্তে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু

ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া স্বামীজী এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই এবং নিজেদের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। গুরুর এই আদেশ পালন করিলেও তাঁহারা পরিগৃহীত আদর্শের অনুসরণপূর্বক হিমালয়ের আশ্রমে গিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত সেভিয়ার সেখানেই দেহত্যাগ করেন এবং প্রকৃত অদ্বৈতবাদীর ন্যায় বলিয়া যান, পার্বত্য নদীতীরে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হওয়ার পর যেন তাঁহার শ্মশানে কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত না হয়। শ্রীযুক্তা সেভিয়ার ইহার পরেও সেখানেই ছিলেন এবং হিমালয়ের নির্জনতার মধ্যে একাকিনী ইংরেজ-মহিলারূপে আঠারটি বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ম্যাকলাউড যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার কি একঘেয়ে মনে হয় না?" তিনি তখন উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি তাঁর (স্বামীজীর) কথা ভাবি।"

আলোচ্যকালেই লণ্ডনে এই দ্বিতীয়বারে শ্রীযুক্ত স্টার্ডি, শ্রীমতী মূলার, কুমারী মার্গারেট ও সেভিয়াররা স্বামীজীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

স্বামীজীর লণ্ডনে বাসকালে ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বামীজীর আদর্শে ও প্রেরণায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরেজী ভাষায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' বা 'অ্যাওকেণ্ড ইণ্ডিয়া' নামক মাসিক পত্রিকা মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত বি. আর. রাজম্ আয়ার। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র প্রথম সংখ্যা পাইয়া স্বামীজী ঐ পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত নঞ্জুণ্ড রাওকে ১৪ই জুলাই যে পত্র লিখেন উহাতে পত্রিকার প্রশংসার সহিত ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রকৃত উপায় ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব চিন্তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন: "'প্রবুদ্ধ ভারত'-গুলি পৌঁছেছে এবং ক্লাসে বিলি করাও হয়েছে। প্রত্রিকা খুব সন্তোষজনক হয়েছে; ভারতে এর যথেষ্ট প্রচলন হবে নিশ্চয়। আমেরিকাতেও এর কিছু গ্রাহক হতে পারে। ...আমি এখানে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; কিন্তু বিদেশী সাহায্যের উপর একেবারেই নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির মতো জাতিকেও নিজেকে নিজে সাহায্য করতে হবে। এই হচ্ছে ঠিক ঠিক স্বদেশ-প্রেম। যদি কোন জাতি তা করতে না পারে, তবে বলতে হবে—তার এখনও সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। ...একটি বিষয়ে কিন্তু আমার একটু মন্তব্য করতে হ'ল—মলাটটা একেবারে রুচিহীন, অতি বিশ্রী ও কদর্য।

…এটা ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন…। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক। …কত ভাবই তো রয়েছে—ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। লণ্ডনে গ্রীনম্যান কোম্পানি যে 'রাজযোগ' ছেপেছে তাতে আমার তৈরী প্রতীকটি দেখুন। …আমি নিউ ইয়র্কে রাজযোগ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিয়াছিলাম, সেগুলি এই পুস্তকে আছে।"

ইওরোপ ভ্রমণ

অবিরাম কার্যের ফলে স্বামীজী ক্লান্ত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার ৭ই জুলাই-এর পত্রে হেল-ভগিনীদিগকে জানাইয়াছিলেন, "সুইজরলণ্ডের পাহাড়ে শান্তি ও বিশ্রামের জন্য ১৯শে যাচ্ছি—মাসখানেকের জন্য। আবার শরৎকালে লণ্ডনে ফিরে কাজ আরম্ভ করা যাবে।" এই সময়টায় লণ্ডনের বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন; এই ঋতুটাই স্বামীজীর বিশ্রামের পক্ষে অনুকূল ছিল। অতএব বন্ধুরা যখন সুইজরলণ্ডে বেড়াইবার ও বিশ্রাম লইবার কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি অবশেষে সানন্দে বলিলেন, "হাঁ, আমারও বরফ দেখবার ও পাহাড়ী রাস্তায় বেড়াবার খুব সখ হয়েছে।" এই উদ্দেশ্যে ১৭ই জুলাই হইতে লণ্ডনের কাজ আপাততঃ বন্ধ করিয়া তিনি লণ্ডনের অবশিষ্ট বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় লইলেন এবং সকলের প্রেম প্রীতি ও শুভেচ্ছা সঙ্গে লইয়া ১৯শে জুলাই (১৮৯৬) বিকালে ইওরোপ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিলেন শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলার ও সেভিয়ার-দম্পতি; খরচ বহন করিবেন তাঁহারাই।

ডোভারে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী ফরাসী উপকূলের ক্যালে বন্দরে যাইবার জন্য সদলবলে জাহাজে উঠিলেন। এই ঋতুতে ইংলিশ চ্যানেল সাধারণতঃ তরঙ্গ-সঙ্কুল হইলেও এবারে সৌভাগ্যক্রমে শান্ত ছিল। নির্বিবাদে ক্যালেতে পৌঁছিয়া একটানা জেনেভা না গিয়া একটু বিশ্রামের জন্য তাঁহারা রাত্রিটা প্যারিসে কাটাইলেন। পরদিন আবার যাত্রা শুরু করিয়া তাঁহারা সানন্দে জেনেভায় উপস্থিত হইলেন। যে হোটেলে তাঁহারা স্থান পাইলেন উহা সুদৃশ্য ও শান্তবক্ষ হ্রদের পাড়ে অবস্থিত ছিল। স্থানটির শীতল স্বাস্থ্যপ্রদ সমীরণ এবং জলরাশির, আকাশের ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের প্রগাঢ় নীলিমা তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিল। গৃহগুলির সৌন্দর্য এবং চারিদিকের অভিনবত্বে স্বামীজী মুগ্ধ হইলেন। প্রকৃতির লীলাভূমি জেনেভা প্রটেস্টাণ্ট রিফর্মেশনের একটি প্রধান কেন্দ্র। অধিকন্তু ঐকালে সেখানে সুইজরলণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের প্রদর্শনী চলিতেছিল। নগরে প্রবেশ করিয়া স্বল্প বিশ্রামান্তে সকলে প্রদর্শনীক্ষেত্রে চলিলেন এবং ঐ দিনের প্রায় সবটা সময়ই সেখানে কাটাইলেন। স্থানীয়

শিল্পকলা, বিশেষতঃ কাঠের কারুকার্য দর্শনে স্বামীজী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি এখানে সেভিয়ার-দম্পতির সহিত বেলুনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঊর্ধ্বে আকাশমার্গে বিচরণকালে অস্তগামী সূর্যদেবের মাধুর্যদর্শনে তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন। নিম্নে জেনেভা নগরী যেন একখানি মানচিত্রবৎ প্রতিভাত হইতেছিল। স্বামীজী আরও ঊর্ধ্বে উঠিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। জেনেভার অদূরে হ্রদ-গিরি-সুশোভিত ইতিহাসবিশ্রুত চিলন-দুর্গ অবস্থিত; স্বামীজী উহা দেখিয়া আসিলেন। নগরে অনেক স্নানার্থী সমবেত হইয়া থাকেন; স্বামীজীও দুই দিন হ্রদে নামিয়া অবগাহন-স্নান করিলেন।

কথা ছিল জেনেভায় দিন কয়েক থাকা হইবে। কিন্তু সুইজরলণ্ডে আসিবার পূর্বেই স্বামীজী বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আমি মন্ঁা পর্বত ও চিরসৌন্দর্যনিলয় চামুনীজ পল্লী দেখব; আর একটি হিমপ্রবাহও অতিক্রম করতে হ'বে।" সেই সবের আকর্ষণে ক্ষুদ্র দলটি জেনেভায় মাত্র তিন দিন কাটাইয়া ফরাসী সীমান্তে অবস্থিত চল্লিশ মাইল দূরবর্তী চামুনীজ গ্রামে চলিলেন। সর্বজন-বিদিত এই ফরাসীয় সৌন্দর্য-নিকেতনে উপস্থিত হইলেন সম্ভবতঃ ২৪শে জুলাই। এখানে আসিয়া আল্পস পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর মন্ঁার দৃশ্য দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "এ সত্যি চমৎকার! এখানে আমরা একেবারে বরফের মধ্যে রয়েছি। ভারতবর্ষে বরফের রাজ্য বড় দূরে; বরফের কাছে যেতে হলে বহুদিন ধরে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলতে হয়। তবে তিব্বতের সীমান্তে যেসব বিশাল উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ রয়েছে, তাদের তুলনায় এগুলি তো ক্ষুদ্র গিরি মাত্র। তবু এ অতি সুন্দর। এস আমরা পর্বতে আরোহণ করি।" মন্ঁা শিখরে আরোহণের প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও স্বামীজী যখন পথপ্রদর্শকের মুখে শুনিলেন, সুনিপুণ পর্বতারোহী ব্যতীত কেহ সেখানে উঠিতে পারে না এবং দূরবীক্ষণযোগে শৈল-সংস্থান-দর্শনে তাঁহারও ঐরূপ প্রতীতি হইল, তখন নিরাশ-হৃদয়ে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিপদসঙ্কুল হিমশিখরে আরোহণ অসাধ্য হইলেও হিমনদী অতিক্রম করা তো অসম্ভব নহে! এইরূপ একটি হিমস্রোত পার না হইলে সুইজরলণ্ড-ভ্রমণই যে নিষ্ফল হইয়া যায়! স্বামীজীর এই সঙ্কল্পপূরণ কঠিন হইল না; কারণ নিকটেই মার-দে-গ্লেস নামক হিমনদী প্রবহমান ছিল। অতএব স্বামীজী কয়েক দিন তুষারশৃঙ্গ-পরিবৃত

চামুনীজ পল্লীতে কাটাইয়া সঙ্কল্প-পরিপূরণার্থ ঐ অভিযানে নির্গত হইলেন। অবশ্য উহা প্রথমে যতটা সহজসাধ্য মনে হইয়াছিল, কার্যতঃ তাহা হইল না; চলিতে গিয়া মাঝে মাঝে পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাপি গভীর খদসমূহ ও পর্বতগাত্রের শ্যামলশ্রী প্রাণে একটা অভূতপূর্ব আনন্দ সঞ্চারিত করিল। হিমপ্রবাহ অতিক্রমের পরই এক প্রকাণ্ড চড়াই; উহা শেষ করিয়া তবে খদের উপরিস্থ গ্রামে পৌঁছিতে হয়। চড়াই উঠিতে গিয়া স্বামীজীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। পূর্বে হিমালয়-ভ্রমণকালে তিনি কখনও এই জাতীয় দুর্বলতা অনুভব করেন নাই। এই অবস্থায় বার কয়েক পদস্খলন হইল। এই প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে উপরে শ্যাপো নামক স্থানে উঠিয়া তিনি সব পরিশ্রম ভুলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, অধিকন্তু একটু বিশ্রাম ও একপাত্র উষ্ণ কফি পানের পর বেশ সুস্থ বোধ করিলেন, দেহেও শক্তিসঞ্চার হইল। কিয়ৎকাল এখানে অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা চামুনীজে ফিরিয়া আসিলেন।

এই ভ্রমণকালে তিনি হিমালয়ের ধ্যানস্তিমিত আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা ও হিমালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আত্মজীবনের অনেক ঘটনা সঙ্গীদিগকে শুনাইলেন। হিমালয়ে একটি আশ্রমস্থাপনের আগ্রহ তিনি পূর্বেও সেভিয়ার-দম্পতিকে জানাইয়াছিলেন—ইহা হেল-ভগিনীদিগকে লিখিত ৭ই জুলাই-এর পত্র হইতে অনুমিত হয়: "মঠ হবার পরিকল্পনা চলছে মাত্র—হিমালয়ের কোথাও সেটা বাস্তব রূপ নেবার চেষ্টা করছে।" এখানে ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার মহোদয় পুনর্বার তাঁহার মুখে হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনের অভিপ্রায় স্পষ্টতররূপে শুনিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "এটা যদি কার্যে পরিণত করা যায়, তবে কি সুন্দরই না হয়! আপনি ঠিক বলেছেন—এরূপ একটি আশ্রম চাইই চাই।" হয়তো এই কথার উপর নির্ভর করিয়া স্বামীজী ৫ই অগস্টের এক পত্রে লালা বদ্রী সাহকে লিখিয়াছিলেন, "আলমোড়ার কাছে কোন সুবিধামত জায়গা আপনার জানা আছে কি, যেখানে বাগবাগিচাসহ আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সঙ্গে বাগান প্রভৃতি অবশ্য থাকা চাই। একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়।" আমরা পরে দেখিব, সেভিয়ার-দম্পতির আনুকূল্যে এইরূপ আশ্রম আলমোড়া জেলার মায়াবতীতে স্থাপিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সুইজরলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহাকে প্রতিপদে হিমালয়ের

কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, আর সেই সঙ্গে জাগিতেছিল ধ্যান, তপস্যা ও আশ্রমাদির স্মৃতি ও অভিলাষ।

সুইজরলণ্ডের চাষীদের আচার-ব্যবহারাদিও স্বামীজীর মনে হিমালয়ের পার্বত্য জাতীয়দের কথা জাগাইয়া দিতেছিল এবং তিনি সহচরবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, "এদের রীতিনীতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ যে দেখছি হিমালয়ের পার্বত্য জাতীয়দেরই মতো। এরা পিঠের উপর যে লম্বা ঝুড়ি ঝুলিয়ে নিয়ে চলে, সেগুলিও আমাদের দেশের পাহাড় অঞ্চলে ব্যবহৃত ঝুড়িরই মতো।"

চামুনীজ হইতে অতঃপর তাঁহারা লিট্‌ল সেণ্ট বার্নার্ডে খ্রীষ্টান সাধুদের মঠ দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহারই ঊর্ধ্বে সুবিখ্যাত 'সেণ্ট বার্নার্ড পাশ' নামক গিরিসঙ্কট, যাহার শিখরোপরি অগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের পান্থশালা অবস্থিত। ইওরোপে মানব-অধ্যুষিত উচ্চ স্থলগুলির মধ্যে অন্যতম।[১] লিট্‌ল সেণ্ট বার্নার্ডে যাওয়ার সহিত হয়ত হিমালয়ে ভাবী মঠ স্থাপনের পরিকল্পনার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। চামুনীজে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা নব্বুই মাইল দূরবর্তী জারমট নামক একটি সুরম্য স্থানে গমন করিলেন। সেখানে স্বামীজী মণ্টরোজা হিমপ্রবাহের নিকটবর্তী স্থান হইতে কিছু পার্বত্য ফুল আহরণ করিয়াছিলেন এবং রূপানন্দ প্রমুখ কয়েকজনকে তাহা পাঠাইয়াছিলেন। জারমট হইতে শ্রীমতী মূলারের অভিপ্রায়ানুসারে সকলে কয়েক মাইল দূরবর্তী সাস্‌ফী নামক আর একটি নির্জন স্থানে গমনপূর্বক সেখানে প্রায় দুই সপ্তাহ যাপন করিলেন সম্ভবতঃ ৫ই হইতে ১৯শে অগস্ট পর্যন্ত। এই স্থানটির চারিপার্শ্বে তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ এবং মূর্তিমতী শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজিত। সংসারের আবিলতার স্পর্শমাত্র এখানে নাই। স্বামীজীর অন্তর্মুখ মন এমন অনুকূল পরিবেশমধ্যে প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হইত। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে এখানে পাইলেন বাগ্মী, প্রচারক বা বিশ্ববরেণ্য ধর্মনেতারূপে নহে; প্রত্যুত নীরব ভগবচ্চিন্তানিরত সন্ন্যাসিরূপে। অনেক সময় তিনি একাকী পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গীদের মনেও যেন সে ধ্যানপরায়ণতার স্পর্শ লাগিয়াছিল; তাঁহারাও স্বামীজীকে স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণের সুযোগ প্রদান করিয়া পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এই অবস্থায় একটা দুর্ঘটনার উপক্রম হইয়াছিল। একদিন সকালে বন্ধুগণসহ ভ্রমণে বাহির

১। স্বামীজী সেখানে গিয়াছিলেন কিনা ইংরাজী জীবনীতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

হইয়া তিনি উপনিষদের বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিয়াছেন; বেদবাণী নির্ঘোষে আল্পস যেন হিমালয়ে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে আপন ভাবে মগ্ন হইয়া তিনি পিছাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গীরা আগাইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অপরেরা দেখেন তিনি দ্রুত তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন এবং উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতেছেন, "আমি ভগবৎকৃপায় বেঁচে গেছি, একটা খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি; আমি আমার পাহাড়-চলার লাঠিটিতে ভর দিয়ে পথ চলছিলাম; হঠাৎ সেটা একটা ফাটল ভেদ করে ঢুকে পড়ল, আর আমি প্রায় হুমড়ি খেয়ে খদে গিয়ে পড়ছিলাম; শুধু দৈববলেই বেঁচে এসেছি।" বন্ধুরা শুনিয়া খুবই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন এবং বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। অতঃপর তিনি যাহাতে একাকী কোথাও না যান, এই বিষয়ে তাঁহারা সতর্ক থাকিতেন।

বাসগৃহে ফিরিবার পরে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য-মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। স্বামীজী উহা দেখিয়া বলিলেন, "এসো, আমরা ভার্জিন (কুমারী) মেরীর শ্রীচরণে পুষ্প অর্ঘ্য প্রদান করি।" তাঁহার মুখ তখন অপূর্ব ভক্তিভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তিনি অপর একজনের সহিত একটু দূরে গিয়া কিছু পাহাড়ী ফুল লইয়া আসিলেন ও শ্রীযুক্তা সেভিয়ারকে বলিলেন, "আমার কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এগুলি ভার্জিন মেরীর শ্রীপদে অর্পণ কর। কারণ তিনিও তো মা!" তিনি নিজেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেন; কিন্তু ভয় হইল, পাছে বিধর্মী তিনি ঐরূপ করিলে কোন হাঙ্গামা বাধে, তাই তিনি নিরস্ত হইলেন।

এইভাবে সুইজরলণ্ডে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া স্বামীজী অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন; তাই ৮ই অগস্টের পত্রে গুডউইনকে জানাইয়াছিলেন, "এখন আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক সামনেই বিরাট তুষার প্রবাহগুলি দেখি আর অনুভব করি, যেন হিমালয়ে আছি।" আমেরিকার সংবাদ তিনি এই সুদূর বরফের দেশে বসিয়াও পাইতেছিলেন। সে সংবাদ ছিল সুখদুঃখমিশ্রিত। গুডউইন খবর দিয়াছিলেন, স্বামী সারদানন্দ সেখানে সাফল্য লাভ করিতেছেন; ইহা সুসংবাদ! কিন্তু গুডউইনের পত্রে বলা হইয়াছিল যে, কৃপানন্দ ঠিক শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিতেছেন না। আমাদের অনুমান, বেদান্তসমিতির সভ্যদের সহিত বনিবনা না হওয়াই এই অশান্তির কারণ। স্বামীজীর পত্রেও আমরা দেখিতে পাই, ওদেশে কৃপানন্দের

থাকার মতো কোন আশ্রম নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেছেন। তবু আমেরিকার কার্যে বিঘ্ন ঘটিতেছে জানিয়াও স্বামীজী চঞ্চল হন নাই বা কাহারও প্রতি দোষারোপও করেন নাই। শান্ত স্নেহময় আচার্যেরই ন্যায় গুডউইনকে লিখিলেন, "আমার স্নায়ুগুলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে এসেছে এবং তুমি যে-জাতীয় বিরক্তিকর ব্যাপারের কথা লিখেছ, তা আমাকে একেবারেই স্পর্শ করে না। এই ছেলেখেলা আমায় উদ্বিগ্ন করবে কি ক'রে? সারা দুনিয়াটা একটা নিছক ছেলে খেলা—প্রচার, শিক্ষাদান, সবই। 'যিনি দ্বেষও করেন না, তাঁকেই সন্ন্যাসী বলে জেনো'।" স্বামীজী সত্যই ছিলেন গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহাপুরুষ! তিনি আরও লিখিয়াছিলেন: "দিন কয়েক আগে হঠাৎ কৃপানন্দকে চিঠি লেখবার একটা অদম্য ইচ্ছা হয়েছিল। হয়তো সে আনন্দ পাচ্ছিল না এবং আমাকে স্মরণ করছিল। সুতরাং আমি তাকে খুব স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখেছিলাম।…মিস ওয়াল্ডোকে বলবে, তাকে যেন যথেষ্ট স্নেহ জানিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। প্রেম কখনও মরে না। সন্তানেরা যাই করুক বা যেমনই হোক না কেন, পিতৃস্নেহের মরণ নেই। সে আমার সন্তান—সে আজ দুঃখে পড়ায় আমার স্নেহ ও সাহায্যের উপর তার দাবি ঠিক তেমনি বা আরও বেশী।" ইহারই কিছু পূর্বে তিনি কৃপানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "গতকাল আমি 'মন্টি রোজা'র তুষার-প্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং সেই চির-তুষারের প্রায় মাঝখানে জাত কয়েকটি শক্ত পাপড়িবিশিষ্ট ফুল তুলে এনেছিলাম। তারই একটি এই চিঠির মধ্যে তোমাকে পাঠাচ্ছি—আশা করি, জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার বাধাবিপর্যয়রূপ হিমরাশি ও তুষারপাতের মধ্যে তুমিও ঐরূপ আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা লাভ করবে।…'সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়; সত্যের মধ্য দিয়েই দেবযান মার্গ চলেছে'…এখানে কোন আশ্রম নেই। একটা থাকলে কি সুন্দরই না হ'ত! আমি তাতে কতই না আনন্দিত হতাম এবং তাতে এদেশের কতই না কল্যাণ হ'ত!"

সুইজরলণ্ডের অন্তঃপাতী 'গ্র্যাণ্ড হোটেল, সায়াস ফি, ভ্যালে' হইতে লিখিত স্বামীজীর ৮ই অগস্টের পত্রে প্রকাশ, তিনি কিয়েল-নিবাসী জার্মান দার্শনিক পল ডয়সনের আমন্ত্রণক্রমে ১০ই সেপ্টেম্বর সেভিয়ার-দম্পতিসহ উক্ত অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইবেন; কিন্তু শ্রীমতী মূলার আগেই ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন। প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত ডয়সন স্বামীজীর সংবাদ রাখিতেন

এবং তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিতেন। তিনি স্বামীজীর সহিত মিলিত হইবার ঔৎসুক্য লইয়া লণ্ডনে পত্র লিখেন এবং উহাই ঘুরিয়া লোকলোচনের অন্তরালবর্তী এই গ্রামে পৌঁছায়। অধ্যাপকের অভিপ্রায় অনুসারেই স্বামীজী স্বীয় ভ্রমণধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিবার পথে জার্মানী হইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনও হাতে পূর্ণ একটি মাস ছিল। অতএব স্থির হইল, তাঁহারা আরও কিছুদিন সুইজরলণ্ডেই কাটাইবেন এবং অতঃপর কুমারী মূলার ব্যতীত আর সকলে জার্মানীর দুই-একটি স্থান দেখিয়া কিয়েলে উপস্থিত হইবেন, মূলার সুইজরলণ্ড হইতেই বিদায় লইবেন।

ক্রমে পূর্বোক্ত গ্রাম ত্যাগ করিয়া সকলে সুইজরলণ্ডের লুসার্ন নগরে উপস্থিত হইলেন (সম্ভবতঃ ২২শে অগস্ট)। লুসার্নে দেখিবার জিনিস অনেক কিছু ছিল; তাঁহারা একে একে সবই দেখিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ছাড়া অপর সকলে সেখানে পার্বত্য রেলপথে মাউণ্ট রিগির শিখরে আরোহণ করিলেন। এই ভ্রমণটির মধ্যেও বেশ একটু অভিনবত্ব ছিল; আবার পর্বতচূড়ায় উঠিলে জগতের অন্যতম অতুলনীয় তুষারদৃশ্য নয়ন-মন মুগ্ধ করিল। অন্যান্য স্থানের মধ্যে লুসার্নে তাঁহারা সুইস গার্ডদের কবরক্ষেত্র এবং তদুপরিস্থ পর্বতগাত্রে খোদিত এক অপরূপ নিদ্রিত সিংহমূর্তি দর্শন করিলেন। এখান হইতে তাঁহারা রিউস নদীর উপরিস্থ দুইটি চিত্রে শোভিত একটি আচ্ছাদিত সেতু অতিক্রম করিলেন। ইহারই একটি চিত্রে 'মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য' অঙ্কিত আছে। তারপর তাঁহারা লুসার্নের মিউজিয়াম ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে ধর্মমন্দিরে সুবিখ্যাত 'ভক্স হিউম্যানা' (মানব কণ্ঠ) নামক অর্গ্যান আছে, তাহা দর্শন করিলেন। এই যন্ত্র হইতে অবিকল মানবকণ্ঠসদৃশ শব্দ নির্গত হইতে দেখিয়া স্বামীজী খুব আমোদিত হইলেন। ইহার পর সকলে স্টীমারে চড়িয়া লুসার্ন হ্রদে ভ্রমণ করিলেন। লুসার্নে উইলহেল্‌ম টেলের নামে উৎসর্গীকৃত ক্ষুদ্র মন্দির দর্শনে উক্ত স্বদেশপ্রেমিকের জীবনকাহিনীর কত ঘটনাই না স্বামীজীর স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। হ্রদতীরে একদিন খুব ঝাল-লঙ্কা পাইয়া তিনি উহা কিনিয়া মুখে দিলে দোকানদার অবাক হইয়া গেল; কিন্তু স্বামীজী প্রশ্ন করিলেন, "তোমার এর চেয়ে আরো ঝাল-লঙ্কা আছে কি?"

লুসার্ন হইতে শ্রীমতী মূলার বাকি তিন জনের নিকট বিদায় লইলেন এবং স্বামীজী সম্ভবতঃ ২৬শে অগস্ট জার্মানীর দিকে অগ্রসর হইয়া সুইজরলণ্ডের

সীমান্তবর্তী এক সুরম্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে গর্নারগ্রাট শৃঙ্গে আরোহণপূর্বক ম্যাটারহর্ন-এর দৃশ্য দেখিবার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু বায়ুর স্বল্পতানিবন্ধন শ্রীযুক্ত সেভিয়ার ব্যতীত আর কেহ শৃঙ্গে উঠিতে পারিলেন না। ইহার পর তাঁহারা রাইন নদীর জলপ্রপাত দেখিবার জন্য শফহজেন-এ গমন করিলেন।

সেখান হইতে ইঁহারা জার্মানীর অন্যতম সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানক্ষেত্র হাইডেলবার্গে উপনীত হইয়া তথায় দুই দিন কাটাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করিয়া এবং জার্মানজাতির বিদ্যাদানের বিপুল আয়োজন ও শিক্ষার্থিবর্গের অদম্য বিদ্যোৎসাহ দেখিয়া স্বামীজী বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। নগরের প্রান্তে এক উচ্চ স্থানে অবস্থিত দুর্গটিও তাঁহারা দেখিলেন। এখান হইতে ইঁহারা কবলেন্‌জ-এ গেলেন এবং এক রাত্রি তথায় যাপনান্তে পরদিবস স্টীমারে উঠিলেন। স্টীমার রাইন নদী বহিয়া ৬০ মাইল দূরবর্তী কোলোন নগরে উপস্থিত হইল। এই শহরে দুই-তিনদিন অবস্থানপূর্বক ইঁহারা তথাকার সুবৃহৎ ভজনালয়, তন্মধ্যস্থ কোষাগার ও সন্ন্যাসিগণের হস্তনির্মিত অতুলনীয় রত্নখচিত ক্রুশ ও অন্য দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিলেন। স্বামীজী একদিন ভজনালয়ে প্রার্থনাকালেও উপস্থিত ছিলেন। সেভিয়াররা ভাবিয়াছিলেন, কোলোন হইতে সোজা কিয়েল যাইবেন; কিন্তু স্বামীজীর বার্লিন দেখিবার আগ্রহ আছে জানিয়া সকলে সেখানে চলিলেন। স্বামীজী যতই জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জার্মানজাতির কৃষ্টি, কার্যোদ্যম, সমৃদ্ধি ও আধুনিক রীতিতে নগরনির্মাণ ইত্যাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ততই বিস্ময়াভিভূত ও জার্মানদের সম্বন্ধে প্রশংসামুখর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বার্লিনে পৌঁছিলে মহানগরের সুপ্রশস্ত রাজপথ, মনোহর উদ্যাননিচয়, রমণীয় প্রাসাদাবলী স্বতঃই তাঁহাকে প্যারিসের কথা স্মরণ করাইয়া দিল এবং তাঁহার তত্ত্বান্বেষী মন ফরাসী ও জার্মান দেশের সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হইল। তিনি বুঝিলেন, উভয় দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। জার্মানী বীরের জাত এবং ইহলৌকিক ও বৌদ্ধিক অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতে দৃঢ়পণ। জার্মানীর সুশিক্ষিত সৈন্যদের দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "কি সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি!" ইহার পর সেভিয়ার তাঁহাকে ড্রেসডেনে লইয়া যাইতে চাহিলে স্বামীজী বলিলেন, "অধ্যাপক ডয়সন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন; আমাদের আর দেরি করা চলবে না।" অতএব তাঁহারা সেখান হইতে

একেবারে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী কিয়েল নগরে (৯ই সেপ্টেম্বর) উপনীত হইলেন এবং এক হোটেলে আশ্রয় লইলেন। অধ্যাপকের সহিত স্বামীজীর মিলন সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় :

"বাল্টিক সাগরতীরে মনোরম পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত জার্মান নগরী কিয়েলে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক ডাঃ পল ডয়সনের সান্নিধ্যে যে আনন্দময় একটি দিন কাটাইয়াছিলাম, তাহার স্মৃতিটি বহু মধুময় ঘটনার সহিত জড়িত থাকায় আমার চিত্তপটে খুবই উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান আছে। ইওরোপীয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ বিদগ্ধসমাজে ডয়সনের স্থান ছিল সর্বাগ্রে এবং তাঁহার দর্শনানুভূতি ছিল অনুপম। স্বামীজী হোটেলে পৌছিয়াছেন জানিবামাত্র অধ্যাপক একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে পরদিবস (১০ই সেপ্টেম্বর) তাঁহার সহিত প্রাতরাশের জন্য আহ্বান করিলেন এবং সৌজন্য প্রকাশপূর্বক আমাকে এবং আমার স্বামীকেও ঐ সঙ্গেই নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন সকালে ঠিক দশটায় আমরা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে আমাদিগকে তাঁহার পুস্তকাগারে লইয়া যাওয়া হইল; সেখানে ডাঃ ডয়সন ও তাঁহার স্ত্রী আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহারা আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, স্বামীজীর ভ্রমণ ও অভিপ্রায়াদি সম্বন্ধে প্রাথমিক একটু জিজ্ঞাসাদির পরেই অধ্যাপকের দৃষ্টি টেবিলের উপরে খোলা খান কয়েক পুস্তকের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং পণ্ডিত যেভাবে পাণ্ডিত্যের আদর করিয়া থাকেন, সেই প্রথাবলম্বনে অচিরে পুস্তকবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার মতে সত্যানুসন্ধিৎসু মানবের প্রতিভা যেসব অতিমহান চিন্তাধারা গড়িয়া তুলিয়াছে এবং মূল্যবান ফল প্রসব করিয়াছে তন্মধ্যে উপনিষদের ও বেদান্ত-সূত্রের ভিত্তিতে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যাবলম্বনে যে বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা অন্যতম এবং বেদান্তের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম নীতিবাদ রচিত হইতে পারে। ...অধ্যাপক আরও বলিলেন, তাঁহার মনে হয় যেন আধ্যাত্মিকতার উৎসাভিমুখে এমন একটা প্রত্যাবর্তনধারা আরম্ভ হইয়াছে, যাহার ফলে হয়তো ভারত ভবিষ্যতে সর্বজাতির আধ্যাত্মিক নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাগ্রণী আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে স্বীকৃত হইবে।

"ডয়সন যেসব অনুবাদকার্যে লিপ্ত ছিলেন, স্বামীজী তদ্বিষয়ে আগ্রহ দেখাইলেন এবং অনেক অস্পষ্ট স্থলের যথাযথ শব্দার্থ ও ঐগুলির তাৎপর্যবোধ



সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। স্বামীজী এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, পরিষ্কার লক্ষণ নির্ণয়ই হইতেছে সর্বপ্রধান কর্তব্য এবং ভাষার মাধুর্য অতীব গৌণ বিষয়। প্রাচ্যদেশীয় ব্যাখ্যাতা যেরূপ দৃঢ়ভাবে ও বিশ্বাসভরে স্বীয় তেজঃপূর্ণ ও সুপরিষ্কার তাৎপর্য দেখাইতে লাগিলেন এবং তৎসহ সূক্ষ্ম তত্ত্বানুভূতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে জার্মান পণ্ডিত অবশেষে তাঁহার মত অনুমোদন করিলেন।"

কিয়েলে অবস্থানের ঐ দিনটি সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। অধ্যাপক এক সময়ে দেখিলেন, স্বামীজী একখানি কাব্যগ্রন্থ লইয়া উহার পাতা উলটাইয়া যাইতেছেন। তিনি স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু প্রত্যুত্তর পাইলেন না। পরে যখন স্বামীজী ইহা জানিতে পারিলেন, তখন অধ্যাপকের নিকট এই বলিয়া ত্রুটি স্বীকার করিলেন যে, পাঠে নিবিষ্ট থাকায় তিনি তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই। ইহাতে অধ্যাপকের হয়তো প্রত্যয় হয় নাই ; কিন্তু পরে যখন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী ঐ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতে থাকিলেন তখন অধ্যাপক তাঁহার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন এবং অতিমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ স্মৃতিশক্তি তিনি কিরূপে পাইলেন। উত্তরে স্বামীজী মনঃসংযম ও একাগ্রতার কথা তুলিলেন এবং ভারতীয় যোগীরা মনকে একাগ্র করার জন্য যেসব সাধন অবলম্বন করেন ঐ বিষয়ে কথা হইতে লাগিল ; স্বামীজী বলিলেন, তাঁহারা তখন এমন একাগ্রতা অর্জন করেন যে, অঙ্গে জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দিলেও ধ্যানভঙ্গ হয় না।

আলোচ্যকালে কিয়েলে একটি প্রদর্শনী চলিতেছিল। অধ্যাপক ডয়সন স্বামীজীকে উহা দেখাইবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতএব চা-পানের ঠিক পরেই স্বামীজীর দলটি অধ্যাপক-দম্পতির সহিত প্রদর্শনী দেখিতে চলিলেন ; সেখানে জার্মানীর বহুবিধ শিল্পকলাদি দর্শন করিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া স্বামীজী ও সেভিয়াররা স্বীয় হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। অধ্যাপক বলিয়া রাখিলেন, পরদিবস কিয়েলে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু দেখিতে হইবে ; তদনুসারে তিনি পরদিন তাঁহাদিগকে লইয়া নানা স্থানে গেলেন এবং জার্মান-সম্রাট কাইজার উইলিয়াম-কর্তৃক সদ্য-উদ্বোধিত নবনির্মিত সুপ্রসিদ্ধ কিয়েল পোতাশ্রয়ও দেখাইলেন।

স্বামীজীর পক্ষে অধিক দিন কিয়েলে থাকা সম্ভব হইল না। তিনি ইওরোপ-ভ্রমণে প্রায় দুই মাস কাটাইয়া এখন বোধ করিতেছিলেন যে, আবার পূর্ণোদ্যমে ইংলণ্ডের কার্যারম্ভের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব ইংলণ্ডে ফিরিবার আয়োজন করিতে সেভিয়ারদের বলিয়া দিলেন। ডয়সন আশা করিয়াছিলেন, স্বামীজী আরও কিছুকাল থাকিবেন এবং সেই সুযোগে তিনি স্বীয় অমূল্য পুস্তকভাণ্ডারে বসিয়া একান্তে স্বামীজীর সহিত দর্শনালোচনা করিবেন ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থগুলিও খুলিয়া দেখিবেন। অতএব তিনি স্বামীজীকে অন্ততঃ আরও কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন; কিন্তু স্বামীজী যখন জানাইলেন যে, তিনি অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ফিরিতে চান এবং ফিরিবার পূর্বে লণ্ডনের কাজটিকে দৃঢ়সংস্থাপিত দেখিতে চান, তখন অধ্যাপক ইহার মর্ম অনুভব করিলেন ও বলিলেন, "তাহলে স্বামীজী, আমি হাম্বুর্গে আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং তারপর হল্যাণ্ড হয়ে আমরা সকলে লণ্ডনে যাব; সেখানে আপনার সঙ্গে কিছু সময় সানন্দে কাটাতে পারব, আশা করি।" ঐ কথানুসারে স্বামীজীরা হাম্বুর্গে আসিয়া একদিন রহিলেন। অধ্যাপক ডয়সন পূর্বকথা মত সেখানে না আসিয়া ১২ই সেপ্টেম্বর ব্রেমেনে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পর সকলে অ্যামস্টার্ডাম-এ তিন দিন অবস্থান করিলেন ও ঐ অবসরে স্থানীয় চিত্রশালা, যাদুঘর ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখিয়া লইলেন। অতঃপর তাঁহারা লণ্ডন যাত্রা করিলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া স্বামীজী সেভিয়ারদের সহিত তাঁহাদের হাম্পস্টেডের গৃহে গেলেন এবং ডয়সন সেণ্ট জনস উডে জনৈক বন্ধুর ভবনে আশ্রয় লইলেন। স্বামীজীর তখন বোধ হইতেছিল, তিনি যথেষ্ট শক্তি অর্জন করিয়াছেন এবং অধিকতর উদ্যমে পূর্বারব্ধ কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন।

লণ্ডনে বিদায়ের মুখে

সেভিয়ারদের গৃহে দিন কয়েক বিশ্রাম লইয়া স্বামীজী কার্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং শ্রীমতী মূলারের উইম্বলডন-এর অন্তর্বর্তী রিজওয়ে গার্ডেনস-এ অবস্থিত এয়ার্লি লজে বাস পরিবর্তন করিয়া সেখানে সূত্রপাত হিসাবে প্রথম দুই-সপ্তাহে দুইটি বক্তৃতা দিলেন। ইতোমধ্যে লণ্ডনে স্বামীজীর বক্তৃতার জন্য শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডি ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একখানি প্রকাণ্ড হলঘর ভাড়া লইলেন। এদিকে স্বামীজীর ও নিজেদের অবস্থানের জন্য উহারই নিকটে সেভিয়ার-দম্পতি ওয়েস্ট মিনিস্টার অঞ্চলে ১৪নং গ্রে কোটস গার্ডেনসে এক-প্রস্ত ঘর ভাড়া লইলেন। স্বামীজী অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে ঐ স্থানে চলিয়া আসিলেন। স্বামী অভেদানন্দ পূর্বেই ইংলণ্ডে পৌছিয়াছিলেন। তিনিও ঐ বাড়িতে চলিয়া আসিলেন।

ইংলণ্ডে এইবারে স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল প্রধানতঃ বেদান্ত-দর্শন বা জ্ঞানযোগ। প্রথমে শ্রীমতী মূলারের গৃহে ঘরোয়া আসরে যে দুইটি প্রবচন হয়, তাহার বিষয় ছিল 'সভ্যতায় বেদান্তের কার্যকারিতা'। লণ্ডনেও বেদান্তই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, অনুরাগীদের আগ্রহে পূর্বেরই ন্যায় রাজযোগ ও ধ্যান বিষয়েও শিক্ষা চলিতে লাগিল। স্বামীজীর পুনরাগমনবার্তা প্রচারিত হওয়ায় পুরাতন ও নূতন ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে আসিতে লাগিলেন এবং ইঁহাদের অনুরোধে ৮ই অক্টোবর হইতে নিয়মিত ক্লাস খোলা হইল।

অধ্যাপক ডয়সনও প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে বেদান্তশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্মার্থ অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইতেন। স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ করিয়া তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় শাস্ত্রের অর্থবোধ সুকঠিন; উহা বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির আবরণ ছিন্ন করিয়া প্রাচ্যের মুক্তাকাশতলে দাঁড়াইতে হইবে, এমন কি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে। ঐকালে অধ্যাপক মহাশয় কয়েক সপ্তাহ লণ্ডনে অবস্থান করিয়াছিলেন। এদিকে ম্যাক্সমূলার মহাশয়ের সহিতও স্বামীজীর ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছিল। এইরূপ

তিনজন মনীষীর সহযোগিতায় ঐ সময়ে বেদান্ত-প্রচারের ক্ষেত্র যে সমধিক প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামীজী বেদান্ত-বিষয়ে যেসব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা উৎকর্ষ ও মৌলিকতার জন্য পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইদানীন্তন পাঠকবর্গও এই ভাষণাবলীর অভিনব চিন্তাধারা, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, নিজস্ব বিচারশৈলী এবং প্রেরণাপ্রদ ও তেজঃপূর্ণ বাক্যাবলী পাঠে মুগ্ধ হইয়া বলেন, ইহা শুধু পাণ্ডিত্য নহে, প্রত্যুত অনুভূতিরসে সিঞ্চিত ব্রহ্মজ্ঞের বাণী, বা নবযুগের পথপ্রদর্শিকা। বেদান্তের দার্শনিক মতবাদ তো তিনি অবশ্যই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ঐ সঙ্গে কর্মজীবনে অদ্বৈতবাদের উপযোগিতা, ভ্রান্তধারণানির্মুক্ত মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ও সুন্দর ও সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার 'মায়া ও ভ্রান্তি', 'মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ', 'মায়া ও মুক্তি' এবং 'ব্রহ্ম ও জগৎ' মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন, উপরি উক্ত মন্তব্যগুলি কত সত্য। এতদ্ব্যতীত 'ঈশ্বরের সর্বব্যাপকত্ব', 'অপরোক্ষানুভূতি', 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব', 'আত্মার স্বাধীনতা' এবং 'কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ' প্রভৃতি বক্তৃতাবলীতে তিনি অদ্বৈতবাদের স্বরূপ, উহার সহিত অপর মতবাদগুলির পার্থক্য ও সামঞ্জস্য এবং অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ প্রভৃতি বিষয় অতি সফলতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর এ বিশ্বাসও তিনি সর্বদাই প্রকাশ করিতেন যে, বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব ও রজোগুণ-প্রধান কার্যধারা অবলম্বনে পাশ্চাত্ত্য জগৎ এমন এক বৌদ্ধিক স্তরে উন্নীত হইয়াছে যেখানে সে অদ্বৈতবাদ অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে সমর্থ; এবং এই স্বেচ্ছামূলক স্বীকৃতিদ্বারাই সে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে—অদ্বৈতবাদই প্রতীচ্যের অপূর্ণ আত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে সক্ষম। আবার অদ্বৈত বেদান্তই নৈতিকতা ও সার্বভৌম ধর্মের ভিত্তি হইতে পারে এবং উহাই দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের দার্শনিক প্রতিষ্ঠাভূমি হইবার যোগ্য। পাশ্চাত্ত্যদেশ তাঁহার ভাষণগুলিতে আত্মতত্ত্ব, ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, মানুষের দেবত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নবালোকের সন্ধান পাইয়াছিল এবং এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ অধ্যয়ন করিয়া বাইবেলের নিগূঢ় মর্মার্থ উপলব্ধি করিয়াছিল। ফলতঃ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগৎ যেন বেদান্তমধ্যে এক নূতন ও পূর্ণতর জীবনধারা আবিষ্কার করিয়াছিল। আর ভাষণগুলি তো কেবল শব্দরাশি ছিল না; উহাদের মধ্যে

একটি শক্তি সঞ্চারিত থাকিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করিত। মায়াবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে একদিন এমন হইয়াছিল যে, শ্রোতারা আপনাদিগকে আত্মভাবে সমাহিত বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এইরূপ আচার্যই শিষ্যবৃন্দকে অনুভূতিরাজ্যে লইয়া যাইতে সমর্থ। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য বক্তৃতার ন্যায় এই বক্তৃতাগুলিও তিনি বিনা প্রস্তুতিতে মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছিলেন, কোন নোট-এর সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত অন্য সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, বক্তৃতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজী গল্পগুজবে এমন কি হাসি-ঠাট্টাতে কাটাইতেন। বক্তৃতামঞ্চে আরোহণকালে গুডউইন কানে কানে সেদিনকার আলোচ্য বিষয়টি বলিয়া দিতেন। তখন তাঁহার চেহারায় এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিত—যেন অন্য মানুষ হইয়া যাইতেন, আর ঐ অবস্থায় যেন দৈবপ্রেরণাবশে আশ্চর্য সব কথা বলিয়া যাইতেন। ক্ষিপ্রলিপিকার গুডউইন পরে তাঁহাকে বক্তৃতার প্রতিলিপি দেখাইলে, তিনি যেন অবাক হইয়া যাইতেন, এইসব বাণী তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল কিরূপে!

আলোচ্যকালে যেসব পণ্ডিতের সহিত স্বামীজীর সৌহার্দ্যের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর যেসব মনীষী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য: বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ও গ্রন্থকার ফ্রেডারিক এচ. মায়ার্স, রেভারেণ্ড জন পেজ হপস, পজিটিভিস্ট (প্রত্যক্ষবাদী) ও শান্তি-পক্ষাবলম্বী এম. ডি. কনওয়ে, ডাঃ স্ট্যাণ্টন কয়েট, থিস্টিক দলের নেতা রেভারেণ্ড চার্ল্স ভয়সী এবং 'টুওয়ার্ডস ডেমোক্রেসী' নামক গ্রন্থপ্রণেতা এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার। এতদ্ব্যতীত এমন বহু ধর্মযাজক তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন যাঁহারা গির্জায় বক্তৃতাকালে স্বীয় বক্তব্য সহজে বুঝাইবার জন্য স্বামীজীর ব্যাখ্যাপ্রণালীর সাহায্য লইতেন। ক্যানন উইলবারফোর্সকে তো বেদান্তানুরাগী বলিলেই চলিত। সর্বসাধারণের জন্য ভাষণ ও প্রবচন ছাড়াও স্বামীজী বিশেষ বিশেষ ক্লাবে বা গৃহে স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিতেন ও এই প্রণালীতে বহু বন্ধু লাভ করিতেন। তিনি উইলবারফোর্সের গৃহে একবার সাদর আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। 'সিসেম ক্লাবে' তাঁহার বহু বক্তৃতা হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেও উদারপন্থী ধর্মযাজকের গির্জায় বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং নানা প্রণালী

অবলম্বনে বেদান্ত ইংরেজের চিন্তারাজ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন।

তখন তিনি স্বদেশ হইতে গ্রন্থাদি আনাইয়া এবং লণ্ডনের পুস্তকাগারের সাহায্য লইয়া বেদান্তের তিনটি প্রধান দার্শনিক মত—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের আলোচনায়ও ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, এই মতত্রয়ের সারমর্ম সঙ্কলনপূর্বক উহাদের সমন্বয়-সাধন করিবেন ও গ্রন্থাকারে সাধারণের জন্য তাহা প্রচার করিবেন। তাঁহার এই সমন্বয়সাধন ও সিদ্ধির পরিচয় অনেক বক্তৃতা ও পত্রাদিতে পাই; কিন্তু গ্রন্থ তিনি লিখিতে পারেন নাই; কারণ কর্মব্যস্ত স্বল্পায়ুর মধ্যে তিনি সে অবসর খুঁজিয়া পান নাই। প্রচারকার্যে যখন তিনি নামিতেন তখন অন্য কোন দিকে মন দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত; কারণ বক্তৃতা, বন্ধুদের আমন্ত্রণ রক্ষা, জিজ্ঞাসুর সহিত আলাপ করা, ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দেওয়া, অগণিত পত্র লেখা ইত্যাদিতেই দিনের সবটা সময় এবং রাত্রিরও অনেকখানি কাটিয়া যাইত। সুইজরলণ্ড হইতেই তিনি লিখিয়াছিলেন, লণ্ডনে একটা প্রকাণ্ড কাজ অপেক্ষা করিতেছে। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও দেখিলেন, বেদান্তের মতত্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনার্থ গ্রন্থপ্রণয়ন তাঁহার একমাত্র কর্তব্য নহে; অদ্বৈত বেদান্তের যুগোপযোগী কার্যকারিতা দেখাইয়া দেওয়া এবং উহার নিগূঢ় তথ্যসমূহকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ ও ঐ বিষয়ে ভ্রান্তি দূর করা তাঁহার প্রথম কর্তব্য। তবে সমন্বয় ভিত্তিক মৌলিক গ্রন্থ-রচনা অসম্ভব হইলেও তিনি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন যে পূর্বপ্রকাশিত অন্যবিষয়ক গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হইয়াছে; বিশেষতঃ 'রাজযোগ'-এর প্রথম সংস্করণ অক্টোবরের পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল; এবং নভেম্বরে যখন নূতন সংস্করণ ছাপা আরম্ভ হইল, তখন গ্রন্থের অপূর্ণ চাহিদা কয়েক শতে দাঁড়াইয়া গেল। গ্রন্থাকারে বেদান্ত-চিন্তারাশিকে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছাটি কিন্তু তিনি সর্বদাই পোষণ করিতেন; এমন কি, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন মায়াবতী গিয়াছিলেন, তখনও জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্যান্য কার্য হইতে অবসর লইয়া বাকি জীবন কোন এক নিভৃত স্থানে বসিয়া গ্রন্থ-রচনায় কাটাইতে চান; এবং ঐরূপ কার্যের পক্ষে হিমালয়ক্রোড়স্থিত, সমতল-ভূমির উত্তাপরহিত, নির্জন মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমই সর্বাধিক অনুকূল।

আমরা দেখিয়াছি, এই কর্মব্যাপৃতি ও কর্মবিরতির আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর

জীবনে সমান্তরালভাবেই চলিয়াছিল। নবযুগের প্রবর্তক স্বামীজী স্বয়ং অক্লান্ত কর্ম করিয়া এবং অপরকে কর্মে প্রেরণা দিয়া নবীন আদর্শকে সক্রিয় করিয়া তুলিলেও তিনি কর্মের দাসত্ব স্বীকারপূর্বক অধ্যাত্মপ্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন কখনও অস্বীকার করেন নাই, নিজ জীবনে সন্ন্যাসোচিত নৈষ্কর্ম্যের আগ্রহও তিনি সর্বদাই দেখাইয়াছেন। ফলতঃ কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও স্বার্থত্যাগ ও অহংবুদ্ধিশূন্যতা—কর্ম করিয়াও না করা—এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠার মধ্যেই যেন তিনি 'কর্মে অকর্ম দর্শন ও অকর্মে কর্ম দর্শনের' গীতোক্ত মূল সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুইজরলণ্ড হইতে লিখিত ২৩শে অগস্ট-এর পত্রে বৈরাগ্যের সুরটি উচ্চ পর্দাতেই বাজিয়াছে: "আমি কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, এখন অন্যে এটাকে চালাক। দেখতেই তো পাচ্ছেন, কাজটা চালিয়ে দেবার জন্যে কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে আমার যতটুকু করবার তা শেষ হয়েছে; এখন আমার বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন, এমন কি কাজটার ওপরও কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে আর ফিরে আসছি না। এমন কি এই কাজের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকটার ওপরও আমার অরুচি হয়ে আসছে। মা শীঘ্রই আমাকে কাছে টেনে নিন। আর যেন কখনও ফিরে আসতে না হয়! এই সব কাজ করা, উপকার করা ইত্যাদি শুধু চিত্তশুদ্ধির সাধন মাত্র। তা আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগৎ চিরকাল—অনন্তকাল ধরে জগৎই থাকবে। আমরা যে যেমন সে তেমন ভাবেই জগৎটা দেখি। কে কাজ করে, আর কার কাজ? জগৎ বলে কিছু নেই—এ সবই তো স্বয়ং ভগবান। ভ্রমে আমরা একে জগৎ বলি। এখানে আমি নেই, তুমি নেই, আপনি নেই—আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।" সুন্দর কথাগুলির মধ্যে পাই, প্রথমতঃ স্বামীজী লৌকিক অর্থে কার্যের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ কার্যাবলম্বনে যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ—জগৎ বলিয়া কিছুই তাঁহার নিকট নাই, সবই ব্রহ্ম। সাধারণ অর্থে কর্ম তাঁহার নাই; অথচ তিনি পত্রে যাহাই লিখুন বস্তুতঃ তখনও কর্মত্যাগ না করিয়া কর্ম করিতেই থাকিলেন, কেননা ইহা লোককল্যাণার্থ মুক্তপুরুষের অহং-বুদ্ধি-বিসর্জন-পূর্বক ভগবদাদেশ-পালন ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কাজ করিতে বলিয়াছিলেন;

তিনি তাঁহারই কাজ করিতেছিলেন—কেবল তাঁহারই; নিজের নামযশ বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য কিছুই করেন নাই।

স্বামীজীর স্বীকৃত দর্শনের দিক হইতেও তাঁহার উক্তি ও আচরণের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্তু, অথচ জগতের বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, এমন কি জীবন্মুক্ত পুরুষও তাহা আপাততঃ স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ জগৎকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজীর মতে এই অযৌক্তিক অস্বীকারই ভারতের বিবিধ প্রকার অবনতির মূল কারণ। শঙ্করাচার্যও জগৎকে অলীক বলেন নাই, তিনি উহার ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই স্বীকৃতির অনুযায়ী ধর্মপ্রচার, মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভ্রম লোকসিদ্ধ বস্তু হইলেও ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্য এবং ভ্রমকালে ভ্রমেরও সত্তা স্বীকার্য; ভ্রমে রজ্জুতে যখন সর্পদর্শন হয়, তখন জ্ঞানী ব্যক্তি সর্পকে অস্বীকার করিয়া যদি রজ্জু-সর্পটিকে ভ্রান্ত ব্যক্তির গায়ে ছুড়িয়া মারেন, তবে সে ভয়ে জ্ঞান হারাইবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির কল্যাণার্থ জ্ঞানীকে আপাততঃ সর্পকে সত্য বলিয়াই মানিতে হইবে। এইরূপই ছিল প্রাচীন মত। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু লোক কল্যাণের কথা ছাড়িয়া দিয়া সত্য সত্যই জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও মা কালীর অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে প্রণতি জানাইলেন—জগতের সহিত তাঁহার ছিল একটা ভালবাসার সম্বন্ধ, যাহা ব্রহ্মদৃষ্টি হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। স্বামীজীও জগৎকে ঘৃণা না করিয়া, অলীক বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আর তিনি বলিয়াছিলেন, "এ সবই তো স্বয়ং ভগবান।" তাঁহার সমস্ত কার্যের অর্থ হইল ভগবানের সেবা।

অতএব কার্যপরিত্যাগের কথা বারংবার বলার অব্যবহিত পরে সুইজরলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার ভগবন্নির্দিষ্ট কর্মে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনও অযৌক্তিকতা নাই। ফলতঃ লৌকিক অর্থে অভিমান পরবশ হইয়া তিনি কখনও কার্যে লিপ্ত ছিলেন না এবং অভিমানশূন্য কার্য তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই। লণ্ডনের কার্যের পুনরারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের কাজ গড়িয়া তোলার চিন্তায়ও বিশেষ ব্যাপৃত হইলেন। এই বৎসরেই ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি নিবেদিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নিজস্ব ভাবটি বেশ

ধরা পড়ে। ১৬ই ডিসেম্বর যখন তাঁহার ভারত-যাত্রার দিনরূপে স্থির হইয়াছে বলিয়া বন্ধুবান্ধবের শ্রুতিগোচর হইল, তখন পূর্বের সমস্ত দ্বিধা কাটাইয়া মার্গারেট একদিন স্বামীজীকে বলিলেন, তিনিও ভারতে যাইতে চান। স্বামীজী মার্গারেটের এই মনোভাব পূর্বে কখনও পরিষ্কার জানিতে পারেন নাই, অতএব অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি যে উত্তর দিলেন উহাই আমাদের আলোচ্য স্থলে বিশেষ প্রতিধানযোগ্য। তিনি বলিলেন, "আমার নিজের কথা এই বলতে পারি যে, আমি আমার স্বদেশবাসীর জন্য যে কাজে ব্রতী হয়েছি, তা উদ্যাপনের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তো দশবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।" ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপ।

ইংলণ্ডে বক্তৃতাদিতে নিরত থাকার মধ্যে তিনি ভারতের চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতেন এবং সেই সুযোগে ভারতীয় গুরুভ্রাতা, শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবান্ধবকে পত্রযোগে ভারতসম্বন্ধে বিবিধ পরিকল্পনার কথা জানাইতেন ও নূতন বা পূর্বারব্ধ কার্যে উৎসাহ জাগাইতেন, স্থলবিশেষে অর্থসাহায্যও পাঠাইতেন। 'প্রবুদ্ধভারত' ও 'ব্রহ্মবাদিন্' সাময়িক পত্রদ্বয় তখন বেশ চলিতেছে, ইহাদের পরিচালনাবিষয়েও স্বামীজী পরামর্শ দিতেছেন। নঞ্জুণ্ড রাওকে কাজের কৌশল শিখাইতে গিয়া ২৬শে অগস্ট সুইজরলণ্ড হইতে লিখিয়াছিলেন, "কাজকে ঠিক কাজ বলেই ধরতে হবে—এর ভেতর বন্ধুত্বের অথবা চক্ষুলজ্জার স্থান নেই।...'শাকের কড়ি মাছে' দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা। তারপর চাই—অদম্য উৎসাহ। যখন যা কর, তখনকার মতো তাই হবে ভগবৎ-সেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মতো আপনার আরাধ্য দেবতা হোক।" ২৮শে অক্টোবর লণ্ডন হইতে তিনি আলাসিঙ্গাকে জানাইলেন, তিনি সদলবলে ভারতে ফিরিবেন; আর ২০শে নভেম্বরের পত্রে লিখিলেন: "মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর সহধর্মিনী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন করতে যাচ্ছেন।...কলকাতা আর মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র খুলব—এই হচ্ছে আমার বর্তমান পরিকল্পনা।...এই তিনটি কেন্দ্র নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ ক'রব; পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে যাব। প্রভুর ইচ্ছা হ'লে এ-সকল কেন্দ্র হ'তে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ ক'রব তা নয়, আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক পাঠাব।"

ভারতে একটা বড় রকমের কিছুরই তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন এবং ঐ জন্য প্রস্তুতও হইতেছিলেন; পরন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, পথে বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে এইরূপ বৈরাগ্যবান যুবকের একান্তই অভাব; কারণ পরাধীন জাতি অপরের কল্যাণার্থ আত্মোৎসর্গের প্রেরণা পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিল: "আমার মনে হয়, শঙ্করের জন্মভূমি ত্যাগের ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে।" দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারিত না: "ভারতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি, তার সব একটা দোষে পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনও কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি।" (২৬শে অগস্ট, ১৮৯৬)। তৃতীয়তঃ অর্থাভাব। ভারতের অধিকাংশ লোক দরিদ্র; যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা হয় হৃদয়হীন, না হয় উচ্চচিন্তাবিহীন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীজীর ন্যায় বীরহৃদয়, ত্যাগী, ধর্মপ্রাণ স্বদেশপ্রেমিকের পক্ষেও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্থরগতিতে চলিতে হয়, নতুবা অন্য সমস্ত চিন্তা ভুলিয়া ক্ষেত্রপ্রস্তুতির জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে হয়: "যদি কয়েকজন দৃঢ়চেতা খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জয় করে ফেলতে পারি। কোথায় এরূপ লোক? আমরা সবাই যে আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ! মুখে স্বদেশপ্রেমের কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াই, আর 'আমরা খুব ধার্মিক' এই অভিমানে ফুলে আছি।...আমি চাই এমন লোক, যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় এবং স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।" (লণ্ডন, ১৮৯৬; আলাসিঙ্গাকে লেখা)। তেমন লোক প্রস্তুত ছিল না, অতএব উপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণের জন্য ভারতে প্রত্যাগমন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও তিনি জানিতেন, "ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে সেই এক ঘা ভারতের ভিতরের লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়।" (ঐ)। অতএব তিনি ভারতে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন এবং ইংলণ্ডের কাজেরও একটা স্থায়ী সুব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট রহিলেন।

তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইল স্বামী অভেদানন্দকে বিদেশীয় কার্যের উপযুক্ত করিয়া তোলা। এই কার্যের জন্য যোগ্যতা যথেষ্ট থাকিলেও স্বামী অভেদানন্দ প্রথম দিকে স্বভাবতঃই একটু দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। কাজেই একরকম জোর করিয়াই স্বামীজী তাহার দ্বারা ২৭শে অক্টোবর ব্লুম্‌স স্কোয়ারে বক্তৃতা

দেওয়াইলেন। সেদিন স্বামীজীর নিজের বক্তৃতাদানের কথা ছিল; কিন্তু স্বামীজী শ্রোতাদের নিকট ঘোষণা করিলেন, স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা করিবেন। অগত্যা তাহাই হইল। বক্তৃতায় বেদান্তদর্শনের মৌলিক বিষয়গুলি বেশ সুন্দরভাবে আলোচিত হইল। ইহাতে স্বামীজী ও শ্রোতারা সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং বুঝিলেন, কালে ইনি অল্পায়াসেই উত্তম বক্তা হইতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত এরিক হ্যামণ্ড ঐদিনের ঘটনা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "সেদিন অপরাহ্ণে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে খানিকটা নিরাশ হইতে হইয়াছিল। ঘোষণা করা হইল যে, স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে চাহেন না; তাঁহার স্থলে স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা করিবেন। নিজের মনোনীত পণ্ডিতের সাফল্যদর্শনে স্বামীজীর বদন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে আনন্দের অন্ততঃ কিছুটা তিনি তথায় প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না, আর সে কথাগুলিও ছিল আনন্দোচ্ছ্বসিত। আধ্যাত্মিক গুরু স্বীয় প্রিয় সন্তানের—সাফল্যপূর্ণ মেধাবী শিষ্যের জন্য যেরূপ উল্লাস বোধ করেন, স্বামীজীর আনন্দ ছিল উহারই সমজাতীয়। গুরুভ্রাতা যাহাতে সম্পূর্ণ বাধাহীন সুযোগ পান, এই উদ্দেশ্যে নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া স্বামীজীর যেন তৃপ্তির অবধি ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটি যে অনুভব জাগাইয়াছিল, তাহার মাধুর্য এমনি চমৎকার যে উহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। স্বামীজী যেন এই কথাটি ভাবিয়াই রাখিয়াছিলেন এবং সত্য বলিয়া জানিতেন: 'ইহলোক হতে আমার অন্তর্ধান হলেও আমার বাণী এই প্রিয় ওষ্ঠদ্বয়ে উচ্চারিত হতে থাকবে এবং জগৎ তা শুনবে।'···তিনি জানিতেন যে, তাঁহার গুরুভ্রাতা ও প্রিয় ছাত্র এই প্রথম ইংরেজ শ্রোতার সম্মুখে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন; অতএব উদ্ধৃত মন্তব্য শুনিয়া যখন শ্রোতারা হর্ষধ্বনি করিলেন, তখন স্বামীজীরও হৃদয় বিমল আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই ঘটনার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি যে নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিলেন তাহা লোকের মনে অনপনীয় হইয়া রহিল।"

ইংরেজী জীবনীর মতে এই কালমধ্যে গুডউইন ইংলণ্ডে ফিরিয়া ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ও অন্য সূত্রে স্বামী সারদানন্দের সাফল্যের সংবাদ পাইয়া স্বামীজী আমেরিকার কার্যসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। সারদানন্দ গ্রীনএকার কনফারেন্সে যোগ দিয়া স্বামীজীরই মতো সেই একই পাইন গাছের তলায় ছাত্রদের লইয়া ক্লাস করিয়াছিলেন এবং অন্যত্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

অতঃপর বস্টন, ব্রুকলিন এবং নিউ ইয়র্কেও তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি নিউ ইয়র্কে থাকিয়া স্থায়িভাবে কার্যচালনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী ওয়াল্ডো বা হরিদাসী স্বামীজীরই নির্দেশানুযায়ী স্বতন্ত্র ক্লাশ চালাইতেছিলেন এবং সাফল্যও অর্জন করিয়াছিলেন। অন্যান্য কার্যের অবসরে ও স্বামী সারদানন্দের কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে তিনি নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতিতে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ক্লাস চালাইয়াছিলেন। স্বামীজী মনে করিতেন, হরিদাসীই তাঁহার হাতে-গড়া পাশ্চাত্ত্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

স্বামীজী আমেরিকার বাহিরে থাকিলেও সেখানে তাঁহার স্মৃতি ও প্রভাব যে অক্ষুণ্ণ ছিল এবং বেদান্তের প্রচার ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল, ইহার প্রমাণ 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর সম্পাদককে লিখিত শ্রীমতী হেলেন এফ. হান্টিংটনের ১৪ই অক্টোবরের (১৮৯৬) পত্রে জানা যায় : "আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনি জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের বিবিধ শান্তিময় ফল সর্বদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাঁহার প্রভাব যেন সূর্যকিরণসদৃশ—এত নীরব, অথচ এত শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী! আমরা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা চিরন্তন অভ্যাস ও শিক্ষার দোষে যদিও বিপরীত মতই পোষণ করিয়া থাকি, তথাপি একজন প্রাচ্যবাসী কি করিয়া পাশ্চাত্ত্যের উপর এমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিলেন, ইহা চিরকালই এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া থাকিবে।...সাময়িক কুতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলি যেরূপ শব্দবহুল আলোড়ন সৃষ্টি করে, আমাদের আগ্রহ সে জাতীয় নহে। ইহা পূর্বে যেরূপ ছিল, আজ ততোধিক গভীরতর ও প্রবলতর এবং স্বামীজীর সকল শিষ্যই যে যেমন সুযোগ পায় তদনুসারে তাঁহার বার্তা প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে—কেহ হয়তো পরিবারের শান্ত পরিবেশমধ্যে নীরবে, অপরেরা তদপেক্ষা প্রকাশ্যভাবে—যে যেমন পারে। অধিকন্তু মানবের নীরব প্রভাবের পরিমাপ আজ পর্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছে কি? এমন কি এখানে (জর্জিয়াতে) স্বামীজীর কর্মক্ষেত্র হইতে সহস্র মাইল বা ততোধিক দূরে বসিয়া আমি অপরের মুখে তাঁহার নাম শুনিতে পাই।...আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে নিউ ইয়র্কের ন্যায় এখানেও বেদান্ত সুপরিচিত হইয়া যাইবে...স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সকলের এমন প্রীতি অর্জন করিয়াছেন যে, তিনি আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুন, এই কথা আমরা না ভাবিয়া পারি না। স্বামীজী নিজে

যেমন স্বীয় গুরুদেব সম্বন্ধে বলিতেন, 'তাঁহার কেবল উপস্থিতিতেই পাপী অপাপী সকলে আশীর্বাদ লাভ করিত', তেমনি ছিল স্বামীজীরও জীবন আমাদের কাছে। কারণ তিনি আমাদিগকে মহত্তর জীবনযাপন করিতে ও সকলের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন।"

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে কার্যের সুব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজীর মন অক্টোবর মাস হইতেই ভারতে প্রত্যাবর্তনের সক্রিয় চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়াছিল এবং পত্রে ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে সঙ্কল্পটি প্রাসঙ্গিকভাবেই উত্থিত হইত, তখনও উহা নিশ্চিতরূপ ধারণ করে নাই। অক্টোবর হইতে কিছুদিন এইভাবেই কাটিল। তারপর নভেম্বর মাসে একদিন ক্লাসের কাজ শেষ হইয়া গেলে তিনি শ্রীযুক্ত সেভিয়ারকে একান্তে ডাকিয়া অকস্মাৎ বলিলেন, তিনি যেন স্বামীজী, গুডউইন ও সেভিয়ারদের উভয়ের জন্য মোট চারিখানি টিকেট কিনিয়া ফেলেন। গুডউইন ইংলণ্ড হইতে বরাবর জাহাজে যাইবেন; কিন্তু সমুদ্রযাত্রা কমাইবার জন্য স্বামীজী সেভিয়ারদের সহিত স্থলপথে ইওরোপের মধ্য দিয়া নেপল্‌স পর্যন্ত ট্রেনে যাইবেন, ও নেপল্‌স-এ জাহাজ ধরিবেন। এই সুযোগে ইওরোপেরও খানিকটা দেখা হইয়া যাইবে। ঘোষণাটি আকস্মিক হইলেও শ্রীযুক্তা সেভিয়ার খুব আশ্চর্য হইলেন না। তিনি পূর্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, স্বামীজীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের দিন খুব দূরবর্তী নহে এবং স্থির করিয়াছিলেন, যেদিন স্বামীজীর সঙ্কল্প স্থির হইয়া যাইবে সেদিন তিনিও শ্রীযুক্ত সেভিয়ারের সহিত ভারতযাত্রা করিবেন ও সেখানে বানপ্রস্থ অবলম্বনে বাকি জীবন কাটাইবেন। স্বামীজীর ১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া সেভিয়ার-দম্পতি অনতিবিলম্বে সকলের জন্য নর্থ জার্মান লয়েড কোম্পানীর একখানি নব-নির্মিত জাহাজের টিকেট ক্রয় করিলেন; ঐ জাহাজে ৩০শে ডিসেম্বর নেপল্‌স হইতে কলম্বো যাইবার কথা ছিল। কিন্তু নূতন জাহাজ কোন কারণে নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করিতে না পারায়, ঐ কোম্পানীর 'প্রিন্স রিজেণ্ট লিওপোল্ড' নামক অপর এক জাহাজে তাঁহাদের স্থান করিয়া দেওয়া হয়। স্বামীজী তখন ভারতীয় কাজের জন্য উদ্‌গ্রীব। শ্রীযুক্ত সেভিয়ারের সহিত তিনি কত পরিকল্পনা-বিষয়েই না আলোচনা করিতেন। সে উৎসাহে মাতিয়া ভাবী-বানপ্রস্থ জীবনের প্রস্তুতি-হিসাবে সেভিয়ার ও তাঁহার স্ত্রী ইংলণ্ডের অস্থাবর-সম্পত্তি—

অলঙ্কার, গৃহসামগ্রী, চিত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন। বাড়িরও ব্যবস্থা করিয়া বিদায়ের দিন গুণিতে লাগিলেন। শ্রীমতী মূলারও তাঁহার পরিচারিকা কুমারী বেল-এর সহিত কিছুদিন পরে স্বামীজীর অনুগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। স্বামীজী ভারতের পুনরভ্যুত্থানের জন্য যে কার্যধারা রচনা করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে নারী-সমাজের একটা বিশেষ স্থান ছিল। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও হিমালয়ে তিনটি কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তিনি একদিকে যেমন ভারতীয় ও বিদেশীয় কার্যের জন্য যুবকদিগকে প্রস্তুত করিতে উদ্যত ছিলেন, অপর দিকে তেমনি জাতীয় ধারায় আদর্শ স্ত্রী, মাতা এবং ব্রহ্মচারিণীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তন গঠনের কথা ভাবিতেছিলেন। শ্রীমতী মূলার এই ভাবটি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণপূর্বক স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্বামীজী মনে মনে ইহাও ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যথাকালে তিনি মার্গারেট নোবলকেও ভারতে আনিয়া তাঁহার হস্তে নারী-বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করিবেন।

এদিকে শ্রীযুক্তা ওলি বুলও স্বামীজীর স্বদেশযাত্রার সংবাদ তাঁহারই পত্রে জানিতে পারিলেন এবং প্রত্যুত্তরে জানাইয়া রাখিলেন যে, ভারতীয় কাজের জন্য, বিশেষতঃ কলিকাতায় স্থায়ী আশ্রম স্থাপনের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু স্বামীজী ভারতীয় অবস্থা, লোকবল ও নিজের সামর্থ্য বুঝিয়াই চলিতে চাহিতেন; তাই ভারতযাত্রার এক সপ্তাহ পূর্বে শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞ হইলেও তখনই অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তিনি কার্যের ভাবী রূপ ও সম্ভাবনা বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়া প্রথমেই আপনাকে অর্থভারে নিপীড়িত করিতে চাহেন না। অবশ্য এই অর্থ তিনি পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা দ্বারাই বেলুড় মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। স্বামীজী বিশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তবু এইরূপ বিবিধ অনুকূল অবস্থা হইতে কার্যসাফল্যের অনেকটা পূর্বাভাস পাইয়া তাঁহার মন নিশ্চয়ই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল।

লণ্ডনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যখন বুঝিলেন, তাঁহাদের ধর্মজীবনের পরিচালক স্বামী বিবেকানন্দ ডিসেম্বরের মধ্যভাগে চলিয়া যাইবেন, তখন তাঁহাদের মন অতীব বিষণ্ণ হইল। স্থির হইল যে, তাঁহার সম্মানার্থ এক বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন হইবে। এই কার্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও

অদম্য উৎসাহী কর্মী শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডি। গুডউইনের সাহায্যে তিনি বিদায় সম্ভাষণটি রচনা করিলেন এবং স্বামীজীর সকল ভক্ত ও বন্ধুদের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। স্বামীজীর বিদায়ের পূর্ববর্তী রবিবারে ১৩ই ডিসেম্বর পিকা-ডিলিতে অবস্থিত 'রয়েল সোসাইটি অব পেইণ্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স'-এর ভবনে যখন বিদায়সভা বসিল, তখন শহর ও শহরতলী হইতে এত লোকসমাগম হইল যে, সকলের পক্ষে স্থানসঙ্কুলান অসম্ভব ছিল। স্বামী অভেদানন্দও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর মন সেদিন ভারাক্রান্ত ছিল এবং তিনি যখন ধীরপদক্ষেপে বক্তৃতাগৃহে প্রবেশ করিলেন তখন চারিপাশের নিস্তব্ধতাই যেন জানাইয়া দিল, স্বামীজী ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে প্রেমের বন্ধন কত দৃঢ় ও ঐকান্তিক। শ্রীযুক্ত এরিক হামণ্ড লিখিয়াছেন :

"সেদিন লণ্ডনের রবিবার—দোকানপাটের দ্বার রুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং মহানগরের রাজপথসমূহ যানচলাচলের বাহুল্যবশতঃ যেমন শব্দমুখর থাকে, আজ অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহা মন্দীভূত। লণ্ডনবাসীরা রবিবাসরীয় আচ্ছাদনে ভূষিত ও তাহাদের চলন-বলনে একটা রবিবারের উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছাপ রহিয়াছে। বৃদ্ধ, ভদ্র ও প্রায় নীরব ব্যক্তিগণ গির্জা ও ভজনাগার অভিমুখে চলিয়াছে। যে স্বামীজীর অভ্যুদয় তাঁহার বন্ধুবর্গের হৃদয়ে এক গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, আজ অপরাহ্নে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইবে। যে হলে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইবে, উহা চিত্রকরদিগের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং উহার প্রাচীরে বহু চিত্র শোভা পাইতেছিল। ইংলণ্ডের রাজধানীর যে মঞ্চ হইতে স্বামীজী ইংরেজদিগের প্রতি শেষবাণী উচ্চারণ করিবেন, উহা নানাবিধ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত ছিল। সমাজের বহু প্রকারের ও বহু শ্রেণীর লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল ; কিন্তু সব কয়টি মনে একটিমাত্র বাসনা জাগিতেছিল—তাহারা আর একবার তাঁহাকে দেখিতে চায়, তাঁহার কথা শুনিতে চায়, এমন কি সম্ভব হইলে একবার তাঁহার পবিত্র বসন স্পর্শ করিতে চায়। মঞ্চোপরি নির্দিষ্ট সময়ে গায়ক ও বাদকগণ সুমিষ্ট সুরলহরী তুলিতেছিল ; স্বামীজী যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপে নরনারীরা বক্তৃতা করিতেছিল ; সেসব শুনিয়া মধ্যে মধ্যে এবং বক্তৃতাগুলির শেষে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠিতেছিল ; অনেকে ছিল নীরব ও বিমর্ষ-ভারাক্রান্ত-হৃদয় ; অনেকের নয়ন অশ্রুসিক্ত ছিল ; অন্তরের অন্ধকার ও বিষাদ যেন বাহিরের মন্দালোক ও

নিরানন্দকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছিল। একটি মাত্র রূপ, একটি মাত্র আকৃতি সে দুঃখের বিরুদ্ধে অভিযানে জয়মণ্ডিত হইল ; হরিদ্রাবর্ণের তৈলস্ফটিকতুল্য (অ্যাম্বারের মতো) সমুজ্জ্বল বেশে বিভূষিত স্বামীজী যেন সূর্যকিরণনির্মিত একটি দীপ্তিমান জীবন্ত শরযষ্টির ন্যায় জনতার মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। 'ঠিক বলছি, ঠিক বলছি'—তিনি বলিতে লাগিলেন—'আবার আমাদের মিলন হবে, অবশ্যই হবে'।" (ইংরেজী জীবনী, ৪৩৮)।

অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডি স্বামীজীর করকমলে একখানি বিদায়-অভিভাষণ অর্পণ করিলেন। স্বামীজী খুবই বিচলিত হইয়া আবেগভরে একটি প্রীতিপূর্ণ অথচ অধ্যাত্মভাবে সমৃদ্ধ বক্তৃতা দিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি হয়। "রোমসাম্রাজ্যের শান্তির সুযোগ পাইয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল"—তাঁহার এই কথার উপর নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "তাঁহার কথার তাৎপর্য হয়তো এই ছিল যে, এরূপ সময়ও আসিবে যখন ভারতীয় প্রচারকবর্গের এমন এক সুবিশাল দলকে পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখা যাইবে যাহারা স্বামীজী যে ফসল অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহা কাটিয়া ঘরে তুলিতে ব্যস্ত থাকিবে এবং দূর ভবিষ্যতে কাটিবার জন্য নিজেরাও নূতন ফসল প্রস্তুত করিবে।" আবার তাঁহার বিদায়মুহূর্তে যত স্মরণীয় কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হ্যামণ্ডকে কথিত উক্তিগুলি সর্বাধিক প্রাণস্পর্শী : "আমার হয়তো এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেহ হইতে মুক্ত হওয়া—পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় ইহাকে ছুঁড়িয়া ফেলাই সমীচীন। কিন্তু যতদিন মানবজাতির সকলে সর্বোত্তম সত্যকে জানিতে না পারিবে, ততদিন আমি কখনও প্রচারকার্য বা সাহায্যবিতরণ হইতে বিরত হইব না।" (ঐ,৪৩৯)। কার্যতঃও দেখা যাইতেছে, যদিও তিনি স্থূলদেহে নাই, তথাপি তাঁহার প্রাণপ্রদ বাণী অনুশীলনপূর্বক এবং তাঁহার সহিত অলৌকিক আত্মীয়তা স্থাপনপূর্বক কত শত লোক বর্তমান যুগেও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে—স্বামীজী এখনও কৃপাবিতরণে মুক্তহস্ত! ইহাই ছিল প্রকৃতপক্ষে লণ্ডনে তাঁহার শেষ ভাষণ, কেননা যদিও শেষবারে আমেরিকায় যাইবার পথে তিনি (১৮৯৯) পুনর্বার ঐ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেবারে জনসাধারণের সমক্ষে ধর্মপ্রচারক হিসাবে উপস্থিত হন নাই।

লণ্ডনে স্বামীজীর শেষ সাধারণ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অদ্বৈত বেদান্ত' ও

তারিখ ছিল ১০ই ডিসেম্বর। এই ভাষণ, ইংলণ্ডে স্বামীজীর সাফল্য এবং ১৩ই ডিসেম্বরের বিদায়-অভিনন্দন সম্বন্ধে জনৈক সুলেখকের লেখনীমুখে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এই তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়: "১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর 'অদ্বৈত দর্শন' বিষয়ে স্বামীজীর শেষ বক্তৃতা যখন প্রদত্ত হয়, তখন কক্ষটি শ্রোতৃপরিপূর্ণ ছিল, আর তাহারা এই শেষ বক্তৃতাটি হইতে যাহাতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিল। লণ্ডনে স্বামীজী যেসব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে শ্রোতারা যেরূপ নিয়মিতভাবে আসিত তাহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, সম্প্রতি যে বেদান্তব্যাখ্যা হইয়া গেল উহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ কিরূপ নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে ব্যাখ্যা এমন এক ব্যক্তির মুখনিঃসৃত ছিল যাঁহার ব্যক্তিত্ব অনেকের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অপর অনেকের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিল, আর সে ব্যাখ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্র ছিল শুধু পাশ্চাত্ত্য দেশই নহে, প্রত্যুত যে প্রাচ্যদেশে উহা প্রথম উপস্থাপিত হইয়াছিল সে দেশও বটে। এই উদার ও সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যাখ্যার ফলে বিভিন্ন মতবাদী জনসমষ্টি, এমন কি চার্চ অব ইংলণ্ডের বহু ধর্মযাজক আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং ইঁহারা সমবেতভাবে স্বামীজীর উপদেশাবলীকে যথাসম্ভব সুদূরপ্রসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

"কোন সুগভীর আধ্যাত্মিক বার্তাই প্রথমে দ্রুতসঞ্চারী হয় না; অবশ্য বিবেকবান ও উদ্যমশীল একদল অনুবাদকের প্রযত্নে প্রাচ্য চিন্তা ক্রমে অধিকাধিক সুপরিচিত হইতেছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সদৃশ আচার্যের অভ্যুদয়ে পুস্তকনিহিত সে বিদ্যা প্রাণলাভ করে এবং উহার অসামঞ্জস্য দূরীভূত হয়। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, সংস্কৃতিসম্পন্ন ও বিদ্বান বলিয়া যাঁহারা নিশ্চিতরূপে স্বীকৃত হন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বামীজীর বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি আজ এই দিকে প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছে যে, ভারতে সার্বভৌম চিন্তা ও জ্ঞানের এমন এক বিরাট রত্নকোষ আছে, যাহা ভারত যুগযুগান্তর ধরিয়া বিশ্বের সেবার্থ তত্ত্বাবধায়করূপে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে।...স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকে যদি আধুনিক মিশনরীদের কার্যের সহিত তুলনা করা হয়, তবে বলিতে হইবে, অধিকাংশ মিশনরীদের সহিত তাঁহার এই পার্থক্য যে, তাঁহার কার্যের দ্বারা কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয় নাই, একটি স্থলেও বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতা সঞ্জাত হয় নাই। ইহার কারণ যেমন অতি সরল, ইহার শক্তিও তেমনি প্রবল। স্বামীজী কোন সম্প্রদায়ের

পক্ষপাতী নহেন—তিনি ধর্মমাত্রের উদ্বোধক, কোন বিশেষ ধর্মের নহে। ধর্মের বিরাট ক্ষেত্রে যাঁহারা মতবিশেষের পক্ষাবলম্বী তাঁহারাও তাঁহার সহিত বিরোধের কারণ খুঁজিয়া পাইবেন না।...বিদায় অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সামরিক ও অসামরিক বিভাগদ্বয়ের এমন অনেক প্রাচীন রাজ-কর্মচারী ছিলেন, যাঁহারা ভারতে জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছেন এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না যে, তাঁহারা ভাবাতিশয্যবশতঃ এমন এক বিশেষ প্রবক্তার প্রতি, এমন এক দার্শনিক মতাভিমুখে বা এমন এক জাতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

লণ্ডনে স্বামীজীর সাফল্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রাজনীতিক নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ১৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৯ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এইরূপ তথ্য প্রকাশ করেন: "ভারতীয় কেহ কেহ মনে করেন, স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর দ্বারা ইংলণ্ডে অতি সামান্য সুফলই অর্জিত হইয়াছে এবং তাঁহার বন্ধু ও গুণগ্রাহিবৃন্দ তাঁহার কৃতিত্বকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখেন। কিন্তু আমি এখানে আসিয়া দেখিলাম, তিনি সর্বত্র এক লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বহু অংশে আমি এমন লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাঁহারা বিবেকানন্দের প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন। যদিও আমি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নহি এবং ইহাও ঠিক যে, তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে, তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, বিবেকানন্দ এখানে অনেকের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন এবং তাহাদের চিত্তের বিস্তারসাধন করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবে এখন এদেশীয় অধিকাংশ ব্যক্তি দৃঢভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্ররাশির মধ্যে অত্যাশ্চর্য আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ নিহিত রহিয়াছে। তিনি যে শুধু এই ভাবটিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটি সুবর্ণসূত্র সংস্থাপনেও কৃতকার্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হাউই প্রণীত 'দি ডেড পুলপিট' (খ্রীষ্টধর্মের অবসান) হইতে 'বিবেকানন্দের মতবাদ' সম্বন্ধে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়াছি, তাহা হইতেই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন, বিবেকানন্দের মতসমূহের প্রচারের ফলে অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম বর্জন করিয়াছেন। আবার এদেশে তাঁহার কার্য কত গভীর ও সুবিস্তৃত তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে সহজেই অনুভূত হইবে। কাল সন্ধ্যায় আমি লণ্ডনের দক্ষিণাংশে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম। রাস্তা ভুলিয়া আমি এক মোড়ে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম

কোন পথে যাই। এমন সময় একটি মহিলা একটি বালকের সহিত আমার দিকে অগ্রসর হইলেন,...মনে হইল তিনি বোধ হয় আমাকে পথ দেখাইয়া দিতে চান। তিনি শুধাইলেন, আমি আপনার সাহায্য করতে পারি কি?...তিনি আমাকে পথ দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "কোন কোন খবরের কাগজ পড়ে আমি জেনেছিলাম যে আপনি লণ্ডনে আসছেন।[১] প্রথম দর্শনেই আমি আমার ছেলেকে বললাম, 'ঐ দেখ স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে'।" আমায় তখন তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরিতে হইবে; সুতরাং আমি বিবেকানন্দ নই একথা বুঝাইবার সময় ছিল না, আমাকে দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, ভদ্রমহিলাটি বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত না হইয়াও তাঁহার প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। এই উপভোগ্য ঘটনায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম, আমি যে গেরুয়া পাগড়ি পরিয়াছিলাম, উহাই আমাকে ঈদৃশ সম্মানের ভাগী করিয়াছিল। এই ঘটনা ছাড়াও আমি এখানে এমন অনেক শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোক দেখিয়াছি, যাঁহারা ভারতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন এবং ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কিছু বলিলে আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন।"

১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী সেভিয়ার-দম্পতির সহিত লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ফরাসী দেশে চলিলেন; গুডউইন কিন্তু সাণ্ডাম্পটন-এ জাহাজ ধরিলেন; তিনি নেপল্‌স-এ স্বামীজীদের সহিত মিলিত হইবেন। লণ্ডন রেল স্টেশনে বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজী প্রভৃতিকে বিদায় দিলেন। বন্ধুদের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমেরিকাস্থ জনৈক ভক্তকে লিখিত স্টার্ডির একখানি পত্র হইতে জানা যায়: "স্বামী বিবেকানন্দ আজ চলিয়া গেলেন।...'রয়েল ইনষ্টিটিউট অব পেইণ্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স'-এর চিত্রভবনে তাঁহাকে এক জমকালো বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হয়। প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বন্ধু তখন লণ্ডনের

১। ভারতীয় রাজন্যবর্গ যখন দরবারে যোগ দিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ স্বামীজীকেও যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্টার্ডিও ঐজন্য আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। তখন হয়তো তাঁহার যাওয়ার সম্ভাবনার কথা খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছিল; কিন্তু স্বামীজী ঐ সময়ে যাইতে পারেন নাই। ('বাণী ও রচনা', ৭।৩৩৭, ৭।৩৩৮)

বাহিরে ছিলেন। তাঁহার প্রভাব অনেক হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা তাঁহার কাজ পুরাদমে চালাইয়া যাইতেছি। তাঁহার এক গুরুভাই আমাকে সাহায্য করিবেন; ইনি বেশ অমায়িক, লোকপ্রিয় ও বৈরাগ্যবান যুবক।...আপনার অনুমান ঠিকই হইয়াছে। এই জন্মে আমি যত বন্ধু ও উপদেষ্টা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বোত্তম ও পবিত্রতম; অতএব ইঁহাকে হারাইয়া আমার হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। সম্প্রতি এমন সৌভাগ্যের অধিকার লাভের জন্য আমি অতীতে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ পুণ্য অর্জন করিয়াছিলাম। আমি সারা জীবন যাহার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, স্বামীজীর মধ্যে তাহাই পাইয়াছি।"

স্বামীজীও ইংলণ্ডবাসীর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও প্রীতি লইয়াই স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। ২৮শে নভেম্বরের এক পত্রে তিনি হেল-ভগিনীদিগকে জানাইয়াছিলেন, "ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, অন্য সব জাতের চেয়ে প্রভু কেন তাদের অধিক কৃপা করেছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটে ভেঙ্গে দিতে পারলেই হ'ল—বস্, তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।" ভারতে পৌঁছিয়াও তিনি এই কথাগুলি আরও পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছিলেন: "ইংরেজ জাতির প্রতি আমা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা পোষণ করিয়া কেহই কখন ইংলণ্ডে পদার্পণ করে নাই; এই সভামঞ্চে যেসকল ইংরেজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যত আমি তাঁহাদের সহিত বাস করিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম, ব্রিটিশজাতির জীবনযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই ঐ জাতির হৃৎ-স্পন্দন কোথায় হইতেছে বুঝিতে লাগিলাম, ততই তাহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরেজজাতিকে এখন আমা অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন।...আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয় দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ইংরেজজাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়—তাহার মস্তিষ্কের খুলি যদিও অন্য জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি অধ্যবসায় সহকারে তাহাদের মস্তিষ্কে কোন ভাব

প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়—উহা তাহাদের মস্তিষ্কে থাকিয়াই যায়, কখনও বাহির হয় না, আর ঐ জাতির অসীম কার্যকরী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে,…এই জাতির কল্পনা-শক্তি অল্প, কার্যকরী শক্তি অগাধ।…ইংরেজ বীরের জাতি, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, তাহাদের শিক্ষাই প্রকৃত ভাব গোপন করা।…কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে, এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরেজ হৃদয়ের ভাবধারার গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনি একবার সেখানে পৌঁছিতে পারেন, যদি ইংরেজের সহিত আপনার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি তাঁহার সহিত মিশেন, যদি একবার আপনার নিকট তাঁহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরবন্ধু, তবে তিনি আপনার চিরদাস। এইজন্য আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচার কার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে।" ('বাণী ও রচনা', ৫।২০৬-৮)

সত্যই স্বামীজী ইংলণ্ডবাসীদের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহাদিগকে ভালবাসিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের বাস্তব মিলনের পথ সুগম ও সুবিস্তৃত করিয়াছিলেন।

স্বদেশের পথে

স্বামীজী স্বদেশাভিমুখে চলিলেন, লণ্ডন ক্রমেই দূরে সরিয়া গেল। তিনি তখন এই ভাবিয়া আনন্দে ভরপুর যে, তিনি এক গুরু দায়িত্ব হইতে মুক্ত—প্রতীচ্য ভূখণ্ডের কার্যভার উপযুক্ত ব্যক্তিদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে, এখন উহা আপন শক্তিতে সুষ্ঠু পরিচালিত হইবে। অতঃপর ভারত তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। সেভিয়ার-দম্পতিকে তিনি বলিলেন, "এখন আমার শুধু একটি মাত্র চিন্তার বিষয় আছে—আর সে হ'ল ভারত। আমি তাকিয়ে আছি ভারতের অভিমুখে—শুধু ভারতের দিকে।" ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে এক ইংরেজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বিলাসপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান পাশ্চাত্ত্য দেশে চার বছর ব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের পর এখন আপনার মাতৃভূমি আপনার কাছে কেমন লাগবে?" ইহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা খুবই হৃদয়গ্রাহী, "দেশ ছেড়ে আসার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম; এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু পর্যন্ত পবিত্র; ভারত এখন পুণ্যভূমি—তীর্থক্ষেত্র।"

ডোভার, ক্যালে ও মণ্ট সেনিসের পথে স্বামীজী সশিষ্য ইটালির দিকে অগ্রসর হইলেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সাফল্য এবং ভারতে ভাবী তুমুল আন্দোলনের আশায় তাঁহার মন তখন উৎফুল্ল। কাজেই ট্রেনে দীর্ঘপথ চলা তাঁহার পক্ষে সাধারণতঃ ক্লেশপ্রদ হইলেও গল্পগুজবে সময় যেন কোন দিকে কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইতিহাসের ঘটনাবলী ছিল তাঁহার নখদর্পণে—চলিতে চলিতে ইওরোপের কত কথাই তিনি শিষ্যদ্বয়কে শুনাইতে লাগিলেন। আর ভারত-সম্বন্ধীয় অপূর্ব ভাবী কার্যধারাও মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্তাকর্ষক বাগবিন্যাস সাহায্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও তাঁহাকে বিশেষ আকর্ষণ করিল এবং তিনি সরল বালকের ন্যায় সর্ববিষয়ে এক প্রাণঢালা আনন্দে মাতিয়া গেলেন—যাহা কিছু দেখেন, সবই সুন্দর! অনুরাগী সঙ্গীরাও তাঁহার আনন্দে সর্বতোভাবে যোগ দিলেন এবং তাঁহারাও হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হইয়া মনে মনে বহু প্রকার কল্পনার চিত্র আঁকিতে লাগিলেন। ট্রেন ফরাসী দেশ অতিক্রম করার পর আল্পস পর্বতমালা

ভেদ করিয়া মিলানে উপস্থিত হইল। স্বামীজী শিষ্যদের সহিত নগরের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাথিড্রেলের (ভজনালয়ের) নিকটবর্তী এক হোটেলে আশ্রয় লইলেন, যাহাতে ঐ ভজনালয়ে সহজে যাতায়াত করিতে পারেন। ইটালিতে স্বামীজীর এই প্রথম পদার্পণ। রোমক সভ্যতার কীর্তিচিহ্নগুলি তিনি মনোযোগ সহকারে দেখিয়া তারিফ করিতে লাগিলেন। লিওনার্দো দা ভিন্সির অঙ্কিত 'শেষ ভোজের' চিত্রখানি দর্শনে স্বামীজী বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। মিলান হইতে যে তুষারদৃশ্য দেখা যায় তাহাও অতি সুন্দর।

মিলানের পর তাঁহারা পিসা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে বিশেষ দর্শনীয় লিনিং টাওয়ার (হেলানো স্তম্ভ), ক্যাথিড্রেল, ক্যাম্পো সান্তো ও ব্যাপ্টিস্ট্রি (খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষাস্থল)। লিনিং টাওয়ারটি ১৮৩ ফুট উচ্চ; ইহা অন্যান্য স্তম্ভের ন্যায় সোজা দণ্ডায়মান না থাকিয়া একদিকে এমন ভাবে হেলিয়া আছে যে, অশ্বাদি পশুও উহাতে অক্লেশে আরোহণ করিতে পারে। এখান হইতে দূরে আপেনাইন শৈলমালার সুন্দর দৃশ্য চক্ষুগোচর হয়। মিলান ও পিসার শ্বেতমর্মর-নির্মিত স্থাপত্যশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য; পিসার স্থাপত্যকার্যে আবার শ্বেতমর্মরের সহিত কৃষ্ণমর্মরেরও মিশ্রণ ঘটিয়াছে। স্বামীজী এই সমস্তই দর্শন করিলেন, ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্বলিত স্থানগুলিও দেখিলেন; অতঃপর ফ্লোরেন্সে উপনীত হইলেন। ফ্লোরেন্স চিত্রানুরাগীর তীর্থক্ষেত্র এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর রঙ্গভূমি। স্বামীজী চিত্রশালা দেখিলেন, পার্কে ভ্রমণ করিলেন, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি আর একবার প্রত্যক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আলোচনা করিলেন—এবং সর্বতোভাবে নগরের ভাবপ্রবাহের সহিত যেন মিশিয়া গেলেন। ফ্লোরেন্সে দৈবক্রমে তিনি চিকাগোর শ্রীযুক্ত হেল ও তাঁহার পত্নীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ইহারাও ইওরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী তখন ঐ নগরেই উপস্থিত আছেন, ইহা জানিতেন না। একটি পার্কে অশ্বযানে ভ্রমণকালে এই অপ্রত্যাশিত মিলনের ফলে সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া কাটাইলেন। ফ্লোরেন্সের মিনার্ভা হোটেল হইতে লিখিত স্বামীজীর ২০শে ডিসেম্বরের পত্রে জানা যায়, তিনি সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ২১শে ডিসেম্বর রোম নগরে উপস্থিত হন।

বিশ্ববিশ্রুত রোম নগরীর সহিত মানবেতিহাসের কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই না বিজড়িত! ট্রেন যখন ফ্লোরেন্স ছাড়িয়া রোমের অভিমুখে ছুটিতে থাকিল, তখন

স্বামীজীর মন সে সব অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন হইল। শ্রীযুক্তা লেগেটের কন্যা শ্রীমতী এলবার্টা স্টার্জিস তখন রোমে শ্রীমতী এডোয়ার্ডস-নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার গৃহে বাস করিতেছিলেন। এলবার্টার মাসী-মা শ্রীমতী ম্যাকলাউড শ্রীমতী এডোয়ার্ডসের নামে পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন ; সুতরাং এখন এলবার্টা ও এডোয়ার্ডস উভয়েই স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে রোমের কীর্তিকলাপ দেখাইতে লাগিলেন। স্বামীজী রোমে এক সপ্তাহ ছিলেন এবং প্রতিদিন নানা দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনে ব্যস্ত ছিলেন। ইহারই মধ্যে আবার তিনি দর্শন ও ইতিহাসের আলোচনায় মাতিয়া উঠিতেন। এইসূত্রে স্বামীজীর গভীর পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইয়া শ্রীমতী এডোয়ার্ডস তাঁহার অনুরাগী ভক্তে পরিণত হইলেন। দর্শন ও ইতিহাস ব্যতীত উদার মানবতা এবং বিশ্বজনীন সংস্কৃতির প্রতি স্বামীজীর স্বাভাবিক প্রবণতা দর্শনেও তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রোমের প্রত্যেকটি জিনিসই ছিল প্রেরণাপ্রদ। সেণ্ট পিটারের গির্জার বৃহৎ চূড়ার নিম্নে, খ্রীষ্টশিষ্যদিগের নামে উৎসর্গীকৃত বেদীগুলির সম্মুখে তিনি ধ্যান-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া যেন প্রাচীন ঠিক সেই দিনগুলিকেই জীবন্তরূপে পাইলেন যখন সেণ্ট পল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে নিরত ছিলেন এবং সেণ্ট পিটার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের নেতৃত্বে অধিরূঢ় ছিলেন। খ্রীষ্টানদের উপাসনাপদ্ধতির সহিত স্বদেশের ভজন-পদ্ধতির সাদৃশ্য দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন। সঙ্গের একজন মহিলা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, এইসব অনুষ্ঠানাদি কি আপনার ভাল লাগে ?" তিনি উত্তর দিলেন, "সগুণ ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে নিজের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসগুলি তাঁকে দিতে হয়—গন্ধ, পুষ্প, ফল, রেশমবস্ত্র। ভগবানকে দেবার মতো অত্যুত্তম জিনিস কীই বা আছে ?" কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে তিনি যখন সেণ্ট পিটার্স গির্জায় সেভিয়ার-দম্পতির সহিত অতি জাঁকজমকপূর্ণ 'হাইমাস'-এ (যীশুর বিরাট ভোজোৎসবে) যোগ দিয়াছিলেন, তখন একটু পরেই তিনি চঞ্চল হইয়া তাঁহাদের কানে কানে বলিয়াছিলেন, "এত সব জাঁকজমক এবং চাকচিক্যপূর্ণ সমারোহ কিসের জন্য ? যে সম্প্রদায় এত বাহ্যাড়ম্বর, ধুমধাম ও অনুষ্ঠান নিয়ে পড়ে আছে, তারা কি করে সেই গরীব যীশুখ্রীষ্টের অনুগামী হতে পারে, যাঁর মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না ?" খ্রীষ্টজীবনে যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ মূর্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার সহিত এই ঐশ্বর্যপ্রীতির অসামঞ্জস্য দেখিয়া স্বামীজী সেদিন মর্মাহত হইয়াছিলেন।

স্বামীজীর আনন্দসম্পাদন ও তাঁহার মনকে গভীরচিন্তা হইতে মুক্তি দিবার জন্য শ্রীযুক্ত সেভিয়ার তাঁহাকে গাড়িতে চড়াইয়া শহর হইতে বহুদূরে লইয়া যাইতেন। চিরবিরাজমান প্রাচীন রোমের সেই দূরবর্তী রাজপথগুলি তাঁহাদিগকে ক্ষণিকের জন্য অতীত রোম সম্রাটদের ইতিহাস ও পুরাতন কীর্তিকলাপের কথাও ভুলাইয়া দিত। শুধু সবটুকু মন জুড়িয়া তখনও বিরাজমান থাকিত যীশুখ্রীষ্টেরই কথা—আকাশে বাতাসে তাঁহারই বাণী ধ্বনিত হইত। স্বামীজী তখন যীশুরই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে যীশুর বাল্যজীবনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের, কিংবা বুদ্ধের উপদেশের সহিত 'সার্মন অন দি মাউণ্টে'র (শৈলোপদেশের) সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেন।

শীতকালই রোমের সর্বোত্তম ঋতু, তাই স্বামীজীর শরীর-মন তখন বেশ প্রফুল্ল ছিল। রোমে যাহা কিছু দর্শনীয় ছিল, সমস্তই তিনি সাগ্রহে দেখিলেন—সিজারদের প্রাসাদাবলী, ফোরাম (সম্মেলন-ক্ষেত্র), ট্রোজান স্তম্ভ, প্যালাটাইন পাহাড়, টেম্পল ভেস্টা, প্রাচীন রোমকদের সাধারণ স্নানাগার, রোম-সম্রাট ভেসপিসিয়ানের বৃহৎ রঙ্গভূমি, টাইটাস-এর বিজয় তোরণ, ক্যাপিটোলাইন পাহাড়, ভ্যাটিকানে পোপের প্রাসাদ ইত্যাদি অনেক কিছুই তিনি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বীয় স্মৃতি হইতে প্রত্যেকটির ঐতিহাসিক বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহার এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক জ্ঞান ও স্মৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া বলিয়াছিলেন, "আশ্চর্য স্বামীজী! আপনি দেখিতেছি রোমের প্রত্যেকটি পাথরের খবর রাখেন।" স্বামীজীর মুখে তাঁহারা শুনিলেন, ৮১ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে কেমন করিয়া টাইটাসের বিজয়তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। ফোরাম একসময়ে বিরাট গৃহাদিতে সুশোভিত ছিল, কিন্তু এখন উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। স্বামীজীর দৃষ্টি ঐ সমস্তের মধ্যে ট্রোজানের স্তম্ভের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হইল। স্তম্ভটি ১১৭ ফুট উচ্চ এবং উহার গাত্রে দুই সহস্রাধিক মনুষ্যমূর্তি খোদিত। খ্রীষ্টজন্মের তারিখে দিবাভাগে তাঁহারা 'স্যাণ্টাম্যারিয়া ডি আরা কোয়েলি' গির্জার সম্মুখবর্তী মেলা দেখিতে গেলেন। ইহার সহিত ভারতীয় মেলার সাদৃশ্য দর্শনে স্বামীজী বেশ আমোদিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে রোম দর্শন শেষ হইল। প্রতীচ্য সভ্যতার প্রাচীন লীলাকেন্দ্র রোম দেখিবার সাধ স্বামীজী বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিতেন; আজ সে

অভিলাষ পূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার রোমের সহিত বাস্তবের পার্থক্য তাঁহার অজ্ঞাত থাকিল না। ইতিহাসই তাঁহাকে জানাইয়া দিল, কেমন করিয়া রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইল, আর কেমন করিয়া উদার খ্রীষ্টধর্ম পুরোহিতকুল-পরিচালিত সাম্প্রদায়িক মতবাদে পরিণত হইল। ইহলৌকিক রাজশক্তি ও ধর্মসম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি নেপল্‌স-এর পথে চলিলেন। নেপল্‌স বন্দর হইতে জাহাজে উঠিবার কথা ; কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরি আছে। অতএব এই অবকাশে তাঁহারা শহর দেখিয়া লইলেন। একদিন তাঁহারা বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরি দেখিতে গেলেন এবং বিশেষভাবে নির্মিত এক রেলপথ অবলম্বনে পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করিলেন। ঠিক তখনই আগ্নেয়-গিরি হইতে কিছু প্রস্তর উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা উহাও দেখিতে পাইলেন। আর একদিন আগ্নেয়গিরি হইতে উদ্গত লাভা-স্তরের নিম্নে প্রোথিত পম্পাই নগরী দর্শনে ব্যয়িত হইল। লাভা অপসারণের ফলে তখন নগরের কিয়দংশ লোকচক্ষুগোচর হইয়াছে। এত বৎসর পরেও ঐরূপ একটি গৃহের প্রাচীরচিত্র, ফোয়ারা, প্রস্তরমূর্তি ঠিক পূর্ববৎ অবস্থান করিতেছে দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ বিস্মিত হইলেন। তত্রত্য অনেক ধর্মপ্রতীকের সহিত পুরীর মন্দিরগাত্রে খোদিত মূর্তিগুলির সাদৃশ্যদর্শনেও তিনি চমৎকৃত হইলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা স্থানীয় যাদুঘর ও মৎস্যশালাও দেখিলেন।

নেপল্‌স হইতে তাঁহাদের জাহাজ 'প্রিন্স রিজেণ্ট লিওপোল্ড' ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্বক সুয়েজের পথে সিংহল যাইবার জন্য ৩০শে ডিসেম্বর নোঙর তুলিল। উহা ১৫ই জানুআরি কলম্বো পৌঁছিবার কথা। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম-কালে স্বামীজীর বেশ কষ্ট হইয়াছিল, ইহা মেরীকে লিখিত তাঁহার ৩রা জানুআরির পত্র হইতে জানা যায় : "নেপল্‌স থেকে চারিদিন ভয়াবহ সমুদ্র-যাত্রার পর পোর্ট সৈয়দের কাছে এসে পড়েছি। জাহাজ খুব দুলছে—অতএব এই অবস্থায় লেখা আমার এই হিজিবিজি তুমি ক্ষমা ক'রো।"

ভূমধ্যসাগরে নেপল্‌স ও পোর্ট সৈয়দের মধ্যবর্তী এক স্থলে স্বামীজী এমন এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যাহার স্মৃতি তাঁহার মনে চিরকাল থাকিয়া গিয়াছিল। এক রাত্রে শয্যা গ্রহণের কিঞ্চিৎ পরে কেশশ্মশ্রুবিমণ্ডিত এক ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "যে জায়গাটা নির্দেশ করছি, তা ভাল করে লক্ষ্য কর। তুমি এখন ক্রীটদ্বীপে এসেছ—এই দেশেই খ্রীষ্টধর্মের

উৎপত্তি হয়েছিল।" স্বামীজী তাঁহাকে আরও বলিতে শুনিলেন, "যেসব 'থেরাপুটি' এখানে বাস করত, আমি তাদেরই একজন।" ঐ ব্যক্তি আর একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভগিনী নিবেদিতার মতে সম্ভবতঃ ঐ শব্দটি ছিল 'এসিনি'। কথিত আছে, যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং ঐ 'এসিনি' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'এসিনি'রা ছিলেন বৈরাগ্যপ্রবণ, উদার ধর্মমতের অনুসরণকারী এবং দার্শনিক ক্ষেত্রে চরম অদ্বৈতবাদী। 'থেরাপুটি' শব্দটি নিশ্চয়ই থেরাপুত্ত বা থেরাপুত্র (স্থবির-পুত্র) শব্দের অপভ্রংশ এবং 'এসিনি' শব্দটি হয়তো আসীন বা ঈশানীয় শব্দের বিকৃত রূপ। বয়স্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে থেরা বলা হইত; আবার প্রাচীন এক বৌদ্ধ মতবাদ থেরাবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। স্বপ্নদৃষ্ট বৃদ্ধ এই বলিয়া শেষ করিলেন, "আমরা যেসব সত্য ও আদর্শের উপদেশ দিতাম, খ্রীষ্টানরা তাই যীশুখ্রীষ্টের বাণী বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে যীশুখ্রীষ্ট নামধারী কোন ব্যক্তির কোন কালে জন্মই হয়নি। এখানে খনন করলে এই কথার সাক্ষ্যস্বরূপ অনেক কিছু আবিষ্কৃত হবে।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি ডেকে যাইয়া জানিতে চাহিলেন, জাহাজ তখন কোথায়। ঐ সময় জাহাজের এক কর্মচারী কর্তব্যশেষে স্বকক্ষে ফিরিতেছিলেন; স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কটা বেজেছে?" কর্মচারী উত্তর দিলেন, "মধ্যরাত্র"। "আমরা এখন কোথায় আছি?" স্বামীজী আবার প্রশ্ন করিলেন। কর্মচারী উত্তর দিলেন, "ক্রীট দ্বীপ থেকে ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে।"

যীশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিক যথার্থ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে পূর্বে কোনও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মধ্যরাত্রের এই স্বপ্ন ও বাস্তবের মিলন তাঁহাকে বেশ ভাবাইয়া তুলিল। বাইবেলের 'হায়ার ক্রিটিসিজম'-এ এরূপ কথাই বলা হয়। তাই এখন তাঁহার মনে হইল, ইহা অসম্ভব নহে যে, খ্রীষ্ট-ভক্তগণের রচিত বাইবেল হয়তো প্রাচীনতর গ্রন্থবিশেষেরই নবীন সংস্করণ এবং থেরাপুটি সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত নাজারিন সম্প্রদায়ের মতবাদের সংমিশ্রণের ফলে খ্রীষ্টধর্মের দার্শনিক ও সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন দিক বিরচিত হইয়াছে। অবশ্য খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে এই সব দূরকল্পনাকে স্বামীজী প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তথাপি এই একটি বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, মিশর দেশের আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে ভারত ও মিশরের চিন্তাধারার যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল,

তাহাই খ্রীষ্টধর্মের রূপায়ণে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। শোনা যায়, স্বামীজী ইংলণ্ডের এক প্রত্নতত্ত্ববিদ বন্ধুকে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঠিক তখনই ঐ বন্ধু কিছু করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই; তবে স্বামীজীর দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পরে কলিকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার এক সংবাদে বলা হয় যে, ক্রীটদ্বীপে ভূ-খনন কার্যে নিরত কয়েকজন ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক এরূপ অনেক লিপির সন্ধান পাইয়াছেন, যাহা হইতে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। ইহা এখন প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে, খ্রীষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হইতে কোন কালেই সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না।

স্বামীজীর চিন্তাক্ষেত্রে এই স্বপ্নের প্রভাব যেভাবে যতটুকুই বিস্তারিত হউক না কেন, মেরীপুত্র যীশুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। একদিন এক পাশ্চাত্ত্য শিষ্য মেরীক্রোড়ে অবস্থিত বালক যীশুর একখানি চিত্রকে আশীর্বাদ করিতে বলিলে তিনি শুধু যীশুর চরণ ছুঁইয়া প্রণাম করিলেন। আর একবার অনুরূপ স্থলে এক ভদ্রমহিলার দিকে ফিরিয়া তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "নাজারেথের যীশুর সমকালে জন্মলাভের সৌভাগ্য হলে আমি তাঁর চরণ ধুয়ে দিতাম আমার নয়নজল দিয়ে নয়, পরন্তু বক্ষের রক্ত দিয়ে।"

ঐ জাহাজের দুইজন সহযাত্রীর অসদাচরণে স্বামীজীকে একবার এক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। সহযাত্রী দুইজন ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনরী। গায়ে পড়িয়া তাঁহারা স্বামীজীর সহিত খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। ইঁহাদের বিচারধারা ছিল অতি অসৌজন্যপূর্ণ। প্রতি কথায় যখন তাঁহারা হারিতে থাকিলেন, তখন ক্রমে ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া ক্রোধ, বিদ্রূপ, গালাগালি প্রভৃতি হীনবৃত্তির আশ্রয় লইলেন, আর অকথ্য ভাষায় হিন্দু ও হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ধৈর্য ধরিয়া সব শুনিতেছিলেন; কিন্তু পরিশেষে আর পারিলেন না; ধীর পদক্ষেপে একজনের নিকটে গিয়া অকস্মাৎ শক্ত করিয়া তাঁহার জামার কলার ধরিলেন এবং কৌতুকভরে অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আবার আমার ধর্মের নিন্দা করলে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।" ভীত মিশনরী তখন ভয়কম্পিত-দেহে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "মশায়, ছেড়ে দিন; আর কখনো এমন করব না।" ইহার পর তিনি কৃতাপরাধের দণ্ডস্বরূপ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই অত্যন্ত

বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাঁহার বন্ধুত্বলাভে যত্নপর থাকিতেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর একদিন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা সিংহ, কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে তাহলে তুমি কি কর?" প্রিয়নাথবাবু অমনি উত্তর দিলেন, "মশায়, তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিই।" স্বামীজী বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ কথা! যদি তোমার ধর্মের প্রতি ঠিক সেই রকম অচলা ভক্তি থাকত, তাহলে তুমি কখনও একটি হিন্দুর ছেলেকে খ্রীষ্টান হতে দেখতে পারতে না। কিন্তু দেখ, রোজ এ ঘটনা ঘটছে। অথচ তোমরা নীরব রয়েছ। বাপু, তোমাদের বিশ্বাস কই? দেশের প্রতি মমতা কই? মুখের উপর প্রত্যহ পাদরীরা তোমাদের ধর্মকে অসংখ্য গাল দিচ্ছে; কিন্তু কয়জন লোকের রক্ত যথার্থ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে গরম হচ্ছে?"

পথের আর একটি ঘটনা স্বামীজীর স্বদেশ-প্রেম, বালকসুলভ সারল্য ও নিরহঙ্কারের পরিচায়ক। এডেনে জল ইত্যাদি লইবার জন্য জাহাজ কিছুক্ষণ থামিবে জানিয়া স্বামীজী সঙ্গীদের সহিত জায়গাটা একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার জন্য নামিয়া পড়িলেন এবং গাড়িতে চাপিয়া তিন মাইল দূরবর্তী কয়েকটি বৃহৎ জলাশয় দেখিতে গেলেন। সেখানে এক ভারতবাসী পানওয়ালাকে দেখিতে পাইয়া তিনি সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতপদে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পার্শ্বে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন। ইত্যবসরে বিদেশী বন্ধুরাও সেখানে আসিয়া পড়িলেন আর দেখিলেন, স্বামীজী পানওয়ালাকে বলিতেছেন, "ভাই, তোমার ছিলিমটা দাও তো!" এবং উহা পাইয়া মহানন্দে ধূমপান করিতেছেন। সেভিয়ার সাহেব তাঁহার এই বালকসুলভ স্বজনপ্রীতি ও স্ফূর্তি দেখিয়া বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি! তাই বুঝি আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন!" পানওয়ালা এতক্ষণে এই অপূর্ব অতিথির পরিচয় পাইল এবং তাঁহার পদপ্রান্তে আনত হইয়া চরণধূলি গ্রহণ করিল। সঙ্গীরা পরে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী কিছু চাইলে পানওয়ালা কেন, অপর কারো পক্ষেই 'না' বলা সহজ ছিল না—এমনি সহাস্য, প্রীতিপূর্ণ ও বিশ্বাসভরা ছিল তাঁর চক্ষের চাহনি। তিনি যে চতুর দৃষ্টিতে পানওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ভাই, তোমার ছিলিমটা দাও তো'—তা কখনও ভুলবার নয়।"

ঘটনাটি ক্ষুদ্র হইলেও স্বামীজীর চরিত্র বুঝিবার পক্ষে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

যে স্বামীজী স্বধর্মের নিন্দা শুনিয়া রোষকষায়িতনয়নে মিশনরীকে দগ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনিই আবার স্বদেশের টানে পানওয়ালাকে স্নেহকটাক্ষে আপনার করিয়া লন। যিনি দেশবিদেশে বাগ্মিতা ও আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে কীর্তিধ্বজা উড়াইয়াছেন, তিনিই আবার ভালবাসার আকর্ষণে সামান্য ব্যক্তির দ্বারস্থ হন, পদগৌরব ভুলিয়া যান, বিদেশীর বিপরীত সমালোচনার চিন্তা তখন তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র উদিত হয় না। দেশবাসীর কাপুরুষতা, উদ্যমহীনতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যিনি নির্মম কষাঘাত করেন, সেই স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ-মমতাই আবার তাঁহার দৃষ্টিতে বিদেশীর তুলনায় অধিকতর মূল্যবান।

পথে আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই; শুধু অপর একখানি জাহাজ খাদ্যাভাব ও জলাভাববশতঃ সঙ্কটের সংকেত করিলে স্বামীজীদের জাহাজ হইতে উহাতে নৌকাযোগে আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়।

১৫ই জানুআরি (১৮৯৭) প্রত্যূষে সিংহলের তীরভূমি দৃষ্ট হইল—অরুণ-কিরণে রঞ্জিত বৃক্ষশ্রেণী-সুশোভিত স্বদেশের বেলাভূমি সার্ধ তিন বৎসর পরে স্বামীজীর চক্ষে বড়ই মনোরম দেখাইল। সিংহল তখন রাজনীতিক দিক হইতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত; আবার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতেও উত্তর ভারতের সহিত উহার যোগসূত্র সুস্পষ্ট। ইতিহাস-চেতনা স্বামীজীকে জানাইয়া দিল: "সিংহলীরা দ্রাবিড়জাতি নয়—খাঁটি আর্য। প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাংলা দেশ থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে তারা তাদের পরিষ্কার ইতিহাস রেখেছে। এইখানেই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র, আর অনুরাধাপুর ছিল সেকালের লণ্ডন।" জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে থাকিলে সমুদ্র-সৈকতের হরিদ্রাভ বালুরাশি ও তদূর্ধ্বে উচ্চশির নারিকেল বৃক্ষরাজি স্বামীজীর নয়নে ও মনে হর্ষ উৎপাদন করিল। সত্যই তিনি ভারতে ফিরিয়াছেন—এই চিন্তায় তখন তিনি বিভোর। কিন্তু তাঁহার জন্য যে স্বাগত সম্ভাষণের আয়োজন হইয়াছিল, তাহার বিপুলতা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তিনি পূর্বে কিছুই ধারণা করিতে পারেন নাই। স্বদেশ-প্রত্যাগত বিজয়ী বীর সন্ন্যাসীকে বরণ করিবার জন্য সকল সম্প্রদায় ও সমাজের সর্ব স্তরের লোক বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তীরে নামিয়া শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, তিনি তখন ভারতীয় সমাজে এক মহামানবরূপে পরিগৃহীত হইতেছেন—দেশের তিনি মহামান্য বরপুত্র! অতঃপর

ভাবী দিনগুলিতে নগরে নগরে তাঁহার সম্মানার্থ রচিত হইবে কত বিজয়তোরণ, সভাসমিতিতে সমবেত হইবে কত উৎসুক নরনারী, সংবাদপত্রাদিতে কতভাবে বিঘোষিত হইবে তাঁহারই কীর্তি, আর সর্বত্র উত্থিত হইবে গগনভেদী ধ্বনি—"স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয় !"

নিদ্রিত ভারত জাগে

স্বামীজীর কলম্বো নগরে পদার্পণ ভারতের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা—সেদিন আরম্ভ হইল ভারতের সক্রিয় নবজাগরণ, নবীন উৎসাহে নবতর সাফল্যের প্রতি অভিযান। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বিজয়বার্তা ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক শিহরণ আনিয়া দিয়াছিল; ভারতের বরপুত্র স্বদেশের প্রাচীন বাণীকে যেমন করিয়া পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচার করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে ভারতের আত্মা যেন নূতন করিয়া আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার সবটুকু মন আত্মশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, সে দরিদ্র ও পরপদদলিত হইলেও তাহার নিকট এমন এক শাশ্বত অবিনশ্বর বাণী আছে যাহা বিশ্ববাসী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করে। ভারতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ঐ বাণীরই উপর প্রতিষ্ঠিত। আকাশের ন্যায় সুবিস্তৃত ও সমুদ্রেরই ন্যায় সুগভীর সে বাণীকে অবলম্বন করিয়া এককালে ভারতে ঐক্য ও সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আজও তাহা সম্ভব। ভারতবাসী বুঝিল, স্বামীজীর বাক্যাবলীতে যে সনাতন ধর্ম উদ্ঘোষিত হইয়াছে, উহা কেবল আত্মপ্রত্যয়শূন্য, ভীতিবিহ্বল, সর্ববিষয়ে সর্বত্র পশ্চাৎপদ ও আত্মরক্ষায় নিযুক্ত নহে, উহা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন, অভীঃ-মন্ত্রে সঞ্চালিত, সক্রিয় ও বিস্তারকামী। স্বামীজীর সনাতন ধর্মে কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না; উহা যেমন ভারতীয় সর্ব-সম্প্রদায়ের মৌলিক তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনি বিশ্ব-মানবের বিবিধ ধর্মের মিলনের ভিত্তিভূমিও দেখাইয়া দিয়াছিল—স্বামীজী ছিলেন বস্তুতঃ সর্বধর্মের মুখপাত্র। সুতরাং ভারতবাসীরা এক উদার ভ্রাতৃভাব লইয়া বিশ্বসভায় আত্মমর্যাদা স্থাপনে অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।

আবার স্বামীজীর আহ্বান কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে উচ্চতম ভূমিতে প্রতি-ধ্বনিত না হইয়া সমাজের সর্বত্র সকল মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাইয়াছিল, কারণ তিনি বনের বেদান্তকে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—বেদান্ত তখন হইতে শুধু গিরিকন্দরে বা ঋষির আশ্রমে আবদ্ধ না থাকিয়া মানবজীবনের প্রতিক্ষেত্রে স্বীয় প্রভাব বিস্তারপূর্বক মানবসমাজকে নবরূপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অতএব ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও

রাজনীতিক জীবনও স্বামীজীকে পাইয়াছিল নেতারূপে, পথপ্রদর্শকরূপে। সমাজের দোষত্রুটি তিনি জানিতেন; কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ বিদেশী, বিধর্মী বা ভ্রান্ত সমাজসংস্কারকের ন্যায় ঐগুলির অযথা নিন্দা না করিয়া তিনি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বনে সকলকে বলিয়াছিলেন, তাহারা এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছে, তাহা উত্তম, কিন্তু উহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া আরও আগাইয়া যাইতে হইবে; চলার পথে ভুলভ্রান্তি হইয়াই থাকে, ভারতীয় সমাজেরও পদস্খলন হইয়াছে, কিন্তু উহাকেই বড় করিয়া না দেখিয়া এখন বিধিনির্দিষ্ট সুপথে আরও দৃঢ়তর পদবিক্ষেপে চলিতে হইবে। সমাজ-সংস্কার অত্যাবশ্যক হইলেও ধর্মকে ছাড়িয়া সংস্কার হইতে পারে না—ধর্মবিচ্যুত সামাজিক পরিবর্তন মানুষকে উন্নত না করিয়া অবনত করে। আবার ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে হইলে সাধারণ মানবের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "খালিপেটে ধর্ম হয় না"; তাই ভারতের অন্যতম প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হইবে দরিদ্রের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা—দয়া হিসাবে নহে, প্রত্যুত অবশ্যকর্তব্য সেবা বা পূজা হিসাবে। দারিদ্র্য ও রোগাদি নিবারণের জন্য জাতিবর্ণনির্বিশেষে নরনারী সকলকে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। শুধু উচ্চস্তরের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গণজাগরণের পথ সুপ্রশস্ত করিতে হইবে। পৌরোহিত্যের মারাত্মক অষ্টপাশ হইতে, বাল্যবিবাহের দ্বারা সমাজের শক্তিক্ষয় হইতে, ছুঁৎমার্গের দ্বারা সমাজের একাঙ্গকে চিরতরে পঙ্গু করা হইতে ভারতকে বাঁচাইতে হইবে। ভারতের জনসাধারণের সমস্যা স্বামীজী যেমন করিয়া ভাবিয়াছিলেন, যেমন করিয়া তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং তাহাদের সার্বিক উন্নতিকল্পে যেভাবে তাহাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় আর কেহ করেন নাই; আর ভারতের মূক জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তিনি যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় অপর কেহ করেন নাই। সুতরাং এই 'ঈশ্বরকোটি' দেশ-নেতা মহাপুরুষকে স্বাগত জানাইতে দেশবাসী জনসাধারণ আগ্রহান্বিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

শিক্ষিত সমাজও স্বামীজীর নিকট প্রচুর ঋণী ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী তাঁহারা পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পত্রের যেসব অনুলিপি তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বিতরিত হইত সেসবের সহিতও তাঁহারা পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া-

ছিলেন, এই গৌরবমণ্ডিত নবীন নেতা এমন এক নবজাগরণের যোজনা লইয়া আসিয়াছেন, যাহা অজ্ঞাতপূর্ব অথচ ভারতের চিরন্তন ধারারই পুনঃপ্রবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার এই বার্তামধ্যে রক্ষণশীলতা ও প্রগতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল ; ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ সকলে সম্মিলিত প্রযত্নের একটা সাধারণ ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিল ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল ; ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিবাদ নির্মূলিত হইয়াছিল ; এবং শতধা বিভক্ত জাতীয় জীবন এক সমন্বয়ভূমির সন্ধান পাইয়াছিল। ভারতের যুবসম্প্রদায় দেখিয়াছিল, স্বামীজী বাগাড়ম্বর মাত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না ; তিনি সকলকে মন-মুখ এক করিয়া বেদান্তবাণীকে কার্যে পরিণত করিতে ডাকিয়াছিলেন ; স্বার্থকে বর্জন করিয়া সকলকে জনকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন ; এবং নেতিমূলক সমাজ-সংস্কারের খুঁটিনাটি সমস্যায় হাবু-ডুবু না খাইয়া ইতিমূলক আমূল সংস্কার অবলম্বনপূর্বক সমস্ত দেশকে সতেজ, সবল, সক্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুঝিতে বাকি ছিল না যে, এই নববার্তা শুধু ধর্মক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হইবে না, ইহার প্রভাব সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়া অচিরে ভারতভূমিকে প্রকৃত স্বাধীনতাগৌরবে মণ্ডিত করিবে।

অতএব বিবেকানন্দের ভারতে পদার্পণকে এক অতি শুভ মুহূর্ত জানিয়া সর্বশ্রেণীর মানব বিবিধ প্রকারে অন্তরের আনন্দ জানাইতে অগ্রসর হইল। ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকলে এই নবযুগের বার্তাবহকে নায়করূপে, গুরুরূপে অভ্যর্থনা করিল। প্রমথবাবু সত্যই লিখিয়াছেন : "বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বড় আদরের ও যত্নের ধন। তিনি দুঃখিনী ভারতমাতার একনিষ্ঠ বীরসন্তান এবং চিরলাঞ্ছিত আর্যজাতির কুলতিলক। তিনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তি, নিরাশায় আশা, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের হাস্যরেখা, দরিদ্রের 'সাগরছেঁচা' মানিক।" (বাংলা জীবনী, ৫৮০)

স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঠিক কিভাবে সংবর্ধিত হইবেন, ইহার স্পষ্ট ধারণা তাঁহার না থাকিলেও তিনি জানিতেন, তাঁহার বাণী সাদরে গৃহীত ও অশেষ ফলপ্রসূ হইবে—কেননা ইহা শ্রীগুরুর কণ্ঠে উচ্চারিত ঈশ্বরেরই নির্দেশ। তিনি ভারত ও ভারতেতর সকল দেশকেই অধ্যাত্মসম্পদে সমৃদ্ধ করিতে যত্নপর থাকিলেও তাঁহার স্বীয় অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, দীর্ঘকালের

সাধনার ফলে ভারতবাসী ধর্মের মর্মকথা যত সহজে অনুভব করিতে সক্ষম, অপর দেশবাসীর পক্ষে তাহা তত সহজ নহে। ডেট্রয়েটে তিনি একদিন জন-কয়েক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন : "তোমাদের দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে আমায় প্রাণপাতী পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ এইখানেই কাটিল। অথচ যে দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম এত প্রবল সেখানে কত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া কার্য করিতে হইতেছে—দেখিতেছ। কিন্তু এদেশের লোকের নিকট আমার কার্যের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কতটুকুই বা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্যের প্রকৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের লোক আমার নিজের দেশের লোক। তাহারা বুঝিবে যে কি রত্ন আমি শরীরের রক্ত জল করিয়া এখানে ছড়াইয়া যাইতেছি! এই রত্নের—এই অপরূপ বেদান্তবিদ্যার সম্পূর্ণ সমাদর শুধু সেই দেশেই সম্ভব। আর হইবেও তাহাই। কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মূলগ্রন্থি পর্যন্ত নড়িয়া উঠিবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।" (ঐ, ৫৮১)। এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

কলম্বোর হিন্দুসমাজ স্বামীজীকে স্বাগত জানাইবার জন্য এক কমিটি গঠন করিয়াছিল। নেপল্‌স-এ ৩০শে ডিসেম্বর জাহাজ ধরিয়া স্বামীজী যখন ১৫ই জানুআরি (১৮৯৭) কলম্বো বন্দরে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার অভিনন্দনের জন্য ঐ কমিটির পক্ষ হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সিংহলের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তির সহিত জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিলেন। যথাকালে নিরঞ্জনানন্দ ও হ্যারিসন নামে কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব কমিটির মুখপাত্র হিসাবে জাহাজে উঠিয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু জাহাজ হইতে নামিতে বেশ দেরি হইল। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য একখানি লঞ্চ প্রস্তুত ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তিনি ভক্তবৃন্দসহ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া লঞ্চে উঠিলেন। স্টীম লঞ্চখানি যখন তাঁহাদিগকে লইয়া তীরে উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার দর্শনার্থী সহস্র সহস্র হিন্দু-জনতা হইতে যে আনন্দকোলাহল ও করতালিধ্বনি উত্থিত হইল, তাহা সাগরগর্জনকেও ছাপাইয়া গেল। গৈরিক-পরিহিত সৌম্যমূর্তি ভাস্বরলোচন স্বামী বিবেকানন্দ জনগণ-অধিনায়করূপে ভারতে পদার্পণ করিলে উন্মত্ত জনমণ্ডলী যেন বিবিধরূপে হৃদয়ের উল্লাস

জানাইয়াও তৃপ্ত হইল না—তাহারা আনন্দধ্বনিসহকারে টুপি, ছাতা, রুমাল ইত্যাদি আকাশে ছুঁড়িতে লাগিল ; আর স্বামীজীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখার আকুল আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহারই অবসরে সিংহলের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য মাননীয় পি. কুমারস্বামী মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতা অগ্রসর হইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং একটি সুগন্ধ যূথিকামালা তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে এক-খানি প্রকাণ্ড জুড়িগাড়িতে বসাইয়া বার্নেস স্ট্রীট নামক রাস্তায় তাঁহার প্রকাশ্য অভ্যর্থনার জন্য নির্দিষ্ট একটি বাংলোতে লইয়া যাওয়া হইল। বাড়িটি কলম্বো নগরের এক প্রান্তে অবস্থিত ; কলম্বোতে যে প্রসিদ্ধ দারুচিনি বাগান আছে উহা হইতে সিকি মাইল দূরে। ঐ বাগানেরই মধ্যে স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। স্বামীজীর এই অভ্যর্থনার বিবরণ আমরা একখানি স্থানীয় ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম :

"কলম্বো-বাসী হিন্দুসমাজের ইতিহাসে ১৫ই জানুআরি একটি স্মরণীয় দিন, কারণ সে দিন তাহারা ধর্মসঙ্ঘসমূহের মধ্যে পবিত্রতম ভারতীয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অশেষ সদ্‌গুণবিভূষিত অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাশালী আচার্যপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাইয়াছিল। তাঁহার আগমন ছিল যুগ-প্রবর্তনকারী—সেদিন হইতে অভূতপূর্ব অধ্যাত্ম ক্রিয়াকলাপের নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল।

"দিবা অবসান হইয়া রাত্রিসমাগমের প্রাক্‌কালে যখন হিন্দুশাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তি-প্রকাশের জন্য সর্বোত্তমরূপে বিহিত সন্ধ্যাকাল সমাগত হইয়া ভাবী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সূচনা করিল, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও অপর কয়েকজনের দ্বারা পরিবৃত ও গেরুয়াবস্ত্রে সজ্জিত সুঠামদেহ, সৌম্যমূর্তি, আয়ত সমুজ্জ্বল নয়নবিশিষ্ট এক ঋষির অভ্যুদয় হইল। সমবেত জনতা যখন দেখিল যে, স্টীম লঞ্চখানি ঐ ঋষিবরকে লইয়া জেটির অভিমুখে আসিতেছে তখন সেই বিশাল জনমণ্ডলীর আনন্দোচ্ছ্বাস ও প্রীতিপ্রকাশের দৃশ্য কথায় বলিয়া বুঝানো যায় না। তাহাদের কলরব হর্ষধ্বনি ও করতালি সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গধ্বনিকেও ছাপাইয়া গিয়াছিল। মাননীয় পি. কুমারস্বামী অগ্রসর হইলেন, তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন ; এক ছড়া সুন্দর যূথিকামালা অর্পণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর আরম্ভ হইল আগাইয়া যাইবার এক অদম্য আগ্রহ...

বলপ্রয়োগ করিয়াও সে বিপুল জনতাকে রোধ করা অসম্ভব হইল।...বার্নেস স্ট্রীটের প্রবেশমুখে পত্র নারিকেল-পুষ্প ও বৃন্তে সুসজ্জিত একটি সুদৃশ্য বিজয়-তোরণে স্বামীজীর উদ্দেশে স্বাগতবাণী শোভা পাইতেছিল। স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য যে তেজস্বি-ঘোটকদ্বয়-সমন্বিত যান প্রস্তুত ছিল তাহা যেন নিমেষ-মধ্যে স্বামীজীকে লইয়া বার্নেস স্ট্রীটের সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। শহরে যত ঘোড়ার গাড়ি ছিল সব কয়টিই যাত্রী লইয়া সেই বিজয়-মণ্ডপের দিকে ছুটিল, পায়ে হাঁটিয়াও চলিল অনেকে। সভামণ্ডপটি চিরহরিৎ তালপত্রাদিতে সুশোভিত হইয়াছিল। সেখানে স্বামীজী অশ্বযান হইতে অবতরণ করিলেন এবং শোভাযাত্রা সহ হিন্দুপ্রথানুযায়ী ধ্বজপতাকা, পবিত্র ছত্রাদি সমভিব্যাহারে শ্বেতবস্ত্রাবৃত পথে পদব্রজে চলিতে থাকিলেন। তখন একদল বাদ্যকর ভারতীয় গৎ বাজাইতেছিল। বার্নেস স্ট্রীটের প্রবেশপথে অনেকে শোভাযাত্রায় মিলিত হইলেন এবং সেখান হইতে দারুচিনি বাগানে স্বামীজীর জন্য যে অস্থায়ী বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল উহারই সম্মুখে নির্মিত আর একটি সুসজ্জিত ও শিল্পচাতুর্যপূর্ণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। প্রথম মণ্ডপ হইতে এই দ্বিতীয় মণ্ডপের দূরত্ব ছিল সিকি মাইল। এই পথের উভয় পার্শ্ব তালপত্র-মালিকা-শোভিত তোরণসমূহে সজ্জিত ছিল। স্বামীজী যেমনি এই দ্বিতীয় মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, অমনি একটি বিরাট কৃত্রিম পদ্মের দলসমূহ প্রস্ফুটিত হইল এবং উহার মধ্য হইতে একটি পক্ষী উড়িয়া গেল। এইসব মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী কিন্তু অলক্ষিতই থাকিয়া গেল, কারণ সকলের দৃষ্টি তখন স্বামীজীরই উপর নিবদ্ধ। তাঁহাকে দেখিবার আগ্রহে অনেক সাজসজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল, পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে ঋষি ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ আসন গ্রহণ করিলেন। কোলাহল থামিলে এক সঙ্গীতবিশারদ বেহালাযোগে একটি সুন্দর গৎ বাজাই-লেন; তারপর দুই সহস্র বৎসর পূর্বে তামিল ভাষায় রচিত 'তেবারম্' স্তোত্র সঙ্গীত হইল; স্বামীজীর সম্মানার্থ রচিত একটি সংস্কৃত স্তোত্রেরও আবৃত্তি হইল। মাননীয় পি. কুমারস্বামী অগ্রসর হইয়া প্রাচ্য রীতিতে স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন এবং অতঃপর হিন্দুদের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

"কর্ণবধিরকারী হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে বাগ্মিতাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অভিনন্দনের উত্তর দিলেন। তাঁহার কথাগুলি অতি সরল ও সুস্পষ্ট হইলেও বিরাট জনতার মনে উহা গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিল। উত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিলেন যে,

সেদিন কোন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, কোন মহাবীর অথবা ধনকুবেরের সম্মানার্থ ঐ আনন্দোচ্ছ্বাস উৎসারিত হয় নাই। তিনি বলিলেন, 'এক ভিখারী সন্ন্যাসীকে আপনারা যে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন তাহাতে হিন্দুদের আধ্যাত্মিকতারই প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি কোন উচ্চ সৈন্যাধ্যক্ষ, অথবা রাজা কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তি না হইলেও সমাজের উচ্চপদস্থ এবং বহুসম্মানিত নেতৃবৃন্দ তাঁহার ন্যায় দরিদ্র সন্ন্যাসীর প্রতি সম্মান দেখাইতে সমবেত হইয়াছেন—ইহা আধ্যাত্মিকতারই এক চরম নিদর্শন।" তিনি দৃঢ়রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, জাতিকে বাঁচিতে হইলে আধ্যাত্মিকতাই জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গৃহীত হওয়া আবশ্যক। আর তাঁহাকে যেভাবে অভিনন্দিত করা হইল উহাকে তিনি কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপাররূপে স্বীকার না করিয়া একটি মৌলিক তথ্যের স্বীকৃতি-রূপেই গ্রহণ করিলেন।

"অতঃপর স্বামীজী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানে তাঁহাকে আর একটি মাল্যে ভূষিত করা হইল এবং একটি আসনে বসানো হইল। বাহিরে যেসব লোক আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় যোগদান করিয়াছিল তাহারা সেস্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদিগকে তাঁহার দর্শনেচ্ছু জানিয়া স্বামীজী আবার বাহিরে আসিলেন এবং সন্ন্যাসীদেরই রীতিতে তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন ও আশীর্বাদ করিলেন।"

স্বামীজী যে কয়দিন কলম্বোতে ছিলেন, সেই কয়দিনই তাঁহার ঐ বাসগৃহটি জনপরিপূর্ণ থাকিত—সে গৃহখানি যেন এক তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। সাধুর প্রতি প্রাচ্যদেশবাসীর ভক্তিপরায়ণতার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাঁহারা ধারণাই করিতে পারিবেন না স্বামীজী ঐকালে কিরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আগন্তুকদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোকই থাকিতেন—সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইতে অতি দরিদ্র ভিখারীও বাদ যাইত না। স্বামীজীর পদরজে পবিত্রীকৃত ঐ গৃহের নাম পরে হইয়াছিল 'বিবেকানন্দ লজ' (বা কুটীর)। ঐ সময়ের একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি দরিদ্র বিপন্ন স্ত্রীলোক যথারীতি ফলমূল-হস্তে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইল। নির্বিবাদে ভগবানলাভের উদ্দেশ্যে সাধনায় কালাতিপাতের জন্য তাহার স্বামী সংসার ত্যাগ করিয়াছিল। স্বামীজী স্ত্রীলোকটিকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের উপদেশ দিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে যথারীতি গার্হস্থ্যধর্ম পালন

করিলেই প্রকৃত ধর্মপথ অনুসরণ করা হইবে। ইহার উত্তরে সে যাহা বলিয়াছিল, তাহা খুবই অর্থপূর্ণ। সে বলিল, "গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু উহা যদি বুঝিতে ও অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাতে ফল কি ?" ধর্মপ্রাণ হিন্দুরই ন্যায় সে বুঝিয়াছিল, ধর্ম শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে, উহা অনুভূতিসাপেক্ষ। উপস্থিত শ্রোতারাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ভারতের অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে কত সচেতন।

সিংহলে অবতরণের প্রথম দিনে সর্বসাধারণের সমক্ষে দীর্ঘ ভাষণ দেওয়ার অবকাশ ছিল না ; ঐরূপ প্রথম ভাষণ হইল পরদিন শনিবার অপরাহ্নে 'ফ্লোরাল হলে'। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'পুণ্যভূমি ভারত'। সেদিন শ্রোতার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, অনেককে হলের বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। বলিতে গেলে ইহাই ছিল ভারত-প্রত্যাগমনের পর স্বামীজীর প্রথম সুদীর্ঘ বক্তৃতা। বক্তৃতাটি শুধু বাগ্মিতার জন্য উল্লেখযোগ্য নহে, উহার বক্তব্য বিষয়গুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে তিনি যাহা পূর্বে হয়তো আবেগভরে বিশ্বাস করিতেন, বিদেশভ্রমণ-সম্ভূত অভিজ্ঞতার ফলে উহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন: "যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।...এখান হইতেই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম —সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে।" কিন্তু অন্যদেশে যেরূপ যুদ্ধবিগ্রহের পন্থাবলম্বনে ভাবপ্রচার হইয়া থাকে, ভারতের অধ্যাত্মবার্তা সেভাবে কোনও কালে প্রচারিত হয় নাই: "অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসারিত হইয়াছে ; কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে।" অন্য প্রাচীন জাতি লুপ্ত হইয়া গেলেও "সেই শুভকর্মের ফলেই আমরা এখনও জীবিত।" আমাদের জাতীয় জীবন ধর্মকেই কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে। "এই ভারতে মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য ; ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য।...প্রত্যেক জাতিরই জীবনের যেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে।...সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয়

হিন্দুরও কিছু দিবার আছে—আধ্যাত্মিক আলোকই পৃথিবীর কাছে ভারতের দান।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবধান করিয়া দিলেন: "ভারতের বাহিরে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে আমি ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ—যেগুলির উপর ভারতীয় ধর্মরূপ সৌধ নির্মিত—সেগুলি মাত্র লক্ষ্য করিতেছি।" বস্তুতঃ তিনি ভারতের মৌলিক ও শাশ্বত আধ্যাত্মিক বাণীর প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; যুগ-প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল আচার-ব্যবহার বা বিধিনিষেধের কথা বলেন নাই। আর "সর্বোপরি পৃথিবীকে এই মহান সত্যটি আমাদিগকে শিখাইতে হইবে।... ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্মসহিষ্ণুতা—শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে।...সর্ববিধ ভেদ দূরীভূত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব।... কিন্তু তাই বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পর বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই।" ('বাণী ও রচনা', ৫।৩-১৪)।

পরদিন রবিবারেও সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভিড় লাগিয়াই রহিল; স্বামীজীও তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনাদি করিলেন। সন্ধ্যায় তিনি যখন একটি মন্দিরে শিবদর্শনে চলিলেন, তখনও অনেকে তাঁহার সঙ্গে চলিল। পথচলার সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, লোকেরা প্রায়ই তাঁহার গাড়ি থামাইয়া ফলোপহার দিল, গলে মাল্যদান করিল ও গায়ে গোলাপজল ছিটাইয়া দিল। দক্ষিণভারতের ও সিংহলের রীতি এই যে, কোন বিশিষ্ট অতিথি আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ দ্বারদেশে দীপমালা প্রজ্বালিত হয় এবং নারিকেল কদলী প্রভৃতি মাঙ্গলিক ফলে গৃহদ্বার সুসজ্জিত হয়। স্বামীজী যখন হিন্দুপল্লীর, বিশেষতঃ তামিলপল্লীর প্রধান পথ চেকু স্ট্রীটের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন দেখা গেল, প্রাচীন প্রথাবলম্বনে প্রায় প্রতিটি গৃহেই ঐরূপ করা হইয়াছে। মন্দিরে স্বামীজীকে "জয় মহাদেব" রবে আহ্বান জানানো হইল। সেখানে পূজাদি-সমাপনান্তে তিনি সমবেত জনতা ও পুরোহিত মণ্ডলীর সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিলেন। তিনি যখন বাসস্থানে ফিরিলেন, তখন সেখানেও বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার সহিত আলাপের জন্য বসিয়াছিলেন, এইসব কথাবার্তায় রাত্রি আড়াইটা বাজিয়া গেল।

পরদিবস সোমবারে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজী শ্রীযুক্ত চেলিয়ার গৃহে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার শুভ আগমনোপলক্ষে গৃহখানি সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং

স্বামীজীর আকর্ষণে বহু সহস্র ব্যক্তি সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার গাড়িখানি যেমন নিকটবর্তী হইতে থাকিল অমনি সহস্র কণ্ঠোত্থিত আনন্দধ্বনি প্রবলতর হইতে লাগিল এবং পুষ্পমাল্য ও পুষ্পবর্ষণের দ্বারা তাঁহাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হইল। তিনি অবতরণ করিলে তাঁহাকে একটি সুরচিত ও সুসজ্জিত আসনে বসাইয়া তাঁহার অঙ্গে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দেওয়া হইল। স্বামীজী অতঃপর আগন্তুকদের মধ্যে বিভূতি বিতরণ করিলে সকলেই উহা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিলেন। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, সেখানে স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি প্রতিকৃতি রহিয়াছে; অমনি আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং ঐ গৃহে বিভিন্ন মহাপুরুষদের ছবি সংরক্ষিত আছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা হইল এবং বহু ধর্মসঙ্গীতের পর সেই দিনের ঐ মনোরম অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হইল।

ঐ দিন সন্ধ্যায় কলম্বোর সাধারণ বক্তৃতাগৃহে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা হইল। শ্রোতৃবর্গ সেদিন এক হৃদয়গ্রাহী ও প্রেরণাময় ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। অদ্বৈত-ভিত্তিমূলক সার্বভৌম ধর্মই ছিল তাঁহার মূল বক্তব্য। বক্তৃতাকালে তিনি লক্ষ্য করিলেন, অনেক স্বদেশবাসী বিদেশী পরিচ্ছদে ভূষিত আছেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইওরোপীয় বসনে ভারতীয়দিগকে মোটেই মানায় না; এরূপ দাসোচিত অনুকরণ বড়ই লজ্জার বিষয়। আর তিনি ইহাও বলিলেন যে, কোন পরিচ্ছদ-বিশেষের নিন্দা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত যে বিজিতসুলভ দুর্বলচিত্ততা লইয়া মানুষ ঐরূপ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তাহারই উপর খড়্গহস্ত।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল কলম্বো হইতে জলপথে সোজা মাদ্রাজে যাইবেন; কিন্তু সিংহলে আগমনের পর সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নগরে অন্ততঃ একবার দর্শন দিবার জন্য এমন সব আগ্রহপূর্ণ আবেদন আসিতে লাগিল যে, তিনি অগত্যা প্রধানতঃ স্থলপথে জাফনা হইয়া মাদ্রাজে যাওয়াই স্থির করিলেন। এই পরিবর্তিত সঙ্কল্পানুযায়ী তাঁহাকে ১৯শে জানুআরি সকালের ট্রেনে একটা স্পেশাল সেলুনে করিয়া কাণ্ডি নগরে লইয়া যাওয়া হইল। কাণ্ডি সিংহলের একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস এবং ভগবান বুদ্ধের দন্তমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। স্বামীজীকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইবার জন্য কাণ্ডি রেল স্টেশনে বহু

লোক একটি ভারতীয় ব্যাণ্ড পার্টি ও দেবমন্দিরের শোভাযাত্রার সাজ-সজ্জাদি লইয়া উপস্থিত ছিল। স্বামীজী স্টেশনে উপস্থিত হইলে বাদ্য ও ঐ সকল সাজ-সজ্জাদি সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে আসিলে সমবেত জনমণ্ডলী আনন্দের উচ্ছ্বাসে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। ক্রমে সকলে নীরব হইলে একখানি অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল এবং স্বামীজী সংক্ষেপে উহার উত্তর দিলেন। তারপর তিনি শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে গেলেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ও ভ্রমণের পর পুনর্বার যাত্রা শুরু হইল ও স্বামীজী সেই সন্ধ্যাতেই মাতালে নামক স্থানে উপনীত হইলেন এবং তথায় রাত্রিযাপন করিলেন।

বুধবার সকালে অশ্বযানে দুই শত মাইল অতিক্রমণরূপ কষ্টসাধ্য যাত্রা আরম্ভ হইল। তাঁহাদের গন্তব্যস্থল ছিল সিংহলের উত্তারাংশে অবস্থিত হিন্দুপ্রধান জাফনা নগর। সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকা ও ইওরোপে অন্য প্রকারে জীবন কাটাইয়া এইভাবে ভ্রমণ করা স্বামীজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কিরূপ বিপজ্জনক ছিল তাহা বোধ হয় উৎসাহে নিমগ্ন হিন্দুদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই; কিন্তু আমরা দেখিব, সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ ও বক্তৃতাদির পর স্বামীজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য তিনি বিদেশে থাকাকালেও ইহার পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ভারতে আসিয়া তিনি যেরূপ জীবনযাত্রার সম্মুখীন হইলেন, তাহাতে স্বাস্থ্যোদ্ধার তো দূরের কথা, উহার অনুকূল অবস্থায় থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তবে জাফনা যাত্রা শ্রমসাধ্য হইলেও পথটি ছিল সৌন্দর্যের নিলয়। উভয় পার্শ্বের শস্যশ্যামোজ্জ্বল শোভা পথিকগণের মন ভুলাইতে লাগিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও ছিল অতি মনোহর। কিন্তু একটু পরেই এক দুর্যোগ উপস্থিত হইল। ডাম্বুল নামক স্থানের কয়েক মাইল দূরে পাহাড় হইতে নামিবার কালে গাড়ির সম্মুখের একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যাত্রীদিগকে সেখানে তিন ঘণ্টা কাটাইতে হইল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, চাকাখানি একেবারে খুলিয়া যায় নাই। ঐরূপ হইলে গাড়িখানি উলটাইয়া গিয়া যাত্রীরা আহত হইতেন। অনেক চেষ্টার ফলে দূরবর্তী এক গ্রাম হইতে একখানি মাত্র গোযান সংগৃহীত হইল। উহাতে শ্রীযুক্তা সেভিয়ারকে বসাইয়া মালপত্র বোঝাই করা হইল। গাড়ির পশ্চাতে অপর সকলে মন্থরগতিতে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কয়েক মাইল চলার পর আরও গোযান সংগৃহীত

হইল এবং রাত্রিটা চলন্ত গোযানেই কাটিল। ক্রমে কানাহারি ও তিনপানি হইয়া তাঁহারা নির্দিষ্ট কালের আট ঘণ্টা পরে অনুরাধাপুরমে উপনীত হইলেন।

অনুরাধাপুর এককালে সিংহলীয় বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহু যোজনব্যাপী উহার ভগ্নাবশেষ দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, উহা এককালে এক বিশাল সুসমৃদ্ধ মহানগর ছিল। এখানে ইতস্ততঃ বহু বৌদ্ধমন্দির ও ভিক্ষুদের বাসস্থানের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কীর্তিগুলির ভগ্নস্তূপ-মধ্যেও সেই যুগের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বোধগয়া হইতে আনীত বোধিদ্রুমের একটি শাখা এখানে প্রোথিত হইয়াছিল—জনরব এই যে, উহা ২৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কথা। সে শাখা এখন বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া বহু বৌদ্ধভক্তকে বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কীর্তির মধ্যে একটি সরোবর ও 'দাগোবা' নামে বিখ্যাত কয়েকটি স্তূপ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামীজীদের বাসের জন্য যে স্থানটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, উহার সন্নিকটে অবস্থিত এক সহস্র ছয় শত গ্র্যানাইট পাথরের স্তম্ভও বিশেষ বিস্ময়োৎপাদক। এগুলি দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে নির্মিত এক সুবৃহৎ নবতল পিত্তল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। কথিত আছে, এই বিশাল প্রাসাদে পুরোহিতদের জন্য এক সহস্র শয়নকক্ষ ছিল; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনে আরও বহু কক্ষ ব্যবহৃত হইত। ইহার ছাদ ছিল পিত্তলের এবং সভামণ্ডপটি সিংহশিরোপরি নির্মিত অনেকগুলি সুবর্ণ স্তম্ভে সুসজ্জিত ছিল। মণ্ডপের মধ্যভাগে দ্বিরদরদনির্মিত এক সিংহাসন ও সিংহাসনের উভয়পার্শ্বে কনকখচিত সূর্য ও রজতময় চন্দ্রমা বিরাজ করিত।

পূর্বোক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ও তৎসমীপে দুই-তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে স্বামীজীর উপাসনা সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। তিনি ইংরেজীতে বলিয়া যাইতে থাকিলে অপর দুই ব্যক্তি তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিতে লাগিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন, অসার পূজাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্বক বরং বেদবাণীসমূহকে কার্যকরী করিয়া তোলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। তিনি এই পর্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় দলে দলে ধর্মান্ধ বহু ভিক্ষু ও গৃহস্থ, পুরুষ ও নারী, বৃদ্ধ ও বালক ঢাক ঢোল কাঁসর টিন প্রভৃতি বাজাইয়া সভার চারিদিকে এমন বিকট শব্দ আরম্ভ করিল যে, স্বামীজীকে বাধ্য হইয়া বক্তৃতা বন্ধ করিতে হইল। ইহার ফলে তখনই হয়তো হিন্দু ও বৌদ্ধদের

মধ্যে একটা সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া যাইত; কিন্তু এরূপ অসদ্ব্যবহার সত্ত্বেও স্বামীজী হিন্দুদিগকে ধৈর্য ধরিয়া শান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইতে গিয়া বলিলেন যে, ধর্ম একটি সার্বভৌম বস্তু এবং ভগবানকে শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ বা অপর যে কোনও নামে পূজা করা হউক না কেন, তিনি বস্তুতঃ অভিন্ন। এইরূপ বৌদ্ধপ্রধান ঐ তীর্থক্ষেত্রে তিনি শুধু পরধর্ম-সহিষ্ণুতার কথাই বলিলেন না, পরধর্মে শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের প্রয়োজনও বুঝাইয়া দিলেন।

অনুরাধাপুর হইতে জাফনার দূরত্ব একশত কুড়ি মাইল। এই দীর্ঘ রাস্তার ও ঘোড়ার অবস্থা—দুই ছিল খারাপ; কাজেই এই ভ্রমণ মোটেই সুখাবহ ছিল না। আনন্দপ্রদ জিনিস ছিল শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর উহাতেই একঘেয়েমির হাত হইতে খানিকটা রক্ষা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার উপর আবার পর পর দুই রাত্রি ঘুম হইল না। পথে বাবোনিয়া নামক স্থানে হিন্দু অধিবাসীরা স্বামীজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনাপুরঃসর একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। মধুরভাষী স্বামীজী ইহার এক হৃদয়স্পর্শী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। স্বামীজীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও প্রেরণাময় বাণীতে স্থানীয় ব্যক্তিরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। অতঃপর ইঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বামীজী ভক্তবৃন্দসহ উত্তর সিংহলের বনরাজিশোভিত মনোরম সুদীর্ঘ পথে জাফনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরদিবস প্রাতে সিংহলের প্রধান ভূখণ্ডের সহিত জাফনাদ্বীপের সংযোগ-বিধানকারী সেতুটি যে হস্তিগিরিবর্ত্মে অবস্থিত সেখানে স্বামীজীকে এক স্বাগত সম্ভাষণ দেওয়া হইল। উহা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল; কেননা, উহার জন্য কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না।

জাফনা শহরের দ্বাদশ মাইল দূরে অগ্রসর হইয়া নেতৃস্থানীয় বহু হিন্দু স্বামীজীকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং সেখান হইতে বাকি সবটা পথই তাঁহাকে বহু অশ্বযানের এক শোভাযাত্রাসহ নগরে লইয়া আসিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ নগরের প্রতিটি পথ, এমন কি প্রতি গৃহ সুসজ্জিত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় যখন তাঁহাকে প্রজ্বলিত মশালসহ শোভাযাত্রা করিয়া হিন্দু-মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মিত এক বক্তৃতামণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সে দৃশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সমস্ত পথেই অপূর্ব উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল এবং সে শোভাযাত্রায় অন্ততঃ দশ-বার হাজার লোক উপস্থিত ছিল। সেদিন রবিবার, ২৪শে

জানুআরি। শকট হইতে অবতরণপূর্বক স্বামীজী শিবান ও কাথিরেশন মন্দিরে পূজা করিলেন এবং মন্দিরস্বামিকর্তৃক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইলেন। সভাস্থলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সর্বশ্রেণীর লোক তাঁহার দর্শনার্থ সমবেত হইয়াছিল। শামিয়ানায় উপস্থিত হইলে ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস. চেল্লাপ্পা পিলে স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া বক্তৃতামঞ্চে লইয়া গেলেন। অতঃপর অভিনন্দন পঠিত হইল এবং স্বামীজী একঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা করিলেন। স্বামীজীর জাফনা-ভ্রমণ ও তথায় জনসাধারণের অভিনন্দন সম্বন্ধে স্থানীয় এক সংবাদপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :

"অভ্যর্থনা-সমিতির সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, সাতজন সভ্যের একটি প্রতিনিধি-দল রবিবার সকালে ঘরোয়াভাবে উপ্পার নামক স্থানে স্বামীজীকে স্বাগত জানাইবেন এবং নগরে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদত্ত হইবে ঐদিন সন্ধ্যায়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, রবিবার প্রত্যূষে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় একশত জন উপ্পারে সমবেত হইয়াছেন এবং সাগ্রহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়টা পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসিপ্রবর ও তাঁহার সহগামীদের লইয়া ঘোড়ার গাড়িখানি পৌছাইল না ; অতএব স্থির হইল, আরও পাঁচ মাইল আগাইয়া গিয়া চাবাকাচারী নামক স্থানে অপেক্ষা করা হইবে। ঐ স্থানে পৌছাইতে না পৌছাইতে স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া ডাক-গাড়ি আসিয়া পড়িল। তখন গাড়িতে চড়িয়া শহরে যাইবার জন্য এক শোভাযাত্রা সাজানো হইল। প্রথম গাড়িতে উঠিলেন স্বামীজী, তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম। গাড়িখানি ছিল যুগলাশ্ববাহিত একখানি (চারি চাকার) ল্যাণ্ডো। বাকি সকলে কুড়িখানি গাড়িতে পশ্চাতে চলিলেন। সেণ্ট্রাল রোড ধরিয়া শোভাযাত্রাটি নগরে পৌছিতে সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল। অভ্যর্থনা-সমিতির হাতে সময় বেশী না থাকিলেও অপরাহ্ণে হিন্দু-মহাবিদ্যালয়ে স্বামীজীর যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি বিশাল ও সযত্নে সুসজ্জিত মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। শহর হইতে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ দুই মাইল রাস্তা মাল্যশৃঙ্খল ও আলোকমালায় সুশোভিত ছিল, বিশেষতঃ গ্র্যাণ্ড বাজারের পরবর্তী অংশের কথা উল্লেখযোগ্য। রাস্তার দুই দিকে কদলীবৃক্ষ প্রোথিত হইয়াছিল এবং ধ্বজপতাকাদিতে সমস্ত রাস্তাটি সুশোভিত ছিল। সমস্ত দৃশ্যটি ছিল সুমনোহর

এবং জনগণের মধ্যে ছিল প্রচুর উৎসাহ। দ্বীপের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসীর দর্শন-কামনায় সমাগত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। মহাবিদ্যালয় অবধি জাফনাকঙ্কেসান্তুরা রোডটি সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত গোযান ও অশ্ব-যানের পক্ষে অগম্য হইয়া গিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে আটটায় মশাল হস্তে ও ভারতীয় সঙ্গীতসহ যে শোভাযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ছিল অভূতপূর্ব। অনুমান করা হইয়াছিল যে, উহাতে প্রায় পনর হাজার লোক যোগ দিয়াছিল এবং সকলেই পদব্রজে চলিয়াছিল। দুই মাইলব্যাপী রাস্তাটি এত জনাকীর্ণ ছিল যে, সর্বত্র মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না, অথচ সর্বদা সুশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। পথটির আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গৃহের সম্মুখেই মঙ্গলঘট ও দীপ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সন্ন্যাসীর প্রতি হিন্দুপ্রথানুসারে যে উচ্চতম শ্রদ্ধা প্রকাশ করা সমুচিত, গৃহবাসীরা এইরূপে তাহাই প্রদর্শন করিয়া-ছিল। অশ্বযান হইতে অবতরণান্তে স্বামীজী শিবান ও কাথিরেশন মন্দিরদ্বয়ে পূজা করিলেন এবং মন্দিরের পুরোহিতদ্বয় তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিলেন। সমস্ত রাস্তায়ও তাঁহাকে মাল্যদান করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যখন রাত্রি দশটায় মহাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে অতীব সুন্দর দেখাইতেছিল।

"স্বামীজীর আগমনের কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই বক্তৃতামণ্ডপ জনপরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বাহিরেরও বহু লোক ভিতরে একটু স্থান করিয়া লইতে সচেষ্ট ছিল। সমাগতদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান সর্বসম্প্রদায়ের লোকই ছিল। মণ্ডপের প্রবেশপথে ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত চেল্লাপ্পা পিলে মহাশয় স্বামীজীকে সংবর্ধনা করিয়া একটি উচ্চ মঞ্চে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার গলে মাল্যদান করিলেন। ইহার পর এক অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল এবং স্বামীজী অতীব বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় একঘণ্টা ধরিয়া উহার প্রত্যুত্তর দিলেন। পরদিবস সন্ধ্যা সাতটায় তিনি হিন্দু-মহাবিদ্যালয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে একঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধরিয়া এক ভাষণ দিলেন। সভায় জাফনার সুশিক্ষিত সমাজের প্রায় চারি সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন ও প্রত্যেকে স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার পরে শ্রোতাদের অনুরোধে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, তিনি কেন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বামীজীর সহিত ভারতে আসিয়াছেন।"

জাফনাতেই স্বামীজীর সিংহলভ্রমণ শেষ হইল। কলম্বো হইতে এই পর্যন্ত জনগণের মধ্যে যে বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, স্বামীজীর বিজয়ে দেশবাসী উৎফুল্ল ও আত্মবিশ্বাসী হইয়াছিল এবং তাঁহার নির্দিষ্ট পথকেই মঙ্গলপ্রদ বলিয়া বরণ করিয়াছিল। কথাটা আরও বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীত হয়, যখন স্মরণ করা যায় যে, সিংহলের শুধু শহরে নহে, গ্রামগুলিতেও এই জাগরণ লক্ষিত হইয়াছিল; অথচ তখনকার দিনে যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। অশিক্ষিত ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলি কেমন করিয়া স্বামীজীর নামে শত বৎসরের নিষ্ক্রিয়তা ছাড়িয়া স্বধর্মরক্ষায় ও উহার বিজয়বার্তা ঘোষণায় উদ্‌বুদ্ধ হইল, ইহা সত্যই ভাবিয়া দেখার বিষয়। স্বামীজী যখন বলিতেন যে, ভারতীয় জীবন ধর্মকেন্দ্রিক, তখন তিনি স্বীয় প্রত্যক্ষ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিতেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বামীজী জানিতেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত তখন নিষ্ক্রিয়প্রায় হইলেও ধর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল।

স্বামীজীকে কতকটা জোর করিয়াই সিংহল ছাড়িয়া যাইতে হইল, কারণ আরও বহু শহর হইতে আগ্রহপূর্ণ টেলিগ্রাম ও পত্র আসিতেছিল, যাহাতে তিনি অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্যও সেসব স্থানে যান। কিন্তু তাঁহার অত সময় ছিল না। অধিকন্তু এই কয়দিনের অবিরাম পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত ও পীড়িত বোধ করিতেছিলেন। জনৈক সহযাত্রী বলিয়াছিলেন, "তিনি যদি আর কিছুদিন সিংহলে থাকিতেন তবে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগের চোটে মারা যাইতেন।"

অতঃপর স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুযায়ী জাফনা হইতেই জলপথে তাঁহার ভারতগমনের ব্যবস্থা করা হইল। একখানি দেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পাম্বান অভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন। বায়ু অনুকূল ও সাগর শান্ত থাকায় এই সমুদ্রযাত্রা সুখাবহ ছিল। ২৫শে জানুআরি রাত্রি বারটায় সঙ্গিগণসহ রওনা হইয়া তিনি পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে পাম্বানে পৌছাইলেন।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

ভারতের অভ্যুত্থানের জন্য স্বামীজীর মনে যে পরিকল্পনা রূপপরিগ্রহ করিতেছিল, উহার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহার স্বদেশ পরিত্যাগের পূর্বে, সমুদ্র-যাত্রাবসরে ও বিদেশে অবস্থানকালে আলাপ-আলোচনা ও পত্রাদির মাধ্যমে বহুভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উহার কিছুটা সিংহলে আত্মপ্রকাশ করিলেও দক্ষিণ ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী হইতেই উহার পূর্ণতম পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিতে তাঁহার পরবর্তী ভাষণগুলি ও কার্যাবলী গভীর ভাবে অনুধাবনযোগ্য।

জাহাজ ২৬শে জানুআরির (১৮৯৭) মধ্যাহ্নের পূর্বেই পাম্বানদ্বীপে অবস্থিত পাম্বান রোডে উপস্থিত হইল। রামনাদের রাজার আমন্ত্রণানুসারে স্বামীজী পাম্বান হইতে রামেশ্বরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, রামনাদ-রাজ তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজকীয় নৌকা লইয়া পাম্বানে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা অপরাহ্নে স্বামীজীকে জাহাজ হইতে স্বীয় রাজতরণীতে লইয়া গেলেন এবং পাত্র-মিত্র-সভাসদসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। রাজার সহিত স্বামীজীর মিলন বড়ই হৃদয়স্পর্শী ছিল। স্বামীজী বলিলেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে বিদেশে প্রেরণের অভিপ্রায় পোষণ করিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামনাদ-রাজ ছিলেন অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তি। অতএব ইহা খুবই সমীচীন হইয়াছিল যে, ভারত-ভূখণ্ডে ফিরিয়া তিনি সর্বপ্রথমে রামনাদ-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। রাজতরণী পাম্বান নগরের তীরে উপনীত হইলে নগরবাসীরা তাঁহাকে তুমুল উৎসাহ সহকারে অভ্যর্থনা জানাইল। সেখানে এক সুসজ্জিত মণ্ডপে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল এবং একখানি অভিনন্দনপত্র পঠিত হইয়া তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। তৎসহ রাজা নিজেও ব্যক্তিগত সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন—উহার প্রতিছত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আবেগে পূর্ণ ছিল। পাম্বানবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করিলেন শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম পিলে। উহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হইল: "পাশ্চাত্ত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্মপ্রচারে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহুদিনের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক উঠিয়া পড়িয়া

লাগুন।" ইহা ছিল ভারতের নেতৃত্ব-গ্রহণেরই সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণের উত্তরে স্বামীজী তাঁহার নবযুগের বার্তার কয়েকটি মূল কথা বা স্বতঃসিদ্ধ তথ্য শুনাইলেন: "আমার বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শই যেন তাঁহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।·· ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, একথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না।···তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান্ জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে।···এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী আধ্যাত্মিকতার জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। ভারতকে পৃথিবীর সকল জাতির জন্য এই আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগাইতে হইবে।···আমরা এখন অবনত ও হীন হইয়া পড়িতে পারি। কিন্তু যদি আমাদের ধর্মের জন্য আমরা প্রাণপণ করি, তবে আমরা আবার মহৎ পদবীতে উন্নীত হইতে পারিব।" সর্বশেষে তিনি মহানুভব রামনাদের রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ভাষণ শেষ করিলেন ('বাণী ও রচনা', ৫।৩২-৩৫)।

সভার কার্য শেষ হইলে স্বামীজীকে রাজশকটে বসাইয়া তাঁহার বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট একটি রাজকীয় বাঙ্গলোর দিকে লইয়া যাওয়া শুরু হইল—রাজ-অমাত্য প্রভৃতি সকলে স্বামীজীর পশ্চাতে পদব্রজে চলিলেন। কিন্তু রামনাদ-রাজ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শকট হইতে ঘোড়া খুলিয়া লইতে বলিলেন এবং স্বয়ং অপর সকলের সাহায্যে গাড়িখানি টানিয়া চলিলেন। স্বামীজী তিন দিন পাম্বানে ছিলেন। সব কয়টি দিনই বেশ আনন্দপরিপূর্ণ ছিল। নগরবাসীরা স্বামীজীকে পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং সর্ববিষয়ে স্বামীজীর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়া ও নির্দেশ পাইয়া আনন্দিত হইতেন। পাম্বানে আগমনের দ্বিতীয় দিনে তিনি ৺রামেশ্বর মন্দির দর্শনে গেলেন। বিদেশযাত্রার পূর্বেও তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। তখন এই সকল জাঁকজমক ছিল না; তিনি তখন ছিলেন অজ্ঞাতপরিচয় দণ্ড-কমণ্ডলুধারী পথশ্রান্ত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। সেদিন তিনি ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবের অভিপ্রায়জ্ঞানহীন ও কৃপাপ্রার্থী; এখনও তিনি সমরূপ দেবভক্তি-পরায়ণ হইলেও মঙ্গলময়ের কৃপায় তিনি আজ রাজগুরু ও বহুজনসম্মানিত দেশবরেণ্য নেতা। স্বামীজীর গাড়ি

মন্দির-সন্নিধানে পৌছাইলে এক বৃহতী জনতা হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের উৎসবে ব্যবহার্য মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ, দেশী সঙ্গীত এবং অন্যান্য সম্মানজ্ঞাপক সম্ভার লইয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইল। দেবদর্শন ও পূজাদি সমাপনান্তে স্বামীজীকে মন্দিরের রত্নকোষে রক্ষিত মণি-মাণিক্য ও হীরকাদি দেখানো হইল। অতঃপর স্বামীজী সঙ্গীদের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য ও স্থাপত্য-নৈপুণ্যাদি দর্শন করিলেন। সহস্রস্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনিটিও তিনি দেখিলেন। অবশেষে সমাগত ব্যক্তিগণের সম্মুখে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি মন্দিরের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া প্রাণস্পর্শী সুললিত ভাষায় তীর্থমাহাত্ম্য ও উপাসনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন ও প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "ধর্ম অনুরাগে, বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে।...সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ-সাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিবদর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিবোপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র।...যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সর্বাগ্রে শিবের সন্তানগণের সেবা করিতে হইবে।" স্বামীজী ধর্মকে একটা সক্রিয় রূপদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন—সেবা ও আত্মমুক্তির প্রচেষ্টাকে সমসূত্রে গাঁথিয়া দিলেন। তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন এবং শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম উহা তামিল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত রামনাদ-রাজ পরদিন স্বামীজীর উপদেশের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য শতসহস্র দুঃখী ব্যক্তিকে অন্নবস্ত্র দান করিলেন এবং পাম্বানে স্বামীজীর আগমনের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ নির্মাণান্তে উহাতে এই বেদবাক্যটি খোদিত করাইলেন, "সত্যমেব জয়তে"। আরও লিখাইয়া রাখিলেন, "পশ্চিম দেশে বেদান্তধর্মপ্রচারে অশ্রুতপূর্ব সফলতা লাভ করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় ইংরেজ শিষ্যগণের সহিত ভারতভূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থান নির্দেশ করিবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক এই স্মারক স্তম্ভ প্রোথিত হইল। সন ১৮৯৭, ২৭শে জানুআরি।" বলিতে গেলে, এখানেই ভারতে আগমনের পর স্বামীজীর 'কার্যে পরিণত বেদান্তের' প্রয়োগ আরম্ভ হইল।

পাম্বান হইতে স্বামীজী উত্তরাভিমুখে চলিলেন—দ্বীপ ছাড়িয়া তিনি ভারতের প্রধান ভূখণ্ডে পদার্পণ করিলেন। জাহাজে অপরতীরে উপস্থিত হইয়া

তাঁহারা গোযানে আরোহণ করিলেন। পথে রামনাদাধিপতির নির্মিত একটি পান্থনিবাসে প্রাতরাশ সারিয়া তাঁহারা তিরুপুল্লানী নামক স্থানে উপস্থিত হইলে স্থানীয় অধিবাসীরা স্বামীজীকে অভ্যর্থিত করিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রামনাদ দেখা গেল। রামনাদের কাছে আসিয়া স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীরা একখানি সুদৃশ্য রাজকীয় নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং উহারই সাহায্যে একটি বৃহৎ জলাশয় উত্তীর্ণ হইলেন। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ জলাশয় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। রামনাদে স্বামীজীর অভ্যর্থনা ঐ হ্রদের অপর উপকূলে আয়োজিত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে পরিবেশটি ছিল অতি মনোরম। বলা বাহুল্য যে, এই অভ্যর্থনায় ভাস্কর সেতুপতিই সোৎসাহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই রামনাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। গুডউইনের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, রামনাদে স্বামীজী রাজগুরুরূপে রাজকীয় সম্মানে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি সরোবরতীরে পদার্পণ করিলে তোপধ্বনি করিয়া সকলকে তাঁহার শুভাগমন-বার্তা জানানো হইল; এবং আকাশে তারকাকারে বিচিত্র আতসবাজি উঠিতে লাগিল—শোভাযাত্রাসহ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত সময়ই এইরূপ হইতে লাগিল, পথের সর্বত্র আনন্দোৎসব লক্ষিত হইল। স্বামীজীকে রাজকীয় পালকীতে বসাইয়া রাজার ভ্রাতার নেতৃত্বাধীনে রাজার অঙ্গরক্ষী সৈন্যদল তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিল আর সকলের পুরোভাগে রাজা স্বয়ং নগ্নপদে পথ দেখাইয়া চলিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু মশাল জ্বলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতে চারিদিক গম গম করিতেছিল—বিলাতী ব্যাণ্ডে বাজিতেছিল, "হের ঐ আসিতেছে বিজয়ী মহাবীর" এই সঙ্গীতটি। এইভাবে অর্ধেক পথ চলার পর স্বামীজী রাজার অনুরোধে গাড়ি ছাড়িয়া একটি সুচারু রাজশিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং শীঘ্রই নির্দিষ্ট আবাসস্থল "শঙ্কর ভিলা" নামক প্রাসাদে উপনীত হইলেন। এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর তিনি সভামণ্ডপে গেলেন।

রাজার সভাগৃহেই অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল এবং স্বামীজীকে দেখিবার জন্য ও অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সেখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল। স্বামীজীকে দেখিবামাত্র সমবেত জনমণ্ডলী হইতে উচ্চ জয়ধ্বনি ও হর্ষকোলাহল উত্থিত হইল। তিনি আসন গ্রহণ করিলে এবং শ্রোতৃবৃন্দ শান্ত হইলে রামনাদাধিপতি একটি ক্ষুদ্র

বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতায় তিনি স্বামীজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন এবং অতঃপর স্বীয় ভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতিকে রামনাদবাসীর পক্ষ হইতে স্বামীজীকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র পাঠের জন্য আহ্বান জানাইলেন। পাঠের পর রাজভ্রাতা অভিনন্দন পত্রখানি কারুকার্য-খচিত এক স্বুবর্ণ পেটিকামধ্যে পুরিয়া স্বামীজীর শ্রীহস্তে সশ্রদ্ধভাবে তুলিয়া দিলেন। অভিনন্দনটিতে স্বামীজীর কার্যের সমসামযিক মূল্যায়নে একটা প্রমাণযোগ্য মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় বলিয়া আমরা সবটুকুই উদ্ধৃত করিলাম :

"শ্রীপরমহংস যতিরাজ দিগ্বিজয় কোলাহল সর্বমতসম্প্রতিপন্ন পরমযোগেশ্বর শ্রীমদ্ভগবচ্ছ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসকরকমলসঞ্জাতরাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দস্বামি পূজ্যপ্যাদেষু—

"স্বামিন্!

"এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধন রামেশ্বর বা রামনাথপুরম্ বা রামনাদের অধিবাসী আমরা আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থান সেই মহাধর্মবীর আমাদের পরম ভক্তি-ভাজন প্রভু শ্রীভগবান রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে, সেই স্থানে ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্য-শালী জ্ঞান করিতেছি।

"আমাদের মহান্ সনাতন ধর্মের প্রকৃত মহত্ত্ব পাশ্চাত্ত্যদেশের মনীষীদিগের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ এবং ঐ চেষ্টায় যে অভূতপূর্ব সুফল ফলিয়াছে তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছি। আপনি অপূর্ব বাগ্মিতাসহকারে ও অভ্রান্ত স্পষ্ট ভাষায় ইওরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মই আদর্শ সার্বভৌম ধর্ম, আর উহা সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী। আপনি মহা নিঃস্বার্থভাবের প্রেরণায় মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া ও মহা স্বার্থত্যাগ করিয়া বহু দেশ, নদ নদী, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র পার হইয়া অতুল-ঐশ্বর্যশালী ইওরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শান্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। আপনি

উপদেশ ও জীবন উভয়তঃ সার্বভৌম ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়তা দেখাইয়াছেন। সর্বোপরি আপনার পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্যাগণের প্রাণেও অনেক পরিমাণে তাহাদের পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্মের চর্চা ও অনুষ্ঠানে একটা আন্তরিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

"এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের আধ্যাত্মিক পুনরভ্যুত্থানের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অন্যতম অনুরক্ত শিষ্য, আমাদের রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, একথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করার জন্য তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ।

"উপসংহারে আমরা সেই সর্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন, আপনি যে কল্যাণকর কার্য এত সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করেন। আপনার পরমভক্ত আজ্ঞাবহ শিষ্য ও সেবকগণের শ্রদ্ধা ও প্রেমসহকৃত এই অভিনন্দন।" (বাংলা জীবনী, ৫৯৮-৬০০)।

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী যাহা বলিলেন, তাহাও স্বামীজীর চিন্তাধারা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। আবার ভাষণটি বাগ্মিতা, শব্দমাধুর্য ও উদ্দীপনার দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য। শ্রোতাদের দৃষ্টি ভারতের মহিমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ও নবযুগের নবীন আশা সকলের মনে সঞ্জীবিত করিয়া তিনি বলিলেন: "সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতে ঘনীভূত ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি-গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব

রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, গভীরতর হইতেছে।...অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।" তিনি আরও বলিলেন: "আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম।...তোমরা যদি আমাদের জাতিকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিয়া উঠিবে।" ভারতের বিশেষত্ব ও ধর্মপ্রাধান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিলেও স্বামীজী কূপমণ্ডূকতার বিরোধী ছিলেন; তিনি জানিতেন ভারতকে অপরের নিকট অনেক কিছু শিখিতে হইবে: "এখন প্রশ্ন এই, পৃথিবীর নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি? সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে; কিরূপে সঙ্ঘ গঠন করিয়া পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তি প্রণালী-বদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও দেশের সকল লোক যতদিন না সম্পূর্ণ ত্যাগস্বীকারে সমর্থ হইতেছে ততদিন সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্যের নিকট পূর্বোক্ত বিষয়গুলি কিছু কিছু শিখিতে হইবে।...ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ।...তথাপি আমাদের যেসব ভ্রাতারা এখনও উচ্চতম সত্যের অধিকারী হয় নাই, তাহাদের পক্ষে হয়তো এক প্রকার জড়বাদ কল্যাণের কারণ হইতে পারে—অবশ্য উহাকে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।...কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সন্ন্যাসীদের নিয়মে বাঁধিবার একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখ-দারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে।" এক বিষয়ে স্বামীজী কিন্তু সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—পাশ্চাত্ত্যের নিকট শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যক হইলেও ভারতীয় ভাব বর্জনপূর্বক অনুকরণ করা সর্বদা নিন্দনীয়: "আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা। এই দুইটির মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দু-সমাজকেই বাছিয়া লইব। কারণ সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন

হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব পাইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই; সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া সামঞ্জস্যহীন হইয়াছে।...সে যে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ সকল আচরণ সাহেবদের মতবিরুদ্ধ।...আগে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষাগ্রহণ কর, যাহা কিছু পার আপনার করিয়া লও, যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর।...তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, তাহাই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ ধর্মের নিম্নে স্থান গ্রহণ করে।" ('বাণী ও রচনা', ৫।৩৮-৪৭)। ভারতের নবজাগরণের ভিত্তিরূপে স্বামীজী যে ভাবাদর্শ সকলের সম্মুখে স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় সবটুকুই এখানে সংক্ষেপে বলা হইয়া গেল। মাদ্রাজের বক্তৃতাবলীতে আমরা ইহারই পূর্ণতর বিকাশ দেখিতে পাইব, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই-চারিটি নূতন কথা ভাষ্যাকারে আসিবে—কিন্তু সূত্র এখানেই রচিত হইয়া গেল।

সভাভঙ্গের পূর্বে রামনাদাধীশ ঘোষণা করিলেন যে, স্বামীজীর রামনাদে শুভপদার্পণের স্মৃতিস্বরূপ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যের জন্য প্রেরণ করা উচিত। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সাধুবাদসহকারে সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। স্বামীজীর প্রবর্তিত সেবাব্রত রূপপরিগ্রহ করিতে লাগিল।

রামনাদে অবস্থানকালে বহু ব্যক্তি স্বামীজীর দর্শনার্থ তাঁহার বাসস্থানে আসিতেন। একদিন তিনি সর্বসাধারণের জন্য খ্রীষ্টান মিশনরী বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন; বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ঐ গৃহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়া বিশেষ উদারতা দেখাইয়াছিলেন। আর একদিন তাঁহারই সম্মানার্থ আহূত রাজদরবারে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাকে অনেকগুলি মানপত্র দেওয়া হয় এবং ঐগুলির উত্তরে তিনি একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, রামনাদাধিপতির যথেষ্ট সাংসারিক মর্যাদা থাকিলেও তাঁহার চিত্ত ভগবচ্চরণে অর্পিত, এইজন্য স্বামীজী ঐ দরবারে তাঁহাকে "রাজর্ষি" আখ্যায় ভূষিত করেন। রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী ফনোগ্রাফে 'ভারতে শক্তি-উপাসনা'র প্রয়োজন

সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দেন। রবিবার সন্ধ্যায় (৩১শে জানুআরি) এই দরবার হয় এবং ইহারই কিছু পরে মধ্যরাত্রে তিনি রামনাদ হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করেন।

রামনাদ ত্যাগের পর তাঁহার প্রথম বিরামস্থল ছিল পরমকুড়ি। তাঁহাকে সেখানে জাঁকজমক সহকারে অভ্যর্থনা করা হয় এবং শোভাযাত্রায় বহু সহস্র ব্যক্তি যোগ দেন। সভাস্থলে সমবেত হইয়া তাঁহারা স্বামীজীকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন তাহাতে প্রতীচ্যে হিন্দু-ধর্ম প্রচারের সাফল্যে আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলা হয়, "আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্যেরা আপনার ধর্মোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহা তাহাদের জীবনকে পর্যন্ত পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিদিগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যাঁহারা তপস্যা ও আত্মসংযম দ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবজাতির প্রকৃত আচার্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" ইহার উত্তরে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে ধর্ম কিরূপে সবল ও সক্রিয় সমাজের ভিত্তি হইতে পারে তাহা বিভিন্ন দিক হইতে দেখাইয়া ও ইওরোপীয় সমাজের সহিত ধর্মভিত্তিক সমাজের তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন, "অতএব আপনারা দেখিতেছেন, সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে ধর্ম কিভাবে আপনাদের সাহায্য করিতে পারে।"

পরমকুড়ির পর মনমদুরা। সেখানে মনমদুরা ও তৎসমীপবর্তী শিবগঙ্গার জমিদার ও অন্যান্য অধিবাসীরা স্বামীজীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন। প্রথমে তারযোগে স্বামীজী জানাইয়াছিলেন যে, ঐ স্থানে থামা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না; কিন্তু পরে জনগণের আগ্রহাতিশয়ে তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হওয়ায় তাহারা খুবই আহ্লাদিত হইয়াছিল এবং এইজন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাইয়াছিল। অভিনন্দনে অন্যান্য কথার মধ্যে এইরূপ বলা হইয়াছিল: "পাশ্চাত্ত্য উদরসর্বস্ব জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্মভাবসমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময় আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী আচার্যের অভ্যুদয়ে ধর্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের ধর্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য সুবর্ণের উপর যে ধূলিরাশি কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভারূপ টাঁকশালের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারূপে জগতের সর্বত্র ব্যবহৃত হইবে। আপনি যেরূপ

উদারভাবে চিকাগোর ধর্মসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস—আমাদের পূজনীয়া মহারানীর রাজ্যে যেমন সূর্য অস্ত যায় না, তেমনি আপনারও ধর্মরাজ্য জগতের সর্বত্র বিস্তারিত হইবে।" স্বামীজী এই অভিনন্দনেরও যথোচিত উত্তর দিতে গিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিলেন: "আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি যে অক্ষুণ্ণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি আমাকে এখন গোটাকয়েক রূঢ় কথা বলিতে হইবে।...ভারতের এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে।...প্রায় দশ লক্ষের অধিক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ?...ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না?...যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল হইতে বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর।...আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই; আমরা এখন কেবল ছুঁৎমার্গী। আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত—'আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র'।" এই বক্তৃতাপ্রারম্ভে তিনি ব্যক্তিগত একটি কথা জানাইয়াছিলেন: "প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার শরীরের অবস্থা এখন এমন নয় যে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি।" বিদেশের কার্যে তিনি পূর্বেই অবসন্ন ছিলেন, বিগত কয়েকদিনের শ্রমে তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মনমত্নরা হইতে তাঁহারা মত্নরায় পৌঁছিলেন। মত্নরা দক্ষিণ দেশের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ৺মীনাক্ষীদেবীর ও সুন্দরেশ্বর মহাদেবের কারুকার্যখচিত বিশাল যুগলমন্দির ও অন্যান্য দেবমন্দিরাদির জন্য উহা ভক্তদিগের নিকট অতীব আদরণীয়। স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবেও মীনাক্ষী-মন্দির দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তির আকর্ষণস্থল। আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নগরের স্থান অতি উচ্চ। নগরে রামনাদাধিপের একটি সুন্দর বাঙ্গলো আছে। উহাই স্বামীজীর আবাসস্থলরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। অপরাহ্ণে একটি মখমলের খাপে করিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল:

"পরমপূজ্যপাদ স্বামীজী,

"মত্নরাবাসী আমরা হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি

সংসারেরর সমুদয় বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহান্ পরহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মের সহিত বাহ্য অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্মই ত্রিতাপতাপিত জীবকে শান্তিদানে সমর্থ।

"আপনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডবাসীকে সেই ধর্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা অনুযায়ী উপায়ে উন্নতিপথে আরোহণে সাহায্য করে। যদিও গত চার বৎসর আপনি পাশ্চাত্ত্যদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা বিদেশাগত উত্তরোত্তর বর্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই!

"ভারত যে আজ পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছে তাহার কারণ, তাহাকে জগতে আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। কলিযুগের অন্তর্বর্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা অবির্ভূত হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

"আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেজন্য আনন্দপ্রকাশ এবং সহস্র মনুষ্যের যে অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার—এই দুই বিষয়ে প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি সুন্দরেশ্বর-দেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিত্র দ্বাদশান্তক্ষেত্র এই মদুরা ভারতের অন্য কোন নগরী অপেক্ষা পশ্চাদ্‌গামী নহে জানিবেন।

"আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন, উদ্যম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন।" (বাংলা জীবনী, ২য় সং, ৬০৩-০৪)।

দীর্ঘ তিন সপ্তাহ ধরিয়া কায়ক্লেশবহুল ভ্রমণ, আহারাদির অনিয়ম, জিজ্ঞাসুদের সহিত অবিরাম আলোচনা ও পুনঃপুনঃ সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিয়া স্বামীজীর শরীর এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, শেষে কয়েক স্থানে যখন তখন দেখা-সাক্ষাৎ করা বা বক্তৃতা দিবার মতো অবস্থা তাঁহার ছিল না। তবু তিনি নিজ সুখ-সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভাবিয়া লোককল্যাণার্থ কর্তব্যসাধনে নিরত রহিলেন এবং এই অভিনন্দনের উত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতায় তিনি বলিলেন: "একদিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপরদিকে জড়বাদ—ইওরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার, যাহা পাশ্চাত্ত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তিতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুইটি হইতেই সাবধান থাকিতে হইবে।…দ্বিতীয়তঃ আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা সচরাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ-নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্য-দেবতা সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার মাত্র।…মনে রাখিও চিরকালই এইসকল প্রথা ও আচারের পরিবর্তন হইয়াছে।…বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে; কিন্তু কোন স্মৃতির প্রাধান্য যুগপরিবর্তনেই শেষ হইয়া যাইবে।…আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু এবং তাহার সহিত জড়বাদীর উদারভাব।…হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর, অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই।" পরিশেষে তিনি কোনও প্রথার অযথা নিন্দা না করিয়া এবং অতীতে উহা উপকারী ছিল জানিয়া ঐসকল আলোচনায় অযথা শক্তিক্ষয় হইতে বিরত থাকিয়া সত্যের সাক্ষাৎকারলাভপূর্বক ঋষিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে এবং তদবলম্বনে নিজের ও অপরের মুক্তিসাধন করিতে আহ্বান জানাইলেন।

এই তীর্থক্ষেত্রে অবস্থানকালে তিনি মীনাক্ষী-মন্দিরে গিয়া মীনাক্ষীদেবী ও সুন্দরেশ্বর শিবকে দর্শন করিলেন এবং মন্দিরে সংরক্ষিত ধনরত্নাদিও দেখিলেন। উহার মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্য গজমতিও ছিল। মন্দিরের পুরোহিতবর্গ তাঁহার প্রতি অশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রাচীন কাহিনী ও স্থাপত্যের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় তিনি নগর ত্যাগ করিয়া ট্রেনে উঠিলেন। গন্তব্যস্থল ছিল কুম্ভকোণম্; কিন্তু সারা রাত্রি যত স্টেশনে ট্রেন থামিল সর্বত্রই তাঁহাকে গাত্রোত্থানপূর্বক সমাগত দর্শনার্থীদের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে হইল। দূর দূরান্তর গ্রাম হইতে সমবেত জনমণ্ডলী ঐ সকল স্থানে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইল এবং পুষ্পমাল্য ও ফলমূলাদি দান করিল। তিনিও তাহাদের ধর্মোদ্দীপনায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের অনুরোধক্রমে কোন কোন জায়গায় সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিলেন। অধিকন্তু সর্বত্রই তিনি সহাস্যবদনে সকলকে দর্শন দিয়া আপ্যায়িত করিলেন এবং তাহাদের আনীত উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিলেন। সর্বত্রই লোকে তাঁহাকে দুই-চারিদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সময়সংক্ষেপ বলিয়া এবং শারীরিক ক্লান্তিবশতঃ তাহা সম্ভব হয় নাই। এই প্রকারে রাত্রি

চারিটায় যখন ট্রেন ত্রিচিনপল্লীতে উপস্থিত হইল, তখন দেখা গেল সহস্রাধিক লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রে বলা হইল: "আমরা আশা করিয়াছিলাম, আপনি অন্ততঃ এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিকে কৃতার্থ করিবেন। যাহা হউক, মাদ্রাজবাসীরা যে শীঘ্রই আপনাকে পাইবে, ইহাই ভাবিয়া আমরা পরম আনন্দ বোধ করিতেছি।" ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও স্বামীজীকে স্বতন্ত্র অভিনন্দন দিলেন। সময় অল্পই ছিল; অতএব স্বামীজী অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। পরবর্তী বৃহৎ নগর তাঞ্জোরে ইহার কিছুকাল পরে যে লোকসমাগম ও উৎসাহ দেখা গেল তাহাও অনুরূপ বৃহৎ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল।

পথের এইসব সাদর অভ্যর্থনাদি হইতেই পরবর্তী বিরামস্থল কুম্ভকোণমে তাঁহার সংবর্ধনা কিরূপ বিরাট আকার ধারণ করিবে তাহা অনুমান করা কঠিন হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই। নগরবাসীরা তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে মাতিয়া গিয়াছিল এবং কিরূপে সে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। এই নগর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এবং নানা ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য সুবিখ্যাত। স্বামীজী এখানে তিন দিন ছিলেন, কারণ অভিনন্দন ও বক্তৃতাদির জন্য এতদিন থাকা অনাবশ্যক হইলেও তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল এবং সর্বত্র লোকের বিপুল উৎসাহদর্শনে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল যে, মাদ্রাজে তিনি ক্ষণমাত্র অবকাশ পাইবেন না। কুম্ভকোণমে তাঁহাকে হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে দুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। ইহার উত্তরে স্বামীজী যে বক্তৃতা করেন তাহার বিষয় ছিল 'বেদান্তের উদ্দেশ্য'।

কুম্ভকোণম্-বক্তৃতাটি বেশ সুদীর্ঘ ও তথ্যবহুল। ইহাতে পূর্বে কথিত অনেকগুলি বিষয় পুনরুল্লিখিত ও প্রসারিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দুই-চারিটি বিষয় স্পষ্টতর বা নবতর আকারে উপস্থাপিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য কথাগুলি এই: "আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই; উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।...এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা সম্ভব নহে।" ইহা পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি। নূতন কথা তিনি শুনাইলেন: "আমার ধারণা, বেদান্ত—কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে

পারে, আর কোন ধর্মই নয়।" ইহার সমর্থনে যুক্তিপরম্পরা উপস্থাপিত করিয়া তিনি বলিলেন যে, বেদান্তবাদ ব্যক্তিবিশেষ, গ্রন্থবিশেষ বা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন পক্ষপাতী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—উহা ইষ্টনিষ্ঠা বা ব্যক্তিগত আদর্শানুসরণে মানবের স্বাধীনতা স্বীকার করে। অধিকন্তু "জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল বেদান্তের উপদেশের সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।...বেদান্তের আলোচনার দ্বিতীয় হেতু—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা।" আর তিনি কহিলেন: "সকল ধর্মই সত্য।...জগতের সকল বস্তু আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও সবই এক বস্তুর বিকাশ মাত্র।" ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের মূলমন্ত্র তাই "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। "পৃথিবীর লোককে আমাদের নিকট এই পরধর্মে সহিষ্ণুতারূপ মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" আবার এই অদ্বৈতবাদকে কার্যকর করিয়া তুলিতে হইবে—"ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।...সর্বপ্রকার নীতি ও বিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।" অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে সকলের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে এবং এইরূপেই আত্মশক্তি অবলম্বনে দেশের ও দশের উন্নতি হইবে।" "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।—এই জন্যই বেদান্তের অদ্বৈতভাব প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে।...এই দরিদ্রগণকে, ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।...উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভিতরে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না।"

স্বামীজী আদর্শের অনুসরণক্রমে আত্মস্বরূপ প্রকাশের কথা, ঈশ্বরলাভের কথাই বলিলেন; তিনি সমাজসংস্কারের দিকে ঝুঁকিলেন না: "আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজ-সংস্কারের প্রচারক নহি, আমি সমাজের দোষ-সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য যে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিখুঁত

ভাবে কার্যে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মানবজাতির একত্ব ও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব—এই বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক।" স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে স্বামীজী কাহারও পশ্চাদ্বর্তী ছিলেন না, তবু তিনি শুধু ভারতের কথা না ভাবিয়া সমগ্র মানবজাতির উন্নতিসাধনের জন্যই সকলকে আহ্বান জানাইলেন ; পরিশেষে স্বদেশপ্রেমের কথাও বলিতে ভুলিলেন না : "স্বদেশ-হিতৈষী হও। যে-জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাস। আমার স্বদেশবাসিগণ, যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়।" "হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই মহান্ জাতীয় অর্ণবপোত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে—হয়তো উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া পোতের জীর্ণ-সংস্কার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদেশবাসী সকলকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এদিকে মনঃসংযোগ করুক।...অভিশাপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না... কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফলপ্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।"

কুম্ভকোণম্ হইতে স্বামীজী ট্রেণে মাদ্রাজ চলিলেন। পথে পূর্বেরই ন্যায় যত স্টেশনে ট্রেন থামিল সর্বত্র তিনি জনসাধারণের নিকট বিপুল সংবর্ধনা পাইলেন। বিশেষতঃ মায়াবরম স্টেশনে এক বিরাট জনতা জমিয়াছিল ; সেখানে শ্রীযুক্ত ভি. নটেশ আয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিটি স্বামীজীকে প্ল্যাটফরমেরই উপর অভিনন্দন প্রদান করিল। উত্তরে তিনি ধন্যবাদ দিয়া সবিনয়ে বলিলেন : "আমি বিশেষ কোন বড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর যে-কেহ ইহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। তবে আমার প্রভু আমাকে যাহা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, আমি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া আসিয়াছি। আমার ক্ষুদ্র শক্তি যে আপনাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে ইহাতেই আমি ধন্য।" তিনি এইরূপও আশা দিলেন যে, সুযোগ-সুবিধা হইলে আবার মায়াবরমে

আসিবেন। অতঃপর বিপুল উৎসাহ ও "জয় বিবেকানন্দ মহারাজজীকী জয়"-ধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছাড়িয়া দিলেও, যতক্ষণ ট্রেন দেখা গেল, ততক্ষণ সেই জনতা সেখানেই দাঁড়াইয়া বিবিধরূপে উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকিল।

বাকি স্টেশনগুলিতেও বেশ উৎসাহ দেখা গেল; বিশেষতঃ মাদ্রাজের নিকটে একটি ছোট স্টেশনে সমাগত জনতা এক কাণ্ড করিয়া বসিল। ট্রেন সেখানে থামিবার কথা নহে; তবু তাহারা স্টেশন-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিল যাহাতে অন্ততঃ দুই-চারি মিনিটের জন্য ট্রেন থামানো হয়। সে অনুরোধ উপেক্ষিত হইল দেখিয়া ট্রেন আটকাইবার জন্য বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য হইতে শত শত ব্যক্তি রেললাইনের উপর শুইয়া পড়িল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্টেশন মাস্টার বুঝিলেন, পরিস্থিতিটি তাঁহার আয়ত্তের অতীত—তিনি ট্রেন থামাইতে পারেন না, লোককেও সরাইতে অক্ষম। ইহারই মধ্যে ট্রেন নিকটে আসিয়া পড়িল। তখন গার্ড অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ট্রেণ থামাইলেন। অমনি জনতা স্বামীজীর কামরার দিকে ছুটিল। স্বামীজী ইহাদের আগ্রহ দর্শনে খুবই বিচলিত হইলেন এবং হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ জানাইলেন। মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় জনতা শান্ত হইল এবং ট্রেনও নির্বিবাদে মাদ্রাজ অভিমুখে ছুটিল।



মাদ্রাজে স্বামীজী, ১৮৯৭

"আমার সমরনীতি"

মাদ্রাজের এগমোর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাইলে দেখা গেল সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্বামীজীকে স্বাগত জানাইবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছেন। তিনি মাদ্রাজে আসিবেন জানিয়াই নগরবাসীরা তাঁহার সংবর্ধনার সমুচিত ব্যবস্থায় নিরত হইয়াছিলেন ; মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে ঐ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের রাজা, ভূম্যধিকারী, মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ও বিভিন্ন সভাসমিতির সদস্যাদি নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে সতরটি বিজয়তোরণ নির্মিত হইয়াছিল, কদলীবৃক্ষ ও নারিকেলবৃন্ত রোপিত হইয়াছিল এবং পত্রপুষ্প, পতাকা ও শৃঙ্খলাদিতে সজ্জিত হইয়া নগরটি অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। দ্বারে দ্বারে পুষ্পমাল্য দুলিতেছিল এবং বিচিত্র বর্ণের পতাকা উড়িতেছিল। স্থানে স্থানে উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত ছিল, "পূজনীয় বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউন", "স্বাগত হে ভগবৎসেবক'', ''স্বাগত প্রাচীন ঋষিগণসেবক", "প্রবুদ্ধ ভারতের হার্দিক সংবর্ধনা'', "স্বামী বিবেকানন্দ সুস্বাগত", "এস শান্তির অগ্রদূত", "এস শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত সন্তান'', ''স্বাগত নরেন্দ্র"। সংস্কৃত শ্লোকাবলীর মধ্যে ছিল "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি''। কয়েকদিন পূর্ব হইতে সংবর্ধনা-সমিতিগুলি কাজে লাগিয়াছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে ও তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন চলিতেছিল সেই বিষয়ে মাদ্রাজের সংবাদপত্রগুলি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আগমনের দিনে 'দি হিন্দু', 'দি মাদ্রাজ মেল' প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিনিধিরা চিঙ্গলপেট স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 'মাদ্রাজ টাইমস'-এ লিখিত হইয়াছিল :

''গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মাদ্রাজের হিন্দু জনসাধারণ বিশ্ববিশ্রুত হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখেই তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কি বিদ্যালয়ে, কি মহাবিদ্যালয়গুলিতে, কি হাইকোর্টে, কি ম্যারিনাতে অথবা রাজপথে ও বাজারে—সর্বত্র দেখা যায় শত শত ব্যক্তি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'স্বামী বিবেকানন্দ কখন আসবেন ?' মফঃস্বল হইতে যেসব ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল,

তাহারা স্বামীজীর অপেক্ষায় এখানেই থাকিয়া গিয়াছে এবং ছুটিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য অভিভাবকদের জরুরী পত্র পাইয়াও এখানে থাকিয়া আহারাদির জন্য খরচের মাত্রা বাড়াইতেছে। যেভাবে স্বামীজী এই প্রদেশের অন্যত্র সংবর্ধিত হইয়াছেন, যেভাবে এখানে আয়োজন চলিতেছে, যেভাবে ক্যাসল কার্নানে বিজয়-তোরণ প্রস্তুত হইতেছে, যেভাবে হিন্দু জনসাধারণের ব্যয়ে এই 'ভগবৎ-প্রেরিত ব্যক্তিকে' এই ক্যাসলে রাখার ব্যবস্থা হইতেছে এবং যেভাবে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ারের ন্যায় নেতৃস্থানীয় হিন্দুভদ্রলোকগণ এই আয়োজনাদিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, স্বামীজী বিপুলভাবে সংবর্ধিত হইবেন। মাদ্রাজই সর্বপ্রথম স্বামীজীর অনুপম প্রতিভা আবিষ্কার করিয়াছিল এবং তাঁহার চিকাগো গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। যিনি স্বীয় জন্মভূমির সম্মানবৃদ্ধিকল্পে এরূপ দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছেন, সেই সর্বজনসমাদৃত মহাপুরুষকে সম্মানিত করার সুযোগও মাদ্রাজ আবার পাইবে। চারি বৎসর পূর্বে স্বামীজী যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি ছিলেন অজ্ঞাতপরিচয় সাধারণ ব্যক্তি। সেণ্ট থোম অঞ্চলের এক অতি সাধারণ বাঙ্গলোতে তিনি প্রায় দুই মাস কাল থাকিয়া ধর্মবিষয়ে আলাপ-আলোচনাদি করিতেন এবং যাহারা আগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট আসিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন ও উপদেশ দিতেন। এমন জন কয়েক শিক্ষিত যুবক ছিলেন যাঁহাদের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং তাঁহারা তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, এমন একটা শক্তি আছে, যাহা তাঁহাকে অপর সকলের ঊর্ধ্বে উন্নীত করিবে এবং তাঁহাকে জনগণ-অধিনায়কপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সবিশেষ সাহায্য করিবে। এই সকল যুবককে তখন 'বিভ্রান্ত-ভাবুক', কল্পনা-প্রবণ ও লুপ্তগৌরব-প্রতিষ্ঠাপক বলিয়া অবজ্ঞা করা হইত। কিন্তু এখন তাঁহারা ইহা দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছেন যে তাঁহাদের স্বামীজী ইওরোপ ও আমেরিকায় অর্জিত প্রভূত সুখ্যাতি লইয়া তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই যুবকেরা তাঁহাকে 'আমাদের স্বামীজী' বলিয়া উল্লেখ করিতেই ভালবাসেন। ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে, স্বামীজীর জীবনব্রতের সারাংশ আধ্যাত্মিকতা।...অপর ধর্মাবলম্বীদের সহিত তাঁহার মতবাদের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, খুব কম লোকই একথা অস্বীকার করিতে সাহস পাইবেন যে হিন্দুধর্মের উত্তম দিকটার প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের দৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া স্বামীজী

এক মহৎকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ধর্মজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে বাণীতে বিশ্বাস পোষণ করেন তাহা পাশ্চাত্ত্য জগতে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সর্বপ্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।"

অভ্যর্থনার দিন সকাল হইতেই শহরটি যেন আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল—দেখা গেল সহস্র সহস্র ব্যক্তি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও উল্লাস ব্যক্ত করার জন্য বিচিত্র পতাকা ও ফুল লইয়া রেল স্টেশনের দিকে চলিতেছে। ট্রেন যখন স্টেশনে পৌঁছিল তখন স্বনামধন্য স্বামীজীকে এমন উৎসাহভরে ও আনন্দধ্বনিসহকারে সংবর্ধনা করা হইল যে, মাদ্রাজে আর কখনও ঐরূপ হয় নাই। প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর শোভাযাত্রা আরম্ভ হইল। রাস্তায় লোকের ভিড় ছিল অগণিত। শোভাযাত্রা যখন দীর্ঘপথ ঘুরিয়া শ্রীযুক্ত বিলিগিরি আয়েঙ্গারের ক্যাসল কার্নান নামক প্রাসাদোপম ভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন রাস্তার পাশের জানালা বা অন্য যে কোন সম্ভাব্য স্থান হইতে স্বামীজীর একটু দর্শন পাইবার জন্য লোক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। স্বামীজী কখনও বসিয়া, কখনও বা দাঁড়াইয়া লোকের সংবর্ধনার উত্তরে প্রতিপ্রণাম জানাইতে লাগিলেন। বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ যেমন মহাসমারোহে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, আজ স্বামীজীও যেন তেমনি মাতৃভূমির মুখ গৌরবোজ্জ্বল করিয়া সগৌরবে স্বদেশবাসীকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার বিজয় যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জিত নহে, উহা অর্জিত জনমানসের ভাবরাজ্যে। স্বামীজীর মাদ্রাজে আগমন এবং ঐ সময়ে নগরবাসীর উল্লাস বর্ণনা করিতে গিয়া একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল :

"পূর্বমুহূর্তেই ইহা সর্বত্র সুপ্রচারিত হইয়াছিল যে, সেদিন সকালে স্বামী বিবেকানন্দ সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ট্রেনে মাদ্রাজে পৌঁছিবেন; অতএব মাদ্রাজের নগরবাসী, বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুরা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক-বালিকা, মহাবিদ্যালয়ের যুবকগণ, ব্যবসায়ী, উকিল, জজ, সর্বমতের সর্বজাতির লোক, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পুরনারীরা পর্যন্ত—পাশ্চাত্ত্য জগতে সাফল্যলাভের পর স্বদেশপ্রত্যাগত স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইলেন। তাঁহার সংবর্ধনার জন্য সংগঠিত অভ্যর্থনাসমিতি তাঁহার সম্মানার্থ অতি চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মাদ্রাজের এগমোর স্টেশনেই ট্রেনটি প্রথম থামে বলিয়া সেখানে তাঁহারা বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্টেশনের অন্তর্ভাগে স্থান সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিনা টিকিটে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়

নাই ; গোটা প্ল্যাটফরমটিই লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এই জনতার মধ্যে মাদ্রাজের সুপরিচিত ব্যক্তিদের কেহই বাদ পড়েন নাই। সকাল প্রায় সাড়ে সাতটায় ট্রেন স্টেশনে আসিল। ট্রেনটি দক্ষিণ প্ল্যাটফরমে থামিবামাত্র জনতা উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং হাততালি দিতে লাগিল ; একটি দেশীয় ব্যাণ্ড পার্টিও উল্লাসপূর্ণ ভারতীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তিনি গাড়ি হইতে নামিলে অভ্যর্থনাসমিতি তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইলেন। স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ, আর ছিলেন তাঁহার ইওরোপীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত জে. জে. গুডউইন। স্বামীজীকে বক্তৃতামঞ্চে লইয়া যাওয়া হইলে সেখানে ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত জে. এইচ. সেভিয়ার ও তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহারা পূর্বদিন কলম্বোর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও স্বামীজীর অনুরাগী শ্রীযুক্ত টি. জি. হ্যারিসন ও তাঁহার পত্নীর সহিত মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা অতঃপর প্ল্যাটফরম ধরিয়া স্টেশনের প্রবেশ-দ্বারাভিমুখে চলিল ; উহার পুরোভাগে চলিল ব্যাণ্ড পার্টি এবং চারিদিকে এমন হর্ষরব ও করতালিধ্বনি উঠিতে লাগিল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়। প্রবেশপথে পরিচয়পর্ব আরম্ভ হইল। স্বামীজীকে মাল্যদান করা হইল এবং ঐসময়ে ব্যাণ্ডে একটি সুন্দর গৎ বাজিয়া উঠিল। সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সহিত কয়েক মিনিট বাক্যালাপের পর স্বামীজী মাননীয় বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও গুরুভ্রাতাদের সহিত যুগলাশ্ববাহিত একখানি অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠিলেন এবং এটর্নি শ্রীযুক্ত বিলিগিরি আয়েঙ্গারের বাসভবন 'ক্যাসল কার্নান' অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এগমোর স্টেশনটি পতাকা, তালপত্র এবং পাতাবাহার প্রভৃতিদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং প্ল্যাটফরমের উপর লাল শালু আস্তীর্ণ হইয়াছিল। বহির্গমনের গেটের উপর নির্মিত একটি বিজয়তোরণে লিখিত ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ সুস্বাগত'। রেল কম্পাউণ্ডের বাহিরে আসিয়া জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং স্বামীজীর প্রতি লোকের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য গাড়িখানিকে প্রতিপদে থামিতে থামিতে চলিতে হইল। সাধারণতঃ দেবমন্দিরে হিন্দুরা যেসব জিনিস অর্পণ করিয়া থাকে—ফল, নারিকেল প্রভৃতি—সেসবেরই দ্বারা এই অর্ঘ্যসমূহ বিরচিত ছিল। স্টেশন হইতে চিন্তাদ্রিপেটের পথে নেপিয়ার পার্কের ধারে ধারে চলিয়া অতঃপর গভর্নমেণ্ট হাউসের অপর দিকে মাউণ্ট রোড ঘুরিয়া, তারপর

ওয়াল্লাজা রোড ও চেপক হইয়া অবশেষে পাইক্রফ্টস রোড পার হইয়া সাউথ বিচ অবলম্বনে আইস হাউস (বা ক্যাসল কার্নান) পর্যন্ত যে পথ ধরিয়া শোভাযাত্রাটি অগ্রসর হইয়াছিল উহার সর্বত্র এবং পথিমধ্যে সংবর্ধনার্থ রচিত তোরণসমূহের নিম্নে অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল। বর্ণিত পথে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে হইতে যেসব স্থলে থামিয়াছিল, সেখানে স্বামীজীকে যেভাবে হর্ষধ্বনিসহ সংবর্ধনা করা হইয়াছিল তাহা রাজকীয় অভ্যর্থনাপেক্ষা মোটেই কম ছিল না। তোরণ-গুলি যেভাবে সাজানো হইয়াছিল এবং ঐগুলিতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি ও সর্বজনীন আনন্দই প্রকাশ পাইতেছিল এবং হিন্দুধর্মের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য প্রশংসা প্রকটিত হইতেছিল। স্বামীজী 'সিটি স্টেবলসে'র সম্মুখে থামিলেন এবং এক উন্মুক্ত মণ্ডপে যথারীতি মাল্যভূষণসহ বহু অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিলেন।

"অভিনন্দনাবসরে যে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার বর্ণনাকালে একটি ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথা বাদ দেওয়া চলে না। একজন সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা বৃদ্ধা মহিলা সেই ভিড় ঠেলিয়া স্বামীজীর গাড়ির নিকটে আসিলেন —উদ্দেশ্য এইভাবে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি স্বীয় পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবেন, কারণ তাঁহার মতে স্বামীজী ছিলেন (অন্যতম শৈব মহাপুরুষ) সম্বন্ধ-মূর্তির অবতার। সেই মহাপুরুষকে সেদিন সকালে কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ও ধর্মভাব লইয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল, তাহাই বুঝাইবার জন্য আমরা এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। সত্য বলিতে কি, চিন্তাদ্রিপেটে এবং অন্যত্র তাঁহাকে কর্পূরারতি করা হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে ঐ বাড়ির পুরললনারা দেবমূর্তির সম্মুখে যেরূপ ধূপ, দীপ ও পুষ্পাদিদ্বারা আরতি করা হয় তেমনিভাবে আরাত্রিকসহকারে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ভক্তদের প্রদত্ত পূজা ও উপঢৌকনাদি স্বীকারের জন্য স্বভাবতঃই শোভাযাত্রাকে পুনঃপুনঃ থামিতে হইয়াছিল এবং সেজন্য উহার গতি ছিল মন্থর, অতিমন্থর। সুতরাং স্বামীজী সাড়ে নয়টার পূর্বে ক্যাসল কার্নানে পৌছিতে পারেন নাই। বিচের (সমুদ্রসৈকত-পার্শ্ববর্তী রাস্তার) মোড়ে আবার ছাত্রগণ তাঁহার গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া অতি উৎসাহভরে নিজেরাই উহা টানিয়া চলিল। ক্যাসল কার্নানে তিনি উপস্থিত হইলে মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারিয়ার, বি. এ., বি.এল. মহাশয় 'মাদ্রাজ বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী সভার' পক্ষ হইতে একটি সংস্কৃত ভাষণ

পাঠ করিলেন। ইহার পরে কানাড়া-ভাষায় ভাষণ পঠিত হইল। এই উৎসবের শেষে বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয় সমাগত ব্যক্তিগণকে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে পথশ্রমের পর স্বামীজী একটু বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। ক্যাসল কার্নানের উপর তলায় একটি সুন্দর বিশাল কক্ষ স্বামীজীর বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

"সুপ্রাচীন কাল হইতে মাদ্রাজে আর কখনও কেহ এভাবে কোন দেশীয় বা ইওরোপীয় ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানাইতে দেখে নাই। সরকারীভাবে যত অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল, তাহার কোনটিই স্বামী বিবেকানন্দের সংবর্ধনার সমকক্ষ নহে; মাদ্রাজের বৃদ্ধতম ব্যক্তিও এইরূপ সাদর সম্ভাষণের কথা স্মরণ করিতে পারেন না এবং আমরা সাহসভরে বলিতে পারি আজিকার দৃশ্যাবলীর স্মৃতি বর্তমান বংশের চিত্তে চিরকাল দৃঢ়াঙ্কিত থাকিবে।"

মাদ্রাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্রগুলি ও স্বামীজীর বক্তৃতাবলী যাহাতে সুনির্দিষ্টরূপে প্রদত্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে নগরের জননেতাগণ শীঘ্রই পরামর্শক্রমে একটা কার্যধারা স্থির করিলেন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, মাদ্রাজের জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রদেয় অভিনন্দন ও উহার উপর স্বামীজীর উত্তরই প্রথম স্থান পাইবে। ইহার পরে আরও চারিটি সভায় চারিটি বক্তৃতা অবলম্বনে স্বামীজী স্বীয় বক্তব্যের বিস্তার ও ব্যাখ্যা করিবেন, স্বদেশ ও বিদেশের নিকট প্রদেয় তাঁহার বাণী সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবেন এবং সমসাময়িক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণের জন্য কিরূপ পথ অনুসরণ করা উচিত তাহা বুঝাইয়া দিবেন। তাঁহার ভাষণের বিষয়গুলি এইরূপ নির্বাচিত হইয়াছিল:

১। আমার সমরনীতি

২। ভারতীয় মহাপুরুষগণ

৩। জাতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা

৪। ভারতের ভবিষ্যৎ

স্বামীজী এই কার্যক্রম অনুমোদন করিলেন। এতদ্ব্যতীত ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' (অথবা 'আমার ভারতীয় কার্যের কয়েকটি দিক') সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে তিনি সম্মত হইলেন। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টাতেই স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়া-

ছিলেন। তিনি চেন্নাপুরী অন্নদান-সমাজম-এর বাৎসরিক অধিবেশনেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিয়াছিলেন। মাদ্রাজ সোশ্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের কার্যভবন দর্শনকালেও তিনি কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন। এইসকল বক্তৃতা ছাড়াও তিনি ক্যাসল কার্নানে দুই দিন সকাল বেলা আগন্তুকদের সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। স্বামীজী যে নয় দিন মাদ্রাজে ছিলেন, সেই দিনগুলিতে যেন নবরাত্রির উৎসব চলিয়াছিল —এমনি বিপুল ছিল লোকসমাগম, ধুমধাম, অভিনন্দন ও বক্তৃতা। ইংরেজী, সংস্কৃত, তামিল, কানাড়া ও তেলেগু ভাষায় তাঁহাকে মোট চব্বিশটি অভিনন্দন দেওয়া হয়।

মাদ্রাজে স্বামীজীর কার্যাবলী সম্বন্ধে আমরা শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার মহাশয়ের স্মৃতিলিপি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ৮২-১০৪)। আমেরিকা যাইবার পূর্বে স্বামীজী ত্রিবান্দ্রমে ইঁহারই গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন :

স্বামীজী যেদিন (অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুআরি) মাদ্রাজে পৌঁছিলেন, "সেই দিনই সন্ধ্যায় অথবা পরদিন দ্বিপ্রহরে (আমার ঠিক মনে নাই, খুব সম্ভবতঃ পরদিন) অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া ও আমার ইচ্ছা হইল, স্বামীজীর কণ্ঠে একটু গান শুনিব, কারণ এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। আমরা 'অষ্টপদী' গাহিতে বলিলাম। তখন বাহিরের লোকের সঙ্গে স্বামীজীর কোন কাজ ছিল না এবং আবশ্যক বিশ্রামলাভের পর তাঁহার মেজাজ অতীব মধুর ও শান্ত ছিল ; তিনি তখনই সম্মত হইলেন। তিনি অতি সুমিষ্ট-কণ্ঠে এবং এতদঞ্চলে অশ্রুত অথচ যথোপযুক্ত সুরে জয়দেবের একটি গান গাহিলেন। সেদিন স্বামীজী আমাদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে, তাঁহার বহুমুখ ও উচ্চভূমিসঞ্চারী অলৌকিক ব্যক্তিত্বের এক অত্যুন্নত স্তরে তিনি সেদিন আমাদের নিকট আপনাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। আমি এখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে পারি যে, তাঁহার প্রথম দিন ক্যাসল কার্নানে আগমন হইতে শেষদিন পর্যন্ত নগরের সর্বশ্রেণীর নরনারী সর্বদা তাঁহার বাসস্থানে ভিড় জমাইয়া রাখিত। সমাজের উচ্চ ও সম্মানিত পরিবারের অন্তর্ভুক্তা, পথচলনে অনভ্যস্তা ও অন্তঃপুরচারিণী বহু মহিলা এমনভাবে সেখানে আসিতেন যেন, তাঁহারা দেবস্থানে উপস্থিত হইতেছেন।...লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল

যে, তিনি (শৈব মহাপুরুষ) সম্বন্ধ-স্বামীর (বা সম্বন্ধ-মূর্তির) অবতার, আর সাধারণ লোকেরা উহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। তাঁহার দর্শন ও গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য যাহারা অপেক্ষা করিত, তাহারা যখনই তাঁহাকে ক্যাসল কার্নানের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে দেখিত, তখনই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত; তিনি কোন সভাস্থলে যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিবার উদ্দেশ্যে যখন তাহাদের পার্শ্ব দিয়া যাইতেন, তখন সকলে একসঙ্গে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত।...

"স্বামীজীর আগমনের তৃতীয় দিন (৮ই ফেব্রুআরি) যখন তাঁহার মাদ্রাজ-অভিনন্দন গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল, তখন অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় তিনি ক্যাসল কার্নান হইতে বাহির হইলেন। সেদিন সকলেরই হৃদয় উচ্চ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ছাত্রগণের সকলেরই মনে যে আগ্রহ জন্মিয়াছিল উহার তীব্রতা কল্পনাতীত ছিল। ভিক্টোরিয়া হলে ও উহার দিকে যত রাস্তা বা গলি গিয়াছে সেই সমস্ত স্থানে যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, তাহা কথায় প্রকাশ করা বা উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। নির্দিষ্ট স্থানাভিমুখে গমনের পথে স্বামীজীর গাড়ি চলিবার মতো স্থানই পাইতেছিল না। স্বামীজীর কৃপাপূর্ণ আদেশানুসারে আমি ও অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া স্বামীজীরই গাড়িতে উঠিয়াছিলাম। আমরা গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হলের সম্মুখে সমবেত বিরাট জনতার সর্বত্র তুমুল রব উঠিতে লাগিল 'খোলা জায়গায় সভা হউক'। আগে হইতে ব্যবস্থা ছিল যে, হলের ভিতরেই স্বামীজীকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইবে। হলটিতে আর তিলধারণেরও স্থান ছিল না। স্যার ভি. ভাষ্যম আয়েঙ্গার ইতোমধ্যেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী মঞ্চোপরি তাঁহারই পার্শ্বে বসিলেন এবং শ্রীযুক্ত এম. ও. পার্থসারথি আয়েঙ্গার অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল স্বামীজীর উপর এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।...এদিকে বাহিরে 'খোলা সভা হউক' ধ্বনি অবিরাম উঠিতে থাকায় ভিতরের কার্যে বিঘ্ন ঘটিতেছিল।...ইহা স্বামীজীর হৃদয় স্পর্শ করিল এবং তিনি যে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি ইহাও বলিলেন যে, আগ্রহ ও উৎসাহ লইয়া যে অগণিত যুবকগণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তিনি তাহাদিগকে নিরাশ করিতে পারেন না। স্বামীজী ও তাঁহার শ্রোতারা (হলের) বাহিরে আসিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দণ্ডায়মান

সেই জনসমুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন, আর অমনি স্বামীজীকে নিজেদের সম্মুখে দেখিয়া তাহারা আনন্দ ও হর্ষপ্রকাশে মত্ত হইয়া তুমুল শব্দ করিয়া উঠিল। শীঘ্রই স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন যে, জনতার কোলাহল ও আনন্দরব এমনই প্রচণ্ড যে, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি নিকটবর্তী কয়েকজনকে ছাড়াইয়া দূরে প্রসারিত হওয়া অসম্ভব।...তিনি মাদ্রাজের একখানি অশ্ব-যানে চড়িয়া—তাঁহারই ভাষায় বলিতে গেলে—'গীতার ভঙ্গীতে' বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন দেখিয়া যাহারা শুনিতে পাইল তাহারা উল্লসিত হইল।...বিশাল জনতার মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং তাহাদের উচ্চরব ও হর্ষধ্বনি এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল যে, স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ছাপাইয়া গেল। অগত্যা তিনি সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করিলেন; তথাপি ইহারই মধ্যে হিন্দুধর্মের মূল তথ্যগুলি বলিতে ভুলিলেন না।...কিন্তু বেশী বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না; সুতরাং তিনি শ্রোতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন এবং সকলকে অনুরোধ করিলেন, তাহাদের উৎসাহ যেন মন্দীভূত না হয় এবং তিনি ভারতের জন্য যেসব মহৎ কার্য সাধন করিতে অভিলাষী এবং এই অতিবৃহৎ জাতিকে পুনরুদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি যেসব পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহার সার্থকতার জন্য তিনি তাহাদের নিকট যত প্রকার সাহায্য চাহিবেন তাহারা যেন তাহা প্রদান করে।

"প্রথম ভাষণের বিষয় ছিল, 'আমার সমরনীতি'।...তাঁহার মাদ্রাজে আসার চতুর্থ দিনে, ৯ই ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ঐ বক্তৃতার আয়োজন হয়। ঐ দিনই সকালে তিনি ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে বক্তৃতা দেন। আমি ঐ বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম না; অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে ঐ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তিনি যখন ১০ই ফেব্রুআরি বুধবারে সোশ্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন দেখিতে যান, তখনও আমি উপস্থিত ছিলাম না। তবে ওখানে কি ঘটিয়াছিল, আমি তাহা স্বামীজীর নিকট জানিতে চাহিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে, তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই বলেন নাই; তবে তিনি স্বয়ং সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও উক্ত সমিতির প্রধান প্রধান সভ্যদের মনে অস্পৃশ্যতাবর্জন এবং জাতিভেদের প্রাচীন ভিত্তির পুনঃ-প্রবর্তনের জন্য উহার পুনরুজ্জীবন বা পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে যেসব আমূল পরিবর্তনকারী

ধারণা ছিল, তিনি হয় ঐ সব বিষয়ে অল্পই উৎসাহ দিয়াছিলেন কিংবা মোটেই দেন নাই।

"আর অগ্রসর হইবার পূর্বে আমাকে একটু পিছনে ফিরিয়া ৮ই ফেব্রুআরির কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করিতে হইবে। আমার তারিখগুলি জানা আছে এবং যতদূর সম্ভব আমি আমার স্মৃতি অবলম্বনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য রক্ষায় যত্নপর হইব। অধ্যাপক পি. লক্ষ্মী নারাসু মহাশয়কে আমি সর্বদাই একজন সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ভদ্রলোক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি প্রায় দ্বিপ্রহরে স্বর্গীয় এন. কে. রামস্বামী আয়ার মহাশয়ের সহিত ক্যাসলে আসিলেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারাসু ছিলেন বিজ্ঞানানুরাগী ও খোলাখুলিভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাঁহার সহগামীকে আমি চিনিতাম না। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, 'দি অ্যাওয়েকেনার অব ইণ্ডিয়া' (ভারতের জাগরণকারী) নামক যে সাময়িক পত্র কতকটা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত এবং পরে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ নারাসু) ছিলেন উহার সম্পাদক ও প্রধান (অথবা একমাত্র) লেখক, আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক ছিলেন উহার প্রকাশক। কিছুকাল পূর্বে স্বামীজীর আনুকূল্যে অথবা তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে 'অ্যাওয়েকেণ্ড ইণ্ডিয়া' (প্রবুদ্ধ ভারত) নামক মাসিক পত্র (মাদ্রাজে) প্রকাশিত হইয়াছিল।" নারাসুর মনে ভয় হইয়াছিল, পত্রের এই নাম (প্রবুদ্ধ ভারত) পড়িয়া লোকের ভুল ধারণা হইবে যে, ভারত সত্যই জাগিয়া উঠিয়াছে; অতএব এই কাল্পনিক ভ্রমের খণ্ডনেরই জন্য নারাসুর নিজের পত্রখানির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। স্পষ্টই মনে হয়, স্বামীজীর নিকট আগত এই দুই ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকায় স্বামীজী যে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন ও যেসব কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক সাময়িক পত্রদ্বয় প্রকাশ করিয়া মাদ্রাজে যে প্রচারকার্য চলিতেছিল, তাহাতে তখন পর্যন্ত নূতন কর্মোদ্যমের প্রেরণার সূত্রপাত হয় নাই এবং যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভারত যে নিদ্রালস্যে নিমগ্ন ছিল, তখনও তেমনি রহিয়াই গিয়াছিল; আর তাঁহাদের 'অ্যাওয়েকেনার অব ইণ্ডিয়া' যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত উহা জনগণের উজ্জীবনে অত্যুজ্জ্বল অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ব্ল্যাভাটস্কির লেখনীমুখে থিওসফিস্টদের মতবাদ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার বিরুদ্ধে যেসব সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ ঐ পত্রে বাহির

হইত, তাহার কিছুটা আমার এখনও মনে আছে। উপরতলায় একটি ছোট পার্শ্ববর্তী ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, আগত ঐ দুই ভদ্রলোক ও অপর আগন্তুকেরা স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন, আর স্বামীজী বসিয়া আছেন তাঁহাদের সম্মুখে একটি দেয়ালের সন্নিকটে, অথচ উহাতে হেলান না দিয়া আচার্যোচিত ব্যাখ্যানাসনে। নিজের অজেয় শক্তি ও মতবাদ সম্বন্ধে নিশ্চিত ব্যক্তি যেমন শান্ত ও নীরব থাকে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারাসু তেমনি ভাবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সহগামী আমাদের সকলেরই নিকট তাঁহার জীবনের পরবর্তী কার্যাবলীর জন্য সুপরিচিত হইয়াছিলেন। আমি যখন ঐ কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলাম, তখন তিনি বলিতে ছিলেন, 'স্বামীজী, আমরা চাই যে আপনার সহিত দর্শন ও ধর্মের সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে আমাদের যে ঘোর আপত্তি আছে—ঐ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করি। এজন্য আপনি কখন আমাদের সময় দিতে পারেন?' স্বামীজী আমাকে ডাকিয়া পার্শ্বে বসিতে বলায় আমি বসিলাম। অমনি তিনি তাঁহার সুপরিচিত স্মিতহাস্তে মুখখানি সমুজ্জ্বল করিয়া বলিলেন, 'এই যে আমার বন্ধু সুন্দররামন আসিয়া পড়িয়াছেন; ইনি আজীবন বেদান্তবাদী এবং ইনি আপনার সব যুক্তির উত্তর দিবেন। আপনি ইঁহাকে বলিতে পারেন।' ইহাতে এন. কে. রামস্বামী আয়ারের ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তিনি অবজ্ঞা বা ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন। অতঃপর আবার স্বামীজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমরা এখানে আপনার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি, অপর কাহারও সহিত নহে।' স্বামীজী অবশ্য নিরুত্তর রহিলেন; ইত্যবসরে অপর অনেকে আসিয়া পড়িলেন, আলোচ্য বিষয়ও পরিবর্তিত হইয়া গেল। স্বামীজী যেখানে ছিলেন, সেখানেই আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আমি বাহিরে চলিয়া গেলাম, অতএব পরে কি ঘটিল জানি না।...

"সেই দিনই অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় সালেম জেলার তিরুপ্পাতুর (ঐ স্থান পরে উত্তর আর্কটে সংযুক্ত হয়) হইতে এক প্রতিনিধি দল স্বামীজীর নিকট আসিলেন; আমার যতদূর মনে পড়ে, স্বামীজী পূর্বোক্ত কক্ষেই উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন শৈব এবং সংখ্যায় ছিলেন পাঁচ ছয় জন। তাঁহাদের কেহই ব্রাহ্মণ ছিলেন না।...স্বামীজী ছিলেন অদ্বৈতবাদী; তাই মনে হয়, তিরুপ্পাতুরের প্রতিনিধি দলটিকে মতলব করিয়াই এমনভাবে

প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যাহাতে তাহারা সেই পুরুষসিংহের নিকট তাঁহারই স্বগৃহে প্রতিস্পর্ধা জানাইতে পারে এবং অদ্বৈতবাদের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতে পারে। দলের নেতার হস্তে ছিল প্রশ্নে পরিপূর্ণ একখানি গোটা কাগজ এবং তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, তিনি উত্তর দাবি করেন। স্বামীজী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিতে বলিলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল: 'অব্যক্ত কিরূপে ব্যক্ত হইলেন?' স্বামীজীর ত্বরিত উত্তর আসিল এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া; কিন্তু উহা আসিল নীলাকাশের ঊর্ধ্বদেশ হইতে বিক্ষিপ্ত বজ্রেরই ন্যায় এবং শত্রুপক্ষের উপর এমনই ভাবে পড়িল যে, তাহাদের দেহ অসাড় এবং স্নায়ুমণ্ডলী নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল।...স্বামীজীর উত্তর ছিল: 'কিরূপে, কেন, কোন যুক্তিতে ইত্যাদি প্রশ্ন ব্যক্ত জগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু সর্ববিক্রিয়াতীত ও কারণাতীত বলিয়া যে অব্যক্ত চিরপরিবর্তনশীল জগতের সহিত এবং তন্মধ্যস্থ সাংসারিক (জন্ম-মৃত্যুর অধীন) জীবনের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধশূন্য, তাঁহার বিষয়ে উঠিতে পারে না। অতএব যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রশ্নটি উত্থাপন করাই অসম্ভব। যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলুন—অপেক্ষাকৃত যুক্তিসম্মতভাবে জিজ্ঞাসা করুন—আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।' এই উত্তরের ফলে আলোচনা-স্রোত বন্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার প্রশ্নকারীরা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা এমন এক ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন যিনি সর্বপ্রকার দার্শনিক গোলক ধাঁধা ও প্রশ্নাবলীর সমাধান করিতে সক্ষম আর তিনি এমন একজন আচার্য—যাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষা তাঁহার নিকট বিনম্রভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে অবনত হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা সযত্নে যে বিচারপদ্ধতি ও প্রশ্ননিচয় লিখিয়া সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা যেন ভুলিয়াই গেলেন, তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট যাদুকরের কাঠির স্পর্শ যেন তাঁহাদের গায়ে লাগিল এবং তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও বিজয়ী মুষ্টির মধ্যে তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়া স্বীয় যাদুমন্ত্রে তাঁহাদের মন ও চিত্তগুলিকে মোহিত করিতে থাকিলেন। অবস্থাটি বুঝিতে স্বামীজীর বিলম্ব হইল না। তাহার পর যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ভারতীয় তর্কযুদ্ধের সর্বপ্রকার অস্ত্র ও কৌশলের প্রয়োগে পারঙ্গম এই বেদান্ত-কেশরী—তাঁহার শত্রুমথনকারী চলন-বলন ও গর্জন, তাঁহার ত্রাসসঞ্চারী বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি এবং তাঁহার নিম্ন-চিবুক (যাহা তিনি আমার

নিকট এক সময়ে যোদ্ধভাবের দ্যোতক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন) এই সমস্তই সংবরণ করিয়া অকস্মাৎ এমন এক মূর্তি ধারণ করিলেন যেন তিনি সকলের দীর্ঘ-দিনের হারানো কৈশোরের সখারূপে অথবা বহুকালের বিচ্ছেদের পর পুনর্লব্ধ স্নেহময় ভ্রাতারূপে তাঁহাদের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছেন। আর যেন তিনি সকলের মঙ্গলসাধনে সর্বান্তঃকরণে আগ্রহশীল। অতঃপর সেখানে যত লোক উপস্থিত ছিলেন এবং যে কেহ তাঁহার বাণী শুনিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলের জন্য এমনভাবে ও এমন সুরে কথা বলিতে লাগিলেন, যাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি অনেকটা এই সব কথা বলিয়াছিলেন : ভগবদনুসন্ধানের ও ভগবদুপাসনার সর্বোত্তম উপায় হইল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সেবা—বুভুক্ষুকে আহার প্রদান, দুঃখিতকে সহানুভূতি প্রদর্শন, পতিত ও বন্ধুহীনকে সাহায্য করা, পীড়িত ও দুর্বলদের শুশ্রূষা ইত্যাদি কার্য। প্রতিনিধিগণ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।...ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতে থাকিলে তাঁহারা তাঁহার পাদপদ্মে শ্রদ্ধানিবেদন করিলেন। এবং যখন তাঁহারা বিদায় লইলেন তখন তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে, এক নবালোক তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে এবং তাঁহাদের জীবন ও কর্মে এক নবীন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে।

"এখন আমরা তাঁহার মাদ্রাজের দ্বিতীয় বক্তৃতার কথায় আসি। ডাঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের বিশেষ অনুরোধে আমি তাঁহার লুজ চার্চ রোডের বাড়িতে ঐদিন সকালে মিলিত হইলাম। উপর তলায় একখানি ঘরে আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। স্বামীজী আমাদিগকে তাঁহার কার্যধারা বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি ভারতে এমন একটি বিরাট ধর্মসংস্কার ও অধ্যাত্ম-জাগরণ আনিতে চান যাহা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ও অপর সকলকে ভ্রাতৃভাবে একই পতাকানিম্নে সম্মিলিত করিবে এবং সকলকে একই জাতীয় আদর্শে পৌছাইতে যত্নপরায়ণ করিবার জন্য অনন্ত প্রেরণার উৎস হইবে।...

"আয়ার মহাশয় স্বামীজীর জন্য প্রচুর লাড্ডু ও অন্যান্য মিষ্টান্ন এবং মশলাদার বহু খাদ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্বামীজী উহা নামে মাত্র গ্রহণ করিলেন। অবশ্য একান্ত অবর্জনীয় কফিও ছিল ; তিনি দুই-এক চুমুক দিয়াই রাখিয়া দিলেন। স্বামীজী বোধ হয় কোন দিনই ভূরিভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন না—অন্ততঃ আমি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখি নাই। তিনি যখন ত্রিবাঙ্কুরে

আমার বাড়িতে ছিলেন, তখন দিনের বেলায় একবার স্বল্প আহার করিতেন এবং রাত্রে সামান্য দুধ খাইতেন।

"ক্যাসলে বলিবার মতো কোন ঘটনা দেখি নাই। অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও অবিরাম দর্শনার্থী আসিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয়া ভদ্রমহিলারাও স্বামীজীর পাদপূজা করিতে ও তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিতে অবিরাম আসিতেছিলেন। আগন্তুকদের মধ্যে কোয়েম্বাটোরের একটি যুবকও ছিল। সে লংম্যান কোম্পানির প্রকাশিত স্বামীজীর রাজযোগ পড়িয়াছিল এবং উহাতে লিখিত পদ্ধতি অনুসারে কিঞ্চিৎ সাধনাও করিয়াছিল। সে নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলিতে লাগিল এবং জানাইল যে, সে বোধ করে, তাহার শরীর যেন ক্রমেই হালকা হইয়া যাইতেছে। সে স্বামীজীকে ইহাও বলিল যে, তাহার কয়েকজন বন্ধু, বিশেষতঃ পণ্ডিতগণ তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, ভ্রমস্থলে উপযুক্ত গুরুর উপদেশ গ্রহণ না করিয়া এবং তাঁহার সাহায্যে উহা সংশোধন না করাইয়া অথবা যোগাভ্যাসকালে কোন্ সাধনার পর কোন্ সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে ইত্যাদি না জানিয়া যদি সে যোগাভ্যাস করিতে থাকে তবে বিপদ ঘটার, এমন কি পাগল হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বামীজী তাহাকে বলিয়া দিলেন, সে যেন অপরের কথায় বিভ্রান্ত হইয়া সমাধিরূপ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করে।...

"সন্ধ্যাকালে স্বামীজী 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় ভাষণ দিলেন। ভিক্টোরিয়া হলে আর লোকপ্রবেশের স্থান ছিল না। এই দিনের সভায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, 'মাদ্রাজ মেলের' সম্পাদক স্বর্গীয় ব্র্যাম্প মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার মধ্যেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম (তবে হয়তো ইহা কাকতালীয় ন্যায়ে ঘটিয়াছিল), ব্র্যাম্প যখন উঠিয়া যাইতেছিলেন ঠিক তখনই স্বামীজী গোপীগীতার এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছিলেন:

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥[১]

১। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।১৪

"১২ই ফেব্রুআরি শুক্রবারে আমি দুইবার স্বামীজীকে দর্শন করি। সকাল-বেলা ক্যাসল কার্নানে খাটানো শামিয়ানা লোকে লোকারণ্য ছিল; আর স্বামীজী আসিয়া যখন মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইলেন, তখন জনতা উৎসাহে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। আমেরিকায় তাঁহাকে যেসব প্রশ্ন করা হইত, তিনি কিরূপে উহার উত্তর দিতেন, কিরূপ বিদ্যুৎ-ঝলকপ্রায় উত্তর আসিয়া শ্রোতৃবর্গকে তাঁহার অপূর্ব ধীশক্তি এবং জীবন ও বিশ্বের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গভীর অনুভূতির কথা বুঝাইয়া দিত, আর যেসব বিরুদ্ধবাদী তাঁহাকে কোণঠাসা করিতে বা জব্দ করিতে আসিত, তাঁহার বিদ্রূপাত্মক প্রত্যুক্তি কিরূপে তাহাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিত, এই সব বিষয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। এখানে তাঁহার তর্কের অসিচালন এবং সদিচ্ছাপূর্ণ জিজ্ঞাসুর প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করার বেশ সুযোগ পাইয়াছিলাম। আর সম্মুখে ছিল এক বৃহৎ ও গুণগ্রাহী শ্রোতৃমণ্ডলী। তাঁহার সাফল্য আশানুরূপই হইয়াছিল; তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে এই বিষয়ে এখন সাহায্য করিতে অপারগ, বিশেষতঃ সেদিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে।" সেদিন একজন ইংরেজ মহিলা স্বামীজীকে বেদান্ত বিষয়ে বহু প্রশ্ন করেন এবং বলেন যে, তিনি শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরিয়া বস্তীবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। স্বামীজী তাঁহার বিদায়ের সময় নিজে উঠিয়া ভিড়ের মধ্যে পথ করিয়া দেন এবং ঐ মহিলা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকেন। অপরাহ্ণে ঐ মহিলা তাঁহার পিতাকে লইয়া আবার আসিয়া স্বামীজীর সহিত এক ঘণ্টা আলাপ করেন। শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার ঐ অতিথিদ্বয় চলিয়া যাইবার পর যখন স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি এত পরিশ্রম করার মতো শক্তি পান কিরূপে, তখন স্বামীজী উত্তর দেন, "ভারতে আধ্যাত্মিক কার্যে কেহ ক্লান্তিবোধ করে না।"

মাদ্রাজে স্বামীজীকে দর্শন করিতে যেসব অগণিত নরনারী আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের কথা বলা আবশ্যক। দক্ষিণ দেশের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র তিরুপতি হইতে আগত আগমবাদী বৈখানস-সম্প্রদায়-ভুক্ত একজন বৃদ্ধ স্বামীজীর গলে মাল্য প্রদানান্তে পদযুগল ধারণপূর্বক সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'ইনি স্বয়ং বিখানস।' এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিখানসকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহারা কর্মযোগেরও বিশেষ অনুরাগী এবং

ঐ বিষয়ে আলোচনাও করেন। কিন্তু ইনি স্বামীজীর মুখে কর্মযোগের ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আজন্ম কর্মযোগ ও বৈখানস পদ্ধতির মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছি বটে, তথাপি আপনি উহার তত্ত্ব অনেক বেশী অবগত আছেন।" শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ারের পুত্র শ্রীযুক্ত রামস্বামী শাস্ত্রী তখন বি. এ. পাস করিয়া মাদ্রাজে বি. এল. পড়িতেন এবং সর্বদাই স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি মাদ্রাজের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। একদিন এক প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত হঠাৎ আগন্তুকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলাম আপনি ব্রাহ্মণ নন; আর শাস্ত্রানুযায়ী আপনার সন্ন্যাসগ্রহণ চলে না। আপনি কি করে তাহলে গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করলেন এবং সন্ন্যাসীদের পবিত্র সঙ্ঘে প্রবেশ করলেন?" এরূপ ব্যক্তির সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া অযৌক্তিক জানিয়া স্বামীজী তাঁহাকে নীরব করিবার জন্য বলিলেন, "প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করতে বসে যে চিত্রগুপ্তের নিকট প্রার্থনা করে থাকেন, আমি তাঁরই জাতে জন্মেছি। অতএব ব্রাহ্মণদের যদি সন্ন্যাসে অধিকার থাকে তো, আমার অধিকার ততোধিক।" স্বামীজী তারপর পালটা আক্রমণ করিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "আপনার সংস্কৃত প্রশ্নে এমন একটা ভুল উচ্চারণ ছিল, যা অমার্জনীয়। 'ন ম্লেচ্ছিতং বৈ নাপভাষিতং বৈ' এই কথা বলে পাণিনি এর নিন্দা করেছেন। অতএব এইরূপ আলোচনায় আপনার অধিকার নেই।" পণ্ডিত দেখিলেন সুবিধা হইতেছে না, আর শ্রোতারা স্বামীজীরই পক্ষপাতী, অতএব তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতিলিপি হইতে আরও একটি মজার ঘটনা জানিতে পারা যায়। জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে কোনও এক কূট প্রশ্ন তুলিলেন। স্বামীজী ধৈর্যসহকারে শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে ইংরেজীতে বলিলেন, মতবাদ সম্বন্ধীয় যেসব কূটকচালে বিষয়ের সহিত জীবনসমস্যার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, সেইসব লইয়া তিনি বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করিতে চান না। পণ্ডিত তবু স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন, "আমাকে স্পষ্ট করে বলুন, আপনি দ্বৈতবাদী, না অদ্বৈতবাদী।" স্বামীজী আবার ইংরেজীতে বলিলেন, "পণ্ডিতজীকে বলে দাও, যতক্ষণ আমার দেহ আছে ততক্ষণ আমি দ্বৈতবাদী, তারপর আর নয়। যে সমস্ত বৃথা ও অপকারী তর্ক ও সমস্যার জালে পড়ে মন শুধু বিভ্রান্ত হয় এবং মানুষ জীবনকে

দুঃখপ্রদ মনে করে ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিক হয়ে পড়ে তা রুদ্ধ করা বিষয়ে সাহায্য করারই জন্য আমি এই শরীর ধারণ করেছি।" পণ্ডিত তখন তামিল ভাষায় বলিলেন, "স্বামীজীর কথা তাঁকে অদ্বৈতবাদী বলে প্রতিপন্ন করছে।" স্বামীজী প্রত্যুত্তর দিলেন, "তাই হোক।" ব্যাপারটি ওখানেই থামিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচিত শ্রীযুক্ত আর. ভি. শ্রীনিবাস আয়ার রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন এবং ইঁহার সহিত তিনি স্বামীজীর আগমন-দিবসে এগমোর স্টেশনে গিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আয়ারের মনে পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ছিল। তিনি পূর্বোক্ত দিনেরই বৈঠকে স্বামীজীকে সুন্দররাম আয়ারের দ্বারা প্রশ্ন করাইলেন: "আমাদের যখন পূর্বজন্মের কোন স্মৃতি নাই, তখন কর্মফলবাদ বা জন্মান্তরবাদে এমন আস্থা আসিতে পারে কিরূপে, যাহাতে বাস্তব জীবনে তাহার প্রভাব ও তাৎপর্য থাকিতে পারে? আর কেমন করিয়াই বা উহা চিন্তা ও কার্যে পবিত্রতালাভের প্রেরণা যোগাইতে পারে এবং ঐরূপে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ-পূর্বক সংসার হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির প্রচেষ্টার উদ্ভব হইতে পারে?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "এ জীবনেও ঘটনাবলীর স্মৃতি অবিরাম চলিতে থাকে না, অথচ আমরা এমনভাবে দৈনন্দিন ক্রিয়াদি করিয়া থাকি যেন ঐগুলি কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হইয়া আমাদের জীবন ও ভবিষ্যৎকে নিয়মিত করিতেছে। অতীত জন্মের ও বর্তমান জন্মের ঘটনাবলীর মধ্যে অনুরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া কেন আমরা চলিব না আর কেনই বা সংসার হইতে ও সংসারের অতীত ও বর্তমান দুঃখ-রাশি হইতে উদ্ধারের যে সকল উপায় বেদ ও গুরুমুখে শোনা যায় তাহার অনুসরণ করিব না?" আবার প্রশ্ন হইল, "জীবনের বিভিন্ন স্তর ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া অতিক্রম করার কালেও এজীবনে আমাদের নিজ ব্যক্তিত্বের অভেদ সম্বন্ধে একটা বিচ্ছেদহীন জ্ঞান বর্তমান থাকে; কিন্তু অতীত ও বর্তমান জীবনের ব্যক্তিত্বের অভেদ সম্বন্ধে এইরূপ কোন জ্ঞান থাকিতে তো দেখা যায় না।" উত্তর আসিল, "বিশেষ বিশেষ সুপরিজ্ঞাত সাধনা অবলম্বনে আমরা বিভিন্ন জীবনের (ভেদ সত্ত্বেও তন্মধ্যে) আমাদের এই ব্যক্তিত্বের অভেদজ্ঞান অর্জন করিতে পারি। তুমি চেষ্টা কর না কেন?"

সুন্দররাম আয়ার আরও লিখিয়াছেন: (১২ই তারিখ) "দ্বিপ্রহরে একটার

সময় আবার স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাইলাম। তখনও দর্শনার্থীরা পূর্ববৎ আসা-যাওয়া করিতেছিলেন। অবশেষে মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত কে. পি. শঙ্কর মেনন আসিলেন; ইনি পরে ত্রিবান্দ্রম হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। মনে হইল ইনি স্বামীজীকে পূর্ব হইতেই জানিতেন। স্বামীজী ও তিনি একই সোফায় পাশাপাশি বসিয়াছিলেন, আমি সামনে বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিলাম। মালাবারের লোকেরা স্পর্শদোষ ও উহার প্রতিকার বিষয়ে যেসব বাড়াবাড়ি করে এবং রাজপথ ও গলিপথে চলার সময়ে অচ্ছুতদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য যেসব চেঁচামেচি করে, স্বামীজী ঐসব বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি মালাবারের জাতিবিভাগ ও বিবাহপ্রথার কথা তুলিয়া বলিলেন যে, নায়ারদের আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ণ অধিকার আছে, কারণ বহু শতাব্দী বা যুগযুগান্তর ধরিয়া নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা নায়ার নারীদের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ করিয়া আসিতেছেন।…ঠিক তখনই শ্রীযুক্ত (পরে স্যর) সি. শঙ্করন নায়ার হলে প্রবেশ করিলেন। ইনি এই কালমধ্যেই মাদ্রাজের উকিল ও রাজনীতিবিদ নেতা হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর দিকে অগ্রসর হইলে সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত শঙ্কর মেনন সরিয়া গিয়া অন্য স্থানে বসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শঙ্করন নায়ারকে তাঁহার জায়গায় সোফায় বসান হইল। শ্রীযুক্ত মেনন তাঁহাকে স্বামীজীর পূর্বোক্ত মত জানাইলে বুদ্ধিমান নায়ার এই বিবাদাস্পদ সামাজিক বিষয়ে একেবারে চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। তিনি কয়েক মিনিট মাত্র কথাবার্তা বলিয়া মেনন মহাশয়ের সহিত চলিয়া গেলেন।

"পরদিবস ১৩ই ফেব্রুআরি শনিবারে স্বামীজী পাচেয়্যাপ্পা হলে 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। হলটি লোকে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। আমি মঞ্চের উপরেই বসিয়াছিলাম এবং আমার পার্শ্বে ছিলেন 'হিন্দু' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রী জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বামীজী একসময়ে যুবকদের সম্বোধন করিয়া যখন বলিলেন যে, শুধু 'গীতা গীতা' বলিলেই চলিবে না, নিজেদের পেশীসমূহ সুদৃঢ় করিলে গীতার অর্থ স্পষ্টতর হইবে, তখন আয়ার মহাশয় তামিল ভাষায় পার্শ্ববর্তীদের বলিলেন, 'আমিও একথা কতবারই বলিয়াছি, কিন্তু কেহই কান দেয় নাই, এখন স্বামীজী তাই বলিতেছেন, আর আপনারা বাহবা দিতেছেন।' স্বামীজী যখন শক্তি ও অভয়ের

কথা বলিতে লাগিলেন, তখন আয়ার মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিন্তু স্বামীজী যখন বলিলেন যে, জাতিভেদ জিনিসটা মানুষের প্রকৃতিসম্ভূত ও অন্য-দেশেও অন্যাকারে উহা বিদ্যমান আছে, তখন আয়ারের উৎসাহ একটু মন্দীভূত হইল।

১৪ই ফেব্রুআরি রবিবারে স্বামীজী 'ভারতের ভবিষ্যৎ'—বিষয়ে তাঁহার শেষ বক্তৃতা দিলেন। সেদিন যেরূপ জনবহুল দৃশ্য ও উৎসাহপূর্ণ শ্রোতৃসমাগম দেখিয়াছিলাম সেরূপ আর কখনও দেখি নাই। স্বামীজীর বাগ্মিতাও ছিল সর্বোত্তম—তিনি মঞ্চের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যেন সিংহপ্রায় পাদ-চারণ করিতেছিলেন। তাঁহার নিনাদধ্বনি হলের সর্বত্র প্রসারিত হইয়া অপূর্ব ফলোৎপাদন করিতেছিল। তাঁহার একটি মন্তব্য আমি কখনও ভুলিতে পারিব না, আর উহা স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিশক্তি ও সর্বজ্ঞতারই দ্যোতক ছিল: শাস্তি, ধর্ম, ভাষা, গভর্নমেণ্ট—এই সমস্ত মিলিয়াই জাতি গঠিত হয়; কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনও একটি মাত্রই ভিত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে এবং বাকি সব আমরা উহারই উপর গড়িয়া তুলি। ধর্মই ভারতীয় জীবনের মূল সুর এবং ঐ ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে।

"পরদিন সোমবার, ১৫ই ফেব্রুআরি স্বামীজী জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জাহাজ বন্দর ত্যাগের পূর্বে তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্য তাঁহার বহু অনুরাগী ও অনুগামী এবং ব্যক্তিগত বন্ধুরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রীযুক্ত তিলক স্বামীজীকে পুনা যাইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং স্বামীজীও প্রথমে যাইবার কথাই ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্রামের আবশ্যক ছিল এবং হিমালয়-সুলভ পরিবেশের জন্য তিনি সর্বদাই আগ্রহান্বিত ছিলেন। সমুদ্রসৈকতে আর্য-বৈশ্য-বংশ-সম্ভূত এবং কোমটি নামে পরিচিত বহু ব্যবসায়ী, পবিত্র মাতৃভূমির কল্যাণার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদপূর্ণ একখানি মানপত্র তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। রাজমহেন্দ্রীর মাননীয় শ্রীযুক্ত সুব্বা রাও তাঁহাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ঐ মানপত্র প্রদান করিলেন। স্বামীজী কেবল অবনতমস্তকে উহার স্বীকৃতি জানাইলেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রীতিপূর্ণ প্রশ্নাদি করিলেন। অনেকেই জাহাজে উঠিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজীর সান্নিধ্য উপভোগ করিলেন। আমিও ঐ দলে ছিলাম। আমি অনুরোধ করিলাম, স্বামীজী যেন দয়া করিয়া আমার সহিত কয়েক মুহূর্ত নিভৃতে আলাপ করেন।

তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন। আমরা কয়েক পদ অগ্রসর হইলে আমি তাঁহাকে দুইটি প্রশ্ন করিবার অনুমতি পাইলাম। প্রথম প্রশ্ন—'স্বামীজী, আমাকে ঠিক ঠিক বলুন তো, স্পষ্টতঃ জড়বাদী আমেরিকান ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের মধ্যে আপনার ব্রত উদ্‌যাপনপূর্বক আপনি কি সত্যই স্থায়ী মঙ্গলসাধন করিয়াছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'খুব বেশী নয়। আমি আশা রাখি যে, আমি ইতস্ততঃ যে বীজ বপন করিয়াছি, উহা কালে বর্ধিত হইয়া কিছু লোকের উপকার সাধন করিতে পারিবে।' দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, 'আবার কখন আপনার কার্যসাধন-ব্যপদেশে আমরা আপনাকে দক্ষিণদেশে পাইব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখিও না যে, আমি হিমালয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম উপভোগ করিব এবং তারপর দেশের সর্বত্র হিমানী-সম্প্রপাতের ন্যায় সবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িব'।"

বাংলা জীবনীর মতে প্রথম দিন মাদ্রাজ-বাসীদের অভিনন্দন পাঠের পর 'বিদ্বৎ-বৈদিক-সভা', 'মাদ্রাজ সংস্কার-সমিতি' ও খেতড়ির রাজার পক্ষ হইতেও অভিনন্দনপত্র পঠিত হয়। শেষ দিনের বক্তৃতা প্রদত্ত হয় একটি বৃহৎ শামিয়ানার নিম্নে এবং তাহাতে প্রায় চারি সহস্র শ্রোতা সমাগত হইয়াছিলেন। বিদায়ের পূর্বে স্বামীজীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, তিনি যেন মাদ্রাজেই থাকিয়া যান এবং সেখানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। স্বামীজী বলিয়া গেলেন, তাঁহার পক্ষে থাকা একেবারেই অসম্ভব, তবে ঐ কার্যের জন্য তিনি তাঁহার একজন গুরুভ্রাতাকে পাঠাইবেন।

এই অধ্যায়শেষের পূর্বে মাদ্রাজে স্বামীজীর বাণী কি প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। চিঙ্গলপেট স্টেশন হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত স্বামীজীর সহিত ট্রেনে ভ্রমণকালে 'হিন্দু' পত্রিকার সংবাদ-দাতা তাঁহার সহিত যে আলোচনা করেন, তাহাতে উল্লেখযোগ্য কথাগুলি এই: "যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৪৬১)। "সব সমাজ-সংস্কারকেরা, অন্ততঃ তাদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করেছে—আর সেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়।···নূতন ভাবে সমাজ গঠন করতে হ'লে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার।" (ঐ, ৪৬৩)। "জাতিবিভাগ

খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করতে চাই।...ভারতে এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ।...শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্যপ্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে।" "লোকদের নিজেদেরই সমাজের সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে।...এর জন্যে লোকদের শিক্ষা দিতে হবে—তাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান ক'রে নেবে। তা না হ'লে এ-সব সংস্কার আকাশকুসুমই থেকে যায়। নূতন প্রণালী হ'ল—নিজেদের দ্বারা নিজেদের উন্নতিসাধন।" "ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে—বহিঃপ্রকৃতি-জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে—অন্তঃপ্রকৃতি-জয়। তাহ'লে আর হিন্দু, ইওরোপীয় ব'লে কিছু থাকবে না; উভয়প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে।" (ঐ, ৪৬৫-৬৭)। এই সাক্ষাৎকারকালে তিনি মাদ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র স্থাপনের অভিলাষও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত হিমালয়ে বেদান্ত-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তো ছিলই। ইতঃপূর্বে মাদুরায় এক সাক্ষাৎকারকালে তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন: "অহিন্দুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জ্ঞান করে না। যেকোন ব্যক্তি—তিনি শূদ্রই হউন আর চণ্ডালই হউন—ব্রাহ্মণের নিকট পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও—তিনি যে-কোন জাতি হউন বা যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউন—সত্য শিক্ষা করা যাইতে পারে।" (ঐ, ৪৫৯)।

ক্যাসল কার্নানে অপর একজন সাংবাদিকের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন: "আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ—অপরাপর জাতির সহিত না মেশা।...পাশ্চাত্ত্যের সহিত আমরা কখনও পরস্পরের ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা কূপমণ্ডূক হইয়া গিয়াছিলাম।" (ঐ, ৪৬৯-৭০)। "আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না।...উদীয়মান যুবক-সম্প্রদায়ের উপরেই

আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব।···আমার মতে দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান হইবে।···আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন—নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি, ভগবানে বিশ্বাস করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী আমরা দিন দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইতেছি।" (ঐ, ৪৭২-৭৩)।

আমরা দেখিব, সাংবাদিকগণকে প্রদত্ত এই বাণীগুলিরই বিস্তার সাধিত হইয়াছিল তাঁহার মাদ্রাজের বক্তৃতাবলীতে; এমন কি, ভারতীয় অন্যান্য বক্তৃতাতেও ইহার পুনরুক্তি পাওয়া যায়। এই হিসাবে মাদ্রাজের ভাষণগুলি ও উক্তিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা অবশ্য এখানে জনকল্যাণার্থ স্বামীজীর কার্যপ্রণালী ও উহার ভিত্তির কথাই আলোচনা করিতেছি। শাস্ত্রীয় বিষয় ব্যাখ্যাকল্পে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে বিবেচ্য নহে। উহার বিশেষত্ব ও মৌলিকতা সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র কিছু কিছু বলিয়াছি; আরও বলিবার অবকাশ পাইব।

মাদ্রাজের অভিনন্দনের উত্তরে প্রথম দিনের অসমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন: "পৃথিবীর সকল জাতি দুইটি বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত।··· এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি জয়ী হইবে?···জীবনসংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না ঘৃণার?—ভোগের জয় হইবে, না ত্যাগের?—জড় জয়ী হইবে, না চৈতন্য জয়ী হইবে?···এই মহান্ জাতি অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার, যাহা পৃথিবীর অপর কোন জাতিকে ভোগ করিতে হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও জীবিত রহিয়াছে; কারণ এই জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে; আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?" (ঐ, ৫।৯১-৯২)।

অতঃপর প্রদত্ত বক্তৃতা 'আমার সমরনীতি'তে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে এই কয়েকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে: বক্তৃতা-প্রারম্ভে তিনি জনসাধারণের ভ্রমবিদূরণার্থ বলিলেন যে থিওসফিস্টরা ও ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিদেশে তাঁহার সাহায্য তো করেনই নাই বরং পদে পদে বাধাসৃষ্টি করিয়াছিলেন। তারপর সংস্কারকগণ তাঁহাকে দাবাইবার যে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "কতকগুলি সংস্কারসমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা

করিতেছেন", কিন্তু "এত সহজে ভয় দেখানো চলে না,…জগতের নিকট আমার কিছু বার্তা বহন করিবার আছে, আমি নির্ভয়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বার্তা বহন করিব। সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার।…তাঁহাদের প্রণালী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলা, আমার পদ্ধতি সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।…জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হইবে, কাহারও সাধ্য নাই 'এইরূপ বিকশিত হও' বলিয়া উপদেশ দিতে পারে।… সামাজিক ব্যাধি প্রতিকার বাহিরের চেষ্টাদ্বারা হইবে না—মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।…প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে।…আমাদের সমাজে যেসকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, সেগুলি বৌদ্ধধর্মকৃত।" অতঃপর স্বামীজী প্রতিমাপূজার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, উহা নিন্দনীয় নহে। সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে আরও সবল করিতে হইবে—ইহাই ছিল প্রাচীন মহাপুরুষদের কার্যপন্থা। আর চাই আত্মবিশ্বাস ও বীর্য—"আমাদের এখন আবশ্যক শক্তিসঞ্চার। আমাদের আবশ্যক—লৌহের মতো পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেকদিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি। আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই।…তোমাদের উপনিষদ্—সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শনশাস্ত্রগুলি আবার অবলম্বন কর, আর এইসকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় পরিত্যাগ কর।…লোকে স্বদেশহিতৈষিতার আদর্শের কথা বলিয়া থাকে।…মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক।…মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি?…কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ?…এই সমাজের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ কথা বলিও না।" (ঐ, ৫।৯৩-১১৮)।

'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' দেখাইতে গিয়া স্বামীজী বলিলেন, হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বেদ বা বেদেরই অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্‌সমূহ। অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র অপ্রামাণিক নহে; তথাপি বিরোধস্থলে উপনিষদ্ গ্রাহ্য।

উপনিষদ্ অবলম্বনে ভারতের ধর্মসমূহের মধ্যে সমন্বয়স্থাপন সুসাধ্য আবার "এই বিষয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে, সমগ্র জীবনে আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর।...আর উপনিষদ্ দেখাইয়া দেয় যে, ঐ মুক্তি তোমাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান।...ভারতের নিকট এই মহান্ তত্ত্বটি লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর লোক অপেক্ষা করিতেছে।...জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব বর্তমান।" এই বলিয়া স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন যে, এই তত্ত্বের স্বীকৃতি ও প্রয়োগের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় বহু বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। তারপর বলিলেন, "আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর একটি মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব।" স্বামীজী স্বদেশপ্রেমিক হইলেও, বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বের সহিত আদান-প্রদান বাদ দিয়া ভারত তাহার পৃথক্ নিরপেক্ষ সত্তা বজায় রাখিতে পারে, বর্তমান যুগে এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতেন না—"রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যেসকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই শুধু উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে।...সকলের ভিতর একত্বভাব কিভাবে বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই কথাগুলি এমন স্পষ্টভাষায় তাঁহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় বলেন নাই। আবার শুধু রাজনীতিক সমস্যাই নহে, স্বামীজী দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, নীতিশাস্ত্রের সমস্যাবলীর মীমাংসার এবং উহার যুক্তিসম্মত ভিত্তিভূমির সন্ধানও একমাত্র উপনিষদেই লভ্য।

ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে প্রদত্ত 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' বক্তৃতাতে উল্লেখযোগ্য নূতন বিষয় এই : "আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পর ভাব আদান-প্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্বভৌম ভাবে উপনীত হওয়া।...আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা জগদ্বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে কুসংস্কারগুলিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছি—সেগুলি নহে ; ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহারা

একেবারে মরিয়া যায়। আমরা ব্যক্তিবিশেষের মতানুগামী নহি, আমরা চিরকালই ধর্মের তত্ত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বসমূহের সাকার মূর্তিস্বরূপ।...ব্রহ্মানুভূতির বিভিন্ন সোপান আছে।.. জ্ঞানের ইতি করা যায় না।...আমাদের ধর্ম বলে—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—একজন দুইজনে নহে, অনেকের মধ্যে ঐ সত্য আবির্ভূত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে।...যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎ করায় তাহাই ধর্ম, আর এই ধর্ম সকলের জন্য।"

মাদ্রাজের শেষ বক্তৃতা—'ভারতের ভবিষ্যৎ'। স্বামীজী উহাতে বলিলেন: "আমেরিকা যাইবার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার মনে এই সঙ্কল্পগুলি ছিল: আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত তত্ত্বগুলিকে আমি সাধারণের বোধগম্য করিতে চাই। তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে।... জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা।...আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার লইতে হইবে। তোমরা এখন যে শিক্ষা পাইতেছ...প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিক-ভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে-কোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়।...মাথায় কতকগুলো তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না—অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়।"

এই বক্তৃতাতেই স্বামীজী স্বীয় স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার সবটুকুই ছিল ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ। তিনি দেশের সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে

দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।…সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতে পারে না।…এ কি তামাসা? এসব অর্থহীন বাজে কথা! আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি, কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা, বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা; ইহাদের পূজা করিতে হইবে—'সেবা' নহে। সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়।" (ঐ, ৫।১৯৯)।

চেন্নাপুরী অন্নদান-সমাজমে তিনি বলেন যে, ভারতে অবিচারিত দানের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অসৎ পাত্র লাভবান হইলেও উহা জ্ঞান, সচ্চিন্তা, ধর্ম ও নীতি সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছে—ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীরা এভাবেই প্রতিপালিত হন। পাশ্চাত্ত্যের বিধিবদ্ধ দানে ব্যয়সাধ্য দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণ-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে এবং ভিক্ষুক ও চোর-ডাকাত শব্দদ্বয় সমার্থক হইয়া পড়িয়াছে।

মোটের উপর মাদ্রাজের বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমরা তাঁহার ভারতসম্বন্ধীয় চিন্তাধারার প্রায় সব সূত্রগুলিই স্পষ্টাকারে পাইয়া গেলাম—ইহা বলা চলে। অতএব অতঃপর আর তাঁহার বক্তৃতাবলীর বক্তব্য বিষয় সর্বত্র উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হইবে না।

এই কালে স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে সেখানকার কার্যের ক্রমিক উন্নতি ও প্রসারাদি সম্বন্ধে যেসব পত্রাদি পাইতেছিলেন, তন্মধ্যে বন্ধুবর্গের এই যুক্তপত্রখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ:

"ভারতবর্ষস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি—

"প্রিয় সুহৃৎ ও ভ্রাতঃ,

"আমেরিকায় বেদান্তধর্ম ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যার কার্যে আপনি যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনাকারী এই কেম্ব্রিজ কনফারেন্সের সভ্যগণ ভবৎকৃত এই কার্যকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিতে অতিশয় আনন্দবোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আপনি ও আপনার সহকারী স্বামী সারদানন্দ যেভাবে এই ব্যাখ্যা



কলিকাতায় অভিনন্দন, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭
+ চিহ্নিত ব্যক্তি স্বামীজী

করিয়াছেন, তাহাতে যে শুধু কোন গভীর তত্ত্ব আস্বাদনেরই সুখ আছে তাহা নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা বহু দূরবর্তী জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রবন্ধন সুদৃঢ় হইবে এবং মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক ইষ্ট যে এক এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান—এই ধারণা (যাহা আমরা জগতের সকল উচ্চ ধর্মের নিকট শ্রবণ করিয়া আসিতেছি) আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে।

"আমাদের খুব আশা আছে, আপনার ভারতীয় কার্য এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে আরও অধিক সহায়তা করিবে এবং আপনি সেই দূরদেশস্থিত মহান্ আর্যবংশ-সম্ভূত ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে ভ্রাতৃস্নেহের সুস্নিগ্ধ আশ্বাসবাণী লইয়া পুনরায় আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনিবেন আপনার স্বদেশীয়গণের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ভাবের সংস্পর্শ হইতে যে অভিজ্ঞতালাভ ও চিন্তাশীলতার উদ্ভব হয় তাহার ফলস্বরূপ সুপরিপক্ক জ্ঞানসম্ভার।

"এই কনফারেন্সের অধিবেশনসমূহের যে ফলপ্রদ কার্যসম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়া আমরা সানন্দে জানিতে উদ্গ্রীব হইয়াছি, আগামী বর্ষে আপনার কার্যসমূহ কিভাবে পরিচালিত হইবে এবং আপনাকে আমাদের আচার্যরূপে প্রাপ্ত হইবার কোন আশা আছে কি না। আমাদের একান্ত ইচ্ছা আপনি অচিরে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসেন; এবং যদি আপনি আসেন, তাহা হইলে পূর্ব বন্ধুগণের সকলেই যে হৃদয়ের ঐকান্তিকী প্রীতি-সহযোগে আপনার সংবর্ধনা করিবেন ও আপনার কার্যে ক্রমবর্ধমান উৎসাহের সহিত যোগ দিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইতি—

"আপনার একান্ত অনুরক্ত ও ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ
"লুইস জি. জেনস, ডি. ডি. ডিরেক্টার; সি. সি. এভারেট, ডি. ডি.; উইলিয়ম জেমস; জন এইচ. রাইট; জোসিয়া রয়েস; জে. ই. লো; এ. ও. লভজয়; রাচেল কেণ্ট টেলর; সারা সি. বুল; জন পি. ফক্স।"

(বাংলা জীবনী, ৬১৮-১৯)।

স্বাক্ষরকারীরা আমেরিকার সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং কেহ কেহ বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন। ডাঃ জেনস ছিলেন ব্রুকলিন নৈতিক সমিতির সভাপতি; এভারেট —হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন; জেমস—বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিৎ; রাইট—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক; মিসেস বুল—কেম্ব্রিজ

কনকারেন্সের পৃষ্ঠপোষণকারিণী ও সমাজনেত্রী; কন্স—ঐ কনকারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদক।

এই পত্র ছাড়া ব্রুকলিন নৈতিক সমিতির পক্ষ হইতেও স্বামীজীর প্রশংসা-মুখর ও বিজয়বার্তাজ্ঞাপক একখানি পত্র আসে; উহার শিরোনামায় ছিল—'আমাদের ভারতীয় আর্য-ভ্রাতৃগণের প্রতি'। এই পত্রের বহুসংখ্যক অনুলিপি মুদ্রিত হইয়া মাদ্রাজে বিতরিত হইয়াছিল।

ডেট্রয়েটের বিয়াল্লিশজন অনুরাগীর স্বাক্ষরযুক্ত তৃতীয় আর একখানি অভিনন্দনলিপিও আসিয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল:

"বহুজাতির মাতৃস্থানীয়া প্রাচীন আর্যজাতির এক শাখা কর্তৃক শাসিত, প্রাচীন অথচ নবীন এই দেশের এই বহু দূরবর্তী নগরী হইতে আমরা আপনার জন্মভূমি—যেখানে যুগযুগান্তরের জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত আছে—সেই ভারতভূমিতে আপনাকর্তৃক আমাদিগের নিকট আনীত বাণীর প্রতি হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিজ্ঞাপিত করিতেছি। আর্যবংশোদ্ভব প্রতীচ্যবাসী আমরা আমাদের প্রাচ্য ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে এত দীর্ঘকাল পৃথক্ হইয়াছি যে, আমরা যে একই শোণিত হইতে উৎপন্ন তাহা আপনার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু আপনি এদেশে আসিয়া আপনার দিব্য সামীপ্য ও অনুপম বচনচ্ছটায় আমাদের মধ্যে সেই নির্বাণপ্রায় জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে, আমেরিকার আমরা ও ভারতের আপনারা বিভিন্ন নহি—মূলতঃ এক।

"প্রেমময় ও জ্ঞানময় জগদীশ্বর সকল কার্যে আপনার সহায় ও নিয়ন্তা হউন এবং সর্ববিধ কল্যাণ আপনাকে আশ্রয় করুক। ওঁ তৎ সৎ।"

(বাংলা জীবনী, ৬২০-২১)

অন্যান্য পত্রের মধ্যে একখানি পত্রে আমেরিকাবাসিগণ স্বামীজীর আমেরিকায় কার্যনিরত গুরুভ্রাতাদের সাফল্য ও কর্মবিস্তারের কথা উল্লেখ করায় তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে তাঁহার নিজের প্রশংসাও ছিল কিন্তু স্বামীজী আত্মপ্রশংসা অপেক্ষা আরব্ধকার্যের সাফল্যকে অধিক মূল্য দিতেন। স্বামীজী আরও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নিউ ইয়র্কের নিউ সেঞ্চুরী হলে বেদান্তসভার ছাত্রগণ যখন স্বামী সারদানন্দকে অভ্যর্থনা করেন, তখন ডাঃ এফ. জি. ডে বলেন:

"শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতেছি যাঁহারা আমাদের অশেষ-গুণভূষিত প্রিয়তম আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখ হইতে বেদান্তের গভীর তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইতেন। আরও অনেককে দেখিতেছি যাঁহারা সেই প্রিয় বন্ধু ও শিক্ষাদাতা গুরুর স্বদেশগমনে দুঃখে সন্তাপিত হইয়াছেন এবং তাঁহার পুনরাগমনের জন্য দীর্ঘকাল একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, তাঁহার পরিত্যক্ত কার্যভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। ইঁহার নাম স্বামী সারদানন্দ। পূর্ববর্তী আচার্যের ন্যায় ইঁহাকেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদনে উন্মুখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাই আপনাদের বর্তমান মনোভাব। অতএব আসুন এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই নবাগত আচার্যকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করি।"

বিদেশে কীর্তি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া এই উভয় বস্তু স্বদেশের কার্যে নিয়োগের জন্য কৃতসঙ্কল্প স্বামীজী কলম্বোয় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় অভীষ্ট পূরণে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তা ও তদুদ্দেশ্যে কর্মপন্থা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা তিনি পূর্বেও করিয়াছিলেন; কিন্তু এবারে তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ও ভাব-প্রকাশের মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, যাহার ফলে মনে হইয়াছিল, সাফল্য তাঁহার করতলগত। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত রামস্বামী শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন: "১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের বিবেকানন্দ এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের বিবেকানন্দের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত, ভাগ্যদেবতার সহিত যেন তাঁহার একদিন না একদিন মোকাবিলা হওয়া পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে; কিন্তু তিনি ঠিক জানিতেন না, কবে, কোথায়, কিভাবে সে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ঘটিবে। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত, তাঁহার সে সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিয়া গিয়াছে, তিনি স্বীয় জীবনব্রতের পরিষ্কার পরিচয় পাইয়াছেন এবং ইহার উদ্‌যাপন সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ আস্থাবান। তিনি এখন চলিতেন স্থির অকম্পিত পদবিক্ষেপে এবং নিয়তিনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি আজ্ঞা প্রচার করিতে থাকিতেন আর জানিতেন যে, সে আদেশ বিশ্বস্তরূপে প্রতিপালিত হইবে।" ('রেমিনিসেন্সেস', ১১১)।

জননী জন্মভূমি

এক হিসাবে কলম্বোয় পদার্পণ হইতেই স্বামীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন আরম্ভ হইলেও বঙ্গদেশ ও কলিকাতার সহিত তাঁহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, বঙ্গদেশের জলবায়ুতেই তাঁহার দেহ গঠিত হইয়াছিল, শিক্ষা-দীক্ষাও হইয়াছিল কলিকাতায় বা উহারই উপকণ্ঠে। আর এই মহানগরেই বাস করিতেছিলেন তাঁহার পরমপূজনীয়া স্নেহময়ী জননী ভুবনেশ্বরী দেবী। অতএব অন্য জায়গার সহিত ইহার একটা পার্থক্য ছিল ; স্বামীজী তাহা জানিতেন, বঙ্গবাসীরাও এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন। অতএব কলিকাতাবাসীরাও তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া সাগ্রহে তাঁহার পথ চাহিয়া ছিলেন, আর তিনিও সে শুভ মিলনের জন্য আশা ও আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিলেন।

১৫ই ফেব্রুআরি সকালে স্বামীজী মাদ্রাজ হইতে জাহাজে চড়িয়া কলিকাতায় চলিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে ডাবের জল খাইতে বলিয়াছিলেন ; তাই মাদ্রাজের ভক্তগণ প্রচুর পরিমাণ ডাব জাহাজে তুলিয়া দিলেন। এই অপক্ব নারিকেল-রাশি দেখিয়া সেভিয়ার-পত্নী স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, এ কি মালজাহাজ নাকি যে এরা নারকেল তুলে দিচ্ছে ?" স্বামীজী ইহাতে সহাস্যে বলিলেন, "না না, তা হতে যাবে কেন ? ওগুলো আমারই জন্য। একজন ডাক্তার আমাকে জল না খেয়ে ডাবের জল খেতে বলেছেন।" অবশ্য স্বামীজীর একার পক্ষে এত ডাব খাওয়া সম্ভব ছিল না ; তিনি নিজে প্রয়োজনমত ডাবের জল খাইয়া বাকিগুলি বন্ধুবান্ধব ও সহযাত্রীদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। সমুদ্রপথে কলিকাতায় আসায় স্বামীজীর পক্ষে এই সুবিধা হইয়াছিল যে, তাঁহার কর্মক্লান্ত শরীর ও মন বিশ্রাম পাইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। সমসাময়িক দুইখানি পত্রে তিনি নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যেরও কথা লিখিয়াছিলেন—একখানি মাদ্রাজ-ত্যাগের প্রাক্কালে ও অপরখানি কলিকাতায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে। ১২ই ফেব্রুআরির পত্রে আছে, "আগামী রবিবার মোম্বাসা জাহাজে আমার রওনা হবার কথা। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় পুনার এবং আরও অনেক স্থানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও গরমে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।" ২৫শে ফেব্রুআরির পত্রে আছে: "লোকে যেমন বলে 'আমার মরবারও সময় নেই', সমগ্র দেশময় শোভাযাত্রা, বাদ্যভাণ্ড ও সংবর্ধনার রকমারি আয়োজনে আমি এখন মৃতপ্রায়।...আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছ-মাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ।" জাহাজ যথাকালে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া গঙ্গানদীর মোহনায় প্রবেশ করিল এবং উত্তরাভিমুখে কলিকাতার দিকে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্য ও যৌবনের স্মৃতি তাঁহার মনে উদিত হইল এবং তিনি সঙ্গীদিগকে দর্শনীয় স্থানগুলি সানন্দে দেখাইতে লাগিলেন। ক্রমে জাহাজ আসিয়া খিদিরপুরে থামিল।

কলিকাতার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উহার সভ্য ছিলেন। স্বামীজীর মাদ্রাজে পৌঁছিবার সময় হইতে সমিতি বিবিধ আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন এবং ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, জাহাজ আসার পরদিন সকালে তাঁহাকে স্পেশাল ট্রেনে খিদিরপুর হইতে শিয়ালদহ স্টেশনে আনা হইবে। তদনুসারে স্বামীজী সদলবলে ২০শে ফেব্রুআরি সকাল সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনে উঠিলেন। এদিকে তাঁহাকে দেখিবার ও স্বাগত জানাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে বিপুল লোকসমাগম হইল। কলিকাতাবাসীরা সংবাদপত্রে তাঁহার কীর্তিকাহিনী পড়িয়াছিল; কলম্বো, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যে বিপুল সংবর্ধনা হইয়াছিল তাহা তাহারা জানিত। আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে তাঁহার ভক্তবৃন্দ যেসব অভিনন্দন-পত্রাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও মুদ্রিত ও বিতরিত হওয়ায় তাহারা ঐগুলি সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিল। এমন বরেণ্য ব্যক্তির দর্শনের জন্য কে না লালায়িত হয়? ট্রেনখানি স্টেশনে ঢুকিবার পূর্বে যখন হুইসল বাজাইল তখন উপস্থিত জনতা হইতে এক গগনবিদারী হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। ট্রেন থামিলে স্বামীজী দ্বারে দাঁড়াইয়া সকলকে করজোড়ে অভিবাদন জানাইলেন। তিনি প্ল্যাটফরমে নামিবামাত্র নিকটবর্তী সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিল, আর দূরবর্তীরা জয়ধ্বনি তুলিল, "জয় পরমহংস রামকৃষ্ণদেব কী জয়", "জয় স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়"। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা-সমিতির জনকয়েক সদস্য অতিকষ্টে তাঁহার নিকটে গিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন এবং কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া তাঁহাকে বাহিরে

লইয়া গিয়া প্রতীক্ষমাণ একখানি ল্যাণ্ডো গাড়ির দিকে চলিলেন। এদিকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে ও কুসুমবর্ষণে তাঁহার দেহ আবৃত হইতে থাকিল। জনতার মধ্যে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তখন থামিবার বা দুই-চারিটি কুশল-প্রশ্নাদি করিবারও সুযোগ ছিল না। সে বিপুল সংবর্ধনায় বিহ্বলচিত্ত স্বামীজী অগত্যা ধীরপদক্ষেপে কষ্টে অশ্বযান অভিমুখে চলিতে থাকিলেন।

সেভিয়ার-দম্পতির সহিত স্বামীজী অশ্বযানে আরোহণ করিবামাত্র একদল ছাত্র অগ্রসর হইয়া অশ্বযুগলকে মুক্ত করিয়া দিল এবং নিজেরাই গাড়ি টানিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রা চলিল—গাড়ির পুরোভাগে ব্যাণ্ড পার্টি একটি প্রাণমাতানো গৎ বাজাইতে লাগিল; মধ্যভাগে রহিলেন স্বামীজী ও অপর অনেকে; আর পশ্চাতে একটি কীর্তনের দল খোল করতাল সহ ভগবৎ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিল। উহার পশ্চাতে অনুসরণ করিল অগণিত লোক। পথের দুই ধারে ছিল বিচিত্র বর্ণের ধ্বজপতাকা ও মালা, ফুল ও পত্রসজ্জা। সার্কুলার রোডে, হ্যারিসন রোডের মোড়ে ও রিপন কলেজের সম্মুখে ছিল তিনটি সুসজ্জিত তোরণ; আর ছিল বিপুল উৎসাহী জনতা। সার্কুলার রোডের গেটে লিখিত ছিল, "জয় স্বামীজী"; হ্যারিসন রোডের গেটে ছিল, "জয় রামকৃষ্ণ", আর রিপন কলেজের সম্মুখে ছিল, "স্বাগত"। স্বামীজীর দর্শনার্থী বহুলোক পূর্বেই কলেজ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল; আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি সেদিকে ভিড় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে আশঙ্কা জাগিল, বুঝিবা একটা অঘটন ঘটিয়া যায়। স্বামীজী কলেজে নামিলে তাঁহাকে সাধারণভাবে অভ্যর্থনা জানানো হইল—অভ্যর্থনা-সমিতি স্থির করিয়াছিলেন যে, সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা পরে কোন বিস্তৃততর স্থানে করা হইবে এবং ঐরূপ করিলে সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইবে। সুতরাং এখানে অধিকক্ষণ থাকার প্রয়োজন ছিল না, একটু বিশ্রামান্তে স্বামীজী সদলবলে বাগবাজারের শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের আলয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহস্বামী সেখানে তাঁহাদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় স্বামীজী তাঁহার বিদেশী সঙ্গীদের সহিত বরানগরে গোপাললাল শীল মহাশয়ের গঙ্গাতীরবর্তী উদ্যানবাটীতে চলিলেন। এখানে বিদেশীদের রাখিয়া তিনি স্বয়ং আলমবাজার মঠে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মঠ

হইতে প্রত্যহ শীলেদের বাগানে আসিতেন এবং জিজ্ঞাসু আগন্তুকদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতেন। তাছাড়া সেখানে বসিয়া বহু পত্র ও টেলিগ্রামেরও উত্তর দিতে হইত; তাই স্বামীজীকে সর্বদা খুবই ব্যস্ত থাকিতে হইত। দিনের বেলাটা তাঁহার শীলেদের বাগানেই কাটিত, রাত্রিবাস হইত আলমবাজারের মঠে।

এক সপ্তাহ পরে, ২৮শে ফেব্রুআরি, প্রকাশ্য জনসভায় কলিকাতার নগর-বাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। শোভাবাজারের রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সম্মেলন-স্থান-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সভায় অন্ততঃ পাঁচ সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে এত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন যে, পূর্বে আর কখনও কাহারও অভ্যর্থনার জন্য এরূপ বিপুল সমাবেশ দেখা যায় নাই। স্বামীজী সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণবধিরকারী হর্ষধ্বনির মধ্যে জনকয়েক প্রথিতনামা ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে মঞ্চস্থ আসনে লইয়া গেলেন। সেদিন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভারতের জাতীয় জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুল কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষের মধ্যে ক্বচিৎ একজন এরূপ মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়।" তারপর তিনি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন এবং একটি রৌপ্যপাত্রে করিয়া উহা স্বামীজীর করকমলে অর্পণ করিলেন।

উত্তর দিতে গিয়া স্বামীজী যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা উচ্চারণ-মাধুর্য, বাগ্মিতা, ভাবগাম্ভীর্য, স্বদেশপ্রেম, ভবিষ্যৎপন্থানির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ের একত্র সমাবেশের দৃষ্টিতে অতুলনীয় বলিলেও চলে। সমসাময়িক ভারত স্বামীজীকে স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল; এই বক্তৃতায় এই উভয় দিকই সবিশেষ প্রকটিত হইয়া সেই ধারণাকে বলবতী করিয়াছিল। প্রারম্ভেই তিনি বলিলেন, "মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎ-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়,·· সে সার্ধ ত্রি-হস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়,···'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।" তারপর অতি সরলপ্রাণে ও নম্রতার সহিত তিনি বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি।"—তারপর চিকাগো ধর্মমহা-

সভার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা—ইহা বলিলেন এবং যে পাশ্চাত্ত্য জনসাধারণ শুধু সৎপ্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং অপরের গুণ-গ্রাহী হইয়া স্বামীজীর মতো বিদেশীর প্রতিও প্রচুর সহৃদয়তা দেখাইতে থাকে তাহাদিগের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের বিরুদ্ধে উভয় দেশে যেসব ভুল ধারণা বিদ্যমান, সেগুলির অসারতা দেখাইলেন। পাশ্চাত্ত্যবাসীরা মনে করে, দারিদ্র্য ও ধর্মহীনতা, পরাধীনতা ও আধ্যাত্মিকশক্তিশূন্যতা একই কথা ; পক্ষান্তরে ভারতবাসীরা মনে করে, পাশ্চাত্ত্যবাসীরা ধর্মবিমুখ ও জড়বাদী। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা অনুচিত। ইহার পর তিনি স্বীয় গুরুদেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে যাহাদ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত, সবই আমার ; যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং।" স্বামীজী শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে লব্ধ প্রেরণাদির কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতের পুনরভ্যুত্থানের জন্য যে নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে "ইহা কাহার শক্তি ? ইহা কি তোমাদের শক্তি, না আমার ?" আর নিজেই উত্তর দিলেন, "না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে ; যে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সেই শক্তি।...এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। যে প্রাণশক্তি ভারতকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই।" স্বামীজীর মতে ধর্মই ভারতীয় জীবনের ভিত্তি—একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি ; কলিকাতার বক্তৃতায় ঐ কথাই পুনরুচ্চারিত ও স্পষ্টতর হইল। মাদ্রাজে বিঘোষিত আরও কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "কলিকাতাবাসী যুবকগণ উঠ, জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে।...

উঠ, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে।"

স্বামীজী এই কালে আলমবাজার মঠে ও গোপাললাল শীলের বাগানে ধর্মালোচনাদি তো করিতেনই, সময়ে সময়ে কলিকাতায় গিয়াও বহু ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেন। এই জাতীয় অনেকগুলি দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' সংরক্ষিত হইয়াছে ('বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড)। সব ঘটনার উল্লেখ এখানে অসম্ভব, আমরা শুধু প্রধান কয়েকটি লিপিবদ্ধ করিব।

কলিকাতায় আগমনের তিন-চারি দিন পরে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্লে 'মিরর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন ঐ গৃহে অসিয়া বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের নিকট শুধু ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইলে চলিবে না—আদান-প্রদান প্রয়োজন। বেদান্তপ্রচারের মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সম্বন্ধ এক শ্রদ্ধাপূর্ণ বনিয়াদের উপর পুনঃসংস্থাপিত হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে। যাঁহারা রাজনীতির পথে চলিতে চান, তাঁহারা তাহাই করুন, কিন্তু স্বামীজী এই আদান-প্রদানের পথই পছন্দ করেন। নরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে গোরক্ষিণী-সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো—মাথায় গেরুয়া রঙ্-এর পাগড়ি বাঁধা। সংবাদ পাইয়া স্বামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা হাতে লইয়া নিকটবর্তী একব্যক্তির হাতে দিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী শুনিলেন, ইঁহারা কসাইয়ের হাত হইতে গোমাতাকে রক্ষা করেন এবং স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীজী জানিতে চাহিলেন, "মধ্যভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট নয়-লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করেছে কি ?" আগন্তুক উত্তর দিলেন, "আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।" এই পর্যন্ত নেহাৎ মন্দ ছিল না; কিন্তু একটু পরেই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "লোকের কর্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, 'যেমন কর্ম তেমনি

ফল' হইয়াছে।" প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু তিনি মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন: "যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষি-রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই; তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে—এরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল ব'লে সাব্যস্ত হয়, আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গো-মাতারা নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইয়ের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।" অপ্রতিভ প্রচারক বলিলেন, "হাঁ, আপনি যা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।" স্বামীজী ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, তা না হ'লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?" প্রচারক হয়তো ব্যঙ্গ বুঝিলেন না, অথবা বুঝিয়াও পুনর্বার গোমাতার জন্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী উত্তর দিলেন, "আমি তো সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাব, যাতে আপনাদের সাহায্য ক'রব? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, আগে মানুষের সেবায় ব্যয় ক'রব; মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান করতে হবে। এসব করে যদি অর্থ বাকি থাকে তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।" প্রচারক অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। (ঐ, ৯।৫-১০)।

মার্চ মাসের আর একদিন স্বামীজী গোপাললাল শীলের বাগানে আছেন এমন সময় কলিকাতার বড়বাজারের একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে আসিলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন: "আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীও সংস্কৃতেই তাঁহা-দিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক

সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজীর সংস্কৃত-ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল, পণ্ডিতগণও পরে ঐ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।...

"বাদে স্বামীজী সিদ্ধান্তপক্ষ এবং পণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী একস্থলে 'অস্তি' স্থলে 'স্বস্তি' প্রয়োগ করায়[১] পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোঽহম্ ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্'। পণ্ডিতেরাও স্বামীজীর এইরূপ দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই-চারিজন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময়ে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়গণ, স্বামীজীকে কিরূপ বোধ হইল?' তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিলেন, 'ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন'।"

স্বামীজী পরে বলিয়াছিলেন যে, পণ্ডিতগণ পূর্বমীমাংসাবলম্বনে বিচার করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উত্তরমীমাংসাবলম্বনে জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিতে গভীর দার্শনিক বিচারকালে ব্যাকরণে খুঁটিনাটি ভুলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অসৌজন্যের পরিচায়ক। ইহার পরে সেদিন স্বামীজী শিষ্যের সহিত সংস্কৃতে আলাপ করিয়াছিলেন, পরেও মাঝে মাঝে ঐরূপ করিতেন। স্বামীজী জানিতেন, বহুকাল বিদেশে থাকিয়া অনভ্যস্ত ভাষায় হঠাৎ দীর্ঘ আলোচনা করা কষ্টসাধ্য—সব জিনিসেরই উৎকর্ষ অভ্যাসসাপেক্ষ। (ঐ, ৯।১৮-২০)।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসিতেন ও তাঁহার সাফল্যের জন্য কিরূপ ব্যগ্র থাকিতেন তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ঐ ঘটনাকালেই পাওয়া যায়। যতক্ষণ স্বামীজী বিচারে ব্যাপৃত ছিলেন, ততক্ষণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পার্শ্বের একটি ঘরে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত জপ করিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, যাহাতে স্বামীজী বিজয়মণ্ডিত হন। (বাংলা জীবনী, ২য় সং, ৬৪২)।

১। বাংলা জীবনীতে 'স্বস্তি' স্থলে 'অস্তি' বলার কথা আছে (৬৪০)।

ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রচার-বিষয়ে এক গুরুভ্রাতার সহিত যে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, উহা হইতে জানা যায়, স্বামীজী বিদেশে সদাসর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কেন বলিতেন না। গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ওদেশে সর্বদা সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু করা যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা বলত, 'ও আর তুমি নূতন কি বলছ? আমাদের প্রভু ঈশাইতো রয়েছেন'।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২২)। ঐ দিনই তিনি ধার্মিকদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীর এক অদ্ভুত ধারণার কথাও বলিয়াছিলেন: "ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ হবে সে বাইরের চাল-চলনে তত গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মযাজকেরা যেমন অবাক হয়ে যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কখনও বলেও ফেলত '...আপনার ওরকম চপলতা শোভা পায় না।' উত্তরে আমি বলতাম, 'আমরা আনন্দের সন্তান, বিরসমুখে থাকব কেন'?" ('বাণী ও রচনা', ৯।২১)।

সেবারে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে (৭ই মার্চ, রবিবার) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবোৎসব হয়। দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীবাড়িতে সেজন্য বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। স্বামীজী বেলা নয়টা-দশটা আন্দাজ নগ্নপদে ও গৈরিক উষ্ণীষ মস্তকে পরিয়া উৎসবভূমিতে উপনীত হইলে তাঁহার দর্শনস্পর্শনের জন্য ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিবার জন্য জনতার মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সহস্র সহস্র শির ভক্তিতে অবনত হইল।[১] পরে ৺রাধাকান্তকে প্রণাম করিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সে প্রকোষ্ঠে তখন এত ভিড় জমিয়াছিল যে, তিলমাত্র ধারণের স্থান ছিল না। বাহিরে চতুর্দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি উঠিতেছিল, নহবতের সুরলহরীতে সুরধুনী নৃত্য করিতেছিল, হোর মিলার কোম্পানীর

১। "২৫শে ফাল্গুন,...সেদিনও স্বামীজী মন্দিরে গিয়া কালীদর্শন করিয়াছিলেন।" ('কথা-সাহিত্য' ১৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পত্র।)

স্টীমার বার বার শত শত যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিতেছিল, আর শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ অনুরাগভরে মূর্তভক্তিস্বরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত দুইজন ইংরেজ-মহিলা আসিয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহাদিগকে পঞ্চবটী, বিল্বমূল প্রভৃতি দেখাইতেছিলেন।

পঞ্চবটীমূলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অপর অনেক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাগুণালোচনায় নিবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে বহুজনপরিবেষ্টিত স্বামীজী সেখানে আসিয়া গিরিশবাবুকে দেখিতে পাইলেন এবং "এই যে ঘোষজ" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, গিরিশবাবুও করজোড়ে প্রতি-নমস্কার করিলেন। অতঃপর পূর্বকথা স্মরণ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "ঘোষজ, সেই একদিন, আর এই একদিন।" গিরিশবাবুও উহার সমর্থনে বলিলেন, "তা বটে, তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।" এইভাবে কিছু আলাপ করিয়া স্বামীজী বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে সমবেত জনসমষ্টি স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু স্বামীজী বহু চেষ্টা সত্ত্বেও চারিদিকে উত্থিত কলরবের ঊর্ধ্বে স্বীয় কণ্ঠস্বর তুলিতে অপারগ হওয়ায় বক্তৃতার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অতএব তিনি সঙ্গিনী মহিলাদ্বয়কে ঠাকুরের সাধনাস্থলগুলি দেখাইতে এবং বিশিষ্ট বন্ধুদের সহিত তাঁহাদের আলাপ করাইয়া দিতেই ব্যাপৃত হইলেন। অবশেষে বেলা তিনটার সময় তিনি একখানি ঘোড়ার গাড়ি ডাকাইলেন এবং স্বয়ং একদিকে বসিয়া ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে অপর দিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় পথে বলিলেন: "শুধু ভাবমাত্র নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এসব উৎসব প্রভৃতিও দরকার; তবে তো জনসাধারণের ভেতর এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ—এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ লোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐ সকলে মত্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়।...তবু লোকসংগ্রহের জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও ঐগুলি (উৎসব-কীর্তন ও ষষ্ঠী-পূজা ইত্যাদি) মেনে চলেন।...সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে

অধিকারিভেদে।" ইহার পর কথাপ্রসঙ্গে তিনি শরৎবাবুকে বলিলেন, "এখানকার ভাব কি জানিস?—সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মানতেন—আবার বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে ওসকলই মিথ্যা মায়ামাত্র।" (ঐ, ৯।২৭-৩১)।

ইহার পূর্বে কলিকাতা-অভিনন্দনের কয়েকদিন পরে ৪ঠা মার্চ তিনি স্টার থিয়েটারে 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শোভাবাজারের রাজবাটীতে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ দিকের পরিচয় পাইয়াছিল। উহাতে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, ভারতের অভ্যুদয়কল্পে ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতাটি জনসাধারণের নিকট তাঁহার ধর্মানুভূতির আভাস প্রদান করিল এবং হিন্দুধর্মের মূলীভূত তথ্যগুলি সম্বন্ধেও জনসাধারণকে অবহিত করিল। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষে যে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ দীপ্যমান রহিয়াছে, "কেহই জানে না, কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল।...আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না।" তাঁহার মতে বেদ ও উপনিষদের চিন্তাধারা প্রাচীনকালে বহির্জগতে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত মানবের চিন্তারাশিকে নিয়মিত করিয়াছিল। ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মমত ও দর্শনাদি—সাংখ্য, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ইত্যাদি "সবগুলিই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।" বস্তুতঃ "হিন্দু বলিলেই বেদান্তী বুঝায়।" "উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে গূঢ়রূপে যে সমন্বয়ভাব রহিয়াছে, এখন তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক।...বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পরস্পরবিরোধী নহে, পরস্পরসাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতিস্বরূপ, একটি যেন অপরটির সোপানস্বরূপ এবং সর্বশেষে চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসিত, ইহা দেখানোই আমার জীবনব্রত।"[১] স্বামীজী শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য ও

১ শোনা যায়, ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর মাদ্রাজে অনুরূপ আলোচনাকালে এক পণ্ডিত আপত্তি করেন, "স্বামীজী, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ ইত্যাদি সমস্তপ্রকার মতবাদই সত্য ও চরমোপলব্ধির পথে ভিন্ন ভিন্ন সোপানমাত্র—একথা তো পূর্বাচার্যগণ কেহই বলেন নাই?" স্বামীজী মৃদুহাস্তে উত্তর দেন, "উহা আমার জন্তই নির্দিষ্ট ছিল; সেই জন্তই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)।

অন্যান্য সম্প্রদায়প্রবর্তকদের কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে, ইহারাও উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, যদিও উপনিষদের অর্থনির্ণয়কালে মতভেদের প্রমাণ দিয়াছেন। ফলতঃ "একমাত্র ঐগুলিই আমাদের শাস্ত্র। পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থ এমন কি ব্যাসসূত্র পর্যন্ত প্রামাণ্যবিষয়ে গৌণমাত্র, আমাদের মুখ্যপ্রমাণ বেদ।" ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ইহা ভুলিয়া গিয়া লোকাচার ও দেশাচারকে উপনিষদের স্থলে বসাইয়াছি এবং কালক্রমে উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য ভুলিয়া গিয়া বেদান্তোক্ত মায়াবাদের কদর্থ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সনাতন ধর্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। এইরূপে স্বামীজী হিন্দুদের ভ্রান্তধারণাগুলিকে দূরীভূত করিয়া মহিমাশালী সনাতন ধর্মকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদিগকে সনাতন ধর্মের আরও পক্ষপাতী করিতে চাই।...তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর; কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্যবান স্থির অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেক সুরটিই অমোঘ। তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল —শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল।...সেই প্রাচীন কালের ভাব লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর; ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।"

আবার আমরা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর বিবরণে ফিরিয়া যাই। আলমবাজার মঠে, শীলেদের বাগানে ও কলিকাতার ভক্তদের বাড়িতে যখন যেখানে স্বামীজী উপস্থিত হইতেন, সেখানে দর্শনার্থী ও জিজ্ঞাসুর ভিড় জমিয়া যাইত; স্বামীজীও অবিরাম আত্মতত্ত্ব, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও স্বদেশের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ইহারই মধ্যে আবার আমন্ত্রণক্রমে কোন কোন প্রতিষ্ঠান-দর্শনেও যাইতেন। এইরূপে একবার বাগ-বাজারের বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে অবস্থানকালে তিনি একদিন সশিষ্য ঘোড়ার গাড়ি করিয়া শ্রীযুক্তা মাতাজীর প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে গিয়া-ছিলেন (৬ই মে, ১৮৯৭)। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অবশ্য গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। গাড়ি বিডন স্ট্রীটে উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা

দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া ক'রে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখ-দুঃখের ভাগী, সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস ?" শিষ্য প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম-এ, বি-এ পাশ করিতেছে।" স্বামীজী তবু বলিলেন, "ও তো বিলাতি ঢং-এ হচ্ছে। তোদের ধর্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মতো চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে ? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, তা আবার মেয়েদের ভেতর। গভর্নমেণ্টের সংখ্যাসূচক তালিকায় দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা দশ-বার জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজনও হবে না। তা না হ'লে কি দেশের এমন দুর্দশা হয় ? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ এসব না হ'লে দেশের উন্নতি কি ক'রে হবে ?···সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হ'লে কিছু হবার জো নেই। সেজন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী ক'রব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে।···পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে।···মেয়েদের আগে তুলতে হবে, জনসাধারণকে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।"

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকটে আসিয়া গাড়ি স্বামীজীর আদেশে চোরবাগানের রাস্তায় চলিল এবং স্বামীজী জানাইলেন, "মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতা" তাঁহাকে পত্রযোগে ঐ পাঠশালা দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তিনি তাই সেখানে যাইতেছেন। যথাস্থানে গাড়ি থামিলে মাতাজী তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং স্বামীজীও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিলেন। বিদায়কালে পরিদর্শক-পুস্তকে স্বীয় মত লিপিবদ্ধ করিলেন, "স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলেছে।" ফিরিবার পথে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন: "স্ত্রীলোক না হ'লে কি ছাত্রীদের এমন ক'রে শিক্ষা দিতে পারে ? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাস্টার রয়েছে—ঐটে

ভাল বোধ হল না।...এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল।" ক্রমে বাল্যবিবাহের কথা উঠিল। স্বামীজী ঐ প্রথার নিন্দাচ্ছলে বলিলেন যে, উহার একটা ভাল দিক থাকিলেও "অন্যপক্ষে আবার বলা যাইতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তানপ্রসব ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে।...তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্যবিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।" ঐ প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলিলেন: "ভালমন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ—সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর ক'রে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না।" (ঐ, ৯।৩৩-৩৮)।

আর একদিনের কথা; তখনও স্বামীজী বলরামবাবুর বাড়িতেই আছেন এবং দশ দিন যাবৎ শিষ্যকে সায়নভাষ্য সমেত বেদ পড়াইতেছেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্সমূলারের বেদ-প্রকাশের কথা, তাঁহার চরিত্রমাধুর্য ইত্যাদির আলোচনা হইল। আবার সৃষ্টির অনাদিত্ব, শব্দ হইতে সৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা চলিতে লাগিল। এমন সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিলেন ও পরস্পর অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদির পর সেখানে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ শুনিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ শব্দ-শক্তির কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি জি. সি., এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।" গিরিশবাবু বলিলেন, "কি আর প'ড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদ-বেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব।" এই বলিয়া তিনি প্রকাণ্ড বেদগ্রন্থকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।" স্বামীজী তখন অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইত্যবসরে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি

চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে?"... "গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখলি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল'।"

একটু পরে স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া কথায় কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে, "অধিক পড়াশুনা নিষ্প্রয়োজন" গিরিশবাবুর এই মত এবং "বুদ্ধি মার্জিত করা আবশ্যক" স্বামীজীর এই মত—এই উভয় মতই অধিকারিভেদে সত্য। "গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। গিরিশবাবুর মতো যাঁদের ভক্তি-বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওকে অনুকরণ করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।...একটা অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায় 'মূকাস্বাদনবৎ'। আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসব পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে।"

এইভাবে ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীর শিষ্য গুপ্ত মহারাজ বা স্বামী সদানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন। অমনি আলোচনার গতি পরিবর্তিত হইয়া স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের আর একটা দিক অভিব্যক্ত হইল। তিনি স্বামী সদানন্দকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে, এই জি. সি.-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে, দেশের জন্য কিছু করতে পারিস্?"

সদানন্দ—"মহারাজ! জো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।"

স্বামীজী—"প্রথমে ছোটখাট হারে একটা সেবাশ্রম খোল, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই—এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে।···জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ করফলায়তে'।"

"এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন : দেখ, গিরিশবাবু, মনে হয় এই জাতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা ক'রব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে ? সকলকে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বলো দেখি এমন ভাব ওঠে ?"

গিরিশবাবু—"তা না হলে আর তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন ?" (ঐ, ৯।৪৩-৪৬)।

স্বামীজী সমসাময়িক ভারতে কার্যে পরিণত বেদান্ত ও কর্মযোগ প্রচারের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন, এদেশে ধ্যানধারণা, মুক্তিকামনা, পূজা-অর্চা, সংসারবিমুখতা ইত্যাদির প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিলেও বাস্তবজীবনে ঐসব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত ঐকান্তিকতা বা গভীরতা নাই, বরং দেখা যায়, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া দেশ ক্রমে জড়তা, আলস্য, অবসাদের তমোময় গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে এবং উহারই অনুকূলরূপে ধর্মেরও ব্যাখ্যা ও দার্শনিক যুক্তির প্রয়োগ করিয়া ধর্মকে অর্থহীন আচার-বিচারে ও সামাজিক অত্যাচারে এবং দর্শনকে হাস্যাস্পদ বাগাড়ম্বরে পরিণত করিয়াছে। তিনি তাই চাহিতেন তেজস্বিতা, আত্মনির্ভরতা ও কর্মোৎসাহ। "আমি কিছু নহি, আমি অতি দীন, আমি অতি নীচ"—এইরূপ আত্মাবমাননা তিনি পছন্দ করিতেন না। স্বামীজীকে 'ঈশানুসরণ' গ্রন্থখানির প্রতি বিশেষ অনুরাগী জানিয়া এক ব্যক্তি যখন রচয়িতার বিনয় ও 'তৃণাদপি সুনীচ'-ভাবের প্রশংসা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে ধর্মজীবনে সাফল্যলাভ হয় না, তখন স্বামীজী উহার প্রতিবাদকল্পে বলিয়াছিলেন, "কি ? নিজেকে তুচ্ছ ভাবা ? কেন ? আত্মগ্লানিতে কি লাভ ? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায় ? আমরা জ্যোতির সন্তান। যে জ্যোতিঃ বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত ক'রে আছে, আমরা তাতেই বেঁচে আছি, তারই মধ্যে ডুবে চলাফেরা করছি।"

ভারতে উচ্চারিত স্বামীজীর বাণীতে শুধু জ্ঞান ভক্তি ও কর্মেরই সমন্বয় সংসাধিত হয় নাই, উহাতে যোগেরও পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, একদিন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহের সহিত দুইজন ভদ্রলোক প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য স্বামীজীর নিকট আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর রাজযোগ-পাঠান্তে তাঁহাদের মনে এইসব প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল। স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের বাটীতে উপস্থিত আরও কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। ঐসব শেষ হইলে তিনি অজিজ্ঞাসিতভাবেই প্রাণায়ামের কথা তুলিলেন এবং অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পূর্ণ চারি-ঘণ্টা ধরিয়া অবিরাম ঐ বিষয়েই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—যেন রাজযোগই তাঁহার একমাত্র প্রাণের বস্তু। অধিকন্তু সব বিষয়টা তিনি এমন বিশদ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইলেন যে, জিজ্ঞাসুদের আর প্রশ্ন করার আবশ্যক হইল না। আরও দেখা গেল যে, তিনি বিষয়গুলির যে চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা দিলেন, তাহার অনেকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রোতাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, স্বামীজী স্বীয় উপলব্ধি অবলম্বনেই কথা বলিতেছিলেন এবং সেই অনুভূতির অতি অল্প অংশই পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। সর্বাধিক বিস্ময়ের বিষয় ছিল, স্বামীজী কি করিয়া প্রশ্নকর্তাদের মনোভাব অবগত হইলেন। সিংহ মহাশয় স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি পরে স্বামীজীকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী বলিলেন, "ওদেশেও অনেক সময় ঠিক এরূপ ঘটত, আর লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করত, কেমন করে আমি তাদের মনোগত ভাব বুঝে কথা বলি এবং তাদের প্রশ্নের মীমাংসা করি।" (ঐ, ৯।৩৯৬-৯৭)।

কথায় কথায় সেদিন জাতিস্মরতা, পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগজ শক্তির কথা উঠিলে হঠাৎ একজন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, আপনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা জানেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই।" তখন প্রশ্নকর্তা নির্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, স্বামীজী যাহাতে সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি সে সবই জানি এবং ইচ্ছা করলে আরও জানতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।" (বাংলা জীবনী, ৬৪৩)।

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের ন্যায় ভারতেও স্বামীজী শিষ্যবর্গকে ও অনুরাগিবৃন্দকে বিভিন্ন সাধনমার্গের কথা শুনাইতেন ও শিখাইতেন। কিন্তু ভারতীয় জীবনের

যুগপ্রয়োজনে তাঁহার বাণীতে সেবাব্রতেরই কথা অধিক স্থান পাইত। পরকে তিনি এই বিষয়ে উপদেশ দিতেন, নিজেও লোককল্যাণ-সাধনে বিশ্বাস করিতেন। একদিন একজন তাঁহাকে মুক্তপুরুষ ও অবতারের প্রভেদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি যখন সাধনাবস্থায় ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলাম, তখন অনেক দিন নির্জন গিরিগুহায় কাটিয়েছিলাম এবং মাঝে মাঝে মুক্তি দূরবর্তী দেখে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করতাম। কিন্তু এখন আর আমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নেই। এখন ভাবি, ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতদিন বদ্ধ থাকবে ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না।" বুদ্ধদেবও একদিন ঠিক এরূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অর্হৎদের আদর্শীভূত স্বীয় মুক্তিকামনাকে উচ্চতম স্থান দেওয়া হইলেও মহাযানসম্প্রদায়ে লোককল্যাণে তৎপর বোধিসত্ত্বই সর্বাধিক ভক্তিশ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ আচার্য ও অবতারকল্প পুরুষদের ইহাই মহত্ত্ব যে, তাঁহারা যে উচ্চতম অনুভূতি লাভ করেন, জগতের অপরকেও তাহাতে ভাগী করিতে চান—একা আনন্দসম্ভোগ করা তাঁহাদের চরিত্রের লক্ষণ নহে।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' ও বাংলা জীবনী অবলম্বনে ঘটনাবলী বিবৃত করিতে করিতে যদিও আমরা মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, স্বামীজীর কলিকাতায় আগমনান্তে প্রথম কিছুদিন আলমবাজারের মঠে ও শীলেদের বাগানে অতিমাত্র ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। সেখানে অনেক কিছু ঘটিয়াছিল; কিন্তু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর ন্যায় উপযুক্ত লেখক সব সময় উপস্থিত না থাকায় অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই—অল্প কয়টি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ একটি ভৌতিক ঘটনা বাংলা জীবনীতে পাওয়া যায়, উহাতে স্বামীজীর অতিলৌকিক দৃষ্টিশক্তি প্রমাণিত হয়। এক সন্ধ্যায় মঠের একখানি ঘরে বসিয়া স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দের সহিত গল্প করিতে করিতে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিছু দেখলে?" তিনি বলিলেন, "না"। তখন স্বামীজী বলিলেন, "আমি এইমাত্র একটা প্রেতাত্মার ছিন্নমুণ্ড দেখলাম। সে কাতরভাবে তার কষ্টকর অবস্থা থেকে উদ্ধার প্রার্থনা করছে।" পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল, ঐ বাগানে এক ব্রাহ্মণ দ্বারবান থাকিত ও অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিত। একদিন এক ঘাতক তাহাকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়।

গুরুত্বপূর্ণ যেসব আলোচনা সেখানে হইত তৎসম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দিতে গিয়া বাংলা-জীবনীকার লিখিয়াছেন (৬৩২): "অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি, উৎসাহশীল যুবক ও কলেজের ছাত্র তাঁহার দর্শনার্থ শীলেদের বাগানে আসিতেন। কেহ আসিতেন তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভের আশায়, কেহ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, আবার কেহ বা আসিতেন কেবল তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষে সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।" শরৎবাবু লিখিয়াছেন: "প্রশ্ন-কর্তারা স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার উদ্ভিন্ন প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্বাক হইয়া অবস্থান করিতেন। স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্বদা অবস্থান করিতেন।"

আবার স্বামীজী ছিলেন যুগাচার্য—যুগের নবাভিযানের পথিকৃৎ, কেবল পাণ্ডিত্য দেখাইতে তিনি আসেন নাই। সুতরাং তিনি শুনাইতেন ত্যাগ-বৈরাগ্যের যুক্তি, বুঝাইয়া দিতেন আত্মশ্রদ্ধার্জনের প্রয়োজন, আর দেখাইয়া দিতেন বলবীর্য-বৃদ্ধির উপায়। তিনি ধর্মের নামে কদাচার বা দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে অপারগ ছিলেন, যুক্তিহীন পরানুকরণ, পরানুবাদ বা পাশ্চাত্ত্যের অভিমতানুসারে সমাজসংস্কারাদিতে মাতিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, আর বলিতেন—শিক্ষাদান অবলম্বনে নারীজাতি ও জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। ধর্মভিত্তিক এই সকল কার্যের জন্য তিনি স্বার্থত্যাগী যুবকসম্প্রদায়ের প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন ও নানাভাবে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। তিনি যে প্রথম হইতেই তাঁহার নববার্তা বহনের উপযুক্ত-সংখ্যক ও আবশ্যক-গুণসম্পন্ন যুবকদের পাইয়াছিলেন তাহা বলা চলে না, অন্যান্য আচার্যদের ন্যায় তাঁহাকেও বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াই চলিতে হইয়াছিল। জনসাধারণের তদানীন্তন ভাবরাশিও তাঁহার এই কার্যের অনেকটা প্রতিকূল ছিল; সেই সমস্তকে সরাইয়া দিয়া তবে তাঁহাকে পথ করিয়া চলিতে হইয়াছিল। পরবর্তী ঘটনাগুলি হইতে ইহার কতক আভাস পাওয়া যাইবে।

আমেরিকায় তাঁহার বেদান্তপ্রচারের সংবাদ-শ্রবণে এদেশের অনেক বৈষ্ণব মনে করিয়াছিলেন, বেদান্তপ্রচার ও বৈষ্ণবধর্মের সমর্থন একই ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ সেদেশে শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্মের প্রচার করেন নাই। এই দৃষ্টিতে তাঁহারা স্বামীজীর কার্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণ করিতেও

যত্নপর হইয়াছিলেন। তাই স্বামীজী একদিন কথায় কথায় জনৈক বৈষ্ণবকে বলিয়াছিলেন, "বাবাজী, আমি একদিন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমেরিকায় এক বক্তৃতা দিই। তাহাতে এত ফল হইয়াছিল যে, এক অতুল ঐশ্বর্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী যুবতী সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক নির্জন দ্বীপে কৃষ্ণচিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে কৃতোদ্যম হইয়াছিল।"

বস্তুতঃ যুগপ্রয়োজনে জ্ঞান ও কর্মের কথা অধিক বলিলেও স্বামীজীর অন্তর ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ। ইহারই একটি দৃষ্টান্ত তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ('শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', ১ম খণ্ড, ৪১-৪৩)। ঘটনাটি বরাহনগর মঠে বাসকালের। সংক্ষেপে উহা এইরূপ। স্বামী যোগানন্দ[১] বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কালে কতকগুলি তুলসীর মালা, মালার ঝুলি ও তিলকমাটি লইয়া আসেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর স্বামীজী রঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "ওরে যোগে, তুই তো বৃন্দাবনে গেছলি? আমায় বৈরাগী সাজিয়ে দে।" সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ঐরূপ সাজাইয়া দিলে তিনি রহস্যভরে মালাজপ ইত্যাদির অনুকরণ করিতে থাকিলেন, সম্ভবতঃ ইহাই দেখাইবার জন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে যে নবীন যুগপ্রবর্তন হইতে চলিয়াছে, উহা শুধু প্রাচীন-আচারের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নহে; প্রাচীনের নিজস্ব মহিমা অবশ্যই ছিল, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন উহারই অনুকরণমাত্রে পর্যবসিত না হয়। বাহিরে যুগপ্রয়োজনানুসারে ঐরূপ ব্যবহার করিলেও অনুকরণের অবকাশ পাইয়া অন্তরের ভক্তিভাব অকস্মাৎ উদ্দীপিত হওয়ায় তিনি হরিপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা হইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বোল হরি বোল, হরি হরি বোল।" সে আবেগপূর্ণ উচ্চ অথচ গম্ভীর কণ্ঠরবশ্রবণে সকলেরই ভাব বদলাইল; সকলে উঠিয়া উদ্দাম নৃত্যসহ হরিসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঘর হইতে খোল-করতাল আনিয়া বাজনাও শুরু হইল। মহেন্দ্রবাবুর মতে "অনবরত খোল বাজানো এত দুরূহ হয়েছিল যে, পর্যায়ক্রমে তিনজনকে খোলটা ঘাড়ে করতে হয়েছিল, তবুও তাদের আঙুলগুলো ফুলে গিয়েছিল।" সে কীর্তন সেদিন ঠাকুরের বৈকালী প্রদানের পরেও কিছুকাল চলিয়াছিল এবং উহার আকর্ষণে পাড়ার অনেকে মঠে জমায়েত হইয়াছিল। কীর্তনান্তে ঘরে ফিরিবার পথে

১ অন্যমতে স্বামী প্রেমানন্দ।

তাহাদিগকে বলিতে শোনা গিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, এমন কীর্তন কখনও শুনিনি, এমন মধুর হরিনাম কখনও শুনিনি।"

ইহা তো অনেক পূর্বের ঘটনা। সমসাময়িক একটি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও স্বামীজীর বিনয় ও ভক্তিভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজী একদিন চেয়ারে বসিয়া আগন্তুকদের সহিত কথা কহিতেছেন এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় (বা রামলালদাদা) সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র স্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাদরে আপন চেয়ারে বসাইলেন। স্বামীজীর চেয়ারে আপনাকে উপবিষ্ট দেখিয়া রামলালদাদা লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করিলেও স্বামীজী সেসব কথা শুনিলেন না ; বলিলেন "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু" এবং ঐ কক্ষে পদচারণ করিতে করিতেই তিনি আলাপ করিতে থাকিলেন। রামলালদাদার আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি আসন গ্রহণ করিলেন না।

অন্তরের স্বাভাবিক ভক্তিভাব চাপিয়া রাখিয়া তিনি যুগপ্রয়োজনে আগন্তুক যুবকবৃন্দকে শক্তিলাভ ও পরার্থে স্বার্থত্যাগের বাণী শুনাইতেন। বস্তুতঃ ভক্তিপথেও ত্যাগকে অস্বীকার করা চলে না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "ত্যাগ চাই, যারা ত্যাগ অভ্যাস না করে তারা ধীরে ধীরে অধঃপাতে যায়, যেমন বল্লভাচার্যের দল।" যে যুবকেরা সেবাধর্মে ব্রতী হইবে, তাহাদের পক্ষে উহা একান্ত আবশ্যক হইলেও স্বামীজীর দুঃখ ছিল এই যে, সেরূপ আধার পাওয়া ছিল দুষ্কর—সমাজ যে তখন অতীতের পুঞ্জীভূত ভ্রান্তধারণায় ভারাক্রান্ত! একদিন এক যুবকের সহিত তাঁহার আলাপ হইতেছিল। যুবক বলিলেন, "স্বামীজী, আমি অনেক দলে মিশেছি ; কিন্তু সত্য যে কি, সে আজও ঠিক করতে পারলাম না।" স্বামীজী সস্নেহে বলিলেন, "বাবা ভয় নেই, আমারও একদিন ঐ অবস্থা ছিল। আচ্ছা, বল, কোন্ কোন্ দল তোমায় কি কি উপদেশ দিয়েছে, আর তুমি তার কতটা প্রতিপালন করেছ।" যুবক জানাইলেন, তিনি থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের একজনের নিকট মূর্তিপূজার সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিয়া নিত্য ভক্তিভরে পূজা ও জপ করিয়া আসিতেছেন, তবু শান্তি পান নাই। আর একজনের উপদেশে ধ্যানকালে মনকে সম্পূর্ণ নির্বিষয় করার চেষ্টা করিয়াও শান্তি পান নাই। তিনি বলিলেন, "মশায়, আমি প্রত্যহ দ্বার বন্ধ করে ধ্যানে বসি ও চক্ষু মুদ্রিত করে থাকি। কিন্তু তবুও শান্তি পাই না কেন ?" স্বামীজী বলিলেন, "শান্তি যদি চাও, ঠিক এর বিপরীত করতে হবে। দ্বার উন্মুক্ত

রাখতে হবে। আর চক্ষু মেলে চারদিকে দেখতে হবে। তোমার আশেপাশে কত লোক তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায় রয়েছে, তাদের সাহায্য কর—ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, তৃষ্ণার্তকে জল দাও, যথাসাধ্য পরের উপকার কর—তাতেই মনের শান্তি হবে।" যুবক বলিলেন, "কিন্তু ধরুন, যদি পীড়িতের শুশ্রূষা করতে গিয়ে আমি নিজে বিপদে পড়ি ? রাত-জাগা, অসময়ে খাওয়া ইত্যাদিতে যদি আমার নিজেরই শরীর—।" স্বামীজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্ বুঝেছি। তোমার সে ভয় নেই। তুমি কোনও কালে পরের জন্য রাত জাগতেও যাচ্ছ না, আর তোমার সেজন্য ব্যারামে পড়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।" স্বামীজী জানিতেন, এমন আত্মসুখান্বেষণে তৎপর ব্যক্তি কখনও সেবা-কার্যে ব্রতী হইতে পারে না, আর দেশে এরূপ নিষ্কর্মার সংখ্যাও ছিল প্রচুর। সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিরূপ বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে।

অন্য একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত পূজ্যপাদ মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি ?" স্বামীজী মায়াবাদের এই অপব্যাখ্যা বহুবার শুনিয়াছিলেন এবং ইহার উত্তরও তাঁহার নিকট প্রস্তুত ছিল। তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয় ? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি ?" ('বাণী ও রচনা', ৯।৩৩৬)। প্রাচ্যের তৎকালীন চিন্তারাজ্যে যে বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, স্বামীজীকে এমনি ভাবে তাহার প্রতিকার করিতে হইয়াছিল, কারণ এইরূপে সত্যের স্বরূপ অনাবৃত না হইলে স্বামীজীর সেবাব্রত গ্রহণে লোক আগ্রহান্বিত হইবে কেন ?

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিব, হিন্দুসমাজের একটা অংশও স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজীর পথ সত্যই ছিল কণ্টকাকীর্ণ। দেশবাসীদের মঙ্গলার্থ তাহাদের মন হইতে অতীতের অবাঞ্ছনীয় ধারণাগুলি অপসারিত করিয়া তৎস্থলে নবযুগের আশা ও উত্তম সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল এক অতি বিরাট ও শ্রমসাধ্য কার্য। ইহার জন্য স্বামীজীর প্রচেষ্টা

যেসব বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে পরিচালিত হইতেছিল, তাহার একটা মোটা-মুটি ধারণা আমরা এ পর্যন্ত পাইয়াছি। ঐ ভাবরাশিকে জীবনে প্রত্যক্ষভাবে রূপায়িত করার কার্যেও তিনি তখনই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই দিকটার কথা আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। আপাততঃ আরও কিছু ঘটনাবলী শেষ করি।

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া স্বামীজী মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়াও স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই ঘটিয়াছিল। সেখানে ক্রমেই গরম বাড়িতেছিল ; আর সেই সঙ্গে কাজ এবং দুশ্চিন্তাও ছিল যথেষ্ট। পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক বলিয়াছিলেন, তাঁহার বহুমূত্র রোগ হইয়াছে, এবং ইহার প্রতিকারকল্পে নিয়মিত ভোজন ও গম্ভীর চিন্তা হইতে বিরতি আবশ্যক। কলিকাতায় তাহা অসম্ভব ছিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন, তাঁহার পক্ষে শীতপ্রধান স্থান দার্জিলিং-এ চলিয়া যাওয়া উচিত। তদনুসারে মার্চ মাসের মধ্যভাগে সেখানে যাওয়া স্থির হইল। ইহার পূর্বেই সেভিয়ার-দম্পতি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে স্বামীজীর সঙ্গে গেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুক্ত গুডউইন, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ টার্নবুল এবং মাদ্রাজের ভক্ত সর্বশ্রী আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্য, সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র। মাদ্রাজের ভক্তেরা তাঁহারই সহিত জাহাজে আসিয়া এতদিন আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতে-ছিলেন। স্বামীজী দার্জিলিং-এ আগমনান্তর গুরুভ্রাতাদের সহিত ঐ নগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত এম. এন. ব্যানার্জির অতিথি হইলেন। সঙ্গীদের স্থান হইল বর্ধমান-মহারাজের প্রাসাদোপম ভবন 'রোজ ব্যাঙ্ক'-এ। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ মহারাজ কিছুদিনের জন্য উহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

দার্জিলিং-এ আগমনের পরবর্তী তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন তিনি প্রাতঃকালীন জলযোগান্তে ভ্রমণে বাহির হইলেন। শরীর তখন অনেকটা সুস্থ এবং মনও প্রফুল্ল ছিল। গিরিসৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে অল্পবয়স্ক সাথীদের সহিত ধীরপদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, এক ভুটিয়া স্ত্রীলোক পৃষ্ঠে গুরুভার লইয়া কষ্টে চলিতেছে। হঠাৎ স্ত্রীলোকটির পায়ে হোঁচট লাগায় পিঠের বোঝা পড়িয়া গেল এবং সেও ভূপতিত হইল ও তাহার পঞ্জরে দারুণ আঘাত লাগিল। স্বামীজী অনিমেষনয়নে সব দেখিতেছিলেন।

স্ত্রীলোকটির আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নিজের পাঁজরায় আঘাত অনুভব করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন;—আর যেন চলিতে পারিতেছেন না। একটু পরেই বলিয়া উঠিলেন, "বড্ড ব্যথা লেগেছে; আর যেতে পারছি না।" সঙ্গী বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীজী, কোথায় ব্যথা লেগেছে?" তিনি তাঁহার পার্শ্বদেশ দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে—দেখিসনি ঐ স্ত্রীলোকটির লেগেছে।" আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাশূন্য বালকগণ ইহার তাৎপর্য তখন বুঝিতে পারে নাই, বুঝিয়াছিল অনেক পরে। একজনের ব্যথা সত্যই এমন করিয়া অপরের দৈহিক যন্ত্রণার কারণ হইতে পারে—ইহা সাধারণবুদ্ধিগম্য নহে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দক্ষিণেশ্বরে বিবদমান মাঝিদের একজন অপরকে আঘাত করিলে, সে ব্যথা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে অনুভূত হইয়াছিল। ('কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ', ৪৭-৪৮)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই: দার্জিলিং-এ শ্রীযুক্ত এম. এন. ব্যানার্জির বাড়িতে মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন যুবক ছিলেন। তিনি একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বিষম প্রলাপ বকিতে থাকিলেন। কিন্তু স্বামীজী যেমনি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া মস্তক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন, অমনি জ্বর মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে যুবক রোগে ছট্‌ফট করিতেছিলেন, এখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। ইনি বড় ভাবপ্রবণ ছিলেন এবং সঙ্কীর্তনাদিতে প্রায়ই দশাপ্রাপ্ত হইতেন। তখন তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতেন ও চীৎকার বা গোঁ গোঁ করিতেন। স্বামীজী একদিন তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া দিলে ঐ ভাবপ্রবণতা ও দশাপ্রাপ্তি বন্ধ হইয়া যায়। ক্রমে তিনি স্বামীজীর প্রতি ও অদ্বৈতবাদে বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং আরও পরে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত হন।

তৃতীয় ঘটনা খেতড়ি-রাজ অজিত সিং-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য দার্জিলিং হইতে স্বামীজীর কলিকাতায় আগমন। দরবার উপলক্ষে ইংলণ্ড যাইবার পূর্বে খেতড়ি-রাজ স্বামীজীর দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলেন এবং পারিলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাইবেন, ইহাও ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর পক্ষে তখন চিকিৎসকের উপদেশানুসারে তথায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। যাহা হউক, ১৮ই মার্চ রাজা অজিত সিং প্রত্যূষে হাওড়া স্টেশনে পৌছিলে, অন্যান্য সংবর্ধনা-

কারীদের মধ্যে স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও অপর কোন কোন গুরুভ্রাতার সহিত স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। এদিকে স্বামীজী তারযোগে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ২১শে মার্চ, সকাল এগারটায় শিয়ালদহ পৌঁছিবেন। তদনুসারে রাজাজী বন্ধু-বান্ধবসহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সমুচিত সংবর্ধনা করিলেন। তিনি গাড়িতে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর স্বামীজী ও তাঁহার সহিত আগত অপর একজন সন্ন্যাসীর চরণ কেশুর-চন্দনে ধুইয়া দিলেন ও উভয়কে মাল্যভূষিত করিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি সমবেত ভদ্রলোকদের সম্মুখে একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন এবং উহা স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি অশ্বযানের শোভাযাত্রাসহ স্বামীজীকে লইয়া সকলে রাজাজীর বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নানাহার ও বিশ্রামান্তে স্বামীজী সন্ধ্যার দিকে রাজার সহিত আলমবাজার মঠে গেলেন। আবার রাজার বাড়িতে ফিরিয়া সেখানেই নৈশভোজনান্তে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন (২২শে মার্চ) স্বামীজী পুনর্বার মঠে চলিয়া গেলেন। অজিত সিং ২৬শে মার্চ স্বরাজ্যে ফিরিয়া যান; স্বামীজীও ইহারই কোন একদিন দার্জিলিং-এ প্রত্যাবর্তন করেন। ('স্বামী বিবেকানন্দ: এ ফরগটন চ্যাপ্টার', ২১২-১৯)।

দার্জিলিং হইতে স্বামীজী যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাদের প্রথমখানির তারিখ ১৯শে মার্চ এবং সর্বশেষখানির তারিখ ২৮শে এপ্রিল। অতএব অনুমান হয় প্রায় দেড় মাস তিনি সেখানে ছিলেন। ('বাণী ও রচনা', ৭।৩১৯-৩৩)। পত্র কয়খানির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই: প্রথম পত্রখানি তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্বশিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পত্রে (২০শে মার্চ) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজের কার্যপরিচালন-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রদ্বয় ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষালকে লিখিত। এই পত্রদ্বয়ের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। সুশিক্ষিতা স্বদেশবাসিনীর সহিত তিনি পত্রদ্বয়ে বহু সমস্যাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং প্রতি-পঙ্‌ক্তিতে ভারতীয় মহিলাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই পত্রদ্বয়েই তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই;" "যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার

করিয়া।…আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে তাও একান্ত নেগেটিভ (নেতিভাবপূর্ণ)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'।" সব কথা বলার পর তিনি দেহের অপটুতার জন্য আপসোস করিয়া আর ভবিষ্যতের জন্য আশা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন: "হায় হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিস, তায় বাঙ্গালীর শরীর; এই পরিশ্রমেই অতিকঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল! কিন্তু আশা এই—

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

দার্জিলিং হইতে ২৮শে এপ্রিলের শেষ চিঠিতে তিনি মেরী হেলকে জানাইয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে অনেক ভারতীয় রাজা ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন এবং রাজা অজিত সিং তাঁহাকেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ডাক্তারেরা তাঁহাকে ঐ সময়ে কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে বারণ করায় তাঁহার যাওয়া হয় নাই।

দার্জিলিং-এ স্বামীজীর স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিলেও তিনি ভাল ছিলেন এমন কথা বলা চলে না। অবস্থাবিবেচনায় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে এই সময় পরিশ্রম তো দূরের কথা, পুস্তক পর্যন্ত পড়িতেও নিষেধ করেন। বয়স তখন তাঁহার মাত্র চৌত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, অথচ এই বয়সেই চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি মেরীকে লিখিয়াছিলেন: "আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি, আর তা পেকে সাদা হ'তে আরম্ভ হয়েছে।" এই পত্র লেখার পরেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে মাত্র দিন কয়েক থাকিয়া আবার স্বাস্থ্যলাভের জন্য আলমোড়ায় যাইবার কথা ছিল। তাই তিনি ৫ই মে শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, "কাল আলমোড়া নামক আর একটি শৈলাবাসে যাচ্ছি,—স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্য।"

আমরা পরে দেখিব, এইসব চেষ্টা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি তাঁহার হয় নাই; বিশ্রামপ্রাপ্তিও তেমন ঘটে নাই। মা জগদম্বা স্বীয় কর্ম-সমাপনের পূর্বে এই ক্লান্ত রুগ্ন সন্তানের বিশ্রাম বা স্বাস্থ্যোন্নতির কথা তেমন ভাবেন নাই। আর "শাক্ত মায়ের সন্তান" স্বামীজীও দেহবুদ্ধি ভুলিয়া, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হইয়া জননী জন্মভূমির জন্য ক্রমাগত রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন।

জাতের বড়াই

স্বদেশ-প্রত্যাগত স্বামীজী সর্বত্র মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইতেছেন এবং নবীন কর্মধারা-প্রবর্তনে উদ্যত হইতেছেন—ইহা বলিতে বলিতে আমরা অকস্মাৎ দেখিলাম, তাঁহার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্বিবাদ বা নির্বিরোধ ছিল না। এই বিরোধের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্বেও পাইয়াছি। অনুরাধাপুরমে বৌদ্ধগণ তাঁহার সভা পণ্ড করিয়াছিলেন; মাদ্রাজে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তর্কে হারাইতে আসিয়াছিলেন, কেহ বা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শূদ্র হইয়াও তিনি কিরূপে কাষায়ধারী হইলেন। বঙ্গদেশেও এই জাতীয় বাধা যে একেবারে ছিল না এবং ইহাতে স্বামীজীর কার্য যে ব্যাহত হয় নাই, একথা বলা চলে না। উহারই একটু আলোচনা আমরা এই অধ্যায়ে করিব।

পুরাতন কথা। স্বামীজী যখন শত্রুদের আক্রমণে আমেরিকায় আপনাকে বিপর্যস্ত মনে করিতেছিলেন এবং স্বদেশের সমর্থনলাভেচ্ছায় কলিকাতায় সভা আহ্বানের পরামর্শ দিয়াছিলেন, তখনও রক্ষণশীল-সমাজে স্বামীজীর জাতি লইয়া প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। "সভাপতি নির্বাচন করিবার জন্য শ্রীমনোমোহন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, চারুচন্দ্র বসু ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গিয়াছিলেন।… এরূপ সভায় (তাঁহার) সভাপতিত্ব গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় একথা তাঁহাকে বলিলে প্রথম হইতেই স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহহীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়। পরে তিনি বলেন যে, কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ নাম গুরুদত্ত নহে, শাস্ত্রমতে শূদ্রের সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার আছে কিনা এবিষয়ে বহু মতভেদ আছে এবং সন্ন্যাসী হইয়া ম্লেচ্ছদেশে গমনেও বিশেষ প্রত্যবায় আছে ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন। 'দেখুন, আমি আর এই বৃদ্ধ বয়সে কোন ধর্মসভায় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বা সভাপতি হইব না, এরূপ স্থির করিয়াছি। বিশেষতঃ যেসব কার্যে সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সেসব কাজের ভিতর আর আমি যাইতে চাই না'।" গুরুদাসবাবু বিদেশপ্রবাসী অনধিকারী শূদ্র-সন্ন্যাসীকে হিন্দুসমাজের সমর্থন জানাইতে সম্মত হইলেন না। ('বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', ৩।১২৫-২৬)।

গুরুদাসবাবু অস্বীকৃত হওয়ায় অতঃপর উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে ঐজন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি স্বামীজীর বিষয়ে সব শুনিয়া সম্মত হইলেন। কিন্তু সভায় বক্তৃতাদানকালে "রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'স্বামী বিবেকানন্দ' কথাটিতে আপত্তি করিয়া 'ব্রাদার বিবেকানন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ; কারণ কায়স্থ সন্ন্যাসী হইতে পারে কিনা এবিষয়ে তখনও তাঁহার সন্দেহ ছিল।" (ঐ, ১২৯)।

সমুদ্র-যাত্রা লইয়া দ্বিতীয় সমস্যা উপস্থিত হয় স্বামীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর। ঘটনাস্থল প্রধানতঃ দক্ষিণেশ্বরের ৺কালী-মন্দির। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ 'কথা-সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩৭১) 'স্বামী বিবেকানন্দ ও দক্ষিণেশ্বরে মন্দির বিতর্ক' শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ ঘটনায় আসার পূর্বে লেখকদ্বয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে যে সভায় স্বামীজীকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়, ঐ সভার বিবরণ দিতে গিয়া 'অনুসন্ধান' পত্রিকা হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। পত্রিকায় আছে : "বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার টাউন হলে হিন্দুদিগের এক সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য চিকাগোর ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং আমেরিকাবাসিগণ যে স্বামীজীকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এই সভায় চারি সহস্রেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল।...এই সভা সম্বন্ধে বড়ই একটা রহস্য আছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বলিতেছেন, ইহা হিন্দুদিগের সভা ; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্ম সহযোগিনী 'সঞ্জীবনী' বলিতেছেন যে, বিবেকানন্দ একসময়ে তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন গায়ক ছিলেন এবং তিনি চিকাগো মেলায় যে ধর্ম প্রচার করেন, তাহা হিন্দুধর্ম নয়—ব্রাহ্মধর্ম, সেই কারণে সেদিনকার সভায় অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন ; সুতরাং এসভাকে হিন্দুসভা না বলিয়া ব্রাহ্মসভা বলা উচিত। এদিকে একজন আমেরিকাপ্রবাসীকে হিন্দু বলিতে সহযোগী 'বঙ্গবাসী' প্রস্তুত নহেন। সুতরাং টাউন হলের সভায় 'বঙ্গবাসীর' চিহ্নিত হিন্দুরাজা প্যারীমোহন সভাপতি হইলেও তাঁহার মতে উহা হিন্দুর সভা নহে। এখন বল মা তারা, দাঁড়াই কোথায় ?" মনে রাখিতে হইবে, 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক ছিলেন কায়স্থ-

কুলোদ্ভব যোগেন্দ্রনাথ বসু ; ইনি তখন ব্রাহ্মণদের অনুসৃত স্থিতিশীলতার সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর এবং অব্রাহ্মণ বিবেকানন্দের সন্ন্যাসগ্রহণ, হিন্দুর সমুদ্রগমন ও ম্লেচ্ছাহার ইত্যাদির জন্য সবিশেষ চিন্তিত ও রোষে বিচলিত।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, মার্চ মাসের প্রথম দিকে (১৮৯৭) যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব হয়, তখন বিদেশ-প্রত্যাগত ও ম্লেচ্ছাচারী স্বামী বিবেকানন্দ ৺কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ও ৺রাধাকান্ত মন্দিরে ৺রাধাকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন। ঐদিন স্বামীজীর সহিত দুইটি ইংরেজ মহিলাও মন্দিরোদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে রক্ষণশীলদলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর স্বামীজী দার্জিলিং হইতে নামিয়া আসিয়া ২২শে মার্চ যখন খেতড়ি-রাজের সহিত দক্ষিণেশ্বরে ৺কালীমন্দিরাদি দেখিয়া আসিলেন, তখন ঐ ঘটনা লইয়া এক বিরোধের সূত্রপাত হইল এবং পত্রিকাদির সাহায্যে রক্ষণশীলদল প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। "এ ব্যাপারে 'বঙ্গবাসী' কাগজই উদ্দীপনা দেখিয়েছিল বেশী।" 'বঙ্গবাসী'র মোট বক্তব্য ছিল এই যে, স্বামীজীকে মন্দির-কর্তৃপক্ষ অপমান করিয়া সরাইয়া দেন। এই বিতর্কের পারম্পর্য এইরূপ :

২৮শে মার্চ 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ এক পত্র লিখিয়া সিংহলবাসী ইওরোপীয় বৌদ্ধ টি. জে. হ্যারিসন জানাইলেন যে, যদিও ২৭শে মার্চের 'বঙ্গবাসী'তে খেতড়ির রাজার সহিত স্বামীজীর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গমনের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "তাঁহাদের প্রতি মালিকের তরফে সদ্ব্যবহার করা হয় নাই", তথাপি উহা ঠিক নহে—"আমি ঐ দলের সঙ্গে ছিলাম এবং··প্রত্যক্ষ-দর্শিরূপে আমি উক্ত···বিষয়ের দৃঢ় অস্বীকার না করিয়া পারিতেছি না, কারণ আমাদের অবস্থানকালে কোন ব্যক্তি এমন কিছু করেন নাই বা বলেন নাই, যাহাতে উক্ত বিবৃতি সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।" হ্যারিসন আরও লিখিয়াছিলেন যে, মন্দিরের কর্তারা বরং যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন এবং দর্শনযোগ্য কোন কিছু দেখাইতে বাকি রাখেন নাই ; তবু 'বঙ্গবাসী'তে ঐরূপ বিবৃতি প্রকাশের কারণ এই হইতে পারে যে, "লেখক মন্দিরের মালিক পক্ষের উপর পুরাতন কোন আক্রোশের শোধ তুলিতে চাহিয়াছেন।" এই পর্যন্ত স্বামীজীর পক্ষসমর্থকদের ধারণা ছিল যে, মন্দিরের স্বত্বাধিকারী তাঁহাদের বিরোধী নহেন।

৩০শে মার্চ ঐ একই সুরে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ আর একখানি পত্র প্রকাশ করিলেন: 'বঙ্গবাসীতে' যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সে বিষয়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শিরূপে আমি জানাইতে পারি,…লিখিত বিষয় একেবারেই মিথ্যা।" ঐ পত্রে আরও প্রকাশ: জনৈক সাধুর সহিত হ্যারিসন সাহেব জানবাজারে মন্দিরাধিকারী ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসকে স্বামীজী ও খেতড়িরাজের মন্দির-দর্শন বিষয়ে বলিতে গেলে ত্রৈলোক্যবাবু অসুস্থতাবশতঃ দেখা করেন নাই, কিন্তু বলিয়া পাঠান যে, বিকালে পাঁচটার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। অতিথিরা মন্দিরে উপস্থিত হইলে খাজাঞ্চি ভোলানাথবাবু ও অন্যান্য কর্মচারীরা এবং ত্রৈলোক্যবাবুর পুত্রগণ "অতীব ভদ্রতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দসহ অতিথিদলকে কালীঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পবিত্র দেবীমূর্তির নিকট-দর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। তখন প্রায় ছয়টা। খাজাঞ্চি যাহাতে অধিক আলোক আসিয়া দেবী প্রতিমার উপর পড়ে তাহার জন্য মন্দিরের পশ্চিম দরজা পর্যন্ত খুলিয়া দেন।" মহেন্দ্রনাথের আর একখানি অনুরূপ পত্র বাহির হয় 'মিররে' ২রা এপ্রিল। উহাতেও ত্রৈলোক্যনাথের উপর কোন ইচ্ছাকৃত দোষের আরোপ করা হয় নাই। পত্রে আরও বলা হইয়াছিল: "গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া 'বঙ্গবাসী' কাগজটি স্বামী বিবেকানন্দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে।"[১]

এ পর্যন্ত একেবারে মন্দ চলিতেছিল না; কিন্তু সম্ভবতঃ 'বঙ্গবাসী' ও প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলদের চাপে পড়িয়া ত্রৈলোক্যনাথ তাল সামলাইতে পারিলেন না। তাই 'বঙ্গবাসী'তে ১৫ই চৈত্র খাজাঞ্চী ভোলানাথবাবুর একখানি পত্র বাহির হইল প্রতিপক্ষের সমস্ত কথার অস্বীকারকল্পে। পরে তাঁহার প্রভু ত্রৈলোক্যবাবুরও অনুরূপ পত্র বাহির হইল। তফাত এইটুকু যে, ভোলানাথ বলিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষতঃ মন্দির হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়; আর তাঁহার প্রভু লিখিলেন: তাড়ানো হইয়াছিল ঠিকই তবে প্রত্যক্ষতঃ নহে, পরোক্ষতঃ। ত্রৈলোক্যবাবু আরও লিখিলেন যে, তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন—জয়পুরের মহারাজ মন্দির-দর্শনে যাইবেন। এ বিষয়ে ত্রৈলোক্যবাবুর সন্দেহ থাকিলেও তাঁহার পুত্রগণ জয়পুরের মহারাজকে দেখিবার জন্য উৎসুক হওয়ায় তিনি তাহাদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার

[১] গবেষণাকারী লেখকদ্বয় পুরাতন 'বঙ্গবাসী'র ফাইল পান নাই।

সঙ্গিগণ পরোক্ষভাবে মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে নয়, যেরূপ বাবু ভোলানাথ (মুখোপাধ্যায়) বলিয়াছেন। স্বামীজী ও রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি কাহাকেও বলি নাই এবং আমিও তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানাই নাই। যে ব্যক্তি বিদেশে যাওয়া সত্ত্বেও আপনাকে হিন্দু বলিতে পারে, এমন কাহারও সহিত সামান্য মাত্র সম্পর্ক থাকা উচিত বলিয়া আমি বিবেচনা করি নাই।...প্রতিমার পুনরভিষেকের যে সংবাদ আপনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।" মন্দিরে স্বামীজীর প্রবেশের ফলে দেবীর পুনরভিষেকের প্রয়োজন হইয়াছিল! এখানে মজার কথা এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব-দিনেও স্বামীজী মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া প্রতিমাদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পুনরভিষেকের প্রয়োজন হয় নাই। এবারে 'বঙ্গবাসী'র কলমের ভয়ে তাহাও করিতে হইল! গবেষকদ্বয় লিখিয়াছেন, "পত্রগুলি থেকে আরও প্রমাণ হয়,—স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ অসম্মান করা সম্ভব হয়নি, বরং তাঁকে অভ্যর্থনাই জানানো হয়েছিল।...এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের মহিমাই আবার প্রমাণিত হল—তিনি উপস্থিত থাকলে তাঁকে অস্বীকার করা কারো সাধ্যে নেই।" পরোক্ষ অপমান এই ছিল যে ত্রৈলোক্যবাবু স্বয়ং স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, যদিও তিনি ঐ কালে মন্দিরোদ্যানেই উপস্থিত ছিলেন, অধিকন্তু ত্রৈলোক্যবাবুর মতে তিনি কাহাকেও স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিতে নির্দেশ দেন নাই। স্বামীজীকে অবশ্য বলা হইয়াছিল যে, অসুস্থতানিবন্ধন তিনি দেখা করিতে পারেন নাই।

এই চিঠির উত্তরে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর একখানি পত্রে ত্রৈলোক্যবাবুর কথা ও ব্যবহারের মধ্যে পূর্বোক্ত অসামঞ্জস্যগুলি দেখাইয়া দেন এবং আরও প্রকাশ করেন যে, হিন্দুধর্মের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ বিলাত-ফেরত কেশবের গৃহে যাইতেন ও সেখানে লুচি মিষ্টি খাইতেন বলিয়া ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার মন্দিরে প্রবেশে বাধা দিবার কথাও ভাবিয়াছিলেন, যদিও কার্যে পরিণত করেন নাই। আর একবার ক্যাপ্টেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ঐ বিষয়ে আপত্তি জানাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, এরূপ বিদ্বেষ অযৌক্তিক, কারণ বেদান্তমতে সবই ব্রহ্ম, আর ক্যাপ্টেন স্বয়ং এমন গোঁড়া হইয়াও সাহেবদের সঙ্গে করমর্দনাদি করেন।

অবশ্য ম্লেচ্ছদের সহিত সহজভাবে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সামাজিক ভিত্তিতে না হইয়া ধার্মিক ভিত্তিতেই সংস্থাপিত ছিল। স্বামী

বিবেকানন্দও ঐ পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি রক্ষণশীলদের অনুসৃত কূপমণ্ডূকত্বের বিরোধী ছিলেন ; আবার সংস্কারপন্থী প্রগতিশীলদের অনুমোদিত আত্মাবমাননারও বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বিদেশগমন বা ম্লেচ্ছদের সহিত অবাধ আদান-প্রদানের পশ্চাতে বিন্দুমাত্র স্বার্থসংস্পর্শ বা হঠকারিতা ছিল না। এই হেতু তাঁহার আচরণ সংরক্ষণশীলদের ও প্রগতিবাদীদের উষ্মার কারণ ঘটাইলেও হিন্দু জনসাধারণ উহাকে অনিন্দনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছিল এবং ক্রমে গ্রহণও করিয়াছিল। অবশ্য আর্থনীতিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনাদির ফলে সমুদ্রযাত্রাদি আচরণ কালে গ্রহণীয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকৃত হইত ; কিন্তু ঐ সমস্যাসমাধানকল্পে স্বামীজী যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুসাধারণের পক্ষে উহা সহজে গ্রহণীয় হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই অবদান স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাই দেখা যায়, সমসাময়িক সংবাদপত্র মাদ্রাজের 'সোশ্যাল রিফর্মার' বা কলিকাতার 'বেঙ্গলী'তে স্বামীজীর অভিমত প্রামাণিকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

দেশীয় সংবাদপত্রে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যখন চলিতেছে, স্বামীজী তখন দার্জিলিং-এ, আর তিনি মন্দিরকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার অজ্ঞাত। বস্তুতঃ তিনি এই কাল্পনিক ঘটনার সহিত মোটেই জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? শত্রুপক্ষ এমন একটা সুযোগ হাত-ছাড়া করিবে কেন ? অতএব মিশনরীদের মাধ্যমে এই সংবাদটি খুব ফলাও করিয়া আমেরিকায় পরিবেশিত হইল। আর এই কুৎসা-রটনার অন্যতম প্রধান পাণ্ডা হইলেন ডাঃ ব্যারোজ। ব্যারোজের বিরোধিতার একটি কারণ এই ছিল যে, তিনি মনে করিতেন স্বামীজীর আমেরিকায় জয়লাভের পশ্চাতে তাঁহার হাত অনেকখানি ছিল ; কারণ চিকাগো ধর্ম-মহাসভার পরিচালকরূপে তিনি স্বামীজীর অনেক সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ স্বামীজীর উচিত ছিল, ব্যারোজ খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে পদার্পণ করিলে ঐ বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করা। কিন্তু ব্যারোজ দেখিলেন, তিনি মাদ্রাজে আসিলেও স্বামীজী প্রচারসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না করিয়া এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া মাদ্রাজ হইতে চলিয়া গেলেন। ফলতঃ এইভাবে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া ব্যারোজ প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রচার করিলেন : স্বামীজী জাতিচ্যুত হইয়াছেন বলিলে ভুল হইবে, কারণ

হারাইবার মতো জাতিই তাঁহার নাই—তিনি শূদ্র ; অধিকন্তু তিনি আমেরিকান নারীসমাজকে নিন্দা করিয়াছেন। ১০ই মে (১৮৯৭) ভারত হইতে ফিরিয়া ক্যালিফর্নিয়ায় পদার্পণ করিবামাত্র সেই সন্ধ্যায়ই ব্যারোজ 'ক্রনিকল' কাগজের সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাৎকারসূত্রে আমেরিকাবাসীদিগকে জানাইয়া দিলেন :

"স্বামী (বিবেকানন্দ) আমার আগমনের একসপ্তাহ পূর্বে মাদ্রাজে পৌঁছিলেন, অথচ আমাদের পূর্ব পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য আমার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না, প্রত্যুত আমি যেদিন পৌঁছিলাম, তাহারই পর দিন তাড়াতাড়ি মাদ্রাজ ছাড়িয়া গেলেন। 'ক্রনিকল'-এ আমেরিকার নারীসমাজ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য তাঁহারই উক্তিরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সবটা সত্যই তাঁহার এবং তিনি মিথ্যাকথা বলিতেছেন, ইহা তাঁহার জানা ছিল বলিয়াই তিনি আমাকে এড়াইয়া গেলেন। একটা বিষয়ে কিন্তু একটু সংশোধন করিতে চাই। ঐ স্বামীটি নিজের আচরণের ফলে যে জাতিচ্যুত হইয়াছেন, তাহা ঠিক নহে ; এখন ইহা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, তিনি কোন কালেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না ; ভারতের সম্ভ্রান্ত জাতিগুলির নিম্নতম যে শূদ্রজাতি, তিনি তাহারই অন্তর্ভুক্ত। তিনি আমেরিকার নারীদের সম্বন্ধে ও আমেরিকার প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার সহিত পরিচিত অনেক হিন্দুই বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা আমার নিকট আসিয়া স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের ধর্মের প্রবক্তা নহেন। বিবেকানন্দের কথাগুলির মধ্যে আমার মতে সর্বাধিক আপত্তিজনক হইতেছে এই হাস্যোদ্দীপক ও অতিরঞ্জিত মন্তব্যটি যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হিন্দুবক্তাদের বেশ প্রভাব আছে। তাঁহার এমন বহু গুণ আছে যাহা চমৎকার ও আনন্দপ্রদ ; কিন্তু মনে হয় তাঁহার মস্তিষ্কের সাম্য হারাইয়া গিয়াছে। আমি মোটে বুঝিতেই পারিতাম না, তাঁহার কথাগুলিতে কোন গুরুত্ব আরোপ করিব কিনা। আমার মনে হইত তিনি যেন আর একটি (হাস্যরসিক) হিন্দু মার্ক টোয়েন। তিনি প্রতিভাবান ব্যক্তি এবং কিছু অনুগামীও পাইয়াছেন—যদিও উহারা চিরকাল থাকিবে না।" (ইংরেজী জীবনী, ৫১২)।

মিশনরীদের ও ব্যারোজের প্রদর্শিত দোষত্রুটিগুলি তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এইরূপ : স্বামীজী অকৃতজ্ঞ ; তিনি ভারতে ও বাহিরে যতখানি জনপ্রিয়তার দাবী করেন, বস্তুতঃ তাহা ততটা বা তেমন স্থায়ী নহে ; তিনি জাতিচ্যুত অথবা

নিম্নবর্ণসম্ভূত শূদ্র ; আর তিনি আমেরিকান মহিলাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ। স্বামীজী পূর্বে প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রাদিতে এই জাতীয় দোষারোপের প্রতিকার কোন কালে করেন নাই ; এবারেও করিলেন না। তথাপি ঐ প্রচারের প্রাক্‌কালে, সমকালে অথবা পরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যেসব ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার সমুচিত উত্তর পাওয়া যায়।

প্রথমে অকৃতজ্ঞতার কথাই ধরি। স্বামীজী ব্যারোজকে সাহায্য করেন নাই, ইহা সর্বৈব মিথ্যা। ব্যারোজ ভারতে আসিবার পূর্বে স্বামীজী লণ্ডন হইতে ২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬ তারিখের যে পত্রখানি 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ প্রকাশ করেন তাহাতে এই কথাগুলি ছিল : "চিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ ধর্মমহাসভার স্বীয় বিরাট কল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মিঃ সি. বনি ডাঃ ব্যারোজকে সহকারী নিযুক্ত করায় দক্ষতম ব্যক্তির হস্তেই কার্যভার অর্পিত হয়েছিল ;…ডাঃ ব্যারোজের অদ্ভুত সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল সহনশীলতা ও ঐকান্তিক ভদ্রতাই এই মহাসভাকে অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত করেছিল।…অন্যান্য সকলের তুলনায় ডাঃ ব্যারোজের কাছেই আমরা বেশী ঋণী। তা ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধর্মের পবিত্র নাম, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্যের নাম নিয়ে আসছেন এবং আমার বিশ্বাস—ন্যাজারেথের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা অতিশয় উদার হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত করবে।…তাই আমার দেশবাসীর কাছে বিনীত অনুরোধ—পৃথিবীর অপর দিক থেকে আগত এই বিদেশী ভদ্রলোকের প্রতি তাঁরা এমন আচরণ করুন, যেন তিনি দেখতে পান যে, এই দুঃখ দারিদ্র্য ও অধঃপতনের ভেতরও আমাদের হৃদয় সেই অতীতেরই ন্যায় বন্ধুত্বপূর্ণ আছে, যখন ভারত আর্যভূমি ব'লে পরিচিত ছিল এবং যখন তার ঐশ্বর্যের কথা জগতের সব জাতের মুখে মুখে ফিরত।" ('বাণী ও রচনা', ৭।২৭৪-৭৫)।

মাদ্রাজে ব্যারোজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাওয়ার কারণস্বরূপে স্বামীজী নিজেই লিখিয়াছিলেন যে, স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়েই তাঁহাকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। মিশনরীদের ও ব্যারোজের অন্যান্য দোষারোপ ক্ষালনের জন্য তিনি সংবাদপত্রাদির সাহায্য না লইয়া অন্যপ্রসঙ্গে বন্ধুবান্ধবকে ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখিতে গিয়া যে দুই-চারিটি কথা বলিয়াছিলেন আমরা তাঁহার ৩০শে জানুআরি, ২৮শে এপ্রিল ও ৯ই জুলাই (১৮৯৭) তারিখের

পত্রত্রয় হইতে সেই সব কথা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি; উহাতেই বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। পত্রগুলি মেরীকে লিখিত।

প্রথম পত্রে আছে: "ডাক্তার ব্যারোজকে সাদর-অভ্যর্থনা করার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার স্বদেশবাসীদের নিকট চিঠি লিখেছিলাম। তাঁরা তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা করেছিল। কিন্তু তিনি লোকের মনের উপর রেখাপাত করতে পারেননি, তার জন্য আমি দোষী নই। কলকাতার লোকের ভিতর নূতন কিছু ভাব ঢোকানো বড় কঠিন। ডাক্তার ব্যারোজ আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবছেন, আমি শুনতে পাচ্ছি; এই তো সংসার!"

দ্বিতীয় পত্রে আছে: "আশা করি ডাঃ ব্যারোজ এতদিনে আমেরিকায় পৌঁছেছেন। আহা বেচারা! তিনি অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুনল না। অবশ্য লোকে তাঁকে খুব সাদর অভ্যর্থনা করেছিল; তাও আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি তো আর তাঁর ভিতরে বুদ্ধি ঢোকাতে পারি না! অধিকন্তু, তিনি যেন কি-এক অদ্ভুত ধরনের লোক! শুনলাম, আমি দেশে ফিরে আসলে সমগ্র জাতিটা আনন্দে যে মেতে উঠেছিল, তাতে তিনি খেপে গিয়েছিলেন। যে করেই হোক, আরও বেশী মাথাওয়ালা একজনকে পাঠানো উচিত ছিল, কারণ ডাঃ ব্যারোজ যা বলে গেছেন তাতে হিন্দুরা বুঝেছে ধর্মমহাসভা ছিল একটা তামাশার ব্যাপার (ফার্স)। দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হ'তে পারবে না।"

তৃতীয় পত্রে আছে: "আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের টুকরো অংশ পেয়েছি; তাতে দেখলাম মার্কিন মেয়েদের সম্বন্ধে আমার উক্তিসমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—তাতে আরও এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার জাত হারাবার ভয়—আমি যে সন্ন্যাসী! জাত তো কোনরকম যায়ইনি, বরং সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল, আমার পাশ্চাত্ত্য দেশে যাওয়ার দরুন তা বহুল পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয়, তা'হলে ভারতের অর্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে হবে। তাতো হয়ইনি, বরং সন্ন্যাস নেবার পূর্বে আমার যে জাতি ছিল, সেই জাতিভুক্ত এক প্রধান রাজা আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি সামাজিক

ভোজের আয়োজন করেছিলেন; তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন।...আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরকমটি কারও হয়নি। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হ'ত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসের দরকার হ'ত—জাতিচ্যুত করাই বটে!"

জাতি-চ্যুতি বা সমাজ-চ্যুতির ঠিক উত্তর দিতে গিয়া এখানে ব্যক্তিগত গৌরবের যে উল্লেখ আছে, তাহাকে যেন কোন পাঠক অহঙ্কারের পরিচায়ক বলিয়া মনে না করেন; কারণ তিনি পত্রখানি লিখিয়াছিলেন স্বীয় 'ভগিনী' মেরীকে ব্যক্তিগতভাবে, আর এ চিঠি সাধারণের নিকট শীঘ্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। জাতিচ্যুতির উত্তর দিয়া স্বামীজী ঐ চিঠিতে অন্য বিষয়-গুলিরও আলোচনা করিলেন:

"আমার এরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরীভায়াদের প্রভাব বেশ ক্ষয় ক'রে দিয়েছে। আর তারা এখানে কে? কেউ না। তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমাদের খেয়াল নেই! আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরীভায়াদের সম্বন্ধে—ইংলিশ চার্চের অন্তর্ভুক্ত ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরীর দল কোন্ শ্রেণীর লোক থেকে সংগৃহীত, সে সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার চার্চের অতিরিক্ত গোঁড়া স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং তাদের কুৎসা সৃষ্টি করবার শক্তি সম্বন্ধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল। মিশনরীভায়ারা আমার আমেরিকার কাজটা নষ্ট করবার জন্য এইটিকেই সমগ্র মার্কিন নারীর উপর আক্রমণ ব'লে ঢাক পেটাচ্ছে—কারণ তারা বেশ জানে, শুধু তাদের (মিশনরী-দের) বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা খুশীই হবে। প্রিয় মেরী, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথাই ব'লে থাকি—তারা আমাদের মা-বোনদের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলে, তাতে কি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়?"

স্বামীজীর পক্ষে স্বভাবতই নিজের অপ্রকাশিত চিঠি হইতে উদ্ধৃতি দিয়া আমেরিকান নারীসমাজের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রমাণ করা সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু আমরা জানি উহা কত গভীর ও অকৃত্রিম ছিল। দুই-চারিটি কথা এখানে উপস্থিত করিলেই যথেষ্ট হইবে: "আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের

চালচলন নারীর মতো নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐপ্রকার মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত!" ('বাণী ও রচনা', ৭।৩৭)। "কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখিয়াছি, কত শত জননী দেখিয়াছি, যাঁহাদের নির্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি, যাহারা 'ডায়না দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্মল'—আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না!" (৭।৩৮)। "এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরব।" (ঐ, ৬।৪৮৫)।

আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি স্বামীজীর দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে প্রথম যখন জাতিচ্যুতি লইয়া অপ্রীতিকর বাদ-বিসংবাদ আরম্ভ হয়, তখন তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। আর জানিবেনই বা কিরূপে। তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মা-কালীকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, মন্দিরের কর্মচারীরা ও বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহার সহিত সাদর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার এইরূপ মনে করার কি কারণ ঘটিতে পারে যে, অতঃপর শত্রুপক্ষ একটা কাল্পনিক ঘটনা রচনা করিয়া বলিবে যে, তিনি সমুদ্র-যাত্রার ফলে জাতিচ্যুত হওয়ায় মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন? আর তাহা সত্য হইলেও স্বামীজীর ব্রত উদ্‌যাপনে উহা কোন স্থায়ী বাধা ঘটাইতে পারিত কি? অথবা স্বামীজীর হৃদয় উহাতে বিকম্পিত হইত কি? এই অনুদার-তাকে তিনি কিরূপ অবজ্ঞাভরে দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ পায় তাঁহার অনেক পরবর্তী একখানি চিঠিতে—যখন তিনি স্টার্ডির কতকগুলি বৃথা দোষারোপের উত্তর দিতে গিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছিলেন: "ভারতে অনেকে···ইওরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইউরোপীয়দের সঙ্গে খাই ব'লে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয়

হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হ'তে পারি ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক তো আজও দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে।”

ঘটনাপরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রখানি পড়িলে সন্দেহ থাকে না যে, স্বামীজী স্টার্ডিকে পালটা জবাব দিবার মুখে তর্কের খাতিরে ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের কাল্পনিক বর্ণনা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কোন একটি পারিবারিক দেবালয় (অর্থাৎ বিশ্বাসদের দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি) হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু অতঃপর সত্যসত্যই তাঁহাকে ঐ মন্দিরে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবকালে। উৎসবের পূর্বেই বিশ্বাসদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, “এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব ; কারণ রাসমণির (বাগানের) মালিক বিলাত-ফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দিবেন না !!”

স্বদেশে ও বিদেশে এই প্রকার বিরোধ ও যুক্তিহীন লোকনিন্দার কথা শুনিয়াও অকম্পিতহৃদয় স্বামীজী মেরীকে লিখিয়াছিলেন (৯।৭।৯৭): “প্রিয় মেরী, আমার জন্য কিছু ভয় ক'রো না।...যাই হোক না কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি কখনও কোন জিনিস মতলব ক'রে করিনি। আপনা-আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে, আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত ক'রে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা-আক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি ?...কি ! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার, তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবো ?—আমাকে দেখে কি তেমনি মনে হয় ?”

শূদ্র বিবেকানন্দের সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর হিন্দুধর্মের প্রচারক হওয়ার দাবী, সমুদ্রযাত্রা ও ম্লেচ্ছাহার-গ্রহণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া দেশ-বিদেশে যে বাদ-

প্রতিবাদ বা শক্রপীড়নের উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, উহারই যেন চরম নিষ্পত্তি পাই শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত স্বামীজীর ৩০শে মে (১৮৯৭) তারিখের পত্রে। মেরীকে লিখিত পত্রে উত্তর আছে, ঔদাসীন্য আছে, আর বীরোচিত আত্মপ্রত্যয়ের কথা আছে। কিন্তু সেসব কথা প্রধানতঃ আমেরিকান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে লিপিবদ্ধ। প্রমদাবাবুকে লিখিত পত্রখানি ভারতীয় পরিবেশমধ্যে এক সুশিক্ষিত প্রাচীনপন্থী পুরাতন বন্ধুর উদ্দেশে বিরচিত। ইহাই প্রমদা-বাবুকে লিখিত তাঁহার শেষ পত্র এবং এই পত্রে আরও দেখি, যে অবুঝ প্রাচীন সমাজ কথায় গোঁড়ামি প্রকাশ করে, অথচ অন্তরে পাশ্চাত্ত্যের বাহবা লাভে লালায়িত থাকে আর ব্যবহারে দুর্বল ও দরিদ্রদিগের নিষ্পেষণে নিরত হয়, তাহার প্রতি তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীয় মনোভাব জানাইয়া সর্বপ্রকার রক্ষা করিয়া চলার উপর একখানি মোটা পরদা টানিয়া দিলেন—সে পথের এখানেই ইতি। পত্রখানির উল্লেখযোগ্য অংশগুলি এই :

"শুনিলাম, গৌরচর্মবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়।...আমি ম্লেচ্ছ, শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা খাই, যার-তার সঙ্গে খাই—প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে। তা ছাড়া মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত—এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐ সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম 'ঈশ্বর' যদি হয় তো বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।...উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার ; কারণ ইহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ ; রামানুজ-শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতাই,—আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব ! তা কি হয়, মহাশয় ? কখনও হয়েছে, না হবে ? 'আমি'র লেশ থাকতে কি কিছু হবে ? অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা [হইতেছে] এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহাভেদকারী ও মায়ার মূল—জন্মগত ও গুণগত সর্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক—বাহিরে ব্যাবহারিকে, জাতি-আদি রাখিতে হইবে বৈকি।...মনে মনে অভেদবুদ্ধি ('পেটে পেটে' যার নাম বুঝি), আর বাহিরে পিশাচ নৃত্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন—গরীবের যম ; আর চণ্ডালও যদি বড়

মানুষ হয়, তিনি ধর্মের রক্ষক !!! তাতে আমি পড়ে-শুনে দেখেছি যে, ধর্মকর্ম শূদ্রের জন্য নহে ; সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি বিচার করে তো তাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র।[১] আমি শূদ্র ও ম্লেচ্ছ—আমার আর ও-সব হাঙ্গামে কাজ কি? আমার ম্লেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাড়ীর অন্নে বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা—যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়, ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি তাঁহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে। আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা 'আমার মুক্তি', আমার মুক্তি' ক'রে দিনরাত মাথা ভাবায়, তাহারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়—তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।"

সুন্দর উত্তর—সব দিক হইতে ; শাস্ত্র, দর্শন, যুক্তি, সাধারণ বুদ্ধি, হৃদয়বত্তা, নবীন যুগাদর্শ সবই ইহাতে আছে। আর মজার কথা এই—প্রতিপক্ষভূত যাঁহারা শূদ্র নরেন্দ্রনাথ দত্তকে ভূশায়িত করিয়া প্রকৃত ধর্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ—যোগেন্দ্রনাথ বসু, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস, প্রমদাদাস মিত্র, ব্যারোজ—তাঁহারা সকলেই অব্রাহ্মণ, শূদ্র! পত্রখানি যদিও জনসাধারণে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি পরবর্তী যুগে ভারতীয় ক্ষেত্রে স্বামীজীকে বুঝিবার পক্ষে ইহা অমূল্য। ঠিক এমনি আর একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উত্তর পাই পাশ্চাত্ত্য ক্ষেত্রে ডাঃ জেন্‌সকে লিখিত শ্রীযুক্তা ওলি বুলের ৭ই জুনের (১৮৯৭) পত্রে :

"ক্যালিফর্নিয়ার খবরের কাগজের যে টুকরো পাঠাইয়াছেন, *সেজন্য ধন্যবাদ*। ডাঃ ব্যারোজ যখন এমন স্পষ্টভাষায় বিবেকানন্দকে মিথ্যাবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক মাদ্রাজে ডাঃ ব্যারোজকে এড়াইয়া গিয়াছিলেন, তখন ডাঃ ব্যারোজেরই মঙ্গলকামনায় আমাকে সখেদে বলিতে হইতেছে যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সেসব সুপ্রচারিত অভ্যর্থনাজ্ঞাপক পত্রগুলির উল্লেখ করেন নাই, যাহাতে স্বামীজী হিন্দুগণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ডাঃ ব্যারোজ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিংবা

১। ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্মেঽস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্। মনু, ১০।১২৬

স্বধর্ম সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, সেসব কথা না ভাবিয়াই ডাঃ ব্যারোজ ও বনি চিকাগোতে সমবেত প্রাচ্য প্রতিনিধিদের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য হিন্দুরা যেন তাঁহাকে তদনুরূপ হার্দিক ও বাচনিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সমগ্র ভারতীয় জাতিটি যখন অদৃষ্টপূর্ব হার্দিকতা ও উৎসাহ লইয়া সন্ন্যাসিপ্রবরকে সংবর্ধনা করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই প্রচারিত এই পত্রগুলির সহিত যখন ডাঃ ব্যারোজ স্বদেশে পদার্পণান্তর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসব কথা অধুনা বলিয়াছেন তাহার তুলনা করি, তখন কীদৃশ বৈপরীত্যই না প্রকটিত হয়, আর উভয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য ভারতীয়দের সমক্ষে উভয়ের কিরূপ চিত্রই না উপস্থিত হয়!...

"এখানে বলা চলে যে, ভারতভূমিতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্য যেসব সংবর্ধনার আয়োজন চলিতেছিল তাহাতে আগাগোড়াই তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় ছিল এবং অবশেষে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম বর্জন করিয়া কয়েক মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইয়াছিল। বিবেকানন্দ আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি আমাকে জানানো হয়। এবং আমি অবগত আছি যে, স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তনের দুই বৎসর পূর্ব হইতেই এদেশে এবং ওদেশে স্বামীজীর বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইতেছিল যে, তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আমেরিকান নারীদের নিন্দা করিয়াছেন, আর তৎসহায়ে প্রমাণ করা হইতেছিল যে, বিবেকানন্দের একটা পরস্পরবিরোধী দ্বৈতব্যক্তিত্ব আছে; অথবা ডাঃ ব্যারোজেরই ন্যায় স্বামীজীর বিরুদ্ধপক্ষীয়েরাও স্বামীজী পুনঃপুনঃ ঐ বিষয়ে যেসব কথা বলিয়াছেন তাহার সামূহিক রূপ ও মর্ম চাপিয়া গিয়া এমন কতকগুলি কথা প্রচার করিয়াছিলেন যাহা তাঁহাদের দৃষ্টিতে স্বামীজীর মত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। আমেরিকার হাসি-ঠাট্টার মধ্যে যেসব শুষ্ক ব্যঙ্গবিদ্রূপ আছে এবং যাহা ভদ্রলোকেরাও প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ বিদেশীর পক্ষে ঐগুলির ব্যবহার নিরাপদ নহে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ইংরেজী শব্দ প্রয়োগের উপর এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতা থাকায় তিনি অনেক সময় অনুপযুক্ত স্থলে বা রুচিবিগর্হিতরূপে ঐগুলি উদ্ধৃত করিতে প্রলুব্ধ হইতেন; আবার ইহাও সত্য যে, তিনি যদিও সর্বদা আত্মসংযমপরায়ণ তথাপি অত্যধিক উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে তিনি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তিনি সর্বদাই ন্যায়নিষ্ঠ এবং আমি এমন সব বিরুদ্ধাচারীর কথা বলিতে পারি, যাঁহারা দোষারোপ করিতে গিয়া ন্যায় ও সত্য বর্জন করেন। খ্যাতিমান ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীদের মধ্যে আবেগশীল নরনারীকে আকর্ষণ করিবার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বিবেকানন্দও সে ক্ষমতার অধিকারী, অথচ বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ইহা গৌরবেরই বিষয় যে, তিনি আপনার অন্ধানুসরণের অবকাশ না দিয়া স্থলবিশেষে বরং কঠোর ভাষার আশ্রয় লইয়া থাকেন।

"আমেরিকার যেসব গৃহে বিবেকানন্দ সাদরে গৃহীত হইয়া থাকেন, সেসব গৃহে স্থান পাইলে যে-কোন ব্যক্তি আপনাকে সম্মানিত বোধ করিবেন। স্বামীজীর বন্ধুগণ এই বিষয়ে ডাঃ ব্যারোজের সহিত একমত হইবেন যে, স্বামীজীর প্রতিভা আছে, কিন্তু ঐ প্রতিভা শুধু অমায়িকতাতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বুদ্ধিশক্তির বেলায়ও এমন এক প্রকৃত পণ্ডিতোচিত বিনয়-নম্রতার ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয় যাহা তাঁহাকে অহঙ্কার ও বৃথাদর্প হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতা লইয়া তিনি যে-ভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন, অল্প ব্যক্তিই সেরূপ করিতে সক্ষম; আবার আগ্রহশীল শিক্ষার্থীদিগকে তিনি এমন এক দার্শনিক বিশ্লেষণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন যাহার ভিত্তিতে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক মতবাদসহ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; আধ্যাত্মিক ভূমিতে তাঁহার এমন এক শিশুসুলভ সারল্য আছে, যাহা তাঁহাকে স্বদেশের লোক-সমাজের সুপ্রিয় সেবক বলিয়া পরিচিত করিবে।

"যে সকল কর্মী ন্যায়সঙ্গতরূপেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণে ও সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যখন সাম্প্রতিক রীতিরই অনুসরণক্রমে অপর মতাবলম্বীর সহিত কি কি বিষয়ে মিল আছে তাহার দিকে দৃষ্টি না দিয়া অভ্যাসবশতঃ নিন্দায় মাতিয়া উঠেন ও অবিমৃশ্যকারিতাপূর্ণ সন্দেহের পরিচয় দেন, তখন তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতে সত্যই দুঃখ হয়। ডাঃ ক্লার্ক, ডাঃ ব্যারোজ ও অপরেরা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যের যেসব বিষয় লইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন, সেইসব বিষয়ে তিনি এদেশে ও সেদেশে যেসব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতি পাঠাইলাম। আপনি এইগুলিকে বা তাঁহার সম্বন্ধে আমার মতকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।"

"পুনশ্চ: স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব অচিরস্থায়ী—ডাঃ ব্যারোজের এই মতটি যেমন ভ্রমপূর্ণ ঠিক তেমনি প্রমাদগ্রস্ত এই মন্তব্যটি যে, স্বামীজী তাঁহার

পাশ্চাত্যের সাফল্য বা ব্রতোদ্‌যাপন সম্বন্ধে কোন অত্যুক্তি করিয়াছেন। বিবেকানন্দ ইওরোপীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ফিরিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে ; এবং পুনর্বার স্বাস্থ্যলাভ করিতে না করিতেই যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বহু জরুরী কার্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে, ইহা হইতেই আমার এই কথা প্রমাণিত হয়। আমি বিশ্বাস করি—তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি ধর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত যে-কোন কর্মীকে সেদেশে সাদরে আহ্বান করিতে প্রস্তুত।

"জার্মান পণ্ডিতবৃন্দ, প্রাচ্যবিদ্ ইংরেজ বিদগ্ধসমাজ ও আমাদের স্বদেশের এমার্সন ইহা প্রমাণসহ বলিয়া স্বীকার করেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিন্তার মধ্যে বৈদান্তিক ভাবরাশি আক্ষরিক অর্থে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। এবং শুধু এই অর্থেই বিবেকানন্দ ইহা বলিতে পারিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তি বেদান্তবাদী ; কারণ ঐ দর্শনমধ্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব।" (ইংরেজী জীবনী, ৫১৩-১৪)।

এই প্রসঙ্গের শেষে আমরা স্বামীজীর ২।৩।৯৮ তারিখের পত্রাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, কেন স্বামীজী ব্যারোজের সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল : "লণ্ডন থেকে ফিরে এসে যখন আমি দক্ষিণ ভারতে···শরীরে এল সম্পূর্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ। আমাকে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উত্তরাঞ্চলে আসতে হ'ল ; একদিন দেরি করা মানে অন্য জাহাজ ধরবার জন্য সেই প্রচণ্ড গরমে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা। কথায় কথায় বলছি—আমি পরে জানতে পেরেছি যে, মিঃ ব্যারোজ পরদিন মাদ্রাজ এসে পৌঁছে-ছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশামত আমাকে সেখানে না পেয়ে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন —যদিও আমি তাঁর থাকবার জায়গার ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলাম। বেচারী জানে না আমি তখন মরণাপন্ন।"

নির্দেশিকা